হিমালয়

শঙ্কু মহারাজ



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৮৭

প্রচ্ছদপট ঃ
কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিস্তা
অঙ্কন ঃ মণি সেন
(শিল্পীর কন্যা শ্রীমতী নীলিমা রায়ের সৌজন্যে)
বিন্যাস—পূর্ণেন্দু রায়

HIMALAYA VOL II
A collection of travelogues on The Himalayas (Vol II) by Sanku Maharaj.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyamacharan
Dey Street. Kolkata - 700 073

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১-এ বি. বি. গাঙ্গুলী
স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

'উত্তরস্যাং দিশি' তথা 'হিমতীর্থ হিমাচল' ও 'মানালীর মালঞ্চে' এবং 'লীলাভূমি লাহুল' এই তিনখানি রচনায় চাম্বা কুলু ও লাহুল অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'হিমালয়' গ্রন্থের এই পর্ব উপরোক্ত গ্রন্থগুলির সম্পূর্ণ সংকলন।

'হিমালয়' এই পর্বে রয়েছে ডালহাউসী, খাজিয়ার, চাম্বা, ছাতরারী, ভারমৌর, মণিমহেশ, বশিষ্ঠকুণ্ডু, মানালী, নাগর, কুলু, মণিকরণ, যোগীন্দর নগর, রোতাং গিরিবর্ত্ম, খোক্‌সার, শিশু, গোন্ধলা, তাণ্ডি, থিরোট, ত্রিলোকনাথ, কেলং প্রভৃতি রমণীয় স্থান এবং মহিলা লাহুল পর্বতাভিযানের কথা। অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বৈচিত্র্যময় অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী এই 'হিমালয়'।

সূচীপত্র

ভূমিকা

"হিমালয়! ঋষিদের তপোভূমি। এখানেই বেজেছিল একদিন রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যমধুর মোহন বাঁশি। এখানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। এই সেই বেদবেদান্তের উৎসক্ষেত্র—পাণ্ডবদের লীলাস্থলী।...হিমালয় ভারতবর্ষের রত্নমণি, বিশ্বের ঐশ্বর্যভাণ্ডার, স্বর্গারোহণের পবিত্র প্রতীক।"

বিশ্ববিখ্যাত রুশ চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ লিখেছিলেন এই হিমালয়-প্রশস্তি ('উত্তরস্যাং দিশি'-র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কুলু থেকে মানালী যাওয়ার পথে নাগর উপত্যকায় স্থাপিত নিকোলাস রোয়েরিখের বাসগৃহ ও শিল্পসদন দেখে লেখক শঙ্কু মহারাজ স্মরণ করেছেন ভারতপ্রেমিক প্রকৃতিপ্রেমিক হিমালয়প্রেমিক রোয়েরিখের এই কথাগুলি। তাঁর এই স্মৃতিচারণার কয়েকবছর পরে আর-এক বিমুগ্ধ বিকেলে ম্যাগনোলিয়ার সুবাসে-আমোদিত সেই একই নাগর-শিল্পসদনে দাঁড়িয়ে অপরাহ্নের রোদে-রাঙা দিগন্তবিহারী শৈলরাজের স্তম্ভিত মহিমা দেখতে দেখতে আমারও মনে হয়েছিল নগাধিরাজের এই সমুন্নত ঐশ্বর্যসম্পদ আজ স্বচক্ষে দেখতে পেলাম আমি, আমি ধন্য।

১৩৮১-এর আশ্বিনে শঙ্কু মহারাজের 'হিমালয়' ভ্রমণকাহিনী সংকলনের একটি খণ্ড প্রকাশের পরেই ভ্রমণকাহিনীপ্রিয় পাঠকসমাজে সেটি সমাদৃত হয়। সেটি ছিল গোমুখী ও রূপকুণ্ড পর্ব। 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে', 'গহন-গিরি-কন্দরে' ও 'গিরি-কান্তার' এই তিনখানি গ্রন্থে লেখক তাঁর ভ্রাম্যমাণ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে ভয়ংকরমহিম গোমুখী থেকে চতুরঙ্গী পর্যন্ত পর্যটনবৃত্তান্ত, কুমায়ুন উপত্যকা পরিক্রমকথা এবং রূপকুণ্ড অভিযানের কাহিনী পরিবেশন করেছিলেন। হিমালয় বিষয়েই এ যাবত শঙ্কু মহারাজের কমপক্ষে তেরোটি বই বেরিয়ে গেছে—সুতরাং হিমালয়-ভ্রমণের ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও অধিকার তর্কাতীতভাবেই প্রতিষ্ঠিত। সেইদিক থেকে 'হিমালয়' শিরোনামে বর্তমান সংকলনটি খুবই সমীচীন ও প্রাসঙ্গিক। 'হিমালয' নামক এই দ্বিতীয় সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে 'উত্তরস্যাং দিশি' ও 'লীলাভূমি লাহুল' নামের দুটি গ্রন্থ। গ্রন্থদুটি ইতিপূর্বেই পাঠকদের সমাদর পেয়েছে। 'উত্তরস্যাং দিশি' সম্ভবত ১৩৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর গ্রন্থটিকে লেখক দ্বিখণ্ডিত করেন ভ্রমণের পর্বভেদে। প্রথম অংশ আত্মপ্রকাশ করে 'হিমতীর্থ হিমাচল' নামে, তাতে আছে চাম্বা অঞ্চল অর্থাৎ ডালহাউসী, খাজিয়ার, চাম্বা, ছাতরারি, ভারমৌর ও মণিমহেশের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা। আর 'মানালীর মালঞ্চে' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কুলু-মানালী ও মণিকরণ ভ্রমণের বিবরণ। 'হিমালয়' নামক বর্তমান সংকলনে 'উত্তরস্যাং দিশি' অবশ্য অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়েছে—সুতরাং হিমালয়নিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে একই গ্রন্থ-পরিবহণে দুই সন্নিহিত উপত্যকা পরিক্রমণ করা আবার সহজ হয়ে গেল। তাছাড়া এক মলাটের আশ্রয়ে বাঁধা 'উত্তরস্যাং দিশি' নতুন করে পড়ার আরও একটু মজা আছে। একটু সতর্ক মন নিয়ে পড়লেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন, এই বইটিতে বেশ একটি নতুন ধরনের পরীক্ষামূলক বিবরণ আছে। চাম্বা ও কুলু এই দুটি উপত্যকার মধ্যে লেখক চাম্বা-ভ্রমণ করেছেন আগে, তারপর কুলু। উভয়ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রমণসঙ্গীও পৃথক। কিন্তু বই শুরু হয়েছে কুলু ভ্রমণের কাহিনী নিয়ে। সে কাহিনীতে যেমন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে, তেমনি একটি মিলন-বিরহের লীলাময় উপকাহিনীও গড়ে উঠেছে। এই দিক থেকে কুলু-মানালী-মণিকরণ ভ্রমণের ইতিবৃত্ত নিছক পর্যটন-বৃত্তান্ত নয়—

তা একটি রমণীয় উপন্যাসও বটে। আবার সেই উপন্যাসে লেখক তাঁর নায়িকার সঙ্গে ভ্রমণ ও হৃদয়বিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর পূর্বাবসিত চাম্বাভ্রমণের বিবরণ শুনিয়েছেন। অর্থাৎ ভ্রমণ-ব্যাকরণে 'উত্তরস্যাং দিশি' যুগপৎ ঘটমান বর্তমান ও পুরাঘটিত বর্তমানের যুগল-মিলন।

'উত্তরস্যাং দিশি' পড়ার আগে পাঠকদের মনে রাখতে হবে, কেবল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও রমণীয়দর্শন কিছু শৈলাবাসে টুরিস্ট-সমাগমের সৌকর্যেই হিমালয়-পর্যটকরা কলম ধরেন না। বিশাল-ভয়ংকর হিমালয়ের অধিকাংশ স্থানই রীতিমত দুর্গম, অতি দুরারোহ-দুশ্চর ও পদে পদে মৃত্যুশঙ্কাতুর। কিন্তু সেই দুর্বিনীত দুর্ধর্ষকে অতিক্রম করে যাঁরা অভীষ্টে পৌঁছতে পারেন, হিমালয় তাঁদের জন্য দেয় অভাবনীয় পুরস্কার। ভয়াল রহস্যের সঙ্গে সম্মিলিত সুন্দরের সেই মহোৎসবে পথিকের নরজন্ম সার্থক হয়। পথের নেশায় শুধু পাথেয় ক্ষয় করাই যথেষ্ট নয়—পথপ্রান্তরে সেই বিস্ফার বিস্ময়কে দুচোখ ভরে দেখাতেই ভ্রমণের শেষ পূর্ণতা ঘটে। অন্তত শঙ্কু মহারাজের সেই বিশেষ সৌন্দর্যদৃষ্টিটিই পাঠক হিসেবে আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। এই কাহিনীতে মণিমহেশ তীর্থের বর্ণনায়, খাজিয়ার বশিষ্ঠকুণ্ড-পাঙ্গী উপত্যকার পথে পথে, বিপাশা-ইরাবতী পার্বতীর কলতানে, কুলুর শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত মৃৎসত্রে তিনি যে সৌন্দর্যসূত্রগুলি ক্ষণে ক্ষণে সংগ্রহ করেছেন, তার তুলনা হয় না। শুধু 'উত্তরস্যাং দিশি' কেন, 'লীলাভূমি লাহুলে'র কথাই ধরা যায়। এই বই পড়ে ভ্রমণরসিক পাঠকমাত্রই এমন একটি দুরত্যয় উপত্যকার সাক্ষাৎ পরিচয় পাবেন, যার সুষমা নেই, কিন্তু সেই রিক্ততার একটি মহান গরিমা আছে। লাহুল হিমালয়ের অঙ্গ হলেও এ যেন এ যাবত-পরিচিত হিমালয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক হিমালয়—শূন্যতাই যার গৌরব, তরুবিরল শ্যামহীন নির্হরিৎ রুক্ষতার শোভায় যে অতুলনীয়। বিঘ্ন-বিপদের সন্ত্রস্ততার মধ্য দিয়ে সুন্দরের অভিসার—শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণবার্তায় এই চরম অভীষ্টের সন্ধানই আমাদের পরম প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

চাম্বা ও কুলু হিমাচল প্রদেশের এই দুটি নয়ননন্দন উপত্যকা দীর্ঘকাল দেশী ও বিদেশী পরিব্রাজকদের আকর্ষণ করেছে। চাম্বার দুর্গমতম তীর্থ মণিমহেশ। অনেক কাহিনী-কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে একে নিয়ে। কিংবদন্তী আছে বিধর্মী অত্যাচারে বাবা অমরনাথ স্বয়ং মণিমহেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মণিমহেশের শিবালয়-মন্দির, কৈলাসাকৃতি শৃঙ্গ, পাদদেশে মানস সরোবর ও রাবণহ্রদ তুল্য ছোট গ্লেসিয়ার ও সরোবরের অস্তিত্ব স্বভাবতই এই ধরনের লোকশ্রুতির হেতু হয়েছে। মণিমহেশের মতো রম্যদুর্গম অঞ্চলের বিবরণ বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে কমই চোখে পড়ে। অবশ্য লেখকের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার দেড় দশক পরে সেখানকার পথ এখন অনেকটাই সুগম হয়েছে। এর উপর আবার লেখকের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে আমরা চাম্বা রাজ্যের অবসর-বিনোদন কেন্দ্র খাজিয়ার, বৈচিত্র্যময় পাঙ্গী উপত্যকা, পথে পথে কলমন্দ্রমুখরা ইরাবতী, শান্তসুন্দর চৌঘান, স্তব্ধগম্ভীর নাগর, ছাতরারির প্রসন্ন জনপদ, দুগেঠীর নীলকান্ত আকাশ—দেখতে দেখতে যাই। তালিকা শেষ হতেই চায় না। এত দেখার আনন্দ, এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সঞ্চয়ের এত অফুরান ভাণ্ডার শঙ্কু মহারাজ আমাদের জন্যে উন্মোচিত করে দেন যে, নিতান্ত ভ্রমণ-উদাসীন গৃহস্থও এক অচেনা পৃথিবীর পর্বতকন্দরে, বনে বনে, অপরিচিত শৈলশৃঙ্গে, তরুণিম সানুদেশে, নর্মলীলাময় উষ্ণকুণ্ডে, হিমকান্ত শিখরমালায় অক্লান্ত অবকাশে আচ্ছন্নের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। শঙ্কু মহারাজের বইগুলির অন্যতম গুণ এগুলির সুখপাঠ্যতা। এমন অনর্গল কথকতা, ইতিহাস ভূগোল নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্বের সঙ্গে সরস সাহিত্যের এমন সমাবিষ্ট সমাস যে-কোনো পাঠককেই

দীর্ঘক্ষণ অভিভূত করে রাখে—মনেই হয় না লেখকের অগাধ নিপুণ সযত্ন পরিশ্রম থেকে এগুলি সংকলিত। তাছাড়া প্রতি জনপদ মন্দির বা পার্বত্য প্রদেশ সম্পর্কে তাঁর সংগৃহীত কিংবদন্তী জনশ্রুতি বা লিজেণ্ডগুলি লোকসংস্কৃতির একটি অনালোকিত অধ্যায়কেও পূর্ণ করে তুলেছে। চাম্বা উপত্যকার চৌতড়া মন্দিরে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি দর্শন করে লেখক লিখেছেন—"দেবী দশভূজা বাঙালীর পরমারাধ্যা। বাংলা থেকে হিমাচল বহুদূর। কিন্তু দেবী এখানেও পরমারাধ্যা। মানুষে মানুষে কত পার্থক্য, কিন্তু কী নিবিড় ভাবগত ঐক্য! ভক্তির অচ্ছেদ্য বন্ধনই এই বিরাট ও বিচিত্র দেশের মিলনসূত্র। ধর্মই ভারতকে মহাভারতে পরিণত করেছে।"

এই অখণ্ড ভারতচেতনাও শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণসাহিত্যের আর একটি প্রসাদগুণ।

সকলেই জানেন, বাঙালীর ভ্রমণের নেশা খুবই তীব্র। আজকাল পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি হৃষ্টপুষ্ট সংখ্যার কিছু শিক্ষিত মানুষ, শহর মফস্বল যেখানেই থাকুন না কেন, বছরের কোনো-না-কোনো সময় দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে ভালবাসেন। এই কারণেই গ্রীষ্ম বা পূজোর ছুটিতে ট্রেনে রিজার্ভেশনের টিকিট মেলে না, এই কারণে শহর কলকাতায় এবং এমনকি মফস্বল শহরগুলোতেও অসংখ্য টুরিস্ট ট্রাভেল্ কোম্পানি গজিয়ে উঠেছে, ভ্রমণনির্দেশক বইয়ের সংখ্যাও এখন বাংলা বইয়ের বাজারে কম নয়, পত্রপত্রিকাতেও ভ্রমণ স্পেশাল বেরোয়। শুধু ভ্রমণ বিষয়েই একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মোটের উপর আমাদের ভ্রাম্যমাণতার মানসিকতা যে ক্রমস্ফীতকায় তাতে সংশয় নেই। আমরা এখন শুধু মুখে নয়, গায়ে-পায়েও হিল্লি-দিল্লি সত্যিই মারতে শিখেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির দৌলতে এখন 'মনসা' নয়, ধনের বিনিময়েই মথুরা-গমন নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। আর হিমালয় তো আমাদের কাছে চিরকালের সেরা তীর্থ। গৃহবলিভুক্ বা বাজারথলিমুখ বাঙালীর পক্ষে এই পক্ষবিস্তার জাতিগতভাবে নিশ্চয় অভাবনীয় ও নতুন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে অবশ্যই বাঙালীর এই দেশচারিতায় খুশি হতেন। জলধর সেনের হিমালয়বিষয়ক গ্রন্থ ১৯০০ সালে প্রথম প্রকাশের পর পাঁচ বছরের মধ্যেও সংস্করণ হয়নি। কিন্তু একালের ভ্রমণ-বিষয়ের বইয়ের বছর-শেষে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। ভ্রমণকে কেন্দ্র করে রীতিমত একটা বাণিজ্যধারা আর একটি সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে—দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ ঘটে খুবই কম। সাহিত্যমুখী ভ্রমণে উপন্যাসের স্বাদ পাওয়া যায়, থাকে রম্যরচনার স্বাদুতা, আত্মস্মৃতির মন্ময়তা। তাছাড়া বহু ইতিহাস-ভূগোল-পুরাণ-লোকশ্রুতির তথ্য ও কাহিনীকে তাঁরা মনোরম ভঙ্গিতে বিবৃত করেন। আর বাণিজ্যধারার ভ্রমণ কেবলই পথনির্দেশ, কেবলই বৈষয়িক অভিজ্ঞতার পণ্যতন্ত্র।

তবে সাময়িকতার এই পর্যটন-উপসর্গ শেষ পর্যন্ত স্বভাব-অলস বাঙালীর চরিত্রে দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা জানি না। কিন্তু যথার্থ ভ্রমণসাহিত্যের পাঠক সাময়িক নির্দেশিকার স্তূপ থেকে নিত্যপ্রিয় সাহিত্য যাতে খুঁজে পান, মিত্র ও ঘোষের জহুরি প্রকাশকগণ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। শঙ্কু মহারাজের 'হিমালয়' নামক সংকলনের এই দ্বিতীয় শৃঙ্গটি উদ্যমী সাহিত্যারোহী পাঠকগণ যে অনায়াসে জয় করে নেবেন, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই।

উত্তরস্যাং দিশি

হিমতীর্থ হিমাচল ও মানালীর মালঞ্চে

[ডালহাউসী, খাজিয়ার, চাম্বা, মণিমহেশ, রোতাং গিরিবর্ত্ম, মানালী, নাগর, কুলু, মণিকরণ ও যোগিন্দর নগর।]

মানসীকে

॥ এক ॥

কার কথা বলব ? আমার, মানসীর, না হিমাচলের ?

আমার কথা থাক। মানসীর কথা দিয়েই শুরু করা যাক। আর তার কথা বললে যে হিমাচলের কথাও বলা হবে। আমার কাছে মানসী আর হিমাচল এক হয়ে আছে।

মানসী হাসে। কিন্তু এ হাসি যেন কান্নারই রূপান্তর। এমন করুণ হাসি আমি বেশি দেখি নি। আমি চুপ করে থাকি।

মানসী কথা বলে, "কি হবে আমার কথা শুনে ? তার চেয়ে আপনার কথা বলুন। হিমাচলের কাহিনী বলুন।"

"হিমাচলের কাহিনী তো যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো সময় শোনাতে পারব। কিন্তু আপনার কথা শোনার সময় ও সুযোগ হয়তো জীবনে আর নাও পেতে পারি।"

"না পেলেই বা দুঃখের কি ? কত মানুষের কথাই তো আপনার অজানা রয়ে গেল।" কণ্ঠস্বরকে সহজ ও স্বাভাবিক করে বলে ওঠে, "অযথা সময় নষ্ট করবেন না তো ! এবার আমার আর ওপরে যাওয়া হবে না। এখান থেকেই ফিরে যেতে হচ্ছে কলকাতায়। তাই শুনতে চাইছি হিমাচলের কাহিনী। শুনতে চাইছি মণিমহেশ আর রোতাং গিরিবর্ত্মের কথা।"

"ফিরে যাচ্ছেন কেন ?" প্রশ্ন করি।

"আসার সময় বাবার শরীরটা ভাল দেখে আসি নি। কাল বাবাকে নিয়ে খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। তার বুকের ব্যাথাটা বেড়েছে, সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই ভাবছি এখান থেকেই ফিবে যাব। এ সংসারে যে বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।" মানসী আবার হাসে। তেমনি করুণ হাসি।

আমি চুপ করে থাকি। নিঃশব্দে পথ চলি আর ভাবি মানসীর কথা। মাত্র কিছুক্ষণ আগে পরিচয় হয়েছে তার সঙ্গে। লাহুল উপত্যকা দেখে আজই বিকেলে ফিরে এসেছি মানালী। যাবার সময় ঠিক ছিল না ফিরে আসার দিন। তাই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে যেতে পারি নি। ট্যুরিস্ট্ রিসেপশান অফিসার বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই তিনি আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেবেন। কিন্তু মানালী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখলাম—ট্যুরিস্ট্ অফিস বন্ধ। বিস্মিত হয়েছিলাম, তখনও পাঁচটা বাজে নি। আমার অভিযোগের উত্তরে জনৈক ভদ্রলোক জানালেন, আজ রবিবার। লজ্জা পেলাম। হিমালয় পরিক্রমাকালে দিন ও তারিখের হিসেব ঠিক থাকে না।

রিসেপ্শান অফিসারের সঙ্গে দেখা হল না। আশ্রয় মিলল না। তাই অসহায় অবস্থায় মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বাসস্ট্যান্ডে। আর সেখানেই দেখা হল মানসীর সঙ্গে।

তখন কিন্তু বুঝতে পারি নি সে বাঙালী। স্ল্যাক্স পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েকটি পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে। ওরা কিন্তু আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিল, আমি নিরাশ্রয় পর্যটক। তাই ওরা আমার কাছে এসে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি ট্যুরিস্ট্ ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় উঠবেন ?'

'তাই তো ভাবছি।' অবস্থাটা বললাম ওদের। ওরা বলল, 'কাল ট্যুরিস্ট্ অফিস খুললে ঘর পেয়ে যাবেন। কিন্তু আজ রাতটা কোথায় কাটাবেন ?'

মানসী সহসা বলে উঠেছিল, 'আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারেন।'

'কোথায় ?' আমি হালে পানি পাই।

'কাছেই। মানালী স্কুলের হলে। আমরা সেখানেই আছি।'

আমি সম্মত হয়ে গেলাম। নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল। আর জায়গাটা না দেখে কানা-মামাই বা বলি কেমন করে ?'

মনসীর সঙ্গীরা আমার মালপত্র ধরাধরি করে নিয়ে গিয়েছে মানালী স্কুলে। আমার প্রশ্নের উত্তরে একটি ছেলে জানিয়েছে, তারা সবাই চণ্ডীগড় কলেজের ছাত্র। হাইকিং করতে এসেছে। কাল রোতাং গিরিবর্ত্ম দেখতে যাবে।

কথায় কথায় একটি ছেলে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন।'

'এখন লাহুল উপত্যকার সদর কেলং থেকে। এর আগে ডালহাউসী, খাজিয়ার ও চাম্বা হয়ে মণিমহেশ গিয়েছিলাম।'

'সে কথা নয়।' ছেলেটি বলেছিল, 'মানে আমি জানতে চাইছি আপনি কোথাকার লোক ?'

খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। চুল দাড়ি আর পোশাকের কৃপায় পরিচয় হারিয়ে গেছে। হেসে জবাব দিয়েছিলাম, 'কলকাতার।'

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বিস্মিত করে বাংলায় বলে উঠেছিল মানসী, 'আপনি বাঙালী ?'

'হ্যাঁ। আপনি ?'

'আমার নাম মানসী মুখোপাধ্যায়।'

'আপনি কোথায় থাকেন চণ্ডীগড় ?'

'না। কলকাতায়।'

'আপনি এদের সঙ্গে ?'

'আমি আপনারই মতো এদের অতিথি। কাল বিকেলে এখানে এসে দেখি শনিবার বলে ট্যারিস্ট্ অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। এই ভাবেই ওরা আমাকেও পথ থেকে স্কুলে নিয়ে গেছে।'

'আপনার সঙ্গে আর কে কে আছেন ?'

'কেউ নেই। আমি একা। তাই একাই হিমালয়ের পথে বেরিয়েছি।'

ওর কথা শুনে আমি কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই তখন আর কোন কথা বলতে পারি নি। তবে মানসীর কথা ভেবে বিস্মিত বোধ করেছিলাম। বয়সে সে কলেজের ছেলেদের চেয়ে বড়। ওরা তাকে দিদি বলেই ডাকে। তবু সে সুন্দরী যুবতী। একটি বাঙালী মেয়ে কেমন করে এতগুলো অপরিচিত পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে এভাবে অসংকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক ঘরে রাত্রিবাস করছে ?

বাসস্ট্যান্ডের অনতিদূরেই স্কুল। বেশ বড় বাড়ি। সারি সারি ঘর। দুদিকে বারান্দা। সামনে খেলার মাঠ। ছেলেরা ভলিবল খেলছিল।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠেই ডান দিকে হল ঘর। সেই ঘরে ঠাঁই নিয়েছে চণ্ডীগড় কলেজের ছেলেরা। ঘরের এক পাশে কয়েকখানি বেঞ্চি জড়ো করে রাখা হয়েছে। বাকি

অংশে এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে ছেলেদের বিছানা। অপর দিকের মাঝামাঝি জায়গায় একটি মাত্র শয্যা। পাশেই একটা কালো ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের ওপরে আয়না চিরুনি ও প্রসাধন সামগ্রী। বিছানার ওপরে খানকয়েক শাড়ি ও মেয়েদের জামা ইত্যাদি। ও-পাশে জলের বোতল ক্যামেরা ও একটি বৃহদায়তন লেডিজ ব্যাগ।

নিজের বিছানার পাশেই আমার মালপত্র নামাতে বলে মানসী। ছেলেরা হাসে। বলে, 'আজ আর দিদিকে পায় কে ? আজ সে নিজের জন পেয়ে গেছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না দিদি !'

'ভুলে তো যাই নি ভাই। কোনদিন ভুলতে পারবও না তোমাদের। আর নিজের জনের কথাই যদি বল, তাহলে বলব—কে নিজের আর কে পরের, তা যে আজও নিশ্চয় করে বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে এখানে আমার, তোমাদের চেয়ে বেশি আপনার কেউ নেই।'

আমি আমার মালপত্র গুছিয়ে নিলাম। মানসীর বিছনার কাছেই আমার এয়ার ম্যাট্রেস পাতলাম।

একটু বাদে ছেলেরা তাদের রান্নার তদারকিতে লেগে যায়। ওরা সুইট-রাইস অর্থাৎ গুড় মেশানো ফেনা ভাত ও আলু-টমাটোর তরকারি রান্না করবে। আমি একমনে ওদের আয়োজন দেখছিলাম। ভালই লাগছিল দেখতে। হঠাৎ ধমক লাগায় মানসী, 'বসে বসে ওদের রান্না দেখলেই নিজের পেট ভরবে, না হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে খেতে যেতে হবে।'

ঘড়ির দিকে তাকাই—মোটে সাতটা বাজে। এখনই খেতে যাব কি ? আর তার দরকারই বা কি ? এখানে হোটেল খোলা থাকে রাত নটা পর্যন্ত। তবু কোন কথা বলি না। হিমালয়ের পথিক হলেও মানসী নারী। শাসন করা যে তার জন্মগত অধিকার।

স্কুলের পেছন দিকের বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসি। তারপরে বলি, 'চলুন, কোথায় যেতে হবে ?'

'জানান্নামে নয় নিশ্চয়।' মানসী উঠে দাঁড়ায়। ব্যাগটা হাতে নেয়।

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'গেলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। যার চাল-চুলো কিছুই নেই, তাকে নিয়ে যেখানেই যেতে চান, সে সানন্দে সঙ্গী হবে।'

কার্ডিগ্যানটা গায়ে দিয়ে মানসী একটি ছেলেকে বলে, 'আমরা খেতে যাচ্ছি। তোমাদেরও খাওয়া হক। তারপরে ক্যাম্প-ফায়ার আরম্ভ করা যাবে।'

'ক্যাম্প-ফায়ার হবে নাকি ?' জিজ্ঞেস করছিলাম।

মানসী উত্তর দিয়েছে, 'হ্যাঁ, কালও অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হুল্লোড় করেছি আমরা।'

স্কুলের মাঠ পেরিয়ে আমরা দুজনে বেরিয়ে এসেছি পথে। পথ নয় পাথরের আলো-আঁধারি গলি। অবশ্য গলিতে রাস্তার আলো না থাকলেও আকাশের কিছু আলো আছে। আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ, ভাদ্রের শুক্লাষষ্ঠী আর এক মাস বাদে দেবী দশভূজা আবির্ভূতা হবেন। তাই বাংলার বাতাসে এখন দেবীর আগমনী সুর বেজে উঠেছে, ঘরে ঘরে জেগেছে উৎসবের ধ্বনি।

ছোট গলি ছাড়িয়ে আমরা বড় রাস্তায় এসেছি। আলো ঝলমল এই রাজপথটুকুই মানালীর প্রাণকেন্দ্র। পথের এক পাশে দোকান হোটেল রেস্তোরাঁ, ট্যুরিস্ট-অফিস ডাকঘর প্রভৃতি। আর এক পাশে সিভিল রেস্টহাউস বাসস্ট্যান্ড ও থানা। মাইল খানেক পথ জুড়ে এদের বিস্তার। মূল পথটি এখানে এসেছে কুলু থেকে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে দু ভাগে বিভক্ত হয়েছে। বাঁ দিকের পথটি দেওদার বন ও আপেল বাগানের পাশ দিয়ে উঠে গেছে ওপরে। চলে গেছে ফরেস্ট রেস্ট-হাউস ও ট্যারিস্ট্-বাংলায়। চলে গেছে আরও ওপরে।

ডানদিকের পথটি বাসপথ। বাসস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে থানার গা ঘেঁষে নেমে গেছে বিপাশার তীরে। বিপাশা পেরিয়ে উত্তরে রাহালা ও দক্ষিণে নাগরে।

বড় রাস্তায় এসে ঘড়ি দেখেছিল মানসী। বলেছিল, 'আটটাই বাজে নি দেখছি, এখনই খেয়ে নেবেন ? তার চেয়ে চলনু না খানিকটা পায়চারি করা যাক, ভারী সুন্দর পথ।'

'বেশ তো চলুন। তবে সেই সঙ্গে যদি আমার একটা অনুরোধ রাখেন, বাধিত হব।' বলেছিলাম আমি।

'কী ?'

'আপনাকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। যদি আপত্তি না থাকে বলুন না আপনার কথা।'

মানসী হেসেছিল বড়ই করুণ সে হাসি। আমি চুপ করে ছিলাম, মানসী কথা বলেছিল— কি হবে আমার কথা...

কিন্তু সে-কথা তো বলা হয়েছে আমার।

আমরা নিঃশব্দে পথ চলেছি। মানলী থেকে কুলুর পথ। বাঁ দিকে বন-বিভাগের রিজার্ভ ফরেস্ট, ডানদিকে বাড়ি-ঘর। রাত হয়ে গেছে, যান-বাহন ও পথচারীর সংখ্যা কমে এসেছে। আমরা পাশাপাশি পথ চলছি।

মানসী কথা বলে, 'বলুন না হিমাচলের কথা। জানেন হিমালয় আমার কাছে কেবল পবিত্র ও সুন্দর নয়, সে আমার শান্তির আলয়। তাই তো প্রতিবার বাবাকে একা ফেলে, একা একা চলে আসি হিমালয়ে। হিমালয় আমার সকল দুঃখ হরণ করে, সব ব্যথা আর বেদনাকে ভুলিয়ে দেয়। আমি সবুজ ও সতেজ মন নিয়ে বাবার কাছে ফিরে যাই।' একবার থামে মানসী। তারপরে কণ্ঠস্বরে দাবির পরশ মাখিয়ে আবার বলে, 'চুপ করে আছেন কেন,বলুন ডালহাউসী আর খাজিয়ারের কথা।'

আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। বাধ্য হয়ে শুরু করতে হয় আমাকে, 'ঠিক এক মাস আগে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি। রেলে পাঠানকোটে এসে সেদিনই আমরা ডালহাউসী আসি। সেখান থেকেই আমার এই হিমাচল পরিক্রমা আরম্ভ হয়েছে। কাজেই ডালহাউসীকে দিয়েই শুরু করা যাক।'

'বেশ তো করুন,' মানসী বলে, 'কিন্তু আপনার সঙ্গীরা কোথায় ?'

'স্পিতি উপত্যকায়।'

'আপনি সেখানে না গিয়ে এখানে চলে এলেন কেন,'

'প্রত্যক্ষ কারণ অনেকগুলি আছে। তবে পরোক্ষ কারণ হয়তো নিয়তি।'

'মানে ?'

'যদি বলি, আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হবে বলে।'

'বহুবচনের আড়ালে সত্যকে লুকোতে চাইছেন কেন ?'

'পাছে আপনি আপত্তি করেন, তাই।'

'ইস বিনয়ের অবতার। যাক্‌গে ও-সব বাজে কথা রেখে বলে ফেলুন তো আসল কারণটা।' মানসী যেন আদেশ করে।

হাসতে হাসতে বলি, 'যাবার পথে নাগর, কুলু, মণিকরণ ও যোগিন্দর নগর দেখে পাঠানকোট ফিরব বলে আমি আর স্পিতি উপত্যকার সদর কাজা যাই নি। ওরা কাজা

থেকে এখানে এসে সোজা পাঠানকোট চলে যাবে। সেখানেই ওদের সঙ্গে মিলিত হব আমি।'

'তাহলে আপনারা একসঙ্গেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন।' মানসী বলে।

'আপনি যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?'

'না।'

'কেন?'

'সে-কথা না শুনে ডালহাউসীর কথা বলুন, বাধিত হব।'

অগত্যা আমাকে শুরু করতে হয়—

সকাল ছ'টায় শেয়ালদা এক্সপ্রেস পাঠানকোট পৌঁছল। বেয়াল্লিশ ঘন্টার একঘেয়ে রেলযাত্রার যতি পড়ল। স্টেশন থেকে স্নান সেরে পেট পুরে খেয়ে নিয়ে আমরা এশিয়াটিক ট্রান্সপোর্টের বাসে উঠে বসলাম। আরও কয়েকটি কোম্পানীর বাস যায় ডালহাউসী। সকাল ন'টায় আমাদের বাস ছাড়ল।

প্রথমদিকে মসৃণ সমতল পথ। তারপরে শুরু হল চড়াই। যন্ত্রদানব আমাদের পিঠে নিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে পাহাড়ে উঠছে। আমরা হিমাচলে চলেছি।

পাঠানকোট থেকে ডালহাউসী ৫০ মাইল। ধৌলা ধার (২১,০০০ ফুট) গিরিশ্রেণীর এক প্রান্তে অবস্থিত ডালহাউসী। বিখ্যাত হিমালয় বিশারদ কেনেথ মেসন লিখেছেন, 'The two chief ranges of the Punjab lesser Himalayas are Pir Panjal and Dhaula Dhar....The Dhaula Dhar range, like the Zaskar a branch from the Great Himalaya....Dhaula Dhar is the densely wooded range of Kangra, drained and cut up by tributaries of the Beas and Ravi, It forms an imposing wall of precipitious rock north of Dharamsala, whose cantonments stand at 5000 feet on its Southern flanks.'

দুনেয়ার এসে বাস থামল। পাঠানকোট থেকে ২৮ মাইল। এ পথ ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক। ওপরের গাড়ি এসে পৌঁছয় নি। তাই বসে থাকতে হবে কিছুক্ষণ। বাস থেকে নেমে প্রাণভরে পাকোড়া আর চা খেলাম। পাঠানকোটে পেট ভরে খেয়েছি, এখন খিদে লাগার কথা নয়। খিদে লাগেও নি। তবু খেলাম। এ খাওয়া খিদের নয়, চোখের। এ খাওয়া খাওয়ার জন্য খাওয়া। খাওয়া আর দেখা ছাড়া আর যে কোন কাজ নেই হাতে।

পঁচিশ মিনিট পরে পথ মুক্ত হল। মুক্ত পথ দিয়ে মুক্তবিহঙ্গের মত এগিয়ে চলল বাস। আমরা দূর থেকে হিমালয়কে দেখলাম। প্রতিবারই তাকে এই ভাবে দেখি। কিন্তু প্রতিবারই আমার বিখ্যাত হিমালয় অভিযাত্রী স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ডের সেই উক্তি মনে পড়ে— 'Oh, yes! This really is. How splendid! How splendid! Life to me did indeed seem worth living.The world really was beautiful–something I could really love.'

বাণীক্ষেত ছাড়িয়ে বেলা একটার সময় আমরা ডালহাউসী পৌঁছলাম। পৌঁছলাম ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীন শৈলবাসে। *১৮৫১ সালে লর্ড ডালহাউসী এখানে একটি স্বাস্থ্যবাস নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ১৮৫৪ সালে স্বাস্থ্যাবাসটি নির্মিত হয়। সেই স্বাস্থ্যাবাসকে

* ভারতের প্রাচীনতম শৈলাবাস দার্জিলিং। ১৮৩৫ সালের ১লা ফেবুরারী সিকিমের মহারাজা একটি দানপত্র করে ইংরেজদের দিয়ে দেন।

কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই শৈলবাস। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ও জনগণমন-অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত শৈলাবাস।

দুজন কুলির পিঠে মালপত্র চাপিয়ে আমরা ট্যুরিস্ট্ রেস্ট-হাউসে আসি। মিউনিসিপ্যাল অফিসের সংলগ্ন এই আধুনিক বিশ্রামভবনটি স্বল্পস্থায়ী পর্যটকদের পক্ষে সুলভতম ও সুবিধাজনক আশ্রয়। পর্যটক কিংবা স্বাস্থ্যান্বেষীদের জন্য বহু আশ্রয় আছে এখানে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে আছে—গ্র্যান্ড ভিউ ও মাউনট ভিউ হোটেল আর ডালহাউসী ক্লাব। সুভাষ-চকে আছে—মেট্রো হোটেল। জেনারেল পোস্ট অফিসের কাছে—মেহরস্ হোটেল আর কহিনুর ম্যানসন্স। আছে—মালব্য রোডে ক্র্যাগ্স হোটেল আর কাছারী রোডে ক্লেয়ারস হোটেল। আছে—পি. ডাবলু. ডি. রেস্ট-হাউস আর ইউনিভারসিটি হলিডে হোম।

ট্যুরিস্ট রেস্ট-হাউসের দোতলায় ছ'খানি স্যুট। প্রতি স্যুটে একখানি বড় ও একখানি ছোট ঘর। সামনে খোলা বারান্দা, পেছনে বাথরুম। ঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা। আছে খাট আলমারী আলনা ও চেয়ার-টেবিল। চমৎকার বন্দোবস্ত। দেখে শুনে খুশি হল সুজয়া—আমাদের দলের একমাত্র সভ্যা। দলনেতা অসিতবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

গোছগাছ করে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেওয়া গেল। তার পরে চা ও খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। লালা লাজপৎ রায় রোড ধরে গান্ধী-চকে চললাম। ইরাবতী বিধৌত রমণীয় ডালহাউসীর আয়তন পাঁচ বর্গমাইল। পাঁচটি পাহাড় আছে এর মধ্যে—বালুন, কাঠলোগ, পোট্রেন, টেহরা ও বক্রোটা। এদের উচ্চতা পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার আট শ' ফুট।

বালুন পাহাড়ে আছে সেনানিবাস। বাজার, বাংলো, ব্যারাক, অফিস ও সিনেমা হল নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সেনানিবাস—স্বাস্থ্যাবাসও বটে।

কাঠলোগ পাহাড়ে আছে কাছারী, হাসপাতাল, ধর্মশালা, গুরুদ্বার, আর্যসমাজ ও রামচন্দ্রের মন্দির আর বিশ্ববিদ্যালয় হলিডে হোম। সুভাষ চক থেকে কাছারী রোড ধরে পৌঁছতে হয় সেখানে। সেখানে সবুজ-শান্ত-সুন্দর হিমালয় সব সময় সবাইকে অভিনন্দন জানায়।

তিব্বতী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার টেহরা পাহাড়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন—টিবেটান হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট সেন্টার। গালিচা, বেতের জিনিস, জুতো প্রভৃতি তৈরী করছেন তিব্বতীরা।

ডালহাউসীর সবচেয়ে নির্জন ও সুন্দর অঞ্চল হল বক্রোটা—আপার ও লোয়ার বক্রোটা। রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য বক্রোটা। কিন্তু বক্রোটার কথা এখন নয়, এখন মূল ডালহউসীর কথা বলে নিই। ডালহাউসীর কথা বলতে হলে কিন্তু প্রথমেই বলে নিতে হবে ধৌলা ধারের কথা।

আগেই বলেছি ধৌলাধার হিমালয়ের প্রধান তিনটি গিরিশ্রেণীর অন্যতম। যে গিরিশ্রেণী সম্পর্কে স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড লিখেছেন—'The actual range of the Himalaya, the direct continuation of the same range on which Mount Everest stands, and which is a continuation of the Alps in Switzerland.'

বনময় এই গিরিশ্রেণী। ডালহাউসী তাই বনাবৃত। চারিদিকে কেবল সবুজ আর সবুজ। আর এত সবুজ বলেই বোধহয় এমন মেঘময়। এখানকার আকাশ সব সময়ই বিষণ্ণ। সূর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্য। তাই অনেকে তেমন পছন্দ করেন না ডালহাউসীকে। ফলে এই প্রাচীনতম শৈলাবাসটি দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বহু বাড়ি ভেঙে গেছে, ভেঙে পড়ছে, ভেঙে যাবে। অন্যান্য শৈলাবাসের ন্যায় ডালহাউসী ক্রমবর্ধমান নয়।

অথচ মেঘের জন্যই আমার ভাল লাগে ডালহাউসী। মেঘ নয় যেন বলাকা। বলা নেই, কওয়া নেই—কোথা থেকে তারা আঁসছে ছুটে। কালো পথ, সবুজ বন আর লাল-নীল বাড়ি-ঘর সব কিছু ছেয়ে ফেলছে। পথচারীকে বিহ্বল করে দিয়ে আবার এক সময় পালিয়ে যাচ্ছে। কোথায় ? কে জানে ?

ডালহাউসীর আবহাওয়া বর্ষণমুখর। কিন্তু বর্ষাকাল বলতে বোঝায় জুলাই-অগাস্ট। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় আশি ইঞ্চি। তবে তুষারপাত খুবই কম। জানুয়ারীর প্রথম দিকে কেবল কয়েকদিন বরফ পড়ে। ডালহাউসী দর্শনের সময় এপ্রিল থেকে জুন ও সেপ্টেম্বার-অক্টোবর। গ্রীষ্মকালে ও শরতে এখানকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে পঁচাশী ও ষাট ডিগ্রি ফারেনহাইট। ডালহাউসীর লোকসংখ্যা সাত হাজার। তাদের ভাষা ইংরাজী, হিন্দী ও পাহাড়ী।

যে আবহাওয়ার জন্য ভারতীয়রা ভুলতে বসেছে ডালহাউসীকে, সেই আবহাওয়ার আকর্ষণেই ইংরেজরা এসেছিলেন এখানে। মেঘমুখর ডালহাউসীতে তাঁরা 'হোম'-এর আবহাওয়াকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই তৎকালীন চাম্বার রাজার কাছ থেকে এক শ' বছরের জন্য পাট্টা নিয়েছিলেন এই সুন্দর শৈলাঞ্চল।

গান্ধী চকে আসা গেল। পাঁচটি পথের সঙ্গম গান্ধী চক। লালা লাজপৎ রায় রোড, মালব্য রোড, সাত ধারা রাড, জানাদ্রি রোড ও আপার বক্রোটা রোড। শেষের পথটি রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য আপার বক্রোটা হয়ে চলে গেছে খাজিয়ার। খাজিয়ারের কথা আজ থাক। আজ গান্ধী চকের কথা বলে নিই।

গান্ধী চক ডালহাউসীর ডালহাউসী-স্কোয়ার। উচ্চতা ৬৭৩০ ফুট। বড় বাজার, বড় পোস্ট-অফিস, সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, পাঠাগার ও কমলা নেহরু পার্ক প্রভৃতি সবই এখানে। পাঁচটি পথের প্রশস্ত সঙ্গম। এক পাশে দোকান-পাট হোটেল-রেস্তোঁরা আরেক পাশ রেলিংঘেরা। নিচে শস্য-শ্যামল উপত্যকা। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। বসে বসে দেখার ব্যবস্থাও আছে। পথের পাশে রয়েছে কাঠ ও টিনের সুন্দর একখানি ঘর। ভেতরে বেঞ্চি পাতা। দর্শনার্থীর ভিড়ে সর্বদাই সচকিত এই পান্থশালা।

সাত ধারা রোডটি লোয়ার বক্রোটা লোহালী গ্রাম হয়ে চলে গেছে পঞ্চপুলা জলপ্রপাত। সেখানে শহীদ অজিত সিংহের সমাধি আছে। বীর অজিত সিং অমর শহীদ ভগৎ সিংয়ের কাকা। তিনি লালা লাজপথ রায়ের প্রধান সহকর্মী ও ১৯০৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক ছিলেন।

কমলা নেহরু পার্কে একটু বসে আমরা এলাম পাঠাগারে। সুজয়া পত্রিকা নিয়ে বসে পড়ল। তিন দিন কাগজ পড়া হয় নি। অসিতবাবু বেরিয়ে গেলেন পাঠাগার থেকে। একটু বাদে সুজয়াকে সঙ্গে করে আমরাও বেরিয়ে এলাম বাইরে। অসিতবাবু সেই পান্থশালার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের উপত্যকার ছবি নিচ্ছেন।

ছবি নেয়া হলে এগিয়ে চলি মালব্য রোড দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে। আমরা সুভাষ চকে চলেছি। বাজারের পরে পথ প্রায় জনহীন। বাড়ি-ঘরের সংখ্যাও সামান্য। পথের দুপাশেই বড় বড় গাছ। খানিকটা এসে থামতে হল আমাদের। পথ বন্ধ। একপাল হনুমান বসে আছে পথের ওপরে। ছোট মাঝারী বড়—সব রকমেরই হনুমান আছে ওদের দলে। পথের পাশে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কি যেন খাচ্ছে ওরা। আমাদের দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। নিজেদের কাজ করে যেতে থাকল। বাধ্য হয়ে ভয়ে ভয়ে আমরা ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে

চলি। ওরা কিন্তু তেমনি নির্বিকার থাকে।

সুভাষ চক সাতটি পথের সঙ্গম। উচ্চতা ৬৬০০ ফুট। এখানেও রয়েছে একটি পান্থশালা। তবে এটির ওপরে আচ্ছাদন নেই। আয়তনে বড়, অবস্থানও সুন্দর বহুদূর দেখা যায়। পাশেই পাঠাগার—মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী।

পাঠাগারের পাশ দিয়ে পথ নেমে গেছে নিচে বাজার। বাজারের পরেই প্রাচীন ডালহাউসী—ঘন-বসতি অঞ্চল। বহু বাড়ি খালি পড়ে আছে, বহুবাড়ি ভেঙে পড়েছে। দেখলে দুঃখ হয়। কষ্ট হয় ভারতের এই সুপ্রাচীন শৈলাবাসের দুরবস্থা দেখে। ঐ শৈলাঞ্চল এককালে ছিল চাম্বার রাজার। তার পরে হয়েছে ইংরেজদের। ইংরেজরা চলে যাবার পরে চাম্বা চলে গিয়েছিল হিমাচলে, আর ডালহাউসী পাঞ্জাবে। কেবলমাত্র শহরটি ও পাঠানকোট থেকে আসা পথটি ছাড়া সবই হিমাচলের। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। পথ পাঞ্জাবের কিন্তু পথের দু'পাশ হিমাচলের। তাই পাঞ্জাব সরকার ডালহাউসীর দিকে নজর দেন নি। অবহেলা করেছেন।

আগামী ১লা নভেম্বার (১৯৬৬) থেকে এই অবস্থার অবসান হবে। ডালহাউসী হিমাচলে আসবে। আশা করা যাক হিমাচল সরকার ডলহাউসীর উন্নয়নে মনোনিবেশ করবেন।

সুভাষ চকের সঙ্গম গান্ধী চক থেকে বড়। চকের কাছে ক্যাথলিক চার্চ ও কনভেন্ট কলেজ। দেওদার বন ভেতর দিয়ে আমরা চার্চে পৌঁছলাম। শান্ত সমাহিত স্বর্গীয় পরিবেশ।

দর্শন করে বেরিয়ে এলাম গীর্জা থেকে। বাগানের ভেতর দিয়ে কলেজে এলাম। কেবল কলেজ নয় কলেজিয়েট স্কুল। বেশ বড় দোতলা একটি অট্টালিকা—স্কুল, কলেজ ও হোস্টেল।

১৯৩২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই শিক্ষায়তন। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেদের এবং বি. এ. ক্লাস পর্যন্ত মেয়েদের পড়ানো হয় এখানে। এখন এক শ' কুড়িটি মেয়ে হোস্টেলে আছে। বাইরে থেকে ছেলে-মেয়েরাও পড়তে আসে।

শুনেছি হোস্টেলের ভেতরে বাগানটি বড়ই সুন্দর। কিন্তু মেয়েদের হোস্টেল। ভেতরে যাবার অনুমতি পেলাম না। শুধু আমরা নয়, সুজয়াও যেতে পারল না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হল সুভাষ চকে।

সুভাষ চক গান্ধী চকের চেয়ে কম জম-জমাট, কিন্তু কিছু কম বৈচিত্র্যময় নয়। এখানে দর্শনার্থীর সংখ্যা সামান্য কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা এমন কয়েকজন দর্শনার্থীকে দর্শন করেছি, যাদের কথা কোনোদিন বিস্মৃত হব না। তাদের বেশ-বাস নৈনিতালের কথা স্মরণ করায়, কেশ-বাস স্মরণ করায় মেরিন ড্রাইভের কথা আর ভাষা ও চাল-চলন প্রমাণ করে, মুখে আমরা যতই 'আংরেজী হঠাও' বলে চিৎকার করি না কেন, ইংরেজের ভাষা ও আদব-কায়দা ছাড়া এ-দেশে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।

সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যে কত আপনার, তার পরিচয় পেলাম সুভাষ চকে বসে। স্বামীর প্যান্টের পকেটে উলের প্যাকেট আর স্ত্রীর হাত কাঁটা। দুজনে পাশাপাশি পথ চলেছে। স্ত্রী উল বুনছে, স্বামীর পকেট থেকে উল বেরিয়ে আসছে। কুটিরশিল্প প্রসারের এমন সমবায় ব্যবস্থা এর আগে দেখি নি।

আর এক ভদ্রমহিলাকে দেখে বড়ই ভাল লাগল। তাঁর সবই সাদা—জুতো সাদা, শাড়ি সাদা, জামা সাদা, চুল সাদা। কেবল ঠোঁট দুটি লাল। তাতে সাদার সৌন্দর্য কমে

নি, বরং বেড়েছে। লাল সদাকে উজ্জ্বলতর করেছে।

একটা চায়ের দোকানে বসে আলাপ হল মিস্টার গিলের সঙ্গে। লাহোরের লোক। দেশ বিভাগের পরে দিল্লীতে স্থায়ী হয়েছেন। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে পুরনো পাথরের মূর্তি সংগ্রহ করেন। দিল্লীতে দোকান আছে। বিদেশী পর্যটকরা প্রচুর অর্থ দিয়ে সেই সব মূর্তি কিনে নিয়ে যান। ভদ্রলোক পুরাতত্ত্ব নিয়ে কিছু পড়াশুনা করেছেন।

কথায় কথায় মিস্টার গিল জিজ্ঞেস করেন, 'ডালহাউসী কেমন লাগছে?'

'ভালই।' সুজয়া উত্তর দেয়।

'লাগতেই হবে।' গিল উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকেন, 'প্রত্যেক প্রকৃতির দর্শকের জন্য ডালহাউসী তার প্রাকৃতিক সম্পদ উজার করে দিয়েছে।'

'যেমন?' জিজ্ঞেস করেন অসিতবাবু।

'যেমন ধরুন আপনি একজন প্রকৃতি প্রেমিক। আপনার জন্য রয়েছে সুনীল আকাশ, শুভ্র পর্বত-শিখর আর সবুজ বনানী। এখানকার শান্ত স্বর্গীয় পরিবেশ আর সীমাহীন সৌন্দর্য আপনাকে অসীমের আনন্দ দান করবে।'

'আমি যদি শিল্পী হই?' সুজয়া বলে।

'তাহলে তো ডালহাউসী আপনার কাছে নন্দন-কানন। ঐ সবুজ উপত্যকা আর ইরাবতী, শতদ্রু ও বিপাশার রূপোলী রেখা, ঐ চিরতুষারময় হিমালয় আর এই বিচিত্র বর্ণময় জনপদ, আপনাকে নিত্য নব নব সৃষ্টির প্রেরণা যোগাবে।'

'আমি যদি শিকার করতে ভালবাসি?' অসিতবাবু জিজ্ঞেস করেন।

'আপনার জন্য রয়েছে মিউনিসিপ্যাল ফরেস্ট এবং চাম্বা উপত্যকা—the vale of milk and honey, sparkling springs and impetuous streams.' একবার থামেন মিস্টার গিল। কিন্তু আমরা কিছু বলতে পারার আগেই আবার বলতে শুরু করেন, 'শুধু সৌন্দর্য নয়, বহু শৈলবাসের চেয়ে ডালহাউসী স্বাস্থ্যকর। এখানে কখনও মহামারী দেখা দেয় না। এমন কি পাহাড়ী পেটের অসুখও খুব কম হয়। তাই জওহরলালজী ডালহাউসী সম্পর্কে বলে গেছেন—'One of the finest hill stations in India is Dalhousie from the point of view of beauty, climate and agreeable surroundings.'

মিস্টার গিল থামতেই প্রশ্ন করি আমি, 'আচ্ছা সুভাষচন্দ্র এখানে কোন্ বাড়িতে বাস করেছেন জানেন?'

'সুভাষচন্দ্র, ইউ মিন্ নেতাজী?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর নামেই সুভাষ চক। বায়ু পরিবর্তনের জন্য ১৯৩৭ সালের শরৎকালে তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি ডাক্তার ধরমবীরের বাড়িতে বাস করেছেন। কিন্তু বাড়িটা কোথায় ঠিক বলতে পারব না।' ঘড়ি দেখেন মিস্টার গিল। তিনি উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'আচ্ছা আসি তাহলে। আমার একটা এপয়েন্টমন্ট আছে। আপনারা কাল থাকছেন এখানে, আবার দেখা হবে। গুড নাইট।'

চলে যান মিস্টার গিল। আমরাও ফিরে চলি ট্যুরিস্ট্ বাংলোয়। রাত ন'টা বাজে। পথ প্রায় জনহীন। দর্শনার্থীরা ফিরে গেছে আশ্রয়ে। পথের পাশের বাড়িতে বাড়িতে আলোর বন্যা নেমেছে, আনন্দের হুল্লোড় লেগেছে। সে আলোয় কিন্তু পথের আঁধার ঘোচে নি, সে আনন্দ পথিকের মনে সাড়া জাগায় নি।

বিস্মিত হবার কি আছে ? এমন নিরানন্দ অন্ধকার পথ তো কেবল ডালহাউসীতে নয়, আছে ভারতের সর্বত্র। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আলো, ডেভলেপমেন্ট আর ইন্ডাস্ট্রির প্রাচুর্য, দেশের আঁধার ঘোচায় নি, দুঃখ দূর করে নি। কোথাও কোথাও আলোর বন্যা নেমেছে, কিন্তু সে আলো জনগণের পথে পৌঁছয় নি, গাঁয়ের কুটিরের দাওয়ায় আসে নি। ভারত গ্রাম সর্বস্ব দেশ। ভারতের স্বাধীনতা মানে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার কথাই বলেছিলেন লালা লাজপৎ, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। এই ডালহাউসীতে সুভাষচন্দ্র সেই আলোময় ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন ভারতের।

শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক বিজয়রত্ন মজুমদারের মতে এই ডালহাউসীতে বসেই সুভাচন্দ্রের মনে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ গঠনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। ডাক্তার ধরমবীরের বাড়িতে বসে কথায় কথায় একদিন তিনি বিজয়রত্নকে বলেছিলেন—'ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজী চরিত্রের মতো আর একটি চরিত্রও ত দেখি না। রাণা প্রতাপসিংহও শিবাজীর তুলনায় তুচ্ছ হয়ে যান। শিবাজী নিয়ে নাটক, শিবাজী নিয়ে গল্প, শিবাজী নিয়ে কাব্য, গাথা, শিশুপাঠ্য বই লিখে দেশময় শিবাজীর আদর্শ তুলে ধরতে হবে, নতুবা উপায় নেই।'

সেদিন বিজয়রত্ন পরিহাস করে সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন—'শিবাজী মহারাজের গল্পের মধ্যে সন্দেশের ঝুড়ির ভিতরে বসে পলায়নটুকুই আমার সবচয়ে ভাল লাগে।'

সুভাষচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন,—'শঠে শাঠ্যং—তারও প্রয়োজন আছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে একদিন হিংসার পথ ধরতেই হবে। অস্ত্রহাতে যুদ্ধ ক'রে মেরে এবং ম'রে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত ও স্বাধীন করতেই হবে।'

বিংশ শতাব্দীর শিবাজী সে প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ডালহাউসীর পথ আজও আলোহীন কেন ? তাহলে কি সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে, তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয়েছে ? নেতাজীর আত্মত্যাগ কি বিফল হবে ?

॥ দুই ॥

কাল ঘুমোতে রাত একটা বেজে গিয়েছিল, তবু আজ ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল চণ্ডীগড়ের ছেলেদের কথাবার্তায়। ওরা আজ প্রথম বাস ধরে রাহালা যাবে। রোতাং গিরিবর্ত্ম দেখে আজই ফিরে আসবে এখানে।

কাল ওদের জন্যই জেগে থাকতে হয়েছে আমাদের। আমরা ফিরে আসার পরে গানের আসর তথা ক্যাম্প-ফায়ার আরম্ভ হয়েছিল। ও-রকম আসরের বাঙালী ছেলেরা সাধারণতঃ যে ধরনের গান গায়, তেমন গান নয়। ওরা সবাই সিনেমার গান গেয়েছে। জিন্দিগী আর মহব্বতের মহিমা কীর্তন করে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছে। তার পরে আমাদের অনুরোধ করেছে অংশ নিতে। এ জাতীয় অসরে কখনো অনুরোধ উপেক্ষা করতে নেই। তাই আমি কাজী নজরুলের একটি কবিতা আবৃত্তি করেছি। আর মানসী গেয়েছে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। বেশ ভাল গায় মানসী।

আমাদের কোন তাড়া নেই। সকাল দশটায় ট্যুরিস্ট-অফিস খুলবে। তবু ছেলেরা চলে যাবার সময় উঠে বসতে হয়। মানসী তেমনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। এতো হট্টগোলেও ঘুম ভাঙছে না, আশ্চর্য!

ছেলেরা বেরিয়ে যাবার পর আমিও বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। ঘরে মানসী একা।

বাথরুম সেরে ফিরে আসি ঘরে। মানসী এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুমাক। কাল অনেক রাতে শুয়েছে।

হাত মুখ মুছে আবার এগিয়ে চলি দরজার দিকে। বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

"ঘরে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে কি ?"

মানসীর প্রশ্নে থমকে দাঁড়াই। পেছন ফিরে দেখি কম্বল থেকে মুখ বের করে মৃদু হাসছে মানসী।

হেসে বলি, "আপনার অসুবিধে না হলে, আমার অসুবিধে হবে কেন ? তবে সূর্য উঠেছে, ভাবছিলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখব।"

"সূর্যোদয় কি আর কোনদিন দেখেন নি যে বাইরে যাবার জন্য এমন ছটফট করছেন।"

আমি আমার বিছানায় এসে বসি।

মানসী বলে, "সূর্য তো চিরকাল উদয় হবে। কিন্তু আজকের এই সকালটা কি আর এসেছে আপনার জীবনে ?"

"না।" আমি উত্তর দিই।

মানসী বলে, "আমি জানি, আপনি কেন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।"

"কেন, বলুন তো।"

"পাছে সাহিত্যিকের সুনাম নষ্ট হয়।"

আমি মানসীর দিকে তাকাই।

মানসী বলে, "অবাক হচ্ছেন, না ?"

"তা একটু হচ্ছি বই কি।"

"আমি কালই আপনাকে চিনেছি।"

"কেমন করে ?"

"আমি যে গত এপ্রিল মাসে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সময় বৃন্দাবনে ছিলাম। সেখানেই আপনাকে দেখেছি।"

"আমি তো আপনাকে..."

"দেখেছেন বলে মনে হচ্ছে না। দেখেন নি। আমি দূর থেকে আপনাকে দেখেছি। মনোযোগ দিয়ে আপনার 'হিমালয় ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধ পাঠ শুনেছি।"

"তাহলে ঠিকই চিনেছেন।" আমাকে একটু হাসতে হয়।

"কাল যখন বললেন আপনি বাঙ্গালী, তখনই সন্দেহ হল। তারপরে আপনার হিমাচল পরিকমার কথা শুনে সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। তাই আপনাকে নিয়ে পথে বের হলাম, হিমালয়ের কাহিনী শুনতে চাইলাম। শুনে বুঝতে পারলাম আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়। তাই আজ আর ওদের সঙ্গে আমি রোতাং গেলাম না। আপনার কাছ থেকেই তো শোনা যাবে।"

"কানে শোনা আর চোখে দেখা তো এক জিনিস নয় মানসী দেবী।"

"দেবী দেবী করছেন কেন, আমি দেবী নই মানবী।"

"তাহলে কি বলে ডাকব ?"

"কেন নাম ধরে।"

"কোন আপত্তি হবে না তো ?"

"আপত্তি !" মানসী বলে, "বরং তাকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করব। আপনি

আমার প্রিয় লেখক। আপনার 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' পড়ে গঙ্গোত্রী গিয়েছি। আপনার লেখা আমার হিমালয়ের মতই ভাল লাগে।"

"তা আমারও সৌভাগ্য। পাঠক-পাঠিকার জন্যই লেখা। তাদের ভাল লাগলেই, লেখক ধন্য হয়।" একটু থামি। তারপর আবার বলি,"সাতটা বেজে গেল, এবারে উঠুন তো ! মুখ হাত ধুয়ে চলুন, চা খেয়ে আসি।"

মানসী হাসে। বলে, "আদেশ করলেই তো উঠতে পারি না। আমি যে মেয়ে। মহিলাদের শয্যাত্যাগের আগে পুরুষমানুষদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।"

লজ্জা পাই। তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "আমার একদম খেয়াল ছিল না।"

মানসী হাসতে থাকে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। একটু বাদে মানসী বাথরুমে চলে যায়। আমি ঘরে আসি। এয়ার ম্যাট্রেসের হাওয়া ছেড়ে দিই। জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলি।

মানসী ফিরে আসে। এসেই বলে, "ভদ্রলোককে যে আর একবার বাইরে যেতে হয়। ভদ্রমহিলা বেশ পরিবর্তন করবে।"

"দুঃখিত। আমার একদম খেয়াল ছিল না।"

"এতো কম খেয়াল হলে তো মেয়েদের নিয়ে ঘর করা যায় না। আধ ঘন্টায় দু'বার ভুল হল।"

"আর হবে না।"

"বেশ দেখা যাবে।"

আবার বেরিয়ে আসি বারান্দায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখি। অনেকক্ষণ হল সূর্যোদয় হয়েছে। তার সোনালী কিরণধারায় স্নান করছে মানালী—সুন্দরী মানালী আরও সুন্দর হয়েছে।

প্রভাতী রোদের পরশ লেগেছে শিশির-স্নাত ঘাসবনে, আর এ বারান্দায়। রোদ পড়েছে ওদের গায়ে, যারা কাল রাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। ওরা লাহুল ও স্পিতি উপত্যকার মেহনতী মানুষ। শীত আসছে। তাই নেমে এসেছে নিচে। ওরা কেউ বা এখানে থাকবে, কেউ বা নেমে যাবে আরও নিচে। শীতকালটা কাটাবে কোনমতে। তার পরে আবার ফিরে যাবে ঘরে—হিমাচলের পাহাড়ে পাহাড়ে, দুর্গম-গিরি-কান্তারে।

"এখন আসতে পারেন।" মানসী ঘরের ভেতর থেকে বলে।

আমি ঘরে আসি। মানসী একখানি সিল্কের শাড়ী পড়েছে। বেশ দেখাচ্ছে ওকে। মানসী বলে, "আপনি কি পোশাক পাল্টাবেন ?"

"না।"

"তাহলে চলুন।" মানসী ব্যাগ হাতে নেয়। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। মানসী দরজায় তালা দেয়। আমরা পথে নেমে আসি। নীরবে পথ চলতে থাকি।

বড় রাস্তায় এসে একটা চায়ের দোকানে বসি। চা খেয়ে বেরিয়ে আসি পথে। জিজ্ঞেস করি, "কোথায় যাবেন ?"

মানসী ঘড়ি দেখে বলে, "ট্যুরিস্ট্-অফিস খুলতে এখনও দু'ঘন্টা বাকি।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে চলুন না বিপাশার পাশে গিয়ে বসা যাক কিছুক্ষণ।"

"বেশ তো চলুন। বসে বসে হিমাচলকে দেখা যাক।"

"শুধু দেখব না, সেই সঙ্গে শুনব।" মানসী বলে, "শুনব খাজিয়ারের কথা।"

"ভাল লাগবে না। কাল রাতে হিমাচল ছিল ঘুমিয়ে। আজ জেগে থাকা হিমাচলের সামনে বসে তার কাহিনী কি ভাল লাগবে আপনার ?"

"না লাগলে আপনার কি ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"আমার কিছু নয়, আপনার সময় নষ্ট হবে।"

"হোক্ গে। আমি নষ্ট করতেই চাইছি। সংসারে সবাইকে সমান হিসেবী হতে হবে, তার কি মানে আছে।"

আর কথা না বাড়িয়ে মানসীর সঙ্গে চলতে থাকি। বাসপথ দিয়ে হেঁটে আসি বিপাশার পুলের ধারে। পথ থেকে নেমে এসে নদীতীরের একখানি পাথরের ওপর বসি। মানসী পাশে বসে বলে, "এবার বলুন খাজিয়ারের কথা।"

আমি শুরু করি—

ডালহাউসীর কাছে তিনটি দর্শনীয় স্থান আছে—কালাটোপ, দায়ন কুণ্ড ও খাজিয়ার। সময়াভাবের জন্য আমরা কালাটোপ ও দায়ন কুণ্ডে যেতে পারি নি। আমরা কেবল খাজিয়ার দেখেছি। খাজিয়ারের কথাই বলছি।

দু'দিন ডালহাউসীতে কাটিয়ে আমরা খাজিয়ার রওনা হলাম। কথা ছিল সকাল আটটার সময় রওনা হব। কিন্তু কুলি-বিভ্রাটের জন্য হয়ে উঠল না। আগের দিন যারা অগ্রিম নিয়ে গিয়েছিল, তারা এলো না। অসিতবাবু অবশ্য দমবার পাত্র নন। তিনি খোঁজাখুঁজি করে নতুন লোক নিয়ে এলেন। দরাদরির পরে দৈনিক সাত টাকায় রফা হল। বেলা দশটায় আমরা গান্ধী চকে এলাম। ডালহাউসীকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম খাজিয়ারের পথে।

চড়াই পথ। তবে বেশ চওড়া। জীপ চলতে পারে। বর্ষার আগে নাকি জীপ চলাচল করত। বর্ষায় পথ ভেঙ্গে গেছে বলে এখন আর জীপ চলছে না।

পথের ডানদিকে পাহাড়—বনময় পাহাড়। বাঁদিকে উপত্যকা—ডালহাউসী শহর।

কঠিন চড়াই। এ যাত্রার প্রথম চড়াই। তাই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। তখন তাকিয়ে তাকিয়ে ডালহাউসীকে দেখছি। বেশ ভাল লাগছে। শ্রান্তি কমলে আবার পথ চলছি।

এইভাবে ঘন্টাখানেক চলে চড়াই শেষ হল। আমরা আপার বক্রোটা মল রোডে পৌঁছলাম। এটি ডালহাউসীর সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা। এ পথের ওপর থেকে দক্ষিণের সমতল ও উত্তরের তুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। তাই বোধ করি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আসতেন এখানে।

ডালহাউসী মহর্ষির বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি এখানে একটি বাড়ি কিনেছিলেন। মহর্ষি বহুদিন বাস করেছেন সে বাড়িতে। ১৮৭১ সালের বসন্ত কালে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন বাবার কাছে। তখন তাঁর বয়স এগারো বছর। মহাকবির সেই প্রথম হিমালয় দর্শন। কবি তাঁর জীবনস্মৃতিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন—

'আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলক বিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু সেই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটিও কথাও বলিতে পারে না।....

'আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানলার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম।'

দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য মহর্ষির সেই বাড়িখানি বহুদিন হল বিক্রি হয়ে গেছে। দিল্লীর সেন্ট ষ্টিফেনস্ কলেজের স্বর্গীয় অধ্যক্ষের বিধবা পত্নী মিসেস এম. সি. মুখার্জি এখন সে বাড়ির মালিক। বাড়ির নাম 'স্নোডন'। মিসেস মুখার্জি বাঙ্গালীর গৃহিণী হলেও পাঞ্জাবী রমণী। তিনিও ভেবে আশ্চর্য হন যে এ বাড়িখানিকে আজও কেন জাতীয় সম্পত্তি রূপে অধিগ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা হল না।

তবে এখানে দেখছি একটি পথের নাম রাখা হয়েছে 'টেগোর রোড।' শুনেছি এ পথটি ডালহাউসীর সর্বশ্রেষ্ঠ পথগুলির অন্যতম। ছায়াশীতল-প্রায় সমতল পথ। কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ। পথচারীরা ঐ 'টেগোর' শব্দটির মাঝে দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছেন। আমরাও সেই মহান ঋষি ও মহাকবির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলি খাজিয়ারের পথে।

বাঁ দিকে চায়ের দোকান—ট্র্যাভেলাস ডিলাইট। সে দিকে তাকাতেই অসিতবাবু বলে উঠলেন, 'এই তো খেয়ে-দেয়ে রওনা হলে।'

অসিতবাবু আমাদের নেতা। তিনি চায়ের তেমন ভক্ত নন। কাজেই চায়ের দোকান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই। এগিয়ে চলি প্রায় সমতল পথ দিয়ে। সুন্দর পথ।

মাইল খানেক পেরিয়ে এলাম অক্লেশে। এখানে আবার একটি চায়ের দোকান। কিন্তু অসিতবাবু পাশেই রয়েছেন। অতএব সেদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলি।

পথটা নেমে গেছে খানিকটা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে একটি জলধারা। পথের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিচে বনের ভেতর পথ গেছে হারিয়ে। জলসিক্ত পথ পেরিয়ে এলাম।

একটু এগিয়ে দাঁড়াতে হল একবার। পথের পাশে একটা সাইন বোর্ড ঃ Sanctuary–Hunting & Shooting prohibited–Ahla, Kalatop.

পথটি পাহাড়ের গা বেয়ে একটু ওপরে উঠে গেছে। নিচে নতুন পথ তৈরি হচ্ছে। মজুররা কাজ করছে। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙ্গার আয়োজন চলেছে।

আবার শুরু হল চড়াই। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। পথটি বাঁক নিয়েছে ডাইনে। বাঁকের মুখে সাইন বোর্ড—

Potato Development Station.

পথের দু'দিকেই আলুর চাষ করা হয়েছে। আলু হিমালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাদ্য। হিমালয়ের বহু জায়গায় মানুষ রুটির বদলে আলু খায়। আলুর চাষ প্রসারের জন্য কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

কিছুদূর এসে পথের বাঁ দিকে আবহাওয়া নিরূপণ কেন্দ্র। বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, তাপমাত্রা ও বাতাসের বেগ পরিমাপের যন্ত্র। এখানে পথটি প্রশস্তর। পথের পাশে একফালি সমতল। সেখানে কয়েকটি বাড়ি-ঘর। পথ আরও প্রশস্ত করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বাস চলবে এই পথে। ভাগ্যিস এখন চলছে না। চললে তো আর এমন সুন্দর পথটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারতাম না।

আহলা থেকে ঘন্টাখানেক হেঁটে পৌঁছলাম এ পথের উচ্চতম স্থানে—৮৫০০ ফুটে। তার পরেই শুরু হল উৎরাই। উৎরাই শেষে সমতল—লক্কর মাণ্ডি। আপার বক্রোটা থেকে তিন মাইল। উচ্চতা ৮০০০ ফুট।

পঁচিশ একর সমতল জায়গা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ফরেস্ট নার্সারী। পথের

ডানদিকে গুটি তিনেক চায়ের দোকান। চা, পকোড়া ও মিঠাই পাওয়া যায়। দোকানের সামনে বসে পড়লাম আমরা। অসিতবাবু আপত্তি করলেন না। বরং বসলেন এসে আমাদের পাশে।

দোকানের সামনে ছোট ফালি জমি। নানা ধরনের ছোট ছোট চারাগাছ—নার্সারীর ক্ষুদ্র সংস্করণ। মূল নার্সারী একটু দূরে। এখান থেকে দেখা যায় না।

ক্ষুদ্র নার্সারীর পারে বন বিভাগেরে কোয়ার্টারস। পেছনে দেওদারে ছাওয়া সবুজ পাহাড়। খাড়া ওপরে উঠে গেছে।

এখান থেকে কালাটোপ দু মাইল। সহজ ও সুন্দর বনপথ। সেখানে বন বিশ্রাম গৃহ আছে।

লক্কর মাণ্ডি থেকেই একটি খাড়া পাকদণ্ডী চলে গেছে দায়নকুণ্ডে। ন'হাজার ফুট উঁচুতে সুপ্রশস্ত সবুজ ও সমতল তৃণভূমি। নিকটবর্তী শৈলশিখর থেকে দেখা যায় এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা বিধৌত উপত্যকা। চারটি নদীই হিমাচলের একই অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে সুজলা ও সুফলা করেছে।

সেই অপরূপ রূপ দর্শন হবে না এবারে। আমরা কালাটোপ কিংবা দায়ন কুণ্ডে যাব না। আমরা যাব খাজিয়ার। লক্কর মাণ্ডি থেকে ৮ মাইল।

আধঘন্টা বিশ্রামের পর বেলা সাড়ে তিনটার সময় রওনা হলাম খাজিয়ারের পথে। এতক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বৃষ্টির জন্য বসে থাকতে বাধ্য হলাম। জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

পথে কোথাও কোথাও জল জমে আছে। এখন আর চড়াই-উৎরাই পাথুরে পথ নয়। প্রায় সমতল মাটির পথ। জল আর কাদার পথ। দেওদার বনের বুক চিরে পথ।

পথের পাশে মাটির পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে বহু বর্ণের ফার্ণ আর বিভিন্ন ধরণের গাছ। গাছে গাছে ফুল—সাদা লাল বেগুনী হলুদ আরও কতো রকমের রঙ। মনে হচ্ছে কেউ সযত্নে রচনা করেছে এই কানন। রচনা করেছে চিরকালের পথিকের পথ চলার প্রয়োজনে। পথ চলতে চলতে যাতে তার চির-চেনা হিমালয়কে অচেনা বলে মনে হয়।

মাঝেমাঝেই সাইন বোর্ড'। কোনটিতে সরকারী নাম, কোনটিতে বা বে-সরকারী। বিভিন্ন ওষুধ প্রতিষ্ঠান এখানে ঔষধির চাষ করেছেন। সরকারী প্রচেষ্টায় এখানে একাধিক ফরেস্ট নার্সারীও গড়ে তোলা হয়েছে। সাইনবোর্ড টাঙিয়ে নিজেদের নাম প্রচার করা হয়েছে পথচারীদের কাছে।

সমতল পথ। পথশ্রমের প্রশ্ন নেই। তবু আমরা একসঙ্গে পথ চলছি না। কেউ জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা পথের শোভা দেখতে দেখতে পেছিয়ে পড়ছি। পথের মায়া যে কঠিন মায়া।

এলাম ট্যারিস্ট্ অফিসে। অফিস খুলেছে, অফিসার আসেন নি। আমি ও মানসী সোফায় বসে টেবিলের ওপর রাখা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে থাকি।

কিছুক্ষণ বাদে ট্যারিস্ট্ রিসেপশান অফিসারের আবির্ভাব ঘটল। আমরা নাম বললাম। তিনি খাতা খুললেন। কলম বের করলেন। ঘর মঞ্জুর হল। কিন্তু মন ভরল না মানসীর। সে বলে, 'আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দুটো ঘর দিন না।'

অফিসার আমাদের দিকে তাকান। একটু মৃদু হাসেন। তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট। আমি

মাথা নত করি। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেই মানসী আবার বলে, 'তাহলে আমাদের একটু সুবিধে হয়।'

অফিসার আবার হাসেন। কিন্তু মানসী গম্ভীর। সে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। এবারে মুখ ফিরিয়ে নেন অফিসার। তিনি আবার খাতা খোলেন।

আমার ঘরের পাশে ঘর পায় মানসী। সে উঠে দাঁড়ায়। সহাস্যে ধন্যবাদ জানায় অফিসারকে। আমরা বেরিয়ে আসি ট্যুরিস্ট্ অফিস থেকে।

বাইরে এসে বলি, 'কি দরকার ছিল পাশাপাশি ঘর নেবার। ভদ্রলোক কি ভাবলেন বলুন তো,'

'কি ভাববেন আবার। যা সবাই ভাবেন, তাই ভাবলেন।' মানসী নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দেয়।

'না না, এটা ঠিক হল না। আমার বড় লজ্জা করছে।'

'আপনি যে দেখছি ভারি লাজুক। কিন্তু শুনেছি, লজ্জা থাকলে নাকি লেখক-হওয়া যায় না।'

'লেখকদের সম্পর্কে আপনার ধারণাটা তো দেখছি খুবই ভাল। তবু জেনে রাখুন, আমি মোটেই নির্লজ্জ নই।'

'না হলেই ভাল। আমাকে যে পাশের ঘরে বাস করতে হবে।'

মানসীর কথায় হেসে উঠতে হয় আমাকে। শেষের দিকে মানসীও আমার সঙ্গে হাসতে থাকে।

মালপত্র নিয়ে ট্যুরিস্ট্ বাংলোয় রওনা হলাম, বাসপথকে ডানদিকে রেখে আমরা উঠে আসি ওপরে। চড়াই হলেও চওড়া মোটর-পথ। পোস্ট অফিসকে বাঁদিকে রেখে আপেল বাগানের পাশ দিয়ে এসে পৌঁছই ফরেস্ট রেস্টহাউসের সামনে। কেলং যাবার সময় আমরা সেদিন এখানেই রাত্রিবাস করেছি। চমৎকার বন্দোবস্ত। হবেই বা না কেন, জওহরলালজী মানালী এলে এখানে থাকতেন।

ফরেস্ট রেস্ট হাউস ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। দেওদার বনের ভেতর দিয়ে পথ। খানিকটা এসে ডানদিকে পায়ে-চলা-পথ। সেই পথ দিয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে আমরা এসে পৌঁছই ট্যুরিস্ট্ বাংলোর সামনে। বেশ বড় একটি একতলা বাড়ি। সামনে রেলিং-ঘেরা বারান্দা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় উঠেই সামনে ড্রয়িংরুম ও ডাইনিং-হল। দু'পাশে সারি সারি ঘর। এক প্রান্তের দু'খানি ঘর পেয়েছি আমরা।

বেশ বড় ঘর। মেঝেতে কার্পেট পাতা। চেয়ার-টেবিল-খাট আলনা ও দেয়াল-আলমারী সবই রয়েছে। ঘরের লাগোয়া বাথরুম। এক কথায় চমৎকার ব্যবস্থা।

জিনিসপত্র গোছগাছ করে স্নান সেরে পোশাক পালটে নিলাম। তারপরে মানসীকে সঙ্গে নিয়ে খেয়ে এলাম হোটেল থেকে। মানসী নিজের ঘরে যায়। কিন্তু একটু বাদেই বাইরের দরজায় এসে করাঘাত করে, 'আসতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে।'

মানসী ভেতরে আসে। দরজাটা ভাল করে খুলে দিয়ে একখানি চেয়ার টেনে বসে।

জিজ্ঞেস করি, 'দরজাটা ওভাবে খুলে দিলেন কেন?'

'যাতে লেখকের সুনাম নষ্ট না হয়। দেখলাম কয়েকজন বাঙ্গালী রয়েছেন এখানে।'

'তা হলে এলেন কেন?'

'না এসে পারলাম না বলে।' সঙ্গে সঙ্গে মানসী জবাব দেয়।

আমি চুপ করে যাই। মানসী আবার বলে, 'আপনি যে কেমন করে এমন একা একা ঘুরে বেড়ান, বুঝতে পারছি না।'

'কেন ?'

'আপনি মোটেই স্বাবলম্বী নন।'

'আমি তো সবই গুছিয়ে রেখেছি।'

'ছাই রেখেছেন।' মানসী উঠে দাঁড়ায়। সে আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লেগে যায়। বুঝতে পারছি কাজ পেয়ে কাজের মায়া ছাড়তে পারছে না। তাই নতুন করে গোছগাছ করছে। এও বুঝতে পারি, ওকে বাঁধা দেওয়া বৃথা। তাই চুপ করে থাকি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর কাজ শেষ হয়ে যায়। সে আবার এসে সামনের চেয়ারখানায় বসে। বসেই বলে, 'আচ্ছা, আমাকে কি আপনার খুব গায়ে-পড়া মেয়ে বলে মনে হচ্ছে।'

'তা একটু হচ্ছে বৈ কি।' হাসতে হাসতে বলি।

'হোক্ গে।'

মানসী বলে। 'তবু আমি আপনাকে অমন অগোছাল হয়ে হয়ে থাকতে দেব না।'

'দিলেই কিন্তু ভাল করতেন।'

'কারণ ?'

'আপনি তো আর চিরকাল পাশের ঘরে থাকবেন না। অভ্যেস খারাপ হয়ে গেলে বিপদে পড়ব।'

'বিপদে পড়বেন কেন, তখন তো আর আমি দেখতে আসবো না।' একটু থেমে বলে, 'এ আলোচনা এখন থাক। খাজিয়ারের কথা শেষ করে ফেলুন।'

'খাজিয়ার যাবার কথা তো বললাম তখন।'

'যাবার কথা বললেই কি খাজিয়ারের কথা বলা শেষ হয় ? তাছাড়া আপনি তো খাজিয়ার পৌঁছন নি। বলেন নি খাজিয়ার কেমন, কেন সবাই যায় সেখানে।'

না, একে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। তাই আর কথা না বাড়িয়ে বলতে শুরু করি—

বিকেল ছ'টায় আমরা খাজিয়ার পৌঁছলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম প্রকৃতির সেই অপরূপ সৃষ্টি। চলার বেগ বাড়িয়ে দিই। দেওয়ার বনের ভেতর দিয়ে আমরা এসে দাঁড়াই সবুজ দূর্বাছাওয়া প্রান্তরে। আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গিয়েছে। ঢালের শেষে একটি ছোট গোল জলাশয়। মনে হচ্ছে একখানি বহুবর্ণের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সুন্দর জায়গা যে সভ্যজগতে থাকতে পারে, খাজিয়ার না দেখলে তা যে অজানাই রয়ে যেত।

অনেকে বলেন খাজিয়ার গুলমার্গের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কথাটা সত্য নয়। খাজিয়ার আপন বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। খাজিয়ার গুলমার্গ নয়, খাজিয়ার খাজিয়ার।

চারিদিকে পাহাড়। তুষারাবৃত নয়, মৃত্তিকাময় পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সবুজ বন—অপরূপ দেওদার বন। বন যে এত সুন্দর হতে পারে, তা আগে জানা ছিল না। বন ধাপে ধাপে নেমে এসেছে সবুজ প্রান্তরে। বনের সীমা সর্বত্র সমান নয়। তাই প্রান্তরের প্রান্তে আঁকাবাঁকা বন-রেখা। রেখা নয়, ঢেউ। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গা বেয়ে বনের ঢেউ সমতলে এসে সহসা থেমে গিয়েছে।

বন সুন্দর কিন্তু প্রান্তর আরও সুন্দর। এ তো তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রান্তর নয়, সবুজ কোমল গালিচা। সেই গালিচার উপর দাঁড়িয়ে আমরা কিছুক্ষণ ধরে খাজিয়ারকে দেখলাম।

পদযাত্রার প্রথম দিন। ১২ মাইল পাহাড়ী পথ ভেঙ্গে খাজিয়ার পৌঁছেছি। স্বভাবতই শ্রান্ত আমরা। কিন্তু খাজিয়ারের কমনীয় রূপ আমাদের সকল শ্রান্তি দূর করে দিল। আমরা সেই গালিচাসম কোমল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। লক্ষ্য গোলাকৃতি জলাশয়। দূর থেকে দেখাচ্ছে সবুজের বুকে একটি লাল বৃত্ত। অমন লালচে দেখাচ্ছে কেন ? জলের রং তো লাল নয়।

জল নয়। হ্রদের তীরে পৌঁছে বুঝতে পারলাম। জলাশয়ের কেবল কেন্দ্রস্থলে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা—সেখানে জল। সেই জলের চারিধারে জলাশয় জুড়ে জলজ গাছ। গাছগুলি সবুজ কিন্তু দূর থেকে লালচে দেখায়। মনে হয় সবুজ প্রান্তরের মাঝে রক্তিম আলপনা দেয়া একটি গোলাকৃতি নীল জলাশয়।

জলাশয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে তিব্বতী প্রার্থনা পতাকা ঝুলানো রয়েছে। রয়েছে দুদিকে রেলিং দেয়া একটি কাঠের সাঁকো—তীর থেকে জলাশয়ের প্রায় কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। জলে ভাসছে একটি জলজ গাছের দ্বীপ আর ছোট একখানি ডিঙ্গি—সাঁকোর সঙ্গে বাঁধা। ভাড়া দিলে নৌকোবিলাসের অধিকার অর্জন করা যায়।

সুজয়া গিয়ে নৌকোয়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দোল খেলো। তার পরে খেয়াল হল, সে সাঁতার জানে না। তাড়াতাড়ি উঠে এলো সাঁকোর ওপরে।

চাম্বারাজের অবসর বিনোদন কেন্দ্র ছিল খাজিয়ার। তাই পাহাড়ের ওপর নির্মিত হয়েছিল প্রাসাদ আর হ্রদের তীরে দুটি বাংলো। এখন রাজা রাজ্যহীন, তাই রাজবাংলো পরিণত হয়েছে ডাকবাংলোয়। আর প্রাসাদ খালি পড়ে আছে।

একদিকে ইয়ুথ হোস্টেল আর মাইনর স্কুল। একটু দূরে খাজিয়ার গ্রাম। সেখান থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে স্কুলে।

আর একদিকে ডাকবাংলো, রেস্টহাউস, পোস্ট-অফিস, দোকান, কয়েকটি বাড়ি, মন্দির আর সার্কিট হাউস। সার্কিট হাউস সবার জন্য নয়। কিন্তু মন্দির দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। আমরা মন্দিরে এলাম।

খাজিনাগের মন্দির। দক্ষিণ-মুখী কাঠের মন্দির। ছয় ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে নাটমন্দির। তার পরে মূল-মন্দির। মাটির দেয়াল ও কাঠের দরজা-জানালা। কাঠের ওপর সুন্দর খোদাই কাজ—নানারকমের কারুকার্য। নাটমন্দিরে রয়েছে কাঠের ওপর খোদাই করা পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রতিমূর্তি। চাম্বার রাজা শ্যাম সিং একশ' বছর আগে এই নাটমন্দির তৈরি করে দিয়েছেন।

খাজিনাগ নাগদেবের স্থানীয় নাম। চাম্বারাজ পৃথ্বী সিংয়ের ধাত্রীমাতা 'দাই বাট্‌লো' নির্মাণ করেছেন এ মন্দির। পৃথ্বী সিং ১৬৪১ থেকে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চাম্বার রাজা ছিলেন। কাজেই সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে এ মন্দির। আর তখন নিশ্চয়ই নাটমন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে কোনো কারণে সে নাটমন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। রাজা শ্যাম সিং বর্তমান নাটমন্দিরটি তৈরি করে দেন।

চাম্বার প্রধান সম্পদ কাঠ। চাম্বার কুটিরশিল্পও তাই গড়ে উঠেছিলা দারুশিল্পকে কেন্দ্র করে। খাজিয়ারের এ মন্দিরটিও কাঠের তৈরি। দেয়ালে গম্বুজে ছাদে ও মন্দিরদ্বারে কাঠের ওপরে সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারুকার্য। দেব-দেবী, পরী, লতা-পাতা-ফুল ও মঙ্গলঘট প্রভৃতি খোদাই করা রয়েছে। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহটিও কাষ্ঠ-নির্মিত।

আমরা আনত হয়ে প্রণাম করলাম। কেবল খাজিনাগকে শ্রদ্ধা জানালাম না, সেই সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করলাম সেই সব শিল্পাচার্যদের যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম

করে নির্মাণ করে গেছেন খাজিনাগের এই মন্দির। নির্মাণ করে গেছেন চিরকালের শিল্পরসিকদের পরম বিস্ময়।

পূজারী আমাদের চরণামৃত ও প্রসাদ দিলেন। আমরা ভক্তিভরে সেই অমৃত গ্রহণ করে মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম।

মন্দিরের মেঝে পাথরে বাঁধানো। মাটির দেওয়াল হলেও স্লেট পাথরের চাল। মন্দিরশীর্ষে শিখর-কলস। চতুষ্কোণ মন্দির। মন্দিরের চারদিকে সাতটি কাঠের স্তম্ভ—কারুকার্য-খচিত। চারদিকের চারটি স্তম্ভে চারটি করে মূর্তি খোদিত।

মন্দির প্রদক্ষিণ করে রেস্ট হাউসে চললাম। প্রান্তরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পাইন বনের ধারে ডাকবাংলো ও রেস্টহাউস। দু'খানি করে ঘর ও ডাইনিং হল। প্রতি ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। কাঠের মেঝে, টালির চাল। এখন ঘর প্রতি দৈনিক ভাড়া যথাক্রমে দু'টাকা ও তিন টাকা। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ভাড়া বেশি। প্রয়োজনে বিছানাপত্র ভাড়া পাওয়া যায়।

মালপত্র আগেই পৌঁছে গিয়েছে। কুলিরা বারান্দায় মাল রেখে বিশ্রাম করছিল। আমরা আসতে উঠে দাঁড়ায়। অসিতবাবু জিজ্ঞেস করেন, 'চৌকিদার কোথায় ?'

'তার কোঠিতে।'

'কতদূরে ?'

'এই ডাকবাংলোর পেছনে।'

'ডেকে আনো।' অসিতবাবু একজন কুলিকে বলেন।

কিন্তু তার দরকার হল না। ডাইনিং হলের দরজা ঠেলে একজন উর্দি পড়া কেতাদুরস্ত স্বাস্থ্যবান প্রবীণ বেরিয়ে এসে সেলাম করে আমাদের। কুলিরা সসম্মানে উঠে দাঁড়ায়। একজন বলে, 'চৌকিদার সাব।'

আমরা প্রতি-নমস্কার করি। চৌকিদারের চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমাদের। পরে শুনেছি লোকটি রাজার আমলের। রাজার রাজত্ব গেছে কিন্তু চৌকিদারের রাজকীয় চালচলন এখনও অব্যাহত।

ডালহাউসী থেকেই আমরা ডাকবাংলো রিজার্ভ করেছিলাম। অসিতবাবু তাকে রিজার্ভেশান স্লিপ দেখালেন।

ঘর খুলে দিল চৌকিদার। বলল, 'মালপত্র গুছিয়ে আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি একটু বাদে আবার আসছি।'

কুলিরা মালপত্র নিয়ে আসে। সুজয়ার নির্দেশে তারা মালপত্র গুছিয়ে রাখে। অসিতবাবু সাহায্য করেন তাকে। আমি বাথরুমে ঢুকি।

কিছুক্ষণ বাদে চৌকিদার আবার আসে। অসিতবাবুকে জিজ্ঞেস করে, 'চায়ের সঙ্গে কি খাবেন ? টোস্ট আর ওমলেট দিই।'

নিচের দোকানগুলো দেখিয়ে অসিতবাবু বলেন, 'আমরা ভাবছি ওখানে গিয়ে চা খেয়ে নেব।'

চৌকিদার গম্ভীর স্বরে বলে, 'তাহলে তো আপনাদের চা না খেয়েই থাকতে হবে।'

'কেন ?' আমরা বিস্মিত।

'ওরা যে আপনাদের কাছে কিছুই বিক্রি করবে না।'

'কেন ?'

'তাই নিয়ম।' চৌকিদার শান্ত স্বরে জবাব দেয়।

আমরা তার কথা ঠিক বুঝতে পারি না। দোকান রয়েছে, অথচ তারা আমাদের কাছে কিছু বিক্রি করবে না।

চৌকিদার বুঝতে পারে আমাদের অজ্ঞতা। তাই সে বুঝিয়ে বলে, 'ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস কিংবা সার্কিট হাউসে যাঁরা থাকেন, তাঁরা সবাই আমার খদ্দের। তাই তাদের কাছে ওরা কেউ কিছু বিক্রি করে না।'

খাজিয়ারের প্রাচীনতম অধিবাসী চৌকিদার। সে খাজিয়ারের সবচেয়ে স্বচ্ছল ও ক্ষমতাশালী ব্যাক্তি। রাজার আমল থেকে আছে। তার জমি আছে, গরু আছে, ঘোড়া আছে। আছে অসংখ্য মুরগী আর এই নামহীন হোটেল। ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস আর সার্কিট হাউসের বাসিন্দাদের তার হোটেলে না খেয়ে উপায় নেই। কারণ চৌকিদারের ভয়ে কোন দোকনদার তাদের কাছে কিছু বিক্রি করে না।

চৌকিদারের হোটেলের চার্জ কিছু বেশি হলেও খাবার ভাল, বাসনপত্র ভাল আর কায়দাকানুন মনে রাখার মতো।

বারান্দায় চেয়ার টেবিল পেতে দিল চৌকিদার। চা, টোস্ট আর ওমলেট এলো। আমরা গোল হয়ে বসলাম। সোনালী সূর্যের শেষ শিখায় খাজিয়ার বিচিত্র বর্ণের পোশাক পরেছে। ডালহাউসীর মতো না হলেও, মেঘের খেলা মন্দ নয় খাজিয়ারে। মেঘের ঘোমটায় আস্তে আস্তে সব রং মিলিয়ে যাচ্ছে। খাজিয়ার সাদা হচ্ছে। সে ধূসর হচ্ছে। কালো হচ্ছে। সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলো তার বুকে।

কিছুক্ষণ বাদে চাঁদ উঠল। ইতিমধ্যে আমাদের অলক্ষ্যে কখন যেন মেঘের ঘোমটা সরিয়ে রেখেছে খাজিয়ার। অপরূপ রূপে দেখা দিল সে—সুন্দরী খাজিয়ার—মোহময়ী খাজিয়ার।

সুজয়া মুগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'ড্রিম ল্যাণ্ড।'

ওর স্বামী মাথা নাড়ে।

অসিতবাবু বলেন, 'সত্যি।'

আর আমি ভাবি—সত্যই স্বপ্নের দেশ খাজিয়ার।

॥ তিন ॥

'ছি, ছি! আপনার দেরি করিয়ে দিলাম।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মানসী বলে।

'না, না এখনও সময় আছে। অনায়াসে ঘুরে আসা যাবে। হয়তো একটু রাত হবে ফিরে আসতে। হোক না, ক্ষতি কি?' আমি বলি।

'একাই যাচ্ছেন তো?' মানসী জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, সঙ্গী পাব কোথায়?'

'যদি কেউ সঙ্গী হতে রাজী হয়?'

'সানন্দে সঙ্গে নেব।'

'তাহলে শাড়ীটা পালটে আসি?'

আমি মাথা নাড়ি। মানসী তাড়াতাড়ি চলে যায় নিজের ঘরে। হোটেল থেকে ফিরে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য সে নিজের ঘরে গিয়েছিল। তারপরেই এসে বসেছে আমার

ঘরে। বসে বসে গল্প করেছে আর গল্প শুনেছে। গল্পের মাঝে যে কয়েকটা ঘন্টা কেটে গেছে কেউ টের পাই নি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হয়েছে মানসীর। আমি তাকে বলেছিলাম, বিকেলে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, শেরপা গাইড স্কুল ও বশিষ্ঠ কুণ্ড দেখতে যাব।

আমার অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করে আমার আগে তৈরী হয়ে আসে মানসী। হেসে বলে, 'সে কি এখনও হয়নি আপনার।'

'এই হয়ে এলো বলে।' আমি তাড়াতাড়ি করি। মনে মনে ভাবি—যে মহামুনি 'পথি নারী বিবর্জিতা' উপদেশটি দিয়ে গেছেন, তিনি মানসীর মতো মেয়ের সংস্পর্শে আসেন নি।

কয়েক মিনিট বাদে বেরিয়ে পড়ি পথে। ছায়া-ঘন পথ বেয়ে পাশাপাশি চলছি দুজনে। কেন যেন মানসী কোন কথা বলছে না। আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। বলি, 'এমন গম্ভীর কেন?'

গম্ভীর স্বরেই জবাব দেয় মানসী, 'ভাবছি।'

'কার কথা?'

'আপনার।'

চমকে উঠি। মানালীর নির্জন পথ। অস্তাচলগামী ক্লান্ত সূর্যের ম্লান আলোয় মোহময়ী পথ। এ সময়ে এমন কথা।

তবু স্বাভাবিক স্বরে বলি, 'আমার কথা না ভেবে নিজের কথা বলুন।'

'নিজের কথাই তো বললাম।' মানসী হাসে।

'একথা শুনতে চাইছি না। আমি জানতে চাইছি—আপনি কেন এমন একা একা হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই উৎকট শখের কারণ কি?

'শখ নয়, বলুন নেশা।'

'বেশ। কিন্তু নেশার কারণ কি?'

'ভালোবাসা। আমি হিমালয়কে ভালোবাসি। তাই বার বার তার কাছে ছুটে আসি। হিমালয়ের পথ কেবল আমার অবকাশ যাপনের বিলাসভূমি নয়, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ।'

'তাহলে হিমালয়ের পথে দাঁড়িয়ে আমার কথা ভাবছেন কেন?'

'ভাবছি কারণ, যাদের লেখা পড়ে আমি হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্টা হয়েছি, আপনি তাদের অন্যতম। কি সৌভাগ্য আমার, আজ আপনার পাশে পাশে পদচারণা করছি হিমালয়ের পথে।'

কি বলব? চুপ করে থাকি। নীরবে নেমে আসি তে-মাথার মোড়ে। বাঁ দিকের পথ ধরে চলতে থাকি ধীরে ধীরে।

হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে, 'আপনি নিশ্চয় জোসেফাইন স্কারের 'ফোর মাইলস হাই' বইখানি পড়েছেন!'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা মেজর বেনন্ কি এখনও বেঁচে আছেন?'

'না, তাঁর ছেলেরা বেঁচে আছেন। তাঁদের পদবী বেনন্ হলেও তাঁরা কিন্তু হিন্দু। তবে তাঁর কথা কেন? লর্ড কারজনের কাহিনী শুনতেন?'

'না। মেজর জেনারেল ব্রুস ও স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ডের কথা শুনতাম।'

'তাদের কথা কিছু কিছু আমিও বলতে পারি, অবশ্য যদি আপনি শুনতে রাজি থাকেন।'

'খুব বিনয় করা হচ্ছে, না ? আর কথা না বাড়িয়ে বলতে শুরু করুন দেখি।'

পথ চলতে চলতে শুরু করি—

স্যার ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড ইয়ং হাজব্যান্ড-কে হিমালয় অভিযানের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। ১৮৮৫ সালে তিনি গিলগিট এজেন্সীর প্রতিষ্ঠা করে তৎকালীন সীমান্ত রাজ্য হুঞ্জা ও নাগিরের প্রথম সমীক্ষা করেন। তবে হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল আরও আগে। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। বৃটিশ সম্রাটের ড্রাগন গার্ড বাহিনীর তিনি একজন লেফটেন্যান্ট—রাওয়ালপিণ্ডিতে কর্মরত। ওপর থেকে নির্দেশ এলো, ছুটি নিতে হবে। উনিশ বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছেন—সবাইকে ছেড়ে এসেছেন। কোথায় ছুটি পেলে ঘরে যাবেন, প্রিয়জনের মাঝে ছুটি কাটাবেন। তা নয়, তিনি রওনা হলেন হিমালয়ের পথে। অমৃতসর হয়ে পাঠানকোট এলেন—শুরু হল হিমালয়ের পথে পদচারণা। ধরমশালা, কাংড়া, বৈজনাথ ও সুলতানপুর অর্থাৎ কুলু হযে রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে সেবারে তিনি লাহুল পর্যন্ত গিয়েছিলে।

ইয়ং হাজব্যান্ড ১৮৮৭ সালে কারাকোরাম গিরিশ্রেণীর ১৮০০০ ফুট উঁচু দুর্লঙ্ঘ গিরিবর্ত্ম মুজটাঘ অতিক্রম করে বালতোরা হিমবাহ ও বালতিস্থান হয়ে কাশ্মীরে আসেন। তাঁকে কারাকোরাম সমীক্ষার জনক বলা হয়। ইতিপূর্বেই তিনি গোবি মরুভূমি পেরিয়ে ইয়ারখন্দে গিয়েছিলেন।

১৮৮৯ সালে ইয়ং হাজব্যান্ড সালতোরা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। ১৮৯০ সালে তিনি জর্জ ম্যাকার্টনীর সঙ্গে পামীব পরিদর্শন করেন। ১৯০৩-৪ সালে তিনি তিব্বতে যান। ১৯০৬ সালে তিনি কাশ্মীরের বৃটিশ রেসিডেন্ট্ নিযুক্ত হন। আর তখন তিনি কাশ্মীরে না থাকলে ডঃ স্বেন হেডিন সেবারে কিছুতেই লাদাখের ভেতর দিয়ে তিব্বতে যাবার অনুমতি পেতেন না। ফলে বিশ্ববাসী হয়তো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'Trans Himalaya' থেকে বঞ্চিত হতেন। ১৯০৯ সালে ইয়ং হাজব্যান্ড কাশ্মীর হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে পরিক্রমা করেন। তিনি ১৯২০ সালে এভারেস্ট কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন। তাঁরই আন্তরিক আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথম এভারেস্ট অভিযান সম্ভব হয়।

"সত্যই বিস্ময়কর !" আমি থামতেই মানসী বলে ওঠে।

"এর থেকেও বড় বিস্ময় কি জানেন ?"

"কী ?"

"এরা আমাদের মতো কেবল হিমালয শিখরে পতাকা প্রোথিত করেই পর্বতাভিযাত্রীর কর্তব্য শেষ করেন নি। অনাবিস্কৃত হিমালয়কে আবিস্কার করে, সেই আবিস্কারের কথা ও কাহিনী অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন আমাদের জন্য। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা, আমরা তাঁদের সেই মহান আদর্শ অনুসরণ করতে পারছি না।"

"সত্যি।" মানসী মন্তব্য করে। সে বলে যায়, "এ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পনেরোটি পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে কিন্তু বই লেখা হল মাত্র দু'খানি। একবার থামে মানসী। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, "অবশ্য আমার দিক থেকে দুঃখের কিছু নেই, সে দু'খানি বইয়ের একখানির লেখকের সঙ্গে আজ হিমালয়ের পথে পদচারণা করছি আমি—সত্যি আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে....আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।"

"দরকারও নেই। তবে আপনার আনন্দে আমিও আনন্দিত হলাম।" একটু থেমে আবার বলি, "কিন্তু আমরা এখন যাঁর আলোচনা করছি, সেই অমর অভিযাত্রী ইয়ংহাজব্যান্ড তাঁর অসংখ্য অভিযান ও সংখ্যাতীত অভিযান ও সংখ্যাতীত কাজের মাঝেও কতগুলো বই লিখেছেন জানেন ?"

"কখানা ?" মানসী প্রশ্ন করে।

"তা কম করেও খান বিশেক।"

"আপনি সবগুলো পড়েছেন ?"

আমার হাসি পায়। হাসতে হাসতেই বলি, "তাহলে রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ পেতাম। তবে তাঁর কয়েকখানা বই আমি দেখেছি। যেমন—'The Epic of Mount Everest', 'Everest : the Challenge' 'Wonders in the Himalaya', 'India and Tibet', 'Kashmir', 'Peking to Lhasa'—ইত্যাদি।"

"তিনি কি কেবল হিমালয়ের ওপরেই লিখেছেন,"

"না, না—সমাজনীতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, এমন কি রম্যরচনা পর্যন্ত লিখেছেন।" আমি চুপ করি।

কিন্তু আমাকে চুপ করে থাকতে দেয় না মানসী। সে বলে ওঠে, "এবার তাহলে জেনারেল ব্রুসের কথা বলুন।"

আমি শুরু করি—

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চার্লস গ্রানভিল ব্রুসের কথাও সর্বকালের হিমালয় অভিযাত্রীরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ১৯২১ সালের প্রথম এভারেস্ট অভিযানে তাকেই নেতার পদে বরণ করা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিরক্ষায় প্রয়োজনে তিনি এই অভিযানে যোগদান করতে পারেন না! হাওয়ার্ড-বিউরি এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

ব্রুস অবশ্য ১৯২২ সালের এভারেস্ট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালের তৃতীয় এভারেস্ট অভিযানের নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু পদযাত্রার প্রথম দিকেই তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত জেনারেলই. এফ. নর্টন এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। এই অভিযান কালেই জর্জ এল. ম্যালোরী ও এনড্রু আরভিন চিরকালের মতো হারিয়ে গেছেন।

গুর্খা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ব্রুস। ভারতের প্রতিরক্ষায় পর্বতারোহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি তাঁর সৈন্যদের পর্বতারোহণ শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তাঁর সেই সব গুর্খা পর্বতারোহীরা সেকালের বহু অভিযানে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ,এরিক ই. শিপটন, হিউ রাটলেজ, এইচ. ডাবলু. টিলম্যান ও ডাঃ টি. জি. লংস্টাফের মতো তিনিও মনে করতেন যে পর্বতারোহণ কেবলমাত্র শারীরিক কৌশল নয়, একটি সুকুমার কলা।

জেনারেল ব্রুস পঁয়তিরিশ বছরের অধিককাল হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের দুর্গমগিরি-কান্তারে পদচারণা করেছেন। ১৮৯০, ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালে তিনি কাশ্মীরের বহু অপরাজিত পর্বতশিখরে আরোহণ করেন। নাঙ্গাপর্বত ও ত্রিশূল সহ হিমালয়ের বহু উল্লেখযোগ্য সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। ১৯১২ সালে ব্রুস প্রথম মানালী আসেন। তখনই তাঁর সঙ্গে মেজর বেননের পরিচয় হয়।

"সত্যি এঁরাই প্রকৃত হিমালয় প্রেমিক। অমন দুঃসহ কষ্ট সহ্য করে তাঁরা যদি

হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে না বেড়াতেন, তাহলে আজও হয়তো হিমালয়ের অনেক অংশ আমাদের অজানাই রয়ে যেত।" মানসী মন্তব্য করে।

"ব্রুস কিন্তু কি বলেছেন জানেন?"

"কী?"

"বলেছেন, 'I have not been able to do more than pierce these vast ranges, as one might stick a needle into bloster, in many places; for no one can lay claim to a really intimate knowledge of Himalaya'....."

"জেনারেল ব্রুসও নিশ্চয়ই অনেক বই লিখে গেছেন।" মানসী বলে।

"ইয়ংহাজব্যান্ডের মতো সংখ্যায় অত না হলেও লিখেছেন বৈকি, তাঁর 'Twenty Years in the Himalaya', 'Himalayan Wonderer', 'The Land of Gurkhas', 'Kulu and Lahoul', 'The Assult on Mount Everest—1922' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।"

কথা বলতে বলতে আমরা বিপাশার পুল পেরিয়ে এসেছি। বাঁ দিকে রাহালা ও ডান দিকে নাগরের বাস পথ। গতকাল রাহালা থেকে মানালী এসেছি আমি। আগামীকাল সকালে নাগর যাব।

এখানে পথের পাশে একখানি ইংরেজী সাইনবোর্ড। লাহুল-স্পিতি ও লাদাখের বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব ও উচ্চতা লেখা। মানসী জোরে জোরে পড়তে শুরু করে, 'কোঠি—১৩ কিঃমিঃ উচ্চতা ২৬৭৪ মিটার, রোতাং—৫১ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩৮৭৯ মিটার, গ্রাম্‌ফু—৬৬ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩২৮৪ মিটার, খোকসার—৭১ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩১৪০ মিটার, তাণ্ডি—১০৮ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩০০৯ মিটার, কেলং—১১৫ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩৩৮৪ মিটার, বারালাচা—১৮৯ কিঃমিঃ উচ্চতা ৪৬০৯ মিটার।

মানসীর পড়া শেষ হয়। আবার এগিয়ে চলি।

আমরা রাহালার পথে এগিয়ে চলেছি। বিপাশার তীর দিয়ে পথ। বাঁ দিকে বিপাশা, ডান দিকে পাহাড়। আধ মাইল এসে সরু একটি পায়ে-চলা পথের ধারে পৌঁছলাম। পথটি পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। এইটেই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের পথ। আশ্চর্য! পথের ধারে একটা সাইনবোর্ড পর্যন্ত নেই। জন-বিরল পথ। অনেক সময়েই জেনে নেবার মানুষ পাওয়া যায় না। বাসপথ থেকে শিক্ষাকেন্দ্র দেখাও যাচ্ছে না। কাজেই নতুন লোকের পক্ষে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমি সেদিন রাহালা যাবার পথে রাস্তাটা দেখে গিয়েছিলাম। তাই আজ চিনতে পারলাম।

পায়ে-চলা সেই সরু চড়াই পথটি ধরে আমরা উঠে এলাম ওপরে। এটি সংক্ষিপ্ত পথ। মোটর পথটি এসেছে অনেকটা ঘুড়ে।

কয়েক কাঠা সমতল জায়গা। কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ি আর বাগান নিয়ে শিক্ষায়তন। পাঞ্জাব সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এই শিক্ষায়তন। ১৯৬১ সালে চণ্ডীগড়ে প্রথম এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে নিয়ে আসা হয় এখানে, এই চিধিয়ারীতে। আগামী ১লা নভেম্বর (১৯৬৬) থেকে মানালী হিমাচলের অন্তর্ভূক্ত হবে। তখন এই শিক্ষায়তনের নাম হবে—Western Himalayan Institute of Mountaineering & Allied Sports. তবে সরকার বদলের জন্য শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত। তাই ডাইরেকটার শ্রীহারনাম সিং শিমলা গেছেন।

মোটেই জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নয় এই শিক্ষায়তন। এখানকার বেসিক কোর্সের শিক্ষাকাল দার্জিলিং ও উত্তরকাশীর চেয়ে কম। ফি-ও অল্প। কিন্তু এখানকার শিক্ষা খারাপ ন। খাওয়া থাকাও ভাল। অবস্থান ও কর্তৃপক্ষের সততার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। মানালী শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থানই কর্তৃপক্ষের প্রধান সহায়। এখান থেকে মাত্র একদিন হেঁটেই পৌঁছেন যায় পর্বতারোহণ শিক্ষার মূল-শিবির বিয়াস কুণ্ডে। আর শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গেই রয়েছে শৈলারোহণ শিক্ষা দেবার কয়েকটি আদর্শ স্থান।

তিনটি বেসিক ও দুটি এ্যাডভ্যান্স মাউণ্টেনিয়ারিং কোর্স ছাড়াও একটি করে এ্যাডভেঞ্চার, ইনসট্রাকটর, স্কি ও রক্ ক্লাইম্বিং কোর্স হয় এখানে। বেসিক কোর্স পঁচিশ দিনের ও এ্যাডভান্স কোর্স চল্লিশ দিনের। শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে আড়াই'শ ও চার শ' টাকা করে ফি দিতে হয়। ছ'জন ইনস্ট্রাক্টর আছেন এখানে।

দেখা হল ইনষ্টিটিউটের ইন্সট্রাক্টর শ্রীজ্ঞানচাঁদের সঙ্গে। বিখ্যাত পর্বতারোহী তিনি। কয়েকটি অভিযানে অংশ নিয়েছেন। আমার সঙ্গে পরিচয় নেই কিন্তু পত্রালাপ আছে। নাম বলতেই চিনলেন আমাকে। মানসীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলাম। বলতে হল, মানসী আমার পূর্ব পরিচিতা। কাল মানালীতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়েই বললাম কথাটা। অসিতবাবুরা স্পিতি থেকে ফেরার পথে একটা দিন কাটাবে মানালীতে। সেদিন নিশ্চয়ই তারা আসবে এখানে। দেখা হবে জ্ঞানচাঁদের সঙ্গে। মানসীর কথা শুনে তারা কি ভাববে কে জানে ?

জ্ঞানচাঁদের সঙ্গে আমরা শিক্ষায়তন পরিক্রমায় বের হই। অফিস থেকে হোস্টেল ও ক্লাশরুম দেখে মিউজিয়ামের সামনে আসি। দুর্ভাগ্য আমাদের মিউজিয়াম বন্ধ। দ্বারোয়ান চাবি নিয়ে বাজারে গেছে। কখন আসবে ঠিক নেই।

মিউজিয়াম মানে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানি মাঝারী আকারের টিনের ঘর। জানালা দিয়ে যতটা সম্ভব দেখে নিলাম। চারিদিকের দেয়ালে টাঙানো রয়েছে কয়েকখানি ছবি। এক পাশে বড় একটা টেবিলের ওপরে সাজানো আছে র্পতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম। আর মেঝের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে হিমতীর্থ হিমাচলের একটি মাটির মডেল। ভারী সুন্দর। এইটি দেখার জন্য অন্তত প্রত্যেক পর্যটকের একবার এখানে আসা উচিত।

আমরা ফিরে চলি। জ্ঞানচাঁদ আমাদের এগিয়ে দেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেন, "ঠিক কথা আমূলের কি খবর, সে কেমন আছে ?"

আমূল মানে নীলগিরি অভিযানের নেতা, পঞ্চচুলি ও চন্দ্রপর্বত বিজয়ী অমূল্য সেন। বলি, "অমূল্য ভাল আছে। আপনি তাকে চেনেন দেখছি।"

"চিনব না কেন ?" জ্ঞানচাঁদ বললেন, "আমরা যে প্রি-এভারেস্ট অভিযানে সহযাত্রী ছিলাম। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক পর্বতারোহীই আমূলকে জানে। রেকর্ডটা তো ওর খুবই ভাল। দুটি শৃঙ্গে আরোহণ করেছে, একটা সফলকাম অভিযান পরিচালনা করেছে।"

"আশা করছি সামনের বছর ওর রেকর্ড আরও ভাল হবে।"

"তাই নাকি ? কোথায় যাচ্ছে ?" জ্ঞানচাঁদ বলেন।

আমি উত্তর দিই, "কেদারনাথ পর্বত অভিযানে।"

"কারা আয়োজন করছেন ?"

"গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার একসপ্লোরেশান কমিটি।"

"কে নেতৃত্ব করছে, আমূল নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ।"

"আর কে কে যাচ্ছেন ?"

"প্রাণেশ চক্রবর্তী, বীরেন সরকার, সুজল মুখোপাধ্যায়, হিমাদ্রি ভট্টাচার্য, রামনাথ শর্মা, করুণাময় দাস, অসিত বসু, বরেণ্য মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার স্বপন রায়চৌধুরী ও আমি। উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের শ্রী কে. পি. শর্মা এই অভিযানের প্রধান পরমর্শদাতা। এ ছাড়া প্রতিরক্ষা দপ্তরের মেজর পি. এস. মূর্তি, জিওলজিক্যাল সার্ভের শ্রী এ. পি. তেওয়ারী ও বটানিক্যাল সার্ভের শ্রী বি.ডি. নাইথানি আমাদের সঙ্গে যাবেন।"

"তাঁরা কি করবেন ?" জ্ঞানচাঁদ বলেন।

"বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা। আমরা ২২,৪১০ ফুট উঁচু কেদারনাথ ডোম, ও ২২,৭৭০ ফুট উঁচু কেদারনাথ শৃঙ্গে অভিযান চালাবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও গবেষণা করব।"

"খুব ভাল হবে। আমি আপনাদের এই অভিনব অভিযানের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি। আর আজকের ভারতে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। হিমালয় তো কেবল দেবতাত্মা নয়, সে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাই হিমালয়ের দিকে শত্রুর এমন প্রখর নজর। এতকাল সে ছিল আমাদের সীমান্তরক্ষী, এখন তাকে রক্ষা করার জন্য সীমান্তরক্ষীর প্রয়োজন হচ্ছে। এ জন্য যেমন পর্বতারোহণ শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন হিমালয়ের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া। দুঃখের কথা আমরা পর্বতশিখরে আরোহণ করছি কিন্তু পর্বতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি না। হিমালয়কে জানতে হবে। তার রহস্য উদ্ধার করে—তাকে আবিস্কার করতে হবে। তারপরে হিমালয়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সকল ঐশ্বর্য আহরণ করে এই দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য মোচন করতে হবে। তবেই সার্থক হবে প্রকৃত পর্বতারোহণ।"

থামলেন জ্ঞানচাঁদ। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই মানসী বলে ওঠে, "তাছাড়া গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের বিশদ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কারণ গঙ্গোত্রী ও তার শাখা হিমবাহদের নিয়ে হিমালয়ের বৃহত্তম ও বিশ্বের বিচিত্রতম হিমবাহ অঞ্চল। এই হিমবাহ-অঞ্চলের তিন দিক থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভাগীরথী অলকানন্দা ও মন্দাকিনী। এই তিন নদীর মিলিত ধারাই গঙ্গা। যে বিগলিত-করুণা গঙ্গা সমগ্র ও পূর্ব ভারতের প্রাণধারা।'

মানসীর ভাষা ও বক্তব্যে খুশি হন জ্ঞানচাঁদ। গর্ববোধ করি আমি।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন জ্ঞানচাঁদ। বলেন, "ঠিক কথা, মিস্টার রায় মানে নিতাই রায় আপনাদের খোঁজ করছিলেন।"

"নিতাই রায়, মানে যিনি নীলগিরি পর্বতে আরোহণ করেছেন ?" মানসী মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" জ্ঞানচাঁদ বলেন।

"তিনি এখানে এসেছেন নাকি ?" মানসী প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। তিনি তো আমাদের এ্যাডভান্স কোর্সে গেছেন। পরশুদিন ওরা পাহাড়ে রওনা হয়ে গেছে। যে ক'দিন এখানে ছিলেন, রোজই আপনাদের খোঁজ করতে টুরিস্ট্ অফিসে যেতেন।"

মনটা খারাপ হয়ে যায়। দুটো দিনের জন্য দেখা হল না নিতাইয়ের সঙ্গে।

নজর পড়ে মানসীর দিকে। ভাবি ভালই হল। নিতাই আমার ছোট ভাইয়ের মতো।

মানসী রয়েছে আমার সঙ্গে। কত কি ভাবতে পারত।

জ্ঞানচাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় রাস্তায় নেমে আসি আমরা। রাহালার পথ ধরেই এগিয়ে চলি। কথাটা না বলে আর থাকতে পারি না। মানসীকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি নিতাইকে চেনেন নাকি ?"

"হ্যাঁ।" মানসী মৃদু হেসে উত্তর দেয়।

"কে পবিচয় করে দিল ?" আমি প্রশ্ন করি।

"আপনি।"

"আমি ?" বিস্মিত হই। "আমি আবার কোথায় আপনার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম ?"

"কেন, আমার পড়ার ঘরে।" মানসী তেমনি হাসে।

"আপনার পড়ার ঘরে ? আমি ? কবে গেলাম ?" আমার বিস্ময় বাড়ে।

"আপনি যান নি, আপনার লেখা বই গেছে। আমি 'নীল-দুর্গম' পড়েছি, কাজেই নিতাই রায় আমার অপরিচিত নয়।"

আমি আর কোন কথা না বলে নীরবে পথ চলতে থাকি। ভাবতে ভাল লাগছে মানসী আমার প্রিয়-পাঠিকা। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে হিমালয়ে। তার সঙ্গে আমি পদচারণা করছি হিমাচলের পথে পথে।

পথের ডান দিকে দেওদারে ছাওয়া পাহাড়, বাঁয়ে উচ্ছ্বসিতা বিপাশা, সামনে হিমতীর্থ হিমাচল। মাথার ওপরে নীলাকাশ। আকাশ নয় সুনীল চন্দ্রাতপ। তার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে দু'একখানি ছোট ছোট মেঘ। মেঘ নয় যেন বলাকা।

বৈকালী রোদ বর্ণালী আমেজ ছড়িয়েছে কালো পাহাড়ে, সবুজ বনে আর বিপাশার রুপোলী জলে। আকাশ নীরব, পাহাড় নীরব এমন কি নীরব ঐ দেওদার বন। কিন্তু ওদের সবার মুখপাত্র হয়ে কথা বলছে বিপাশা। কথা নয় গান—হিমতীর্থ হিমাচলের জয়গান।

সহসা কথা বলে মানসী। বাংলায় নয়, ইংরেজীতে। আমাকে কিছু বলে না, কথা বলে যায় আপন মনে। আমি কেবল নীরবে শুনি। মানসী বলে—

'Light-heartedly we wandered along, drinking in the Sunshine, the brilliant blue sky and scudding clouds, the tall deodars climbing towards dark rocky ridges, the lush meadows and sparkling river. Starting as a tiny spring just below Rhotang Pass the River Beas surges down the Kulu Valley, carves a tortuous passage through the foothills and emerges, muddy but triumphant, to roll accross the Indian plains.'

থামে মানসী। আমি বলি, "আপনি দেখছি 'ফোর মাইল্‌স হাই' বইখানা খুবই ভাল করে পড়েছেন, একেবারে মুখস্থ করে রেখেছেন।"

"ভাল করে পড়েছি বই কি। দুটি মেয়ে সুদূর ইংলন্ড থেকে ল্যান্ড রোভার চালিয়ে মানালী এলো। তার পরে বড়া শিগরি হিমবাহে গিয়ে একাধিক পর্বত শিখরে আরোহণ করল। এই অসাধারণ কীর্তির কাহিনী মন দিয়ে পড়ব না ? তবে কি জানেন, মুখস্থ করব বলে মুখস্থ করি নি। মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু সব সময় এমন মুখস্থ বলা যায় না। মনে পড়ে না। এর জন্য পরিবেশের প্রয়োজন। এরকম পরিবেশ তো আর কখনও পাই নি। তাই এমন বলতে পারছি। আর আজ সেই দুর্লভকে এত কাছে পেয়েছি বলেই এমন মুখরা হতে পারছি।"

"কি রকম ?"

"এই মোহময়ী পথ, আর মনের মতো সঙ্গী। পথ আর সাথী আজ আমার মনের বন্ধ দুয়ার দিয়েছে খুলে।" মানসী থামে। আমি নীরবে পথ চলি।

কিন্তু মন স্থির থাকতে পারে না। সে স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহন করে। ভেবে চলি— ইয়ংহাজব্যান্ডের সেই প্রথম হিমালয় পরিক্রমা, প্রায় পঁচাশি বছর আগের কথা। তিনি লিখেছেন, 'Bashist,....the typical Alipine scenery with snowy mountains rising on the either side, and in front of me, at the head of the valley, a massive mountain 20,000 feet in height. The mountain sides were every where covered with Pine forests, and Pines grew een out of the steep cliffs on any little projecting piece of rock and magnificent waterfall fell from the mountain heights....I delightedly drank it all in, and let it sink deeper and deeper within me.'

পঁচাশি বছর আগেকার বর্ণনা কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আজকের কথা। সেই একই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

তবে হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে বৈকি। হিমালয়ের নয়, প্রকৃতির নয়, মানুষের তৈরি জনপদের। সেকালে বশিষ্ঠই ছিল এ অঞ্চলের বৃহত্তম জনপদ। মানালীর কোন উল্লেখ নেই ইয়ংহাজব্যান্ডের লেখায়। বর্তমানের জনবহুল মানালী ছিল জনহীন। জনবসতি ছিল আরও ওপরে মন্দারকোটে। তাই ইয়ংহাজব্যান্ড এখানে এসেই রাত্রিবাস করেছিলেন।

বশিষ্ঠ অতি প্রাচীন জনপদ। কথিত আছে কোন কারণে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে বশিষ্ঠদেব বিপাশায় ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু বিপাশার সাধ্য কি মহামুনির প্রাণনাশ করে। পরমশ্রদ্ধা সহকারে সে তার তরঙ্গবাহু দিয়ে বশিষ্ঠদেবকে তীরে তুলে দিল, রেখে গেল এইখানে। আশ্রম নির্মাণ করে মহামুনি বাস করতে থাকলেন এই রমণীয় স্থানে। তাঁর সেই আশ্রমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই গ্রাম। এখন গ্রামের নাম বশিষ্ঠকুন্ডু। কিন্তু কুন্ডু এখান থেকে কিছু দূরে।

গাঁয়ের পথ এসে মিশেছে বাসপথে। বাসপথে কয়েকখানি দোকান আর গাঁয়ের দুধারে বাড়ি-ঘর। খানিকটা এগিয়েই বাঁ দিকে বিখ্যাত পর্বতারোহী ওয়াংদির 'শেরপা গাইড স্কুল'।

এটি কেবল পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র নয়। হিমাচলের দুর্গম পথে পদযাত্রীদের সে সাহায্য করে। অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তাদের পদযাত্রাকে সফল করে তোলে।

আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে এই বিদ্যালয়ের। এখানে শীতকালে 'স্কি' কোর্স হয়।

ওয়াংদি ইয়োরোপ প্রত্যাগত অভিজ্ঞ শেরপা। সে অনায়াসে কোন পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতা করতে পারে। কিন্তু ওয়াংদি সেই বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন না করে প্রতিষ্ঠা করেছে এই শিক্ষায়তন। নিজের সমস্ত সম্বল সে নিঃশেষ করেছে এর পেছনে। ছাত্র সংখ্যা সামান্য। যা আয় তাতে খরচ কুলোতে চায় না। আর্থিক অসুবিধার জন্য বিয়ে পর্যন্ত করে নি। তবু পর্বতারোহণ প্রসারের প্রচেষ্টা থেকে বিচ্যুত হয় নি।

আমাকে দেখে ভারী খুশি হয় ওয়াংদি। সে আমাদের ওপরে নিয়ে আসে। বাড়ির সামনে সুন্দর বাগান করেছে। মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় সে এই বাড়িটা নিয়েছে।

নানা গল্প করে ওয়াংদি। আমাদের কফি ও বিস্কুট খাওয়ায়। মানসী পর্বতারোহণের

সাজ-সরঞ্জাম দেখতে চায়। সযত্নে সব কিছু দেখায় ওয়াংদি। তার পরে আমাদের এগিয়ে দিতে গেট পর্যন্ত আছে। বলি, "অশেষ ধন্যবাদ। এবার তাহলে আসি। আমরা একবার বশিষ্ঠকুণ্ডে যাব।"

"তাই নাকি। তাহলে একটু দাঁড়ান। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।"

"না না। তুমি আবার কেন যাবে। তোমার না জানি কতো কাজ রয়েছে।"

"কোন কাজ নেই।" ওয়াংদি বলে, "কাল কোর্স চলে গেছে। এখন আমার অফুরন্ত অবসর। আমাকে যে একবার যেতেই হবে কুণ্ডে। আজ সেখানে মহোৎসব হচ্ছে। নেমন্তন্ন করে গেছে। ওরা যে বড়ই ভালবাসে আমাকে। ওদের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে, কবে আমাকে এ স্কুল বন্ধ করে দিতে হত।"

"আচ্ছা সরকার তোমাকে কোন সাহায্য করেন নি?"

"এখন পর্যন্ত না। তবে পাঞ্জাব সরকার রাজি হয়েছিলেন বিয়াসের তীরে কয়েক বিঘা জমি দিতে। কিন্তু সরকার যে বদলে যাচ্ছে মানালী হিমাচলপ্রদেশে চলে যাচ্ছে। তখন আবার কি হবে, কে জানে! যাক্ গে, আমি এখুনি আসছি।"

ওয়াংদি চলে যায় ভেতরে। মানসী এক মনে ওয়াংদির বাগান দেখছে। কাছে গিয়ে বলি, "কি কবরীতে কুসুম রচনা করার মতলব হচ্ছে নাকি?"

"হলেই বা দিচ্ছে কে?"

"কেন এই অধম। নাই বা হলেম কবি। তবু তো করজোড়ে কামনা করতে পারি— আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর।"

একটি ফুল তুলে মানসীর হাতে দিই। মৃদু হেসে ফুলটি খোঁপায় গোঁজে মানসী। বিপাশার পরপারে পাহাড়ের পেছনে সূর্য অদৃশ্য হয়। সে যেন মানসীর কবরী রচনা দেখার জন্যই এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

একটু বাদে ওয়াংদি ফিরে এলো। বলল, "চলুন যাওয়া যাক।"

মানসী এতক্ষণ ওয়াংদির সঙ্গে সামান্য কথা বলেছে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবারে পথে নেমেই সে ওয়াংদিকে বলে, 'না জানিয়ে আপনার বাগান থেকে একটা ফুল নিয়েছি।"

"জেনে খুশি হলাম।" ওয়াংদি বলে, "ফুলটা সৎ কাজে লাগল।"

"তা কাজে লাগাবার আসল মানুষটিকে নিয়ে আসছেন না কেন?" মানসী হাসে।

"আমার যে অনেক কাজ। এই বিদ্যালয়কে বড় করে তুলতে হবে, পর্বতারোহণকে জনপ্রিয় করতে হবে, হিমালয়ের মানুষদের জীবনে উন্নতি আনতে হবে।"

"সে তো এ সব আদর্শ রূপায়ণে আপনাকে সাহায্যও করতে পারে।"

"তা পারে, তবু ভয় হয়। যদি যে আমার মতো দুঃখ কষ্ট সইতে না পারে।"

"এ আপনার ভুল ধারণা মিস্টার ওয়াংদি.। এ দেশের মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হয়েছে, যমরাজের সঙ্গে বিবাদ করেছে। আমি বলছি, বিয়ে করলে আপনার ভালই হবে।"

ওয়াংদি কোন জবাব দেয় না। বোধহয় বুঝতে পেরেছে মানসীর সঙ্গে তর্কে জয়লাভ করার যোগ্যতা নেই তার। তাই সে মানসীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি হাসছে।

আর মানসী। সেও হাসছে, আত্মপ্রসাদের হাসি। বিশ্বের নারীজাতির প্রতিনিধিত্ব করে ওয়াংদিকে পরাজিত করেছে সে।

মানসী কিন্তু চুপ করে থাকে না। সে ওয়াংদিকে জিজ্ঞেস করে, "আপনার স্কুলে মেয়েরা ট্রেনিং নেয়?"

"দু'জন নিয়েছেন। তবে মেয়েদের জন্য আলাদা কোন কোর্স নেই। তাঁরা একজন ভাই ও একজন স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে আছি। চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিলাম। এবারে মানসীকে বলি। ওয়াংদি যাতে বুঝতে পারে, তাই ইংরেজিতেই বলি, "মাউণ্টেনিয়ার হবার সদিচ্ছা আছে কি ?"

"থাকলে ক্ষতি কি ? কি বলুন মিস্টার ওয়াংদি ?"

ওয়াংদি কোন উত্তর দেবার অবকাশ পায় না। আমরা কুণ্ডের সামনে পৌঁছে গেছি। গ্রামবাসীরা সবাই সমবেত হয়েছে এখানে। ভেতরে ও বাইরে বেশ ভিড়। তাঁদেরই কয়েকজন আমাদের দেখে ছুটে এলেন কাছে। ওঁরা সবাই ওয়াংদির পরিচিত। নমস্কার বিনিময়ের পরে ওয়াংদি আমাদের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করে দেয়। ওঁরা অনুরোধ করেন, "আজ আমাদের বাৎসরিক উৎসব। দয়া করে যদি একটু প্রসাদ পান, বড়ই বাধিত হব।'

"না, না। তোমাদের ওসব রান্না খেতে পারবেন না।" ওয়াংদি আপত্তি করে, "এঁরা কলকাতার লোক।"

আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু মানসী হিন্দীতে বলে ওঠে, "কেন খেতে পারব না, খুব পারব। আমরা আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।"

গ্রামবাসীরা খুশি হন। তাঁরা আমাদের নিয়ে চলেন ভেতরে।

মানসী আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলে, "আপনার কোন আপত্তি নেই তো ?"

"থাকলেই বা কি এসে যাচ্ছে। আপনি যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।"

"তা যা বলেছেন। পড়েছেন মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।"

সংকীর্ণ একটি তোরণ পেরিয়ে আমরা বাঁধানো অঙ্গনে উপস্থিত হই। পথের পাশেই অঙ্গন। অঙ্গনের ডানদিকে কুণ্ড—উষ্ণকুণ্ড। ১৪ ফুট দীর্ঘ ১২ ফুট প্রশস্ত ও ৩ ফুট গভীর একটি জলাশয়। জল থেকে ধোঁয়া উঠছে, গন্ধকের গন্ধ আসছে। শুনেছি এই স্বাদহীন জলে কয়েকদিন নিয়মিত স্নান করলে বাত সেরে যায়। গলগণ্ড রোগেরও নাকি মহৌষধ এই কুণ্ডবারি। তবে আক্রান্ত হবার পরেই রোগীকে নিয়ে আসতে হয়।

স্নানের ঘাট দু অংশে বিভক্ত। মেয়েদের অংশ দেয়াল-ঘেরা। পেছনের অংশ ছেলেদের স্নানের জন্য। কুণ্ডের পাশে মন্দির প্রাঙ্গণ। সেখানে একদল মেয়ে-পুরুষ ও ছোট ছেলে-মেয়েরা খেতে বসেছে।

জনৈক গ্রামবাসী বলেন, "এইমাত্র বৈঠক পড়েছে। চলুন এই সঙ্গে আপনারাও বসে যাবেন।"

"না।" মানসী আপত্তি করে। "আমি স্নানটা সেরে নিই।"

"স্নান !" কেউ কিছু বলবার আগেই আমি বলে উঠি, "এই অসময়ে স্নান করবেন কি ?"

"পুণ্যস্নানের কি সময় অসময় আছে নাকি ?" মানসী পাল্টা প্রশ্ন করে।

"কিন্তু কাপড়-চোপড় ?" জিজ্ঞেস করি।

"আছে, মশাই আছে।" বলে কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের থলিটা দেখিয়ে দেয় মানসী।

অনেকবার ভেবেছি, ঝোলাটায় কি আছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে নি। বশিষ্ঠকুণ্ডে আসব শুনেই স্নানের জন্য তৈরি হয়ে এসেছে মানসী। যাক্ গে, স্নান করে যদি সে শান্তি পায়, করুক না। শান্তির জন্যই নাকি তার হিমাচল পরিক্রমা।

"তাহলে যান, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিন।" আমি বলি।

"যাক্ অনুমতি পাওয়া গেল। বড় ভয় ছিল, পাছে আপনি আপত্তি করেন।" মানসী খুশি হয়। ভ্যানিটি ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে একটু মুচকি হেসে চলে যায় দেওয়ালের ও-ধারে।

ওর শেষ কথাগুলো বারবার কানে বাজছে। মানসীর ভয় ছিল, আমি স্নানের অনুমতি দেব না। আমার অনুমতির কি প্রয়োজন তার ? কেবল কি সঙ্গে এসেছি বলে ?

"চলুন আমরা ওদিকে গিয়ে দাঁড়াই।" ওয়াংদি বলে।

"তাই ভাল।" বলে আমি ওয়াংদির সঙ্গে কুণ্ডের তীর দিয়ে মন্দির চত্বরে এসে দাঁড়াই। গ্যাসের কয়েকটা আলো জ্বলছে। জন পঞ্চাশ মেয়ে পুরুষ ও শিশু খেতে বসেছে। তাদের চিৎকার ও কর্তৃপক্ষের হাঁকডাকে চারিদিক মুখরিত। বিরাট বিরাট হাঁড়ি, কড়াই ও গামলায় করে ভাত ডাল তরকারী ও মিষ্টান্ন রাখা হয়েছে। লাল মোটা চালের ভাত, পাতলা জলের মতো ডাল, বহুবর্ণের বিচিত্র দর্শন তরকারী আর দুধমাখা ভাতের মতো মিষ্টান্ন।কিন্তু তাই পরম সমাদরে পেট পুরে খাচ্ছে সবাই। কি আনন্দ, কি উৎসাহ কি উদ্দীপনা ! কত সহজ এদের জীবন যাত্রা। কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় এরা। অথচ সেটুকুও পায় না।

গ্রামের মানুষরা সবাই মিলে আয়োজন করেছে এই মহোৎসব। মোড়ল নিজে তদারক করছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি কাছে এলেন। ওয়াংদি পরিচয় করিয়ে দিল। হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। আমি কলকাতার মানুষ হয়ে আজ বশিষ্ঠকুণ্ডের এই মহোৎসবে যোগদান করেছি, এ নাকি নেহাতই ঠাকুরের কৃপা। বারবার বৃদ্ধ ধন্যবাদ জানান তাঁর ঠাকুরকে।

কিছুক্ষণ বাদে মানসী আসে। বৃদ্ধ আমাদের নিয়ে চলেন মন্দিরে। দেবী ভগবতীর সুন্দর মূর্তি রয়েছে একধারে। আমরা কায়মনোবাক্যে হিমালয়ের মানুষদের জন্য প্রার্থনা করি তাঁর কাছে। বলি—মা তুমি এদের দুঃখ দূর কর। এরা যেন সুখী হয়। যেন চিরকাল এমন সহজ সরল ও আনন্দময় থাকে।

মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে বশিষ্ঠদেবের মূর্তি—কাঠের মূর্তি। এমনকি উপবীত ও হাতের পদ্মটি পর্যন্ত খোদিত কিন্তু মাথার পাগড়িটা কাপড়ের। ফুল দিয়ে সাজানো।

মূর্তির পায়ের কাছে থেকে বেরিয়ে আসছে জলধারা। গিয়ে পড়ছে কুণ্ডে। বশিষ্ঠদেবের চরণামৃত জগতের পাপ ও তাপ দূর করছে। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে মহামুনিকে প্রণাম করি।

॥ চার ॥

প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে আসি পথে। ওয়াংদিকেও বসতে হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। কিন্তু সেও আমারই মতো খেতে পারে নি, ফেলে দিয়েছে। অথচ আশ্চর্য ! মানসী কিছুই ফেলে নি, সবকিছু খেয়েছে। আনন্দের সঙ্গেই খেয়েছে। আমাদের ফেলতে দেখে ধমক দিয়েছে। তবে তাতে তার লাভ হয় নি কোন।

স্কুলের সামনে এসে বিদায় নেয় ওয়াংদি। তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে মানসীর সঙ্গে এগিয়ে চলি মানালীর দিকে। মেটে জ্যোৎস্নায় মৃদু আলোকিত পাথুরে পথ। বিপাশার গান শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি আমরা।

হঠাৎ মানসী বলে ওঠে, "আপনি তো বেশ মানুষ, খুব ফাঁকি দিচ্ছেন।"

"কি রকম ?" কিছুই বুঝতে পারি না।

"সেই কখন খাজিয়ার যাবার কথা বলেছেন। তার পরে সে প্রসঙ্গটা একেবারে শিকেয় তুলে রেখেছেন।"

"সে প্রসঙ্গটা কি এখন শুরু না করলেই নয়। প্রবহমানা বিপাশার পাশে পাশে পথ চলছি আমরা। নীলাকাশে চাঁদ উঠেছে। হিমাচল পড়েছে ঘুমিয়ে। এই পরিবেশে ঐ সব মামুলী বর্ণনা শুনতে ভাল লাগবে আপনার ? তার চেয়ে নীরবে পথ চলা ভাল নয় কি ? এমন পরিবেশ যে বড় একটা পাওয়া যায় না।"

"দেখবেন মশাই, দোহাই আপনার," মানসী হাত জোড় করে, "আবার প্রেম-ট্রেম নিবেদন করে বসবেন না যেন। নির্জনে নারীকে সঙ্গে পেলে আপনাদের তো আবার ও ইচ্ছাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।"

থমকে দাঁড়াই। মানসীর দিকে তাকাই। কি বলছে সে, কি বলতে চাইছে সে ? এমন সাহসই বা তার হল কেমন করে ? কি ভেবেছে আমাকে ?

মানসী থামে নি। সে এগিয়ে চলেছে।

না সেও থেমেছে, কয়েক পা এগিয়ে। পেছন ফেরে মানসী। বলে, "থামলেন কেন ?"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী এগিয়ে আসে কাছে। জিজ্ঞেস করে, "অসন্তুষ্ট হলেন ?"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী আবার বলে, "আমি এমনি বলেছি কথাটা। কিছু ভেবে বলি নি। আমার অন্যায় হয়েছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর বড়ই করুণ শোনায়।

তাহলেও আমি কোন কথা বলি না। তবে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করি।

মানসী আমার পাশে আসে। চলতে চলতে বলে, "আমি জানি আপনি তেমন নন। নইলে কি আর এমন ভাবে আপনার সঙ্গে মিশতে পারতাম। আপনি আমার প্রিয় লেখক, আমার পরম শ্রদ্ধেয়।" একবার থামে মানসী। তার পরে অসহিষ্ণু স্বরে বলে ওঠে, "চুপ করে আছেন কেন ? বলুন কিছু মনে করেন নি আমার কথায়, আমাকে ক্ষমা করেছেন ? বলুন শিগগীর বলুন।"

"ক্ষমা..."

"হ্যাঁ।"

"এতে ক্ষমা করার কি আছে ?" আমি বলি।

"আছে বৈকি। আমি যে অন্যায় করেছি।" মানসী বলে।

"না, আপনি কোন অন্যায় করেন নি। আমি আপনার যত শ্রদ্ধেয়ই হয়ে থাকি, আমি তো মানুষ। আমাকে সাবধান করে দেবার অধিকার আপনার আছে বৈকি !"

"না, নেই।" মানসী বলে, "আপুনি বলুন, আমাকে ক্ষমা করেছেন কিনা ?"

"অন্যায় করেন নি, তবু ক্ষমা করব ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ করলাম।"

"সত্যি বলছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে অমন গম্ভীর স্বরে কথা কইছেন কেন ? একবার হাসুন, একবার, একটুখানি....."

ওর কথায় হাসি পায় আমার। আমি হেসে ফেলি। খুশী হয় মানসী। সুন্দর মুখখানিতে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে বলে, "এবারে আবার পথ চলা যাক। আপনিই তো বলেছেন, হিমালয়ের পথে থামার অবকাশ নেই। আর চলতে চলতে শুরু করুন হিমালয়ের কথা—খাজিয়ারের ভ্রমণকাহিনী। আমার যে বড়ই ভাল লাগে শুনতে।"

"খাজিয়ারের কথা তো শেষ হয়ে গেছে।"

"এরই মধ্যে শেষ হল! সেদিন বিকেলে তো কেবল পৌঁছলেন। পরদিন নিশ্চয়ই ছিলেন সেখানে ?"

"হ্যাঁ" স্বীকার করতে হয় আমাকে।

"তাহলে তো অনেক কথা থাকা উচিত।" মানসী মন্তব্য করে।

"অনেক নয়, তবে কিছু আছে।"

"বেশ তাই বলুন। আর খাজিয়ারে কথা শেষ হলেই তো আর হিমাচলের কথা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। তারপরে চাম্বার কথা বলবেন।"

"তার পরে ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মণিমহেশ।"

আমি হেসে ফেলি।

"হাসবেন না তো। হাসার কি হল ? আর বাজে কথা না বলে, এবারে শুর করবেন কি ?"

আমি শুরু করি—

তার পরদিন খাজিয়ারে ছিলাম। খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে আমাদের। উষার আলোয় খাজিয়ারকে দেখেছি। দেখেছি ভোরের সোনালী রোদে, দুপুরে আর বিকেলে, গোধুলি আর রাতে। প্রহরে প্রহরে নবরূপে প্রকাশিতা হয়েছে খাজিয়ার। সব সময় সুন্দরী সে। ভাল লেগেছে তাকে, ভালোবেসেছি তাকে।

সকালে ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে ছিলাম। খাজিয়ারকে দেখছিলাম। শিশির-সিক্ত শ্যামল প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। অনতিদূরে হ্রদের ধারে মাইনর স্কুল।

প্রান্তরটি ক্রমেই ঢালু হয়ে গিয়ে হ্রদে মিশেছে। ওরা তাই ছুটে ছুটে নিচে নামছিল। ওদের ছোট ছোট পায়ের দাগ পড়ছিল শিশির-ভেজা ঘাসে। আমরা বসে বসে দেখছিলাম।

স্কুলের ঘণ্টা পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এলো—জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে......। ছেলেরা মেয়েরা যে যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতজোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। জাতীয়-সঙ্গীত শেষ হবার পরে ওরা আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

মুগ্ধ হলাম ওদের নিয়মানুবর্তিতা দেখে। ভাবলাম এমন শিক্ষা যেখানে দেওয়া হয়, সরস্বতীর সেই পীঠস্থান, অবশ্যই দর্শন করতে হব।

সকালের খাবার খেয়ে রওনা হলাম স্কুলে। যে ভাবেই হোক আমাদের আগমনবার্তা পেয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক। তিনি গেটের সামনে সম্বর্ধনা জানালেন আমাদের। একখানি বড় ও একখানি ছোট ঘর আর একফালি খেলার মাঠ নিয়ে স্কুল। মাঠে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলে-মেয়েরা। আমরা ভেতরে আসতেই তারা গান গাইতে শুরু করল—আমাদের বরণ করল।

প্রধান শিক্ষক মশাই সব দেখালেন আমাদের। স্কুলের পেছনে পাহাড়ের গায়ে ছেলেরা

চাষ করেছে। এই ফসলের আয় দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়। হতে পারে বিখ্যাত খাজিয়ারের অখ্যাত মাইনর স্কুল,কিন্তু এমনি আদর্শ শিক্ষায়তন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের গ্রামে গ্রামে, তাহলেই সার্থক হবে স্বাধীনতা। যাদের মহৎ প্রচেষ্টায় এই বিদ্যায়তন সরস্বতী পীঠস্থান পরিণত হয়েছে, সেই শিক্ষকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলাম ডাকবাংলোয়।

দিনটা বড়ই আনন্দে কেটেছে। খাওয়ার পরে সারা দুপুর ঘুরে বেড়িয়েছি খাজিয়ারে—হ্রদের তীরে আর দেবদারু বনে, তার শ্যামল কোমল প্রান্তরে।

খাজিয়ারে নানা জাতীয় ভৈষজ উদ্ভিদ জন্মায়। কলকাতা ও বম্বের বিখ্যাত কয়েকটি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এখানে ওষধির চাষ করান। তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচয় হল। পরিচয় হল পোস্টমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে, মন্দিরের পুরোহিত আর গাঁয়ের মানুষদের সঙ্গে। তাঁরা অনুরোধ করলেন কয়েকটা দিন থেকে যেতে।

কিন্তু পরদিন সকালেই বিদায় নিতে হল সুন্দরী খাজিয়ারের কাছ থেকে। চৌকিদার ঘোড়া ঠিক করে দিল। ঘোড়ার ডিপার্টমেণ্টটা তো আর তার নয়, তার ছেলের। ব্যবসা মানে ব্যবসা। সেখানে ছেলে স্বাধীন। ছেলের দরেই রাজী হতে হল আমাদের। বাপ অবশ্য দর কমাবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কি করবে, ছেলের নাকি তাতে পোষায় না। অগত্যা বাপের অনুরোধে আমরা ছেলের দরই মেনে নিই। সকাল সাড়ে আটটায় মাল নিয়ে ছেলে রওনা হয়ে গেল চাম্বা। আর বাপ চা, খাবার ও বিল নিয়ে এল। বিল মিটিয়ে বিদায় নিলাম চৌকিদারের কাছ থেকে।

বিদায় নিচ্ছি খাজিয়ারের কাছ থেকে। তাই আর একবার ভাল করে দেখে নিই তাকে। গালিচাসম কোমল দূর্বাদলের উপর দিয়ে নেমে এলাম হ্রদের তীরে। সুজয়া গিয়ে নৌকোয় বসল। অসিতবাবু ও সুজয়ার স্বামী একে একে ছবি নিল। ছবি নিল খাজিয়ারের। তার পরে ধীরে ধীরে উঠে এলাম ওপরে। বিদায় নিলাম খাজিয়ার থেকে। আর কখনও কি আসব এখানে?

দেবদারু বনের ধারে এসে একটু দাঁড়ালাম। আর একবার খাজিয়ারকে দেখলাম। তার পরে চলতে শুরু করলাম প্রায় সমতল পথ দিয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল খাজিয়ার—স্বপ্নের দেশ খাজিয়ার।

আমরা চলেছি চাম্বা। খাজিয়ার থেকে আট মাইল। এককালে হিমাচলের কেন্দ্রভূমি ছিল চাম্বা। চাম্বার রাজারা জম্মু পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন। সেই অতীত ঐতিহ্যমণ্ডিত রমণীয়া চাম্বায় চলেছি আমরা।

খানিকটা এসে বাঁ দিকে পাহাড়ের ওপরে প্রাচীন রাজবাড়ি—চাম্বার রাজাদের শৈলাবাস। এখন অব্যবহৃত। আগে রাজারা গরমের সময়টা খাজিয়ারেই কাটাতেন। এখন আর সে নিয়ম নেই। রাজা গ্রীষ্মকালে জীপে করে খাজিয়ার আসেন কিন্তু রাজবাড়িতে বড় একটা থাকেন না। সাধারণতঃ সকালে এসে বিকালেই চলে যান। রাজবাড়িতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে না।

নিচে খাজিয়ার গ্রাম। গ্রামকে বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে চললাম। খাজিয়ার থেকে চাম্বা যাবার তিনটি পথ। একটি জীপ চলাচলের—দূরত্ব চৌদ্দ মাইল। এখন রাজা এই পথে খাজিয়ার আসেন। একটি পথ ঘোড়া চলাচলের উপযোগী—দূরত্ব আট মাইল। আগে রাজারা এই পথেই খাজিয়ার আসতেন। রাজা না হয়েও আমরা সেই রাজপথে চলেছি। আমরা

ভাগ্যবান। আর একটি পথ খাড়া নেমে গেছে নিচে। কঠিন উৎরাই। দূরত্ব মোটে পাঁচ মাইল। আগে রাজকর্মচারীরা এই পথে আসা-যাওয়া করতেন। এখন গ্রামবাসীরা যাতায়াত করে।

জীপপথ দিয়ে মাইল-দুয়েক এগোবার পরে আমাদের পথ বাঁ দিকে জঙ্গলের ভেতরে নেমে এলো। মোড়ের মাথায় একটি চায়ের দোকান আর কয়েকখানি বাড়ি-ঘর।

উৎরাই পথ বেয়ে নামতে শুরু করলাম। পথের বাঁ দিকে খাদ, ডান দিকে পাহাড়। দু দিকেই বন। কেবল দেওদার বন নয়, সেই সঙ্গে আরও নানা জাতীয় ছোট বড় গাছের সমারোহ। ছোট গাছে রঙ্গীন ফুল আর বড় গাছে রঙ্গীন ফল। সুজয়া রঙ্গীন ফুল খোঁপায় গোঁজে কিন্তু অসিতবাবু রঙ্গীন ফল খেতে পারেন না। পাহাড়ে সবুজ ছাড়া আর কোন অজানা ফল মুখে দিতে নেই। চক চক করলেই সোনা হয় না। গোল্ডেন আপেলের মতো চেহারা হলেই, সে ফল খাওয়া যায় না।

প্রয়োজনে পথিকরা যাতে জলপান করতে পারে, তার ব্যবস্থা রয়েছে মাঝে মাঝে। পাহাড়ের গায়ে পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে তার ওপর দিয়ে প্রবাহিত করেছে জলধারা। মাঝে মাঝে কলের মতো জল পড়ছে। জলধারা স্যাঁতস্যাঁতে পথকে সিক্ত করে খাদে নামছে।

মাটি আর পাথরের প্রশস্ত পাহাড়ী পথ। তিন মাইল পথ পেরিয়ে একটি সুবিস্তৃত সমতল পর্বতশীর্ষে পৌঁছলাম। সামনে একটু নীচে ছোট গ্রাম চৌড়া।

আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হল দূর-দিগন্তে। বাঁয়ে খাজিয়ার, ডাইনে চাম্বা। দু দিকে দুটি উপত্যকা মাঝখানে গিরিবর্ত্ম সদৃশ এই পর্বতশীর্ষ। খাজিয়ার ছোট, চাম্বা বড়। কিন্তু উভয়েই সুন্দর। খাজিয়ারের সৌন্দর্যসুধা পান করে আমরা চলেছি চাম্বা। তাই এই পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে বার বার খাজিয়ার ও চাম্বাকে দেখি।

পাহাড়টা আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচে—প্রায় চার হাজার ফুট নিচে। পাহাড়ের গায়ে গাছ-পালা। সবুজ পাহাড় গিয়ে মিশেছে সবুজ উপত্যকায়। সুবিশাল শস্যশ্যামল উপত্যকা। তার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে রাবী! রাবী মানে ইরাবতী। নদী নয় যেন একটি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা। ইরাবতীর দু-তীরেই বাড়ি-ঘর। একটি নয়, । দুটি নয়—অসংখ্য। বেশ বড় শহর চাম্বা। অনেকটা ইংরেজী 'এস' অক্ষরের মতো দেখতে। ইরাবতীর এপার থেকে আরম্ভ হয়ে ওপারের পাহাড়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

গিরিবর্ত্ম সদৃশ এই জায়গাটিও বড় সুন্দর। একটি ঝর্ণা রয়েছে এখানে। তৃষ্ণা মিটিয়ে এখানে-ওখানে পড়ে থাকা পাথরের ওপর বসলাম আমরা। বিশ্রামের প্রয়োজন নেই,তবু বসলাম। বসে বসে চাম্বাকে দেখলাম—চিত্রবৎ চাম্বা। চাকচিক্যময়ী চিত্তরঞ্জিনী চিরসুন্দরী চাম্বা।

সহস্রাধিক বছর আগে রাজা সহিল ভার্মা ভারমৌর থেকে এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন। চাম্বা উপত্যকা ভারমৌরের চেয়ে বৃহত্তর এবং সমতলের নিকটতর। এখানে তখন কেবল কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করতেন। রাজধানী উঠে আসার পরে গড়ে ওঠে জনপদ।

রাজা সহিল ভার্মা প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। ভারমৌরে তিনি চুরাশীজন সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের সেবা করেন। সন্তুষ্ট সন্ন্যাসীদের বরে রাজা দশটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেন। রাজকন্যার নাম রাখেন চম্পাবতী। পুত্র ও কন্যালাভের জন্য রাজা চুরাশীজন সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে ভারমৌরে চুরাশীটি শিবমন্দির নির্মাণ করান। সেই থেকে ভারমৌরের মন্দিরময় অংশ চৌরাশী নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার পরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির নির্মাণ করেন। বিগ্রহ নির্মাণের জন্য শ্বেতপাথর আনতে গিয়ে একে একে নয় পুত্র বিন্ধ্যাচলের পথে মারা যান। দশম পুত্র যুগাকর কিন্তু শ্বেতপাথর নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হন। মহা ধুমধামের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির উন্মুক্ত হল। সে মন্দির আজও আছে, সে বিগ্রহ এখনও পূজিত হচ্ছে। কিন্তু নেই সেই রাজা, রাজপুত্র আর রাজকন্যা।

রাজা রাজপুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গুরু চর্পটনাথের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। রাজপুত্র বহুকাল রাজত্ব করার পরে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু রাজকন্যা ?

রাজকন্যা চম্পাবতীর কথাই ভাবছিলাম। বড়ই করুণ তাঁর জীবনকাহিনী। সুন্দরী চম্পাবতী ছিলেন বিদুষী ও ধর্মিষ্ঠা। শাস্ত্রালোচনার জন্য তিনি রোজ রাতে একাকী একজন শাস্ত্রজ্ঞের কাছে যেতেন। পিতা কন্যার চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হলেন। একদিন রাতে তিনি নিঃশব্দে কন্যাকে অনুসরণ করলেন। পৌঁছলেন সেই শাস্ত্রজ্ঞের আশ্রমে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। কেবল শুনতে পেলেন দৈববাণী—যে পিতা নিজ কন্যার চরিত্রে সন্দেহ করে, সেই কন্যার মুখদর্শনের কোন অধিকার নেই তার।

আর ফিরে এলেন না চম্পাবতী। অনুতপ্ত পিতা সেই আশ্রমের প্রাঙ্গণে নির্মাণ করলেন মন্দির আর প্রিয়তমা কন্যার নামেই নামকরণ করলেন তাঁর নতুন রাজধানীর। সে মন্দির আজও আছে, সে রাজধানী আজও আছে। আর বেঁচে আছেন চম্পাবতী, আছেন চিরসুন্দরী চাম্বার চিত্তহারী নামে।

হিমালয়ের পথে ভাবনার শেষ আছে কিন্তু চলার শেষ নেই। তাই এক সময় উঠতে হল আমাদের। উৎরাই পথ বেয়ে আমরা নামতে শুরু করলাম। চাম্বা ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে।

মাইলখানেক নেমে আর একটি গ্রাম। গ্রাম মানে গুটিকয়েক ঘর। পথের ধারে একটি ঘরে কয়েকটি জলের কলসী। পথিকের তৃষ্ণাবারি—গ্রামবাসীরা অনেক নিচের নদী থেকে জল এনে রেখেছে। সুমিষ্ট শীতল জল। তৃষ্ণা মিটিয়ে বসলাম একটা চায়ের দোকানে। অসিতবাবু আপত্তি করলেন না। চায়ে চুমুক দিয়ে চারিদিকে দেখে নিলাম ভাল করে। বনাবৃত জনপদ। ঘরের চালে চাষ করেছে। কাঠের চালের ওপর মাটি দিয়ে ক্ষেত তৈরি হয়েছে—রামদানা ও ভূট্টার ক্ষেত। বেশ ভাল ফসল হয়েছে।

চা খেয়ে নিয়ে আবার চলা শুরু করি। উৎরাই বনপথ বেয়ে নেমে আসি শস্যশ্যামলা উপত্যাকায়। মাটির গ্রাম্যপথ থেকে বাঁধানো রাজপথ। পথের পাশে দোকান-পাট। পথে মোটর চলছে। দুদিন বাদে মোটর দেখলাম। শহরে কোলাহলের মাঝে ফিরে এলাম।

খানিকটা হেঁটে পৌঁছলাম পুলের ধারে—শীতলা ব্রিজ। ইরাবতীর ওপরে ঝুলন্ত লোহার পুল। পুলের মুখে পুলিস। এই পুলের নিরাপত্তার ওপরে সারা শহরের নিরাপত্তা নির্ভর করছে।

পুলের পরে চড়াই। সেই চড়াই পথ বেয়ে আমরা আশ্রয়ে পৌঁছলাম—রাবী ভিউ রেস্ট হাউস ও ডাকবাংলো।

গেটের কাছেই সাইনবোর্ড—উচ্চতা ৩২০০ ফুট। দূরত্ব—পাঠানকোট থেকে ৭৬ মাইল, ডালহাউসী থেকে ৩৫ মাইল, খাজিয়ার থেকে ১৪ মাইল ও ভারমৌর থেকে ৪৪ মাইল। আমরা পাঠানকোট থেকে ডালহাউসী ও খাজিয়ার হয়ে এখানে এসেছি। এখান থেকে

ভারমৌর হয়ে মণিমহেশ যাবো।

গেটের পরে কাঁকর বিছানো পথ। পথের ডান দিকে বাগান আর বাঁ দিকে ডাকবাংলো। একটু উঁচুতে ছোট একটি দোতলা বাড়ি। বাগানে ঝাউ দেওদার ইউক্যালিপটাস ও মরশুমী ফুলের সমারোহ। বাগানের পরে একতলা রেস্ট হাউস—রাবী ভিউ রেস্ট হাউস। সার্থকনামা বিশ্রাম ভবন।

নিচে বয়ে যাচ্ছে নদী। নদী নয় চাম্বার প্রাণধারা ইরাবতী। একটা বাঁক নিয়েছে এখানে, দিক পরিবর্তন করেছে। সে সারাদিন গেয়ে চলেছে গান—হিমালয়ের সামগীতি আর হিমাচলের জয়গান। দূরে পাহাড়, প্রথমে কালো তারপরে সাদা। মর্ত্যের মাটিতে এমন স্বর্গীয় নিকেতন খুব বেশি নেই।

"কোথায় গিয়েছিলেন.... ?"

থামতে হল আমাকে। কেবল কথা নয়, চলা। থামতে হয় মানসীকে। বশিষ্ঠকুণ্ড থেকে আমরা ফিরে চলেছি মানালী টুরিস্ট বাংলোয়। চলতে চলতে মানসীকে খাজিয়ার ও চাম্বার কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যে যে আমরা পৌঁছে গেছি মানালী বাসস্ট্যাণ্ডে, খেয়াল হয় নি। হবে কেমন করে, বলার নেশায় পেয়ে বসলে মানুষের কি আর কোন খেয়াল থাকে ? কিন্তু মানসী ? সে তো নীরবে কেবল শুনছিল। তার খেয়াল হয়নি কেন ? তবে কি শোনার নেশাও কম গভীর নয় ?

খেয়াল হয় জনৈক পথচারীর প্রশ্নে—কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা ?

প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাই।

কাল রাতে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের ককেজন ছাত্র বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরই একজন প্রশ্ন করেছে। তন্ময়তার জন্য লজ্জা পাই। হেসে বলি, "গিয়েছিলাম বশিষ্ঠকুণ্ডে। তোমরা রোতাং দেখে এলে ?"

"হ্যাঁ। তবে সবাই পৌঁছতে পারে নি ওপর পর্যন্ত। দেরি হয়ে গেলে বাস পাবে না বলে, তারা ফিরে এসেছে মারী থেকে। তবে আমরা কজন গিয়েছিলাম।" একটি ছেলে উত্তর দেয়।

আর একজন বলে, "আপনারা টুরিস্ট-বাংলোয় জায়গা পেয়েছেন শুনলাম।"

"হ্যাঁ" মানসী বলে, "বেশ ভাল জায়গা। পাশাপাশি ঘর পেয়েছি আমরা।"

"তাহলে বেশ সুবিধাই হয়েছে।"

"হ্যাঁ।" মানসী বলে।

আমি চুপ করে থাকি।

"আমরা কাল সকালে চণ্ডীগড় রওনা হচ্ছি। ফেরার পথে আপনারা যদি চণ্ডীগড় আসেন, ভারী খুশি হব।" ঠিকানা লিখে একটি ছেলে মানসীর হাতে দেয়।

আর একটি ছেলে হঠাৎ বলে ওঠে, "আরে তাইতো, ভাগ্যিস মনে পড়েছে। আপনার একখানা চিঠি এসেছে ট্যুরিস্ট্ অফিসে।" সে পকেট থেকে ইনল্যান্ড লেটারটা বের করে আমাকে দেয়। তার পরে বিদায় নেয় ওরা—একটি রাতের পরিচয়, কিন্তু কোনদিন ওদের ভুলতে পারব কি ?

আমরা হোটেলে চলি। রাত পৌনে নটা বাজে। একেবারে খেয়ে নিয়ে বাংলোয় ফিরব।

হোটেলে এসে চিঠিটা খুলি।

"কেমন আছেন ?" হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে।

"কে ?"

"যে লিপি পাঠিয়েছে ?"

"ভাল।" ওর দিকে তাকাই। ওর চোখে দুষ্টু হাসি। আমি হেসে ফেলি।

মানসী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, "হাসছেন কেন ?"

"আপনাকে দেখে।"

"মানে ?"

"চিঠিটা কলকাতার নয়, এমন কি কোন মেয়ের পর্যন্ত নয়।"

"কে, কোথা থেকে লিখেছে তাহলে ?"

"লিখেছে প্রাণেশ—মানা অভিযানের বাইশ হাজার আটশ' ফুট উঁচু পঞ্চম শিবির থেকে।"

"প্রাণেশ মানে আপনার নীল-দুর্গম বইয়ের প্রাণেশ চক্রবর্তী।"

"হ্যাঁ"। একটু থেমে বলি, "আহত হলেন বোধহয় ?"

"আহত হব কেন ?"

"কোথায় প্রিয় বান্ধবী আর কোথায় প্রাণেশ চক্রবর্তী। আহত হবার মতো নয় কি ?"

"তাহলেও আহত হই নি। কারণ এ চিঠিটার মূল্য সে-সব চিঠির চেয়ে অনেক বেশি। যাক্ গে বলুন, কি লিখেছে ?"

"আবহাওয়া খুবই খারাপ। ওরা মানা শীর্ষের এক হাজার ফুটের মধ্যে। তবু পাঁচদিন বসে আছে পাঁচ নম্বর শিবিরে। বড় জোর আর তিন চার দিন। তার মধ্যে যদি আবহাওয়ার পরিবর্তন না হয়, তাহলে ওদের নেমে আসতে হবে। ২৩,৮৬০ ফুট উঁচু দুর্গম মানা শীর্ষ এবারও রয়ে যাবে ভারতীয় পর্বতারোহীদের পদক্ষেপের বাইরে।"

"কত তারিখে চিঠি লিখেছে ?"

"যোলোই সেপ্টেম্বর।"

"আজ চবিবশে।" মানসী বলে, "তাহলে তো ইতিমধ্যে যা হবার হয়ে গেছে।"

"তা হয়েছে।"

"কিন্তু জ্ঞানচাঁদ তো কিছুই বললেন না।"

"আমিও তাই ভাবছি। আমরা না হয় হিমালয়ে এসেছি। কাগজ পড়ছি না, রেড়িও শুনছি না। কিন্তু তিনি এখানকারই লোক। শিক্ষায়তনে নিয়মিত সংবাদপত্র আসে। পর্বতারোহণ সম্পর্কীয় সংবাদ তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না।"

বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। আমরা উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে আসি। খেতে আরম্ভ করি। ইংরেজী সংবাদ শুরু হল। আমরা সংবাদ শুনতে শুনতে খেতে থাকি। বড় গোলমাল হচ্ছে। আরও অনেকে খাচ্ছেন। কর্মব্যস্ত বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে। তবে রেডিও বেশ জোরে চলছে। মোটামুটি শোনা যাচ্ছে।

সচকিত হই। আমি একা নই, মানসীও মুখ তোলে। রেডিওতে বলছে—গত ১৯শে বিকেলে একজন অভিযাত্রী ও তিনজন শেরপা মানা শীর্ষে আরোহণ করেছে।

কে সেই অভিযাত্রী ? বিশ্বদেব বিশ্বাস, তাপস ভট্টাচার্য না প্রাণেশ চক্রবর্তী ? যেই হোক, এ জয় সকলের।

একজন আরোহণ করলেই সে কৃতিত্ব সারা দেশের, সমবেত প্রচেষ্টাই কেবল পর্বতারোহণে সাফল্য, এনে দেয়। কি আনন্দ ! মানা শীর্ষে বাঙ্গালী অভিযাত্রীরা জাতীয়

পতাকা প্রোথিত করেছে। ভারতের বে-সরকারী পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত বৃহত্তম সাফল্য এই শীর্ষারোহণ। কিন্তু....রেডিওতে কি বলছে ?

বলছে—পরদিন পাঁচ নম্বর শিবির থেকেও নেমে আসার সময় এক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে দুজন অভিযাত্রী ও তিনজন শেরপা। সামরিক কর্তৃপক্ষ আহত অভিযাত্রীদের নিয়ে আসতে বেরিলী থেকে হেলিকপটার পাঠাচ্ছেন। উত্তর প্রদেশ সরকার গ্রাউন্ড রেসকিউ পার্টি পাঠাচ্ছেন।

সংবাদ শেষ হল আর কোন সংবাদ নেই।

এ তো দুঃসংবাদ। সাফল্যের সকল আনন্দকে ম্লান করে দিল দুর্ঘটনার সংবাদ। পর্বতারোহণে সাফল্যের চেয়ে অধিকতর কাম্য নিরাপদ প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু কেমন করে দুর্ঘটনা ঘটল ? যারা শিখরে আরোহণ করেছে তারাই পাঁচ নম্বর শিবিরে ছিল। তারাই পরদিন নেমে আসার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। দুজন অভিযাত্রী ও তিনজন শেরপা। কিন্তু শিখরে তো আরোহণ করেছে একজন অভিযাত্রী।

কিছু বুঝতে পারছি না। আর খেতে ইচ্ছে করছে না। মানসীও বুঝতে পারে আমার মানসিক অবস্থা। সেও হাত গুটিয়ে বসে আছে। আমি উঠে পড়ি, মানসীও ওঠে। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসি।

কোথায় যাব ? কার কাছে খবর পাব ? ট্রাঙ্ককল করব ? টেলিগ্রাম করব ? কলকাতা, দিল্লি, জোশীমঠ, বেরিলী ? কিন্তু তারাই বা কেমন করে জানবে সব খবর ? যা খবর পাওয়া গেছে তা তো রেডিওতেই বলল। এর বেশি আর কোন খবর নিশ্চয়ই পাওয়া যায় নি।

কিন্তু সব খবর না পেলেও, ওরা সবাই ভাল আছে, এ খবরটুকু যে অন্তত পাওয়া দরকার। না পেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। কে আমাকে সে খবর দেবে ?

মানসী বলে, "আপনি এতো উতলা হচ্ছেন কেন ? দুর্ঘটনাটা তো তেমন কিছু মারাত্মক নাও হতে পারে।"

"পাহাড়ে সাধারণতঃ তা হয় না। ওরা প্রায় প্রত্যেকেই আমার অতি প্রিয়। ওরা ভাল আছে না জানা পর্যন্ত আমি কেমন করে নিশ্চিন্ত হতে পারি বলুন ?"

"কাল নিশ্চয়ই সে খবর পাওয়া যাবে। আমি ওদের কাউকে চিনি না কিন্তু জানি।" আমিও ওঁদের ভালোবাসি কারণ ওরা হিমালয়কে ভালোবাসেন। আমার মন বলছে ওঁরা সবাই ভাল আছেন। চলুন এখন বাংলোয় ফেরা যাক।"

আমার মনে পড়ে প্রাণেশের পিতা প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর কথা। তাঁর ইচ্ছে ছিল না, প্রাণেশ এবার অভিযানে যায়। তিনি ওকে না করেই দিয়েছিলেন। আমি গিয়ে অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি তাঁকে। প্রাণেশের যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আমি কলকাতায় ফিরে মুখ দেখবো কেমন করে ?

"আপনি অযথা দুশ্চিন্তা করছেন। ওঁরা সবাই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী, ওঁরা ভাল আছেন।" মানসী আবার বলে।

"আপনার কথা সত্য হলে আমার চেয়ে বেশী সুখী খুব কম লোকেই হবে কিন্তু...."

"কোন কিন্তু নয়, আপনি বাংলোয় চলুন। আমার মন বলছে, আমার কথা সত্য হবেই হবে।"

॥ পাঁচ ॥

শেষ রাতের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। তবে তিনটে পর্যন্ত যে জেগে ছিলাম বেশ মনে আছে। জেগে জেগে ভেবেছি মানা অভিযাত্রীদের কথা। ওরা কেমন আছে ? মানসী বলেছে—ভাল আছে। কিন্তু সে কথায় আমার অশান্ত চিত্ত শান্ত হয় নি। আমি চোখ বুজে দুশ্চিন্তার জাল বুনেছি। প্রহরের পর প্রহর পেরিয়েছে, আমার দুশ্চিন্তার অবসান হয় নি।

শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাও বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারলাম না। দরজায় শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয়ই মানসী। স্লিপিং ব্যাগের জীপ খুলি। ঘড়ি দেখি—সাতটা বাজে। এতো সকালে না ডাকলেই পারত। কিন্তু সেই বা কেমন করে জানবে, আমি সারারাত ঘুমোতে পারি নি। কাল এখানে এসেই কথা হয়েছিল আজ আমরা সকাল সকাল উঠে বেড়াতে বের হব। ফিরে এসে নাগর দেখতে যাব !

চোখ ডলতে ডলতে দরজার দিকে এগোই। চোখ জ্বালা করছে।

দরজা খুলতেই মানসী হাসে। বলে, 'সুপ্রভাত।' মানসী ঘরে এসে একখানা চেয়ারে বসে। তারপরে বলে, "রাতে ঘুমান নি তো ?"

"কেমন করে জানলেন ?"

"সত্যি কিনা বলুন।"

"হ্যাঁ।"

"যাক গে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিন। চলুন চা খেয়ে আসি। এসে আবার তৈরী হয়ে নিতে হবে। সাড়ে নটায় বাস।"

"আমরা কি আজ নাগর যাচ্ছি ?"

"তাই তো কথা ছিল। আপনি কি মত পাল্টেছেন নাকি ?"

"না।" আমি বিব্রত বোধ করি, "এই মানে ভাবছিলাম মানালীতে থাকলে হয়তো খবরটা পাওয়া যেত।"

"আমরা তো মানালীতেই থাকছি। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসছি। খবর সন্ধ্যের আগে আসবে না। আর টেলিগ্রাম পাঠাবার হলে তো নাগর রওনা হবার আগেই পাঠিয়ে দিতে পারবেন।" একবার থামে মানসী। তারপরে কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে বলতে থাকে, "ওঁরা আমার অচেনা কিন্তু অজানা নয়। আমি ওঁদের সবার নাম শুনেছি। ওঁরা হিমালয় অভিযানে এসেছেন তাই ওঁরা কেউ আমার পর নন। হয়তো আপনার মতো আপন নন বলে আমার অতো দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। কিন্তু কাল রাতে আমিও ভাল ঘুমোতে পারি নি। কেবলই ওঁদের কথা ভেবেছি আর ঠাকুরকে ডেকেছি—তুমি ওঁদের রক্ষা করো। ঠাকুর আমার কথা শুনেছেন। আমি স্বপ্ন দেখেছি ওঁরা সবাই ভাল আছেন। অভূতপূর্ব সম্বর্ধনার মাঝে হাওড়ায় ট্রেন থেকে নামছেন। আমার এ স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকি।

কিছুক্ষণ বাদে আমরা বেরিয়ে পড়ি পথে। আর আশ্চর্য পথে এসেই মানসী বলে, "অনেকটা পথ যেতে হবে চা খেতে। এই ফাঁকে চাম্বার কথাটা শেষ করে ফেলুন না।"

আমার মানসিক অবস্থার কথা মানসীর অজানা নয়। তার নিজের মানসিক অবস্থাও ভাল নয়। এখন সে এমন একটা প্রস্তাব করতে পারে, ভাবতেই পারি নি।....কিন্তু প্রস্তাবটা

মন্দ কি ? অন্য আলোচনায় ব্যস্ত থাকলে অন্তত এই মানসিক দুশ্চিন্তার কবল থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পাব। আমি বলতে শুরু করি—

চাম্বা হিমালয়ের বক্ষোদেশে অবস্থিত। প্রাচীন নগরী চাম্বা। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা সহিল ভার্মা এই নগরীরর পত্তন করেন। রাজকন্যা চম্পাবতীর যে কাহিনী কাল বলেছি, তা হচ্ছে জনশ্রুতি, ইতিহাস নয়। ইতিহাস বলে সহিল ভার্মার মেয়ে চম্পা এখানে নতুন রাজধানীর স্থান নির্বাচন করেন। আদরের মেয়ের নামে রাজা নগরীর নাম রাখেন।

৩২° ১১' ৩০" ও ৩০° ১৩' ৬" উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৫° ৪৯' ও ৭৭° ৩' ৩০" পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই জেলা। চাম্বা জেলার উত্তর-পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমে লাদাক, উত্তর-পূর্বে কাংড়া ও দক্ষিণ-পূর্বে গুরুদাসপুর জেলা। জেলার আয়তন ৩১৩৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২.১৯,১৫৮ জন। চাম্বা শহরের জনসংখ্যা ৮৬০৯ জন। বিভিন্ন ধর্মের বহু উপজাতি বাস করে এ জেলায়। ১৯৩৩ সালে আটাশটি উপজাতি বাস করত। এখন অবশ্য তাদের কেউ কেউ মিশে গেছে মূলজাতিগুলির সঙ্গে। তাহলেও তাদের অনেকে আপন স্বকীয়তা নিয়ে বাস করছে এখানে। চাম্বা আজও বহু জাতি ও ধর্মের মিলন কেন্দ্র। জাতি ও ধর্ম নিয়ে বিবাদ হয় না এখানে। নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে তারা প্রত্যেকে পাশাপাশি বাস করছে।

চাম্বা প্রাচীন শহর, প্রাচীন রাজ্যে। বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত চাম্বা ছিল স্বাধীন। রাজ্যে পার্বত্য প্রকৃতি সব সময় প্রতিরক্ষায় সাহায্য করেছে। কাংড়া ও কুলুর মতো বার বার বাইরের আক্রমণের সম্মুখীন হয় নি চাম্বা। ফলে একই রাজপুত পরিবার প্রায় দেড় হাজার বছর রাজত্ব করেছে এই রাজ্যে। 'ভূগোল ইতিহাস রচনা করে' কথাটা চাম্বার ক্ষেত্রে খুবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চাম্বার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে কখনও বাইরের প্রভাব পড়ে নি। আপন বৈশিষ্ট্য নিয়েই গড়ে উঠেছে চাম্বার সমাজ-জীবন। এ বিশিষ্টতা আজও অম্লান রয়েছে।

চাম্বা জেলার কথা বলতে হলে প্রথমেই বলে নিতে হয় ভারমৌর ও পাঙ্গী উপত্যাকার কথা। ভারমৌরের কথা পরে বলব, আগে পাঙ্গী উপত্যকার কথা বলে নিই।

পাঙ্গী উপত্যকা চাম্বা জেলার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় অংশ। পদযাত্রীদের কাছে পরম আকর্ষণীয় এই উপত্যকা। হিমাচলের অন্তরলোকে অধিষ্ঠিত প্রকৃতির করুণাধারায় বিগলিত এই রমণীয় উপত্যাকা। কোথাও বৃক্ষবহুল কোথাও বা বৃক্ষলতাহীন। তারই মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চন্দ্রভাগা। বয়ে যাচ্ছে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে দুধারে আকাশ-ছোঁওয়া শিখরমালা। তারা যেন বন্দী করেছে বেগবতী জলধারাকে। আর তাই সে অবিরত আঘাত করছে সেই কারাপ্রাচীরকে।

পাঙ্গী উপত্যকার নিম্নভাগ ঘন সবুজ—পাইন ও দেওদার বন কিংবা তৃণময় প্রান্তর। উপরিভাগ পর্বতময়—আঠারো থেকে বাইশ হাজার ফুট উঁচু শৃঙ্গমালা। এই উপত্যকার প্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যময়ী, তেমনি পরিবর্তনশীলা। তাই পদযাত্রীদের কাছে পাঙ্গী এত প্রিয়। কয়েক মাইল বাদে বাদেই পদযাত্রী নতুন নতুন দৃশ্যের সম্মুখীন হন। তবে পদযাত্রা খুব সহজ নয়। দুর্গম ও দুস্তর পথে পদচারণা করতে হয়। তা তো হবেই। দুঃখ-কষ্টের উর্ধ্বে না উঠতে পারলে, হিমালয়ের পথে পা বাড়াতে নেই। হিমালয় যে শ্রমবিমুখের জন্য নয়।

থামতে হয় আমাকে। মানসী বলে, "চাম্বা জেলা নয়, আপনি চাম্বা শহরের কথা বলুন। আপনারা রেস্টহাউসে পৌঁছলেন তার পরে ?"

একটু ভেবে নিয়ে আমি বলতে থাকি—

কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে আমরা বিশ্রাম ভবনের বারান্দায় এলাম। বারান্দায় ছড়িয়ে আছে আমাদের মালপত্র, কিন্তু মানুষ নেই। ঘোড়াওয়ালা নেই, নেই তার ঘোড়া। কেউ নেই।

অসিতবাবু হাঁক ছাড়েন, 'চৌকিদার.....'

কোথায় চৌকিদার ? কেউ আসে না।....না আসছে। চৌকিদার নয়, ছোট একটি মেয়ে। গুটি গুটি পা ফেলে সুজয়ার সামনে এসে দাঁড়ায় সে। সুজয়া, চিনতে পারে তাকে। জিজ্ঞেস করে, 'পিতাজী কি ধর ?'

'বজার গিয়া।'

'ঘোড়েওয়ালা ?' সুজয়া আমাদের মালপত্র দেখিয়ে বলে।

'বজার গিয়া।'

কি আশ্চর্য! লোকটাকে বলে দিয়েছিলাম, আমরা না আসা পর্যন্ত সে যেন মাল ফেলে কোথাও না যায়। আর সে কিনা মাল এখানে ফেলে রেখে বাজারে গেছে। বলে দিয়েছিলাম, আমরা ডালহাউসী থেকে রেস্টহাউসের পারমিট নিয়ে এসেছি, সে যেন চৌকিদারকে বলে ঘর নিয়ে আমাদের মালপত্র গুছিয়ে রাখে।

কিছুই করে নি। চৌকিদারকে নিয়ে বাজারে চলে গেছে। ওরা না এলে ঘর পাব না। বাইরে বসে থাকতে হবে। অথচ বড়ই শ্রান্ত বোধ করছি। বিশ্রামের প্রয়োজন।

একটু বাদে ছোট মেয়েটি আবার আসে। এবার ছোট ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে। স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর ছেলেটিকে সুজয়া আগে দেখেছে। গত বছর অমরনাথ দর্শন করে ফেরার পথে তার স্বামীর সঙ্গে চাম্বা এসেছিল। কিন্তু সময়াভাবে বেশিদিন থাকতে পারে নি। মাত্র দুটি দিন কাটিয়ে গেছে এই রমণীয় নিকেতনে।

ছেলেটি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে সুজয়ার কাছে। সুজয়া তাকে কোলে তুলে নেয়। ছেলেটি চুপ করে থাকে। আমি বলি, 'মনে হচ্ছে ছেলেটি তোমাকে চিনতে পেরেছে।'

'পারবেই তো। গত বছর যে ও আরও বড় ছিল।' সুজয়া হেসে বলে। তার কথায় আমরাও হাসতে থাকি।

হাসি থামলে চৌকিদারের মেয়ে বলে, 'মেমসাব, মা জিজ্ঞেস করছে, আপনাদের কি চা দেবে ?'

আশ্চর্য! উৎসাহিত কণ্ঠে অসিতবাবু বলে ওঠেন, 'চায় মিলেগী ?'

'জরুর।'

'লে আও।'

ছুটে চলে যায় মেয়েটি। ছেলেটি রয়ে যায় সুজয়ার কাছে। সে কাঁদে না। নির্বিকার থাকে। হয়তো সেও বুঝতে পেরেছে যে তার দিদি একটু বাদেই আসবে ফিরে। আসবে আমাদের জন্য সেই পরম-প্রিয় পানীয় নিয়ে।

ঘোড়াওয়ালা এলো না, কিন্তু চৌকিদার এলো কিছুক্ষণ বাদে। এসেই সেলাম করে। জিজ্ঞেস করি, 'ঘোড়াওয়ালা কোথায় ?'

'বাজার করছে। সে আবার আজই খাজিয়ার ফিরে যাবে।'

'কিন্তু সে আমাদের মালপত্র এই ভাবে ফেলে রেখে হাওয়া হয়ে গেল। তাকে বলেছিলাম, কামরা নিয়ে মালপত্র গুছিয়ে রাখতে।' অসিতবাবু বিরক্তভাবে বলেন।

'তার কোন দোষ নেই। সে কামরা চেয়েছিল কিন্তু আমি দিই নি।' চৌকিদার বলে।

'কেন ?' রেগে যান অসিতবাবু।

'কেমন করে দেব ? আপনারা তো পারমিট দিয়ে দেন নি তাকে।'

'কিন্তু বলে দিয়েছি, আমাদের পারমিট আছে।'

হাসে চৌকিদার, 'আছে বললেই তো কামরা দেওয়া যায় না সাব্। পারমিট না দেখে কাউকে ঘর খুলে দিই না আমি।'

পকেট থেকে পারমিটটা বের করে চৌকিদারের হাতে দেন অসিতবাবু। ভাল করে দেখে নিয়ে চৌকিদার জিজ্ঞেস করে, 'কোন দিকের কামরা নেবেন ?'

'নদীর দিকে।' সুজয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

একটু চিন্তা করে চৌকিদার বলে, 'বেশ চলুন।'

'চলুন তো বলছ, এদিকে যে ঘোড়াওয়ালা হাওয়া। মালপত্র নিয়ে যাবে কে ?' অসিতবাবু চিন্তিত।

'কেন আমি।' চৌকিদার নিশ্চিন্ত করে তাঁকে। 'আমি আপনাদের সব গোছগাছ করে দেব। তবে এ বেলা খানা দিতে পারব না। আপনাদের বাজারে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে। রাত থেকে খানা পাবেন আমার কাছে।'

স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম খাবারের অন্বেষণে। বিকেল হয়ে এলো, এখন দুপুরের খাবার পাওয়া কষ্টকর। হয়তো বা পুরী-তরকারী খেয়েই খিদে মেটাতে হবে।

সুজয়া ভরসা দেয়, 'চলুন না আমার সঙ্গে, চেষ্টা করে দেখা যাক। চাই কি খাবার পেয়েও যেতে পারি, ভাল খাবার। তবে হ্যাঁ, হিন্দুর দোকান নয় কিন্তু।'

'তাহলে ?' অসিতবাবু প্রশ্ন করেন।

'মুসলমানের।'

'কোন আপত্তি নেই।' আমি বলি।

'হিন্দু মুসলমান, পার্শী খ্রীষ্টান যার দোকান হোক আপত্তি নেই। এখন খাবার পাওয়া নিয়ে কথা।' অসিতবাবু বলেন।

অতএব আমরা সুজয়ার সঙ্গে এগিয়ে চলি। শীতলা পুলের পরে নিচের মোটর পথ থেকে একটি পায়ে-চলা পথ উঠে এসেছে বিশ্রাম ভবনের দ্বারে। এখান থেকে দুটি পথ উঠে গেছে দুদিকে। একটি বাসস্ট্যাণ্ডে আর একটি চৌঘানে। চাম্বার চৌঘান। ইরাবতীর তীর দিয়ে চৌঘানে চলেছি আমরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে এলাম চৌঘানে। আধমাইল দীর্ঘ ও প্রায় আড়াই শ' ফুট প্রশস্ত তৃণাচ্ছাদিত সুসমতল প্রান্তর। চারদিকে কাঠের বেড়া, কোথাও কোথাও ভেঙে গেছে। বেড়ার পরে পথ—তিন দিকে নাতিপ্রশস্ত পথ, একদিকে চাম্বার প্রধান রাজপথ। উত্তরে হাসপাতাল ও ভুরি সিং যাদুঘর, পুবে রাজপথ, রাজপ্রাসাদ, অফিস-কাছারি, বাজার ও মন্দির। দক্ষিণে বাসস্ট্যান্ড আর পশ্চিমে ইরাবতী।

চাম্বার সামাজিক মিলনভূমি চৌঘান। সভা-সমিতি গান-বাজনা ও লোকনৃত্যের আসর সবই বসে এখানে। চাম্বার মানুষের বড় প্রিয় চৌঘান। এই অসমতলের রাজ্যে, এমন সুবিস্তৃত সবুজ সমতল প্রিয় হবে না কেন ? কিন্তু চৌঘান চাম্বার ময়দান হলেও অশান্তির উৎস নয়। সে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ নয়, চাম্বাবাসীদের শান্তি-নিকেতন।

চৌঘানের ভেতর দিয়ে আমরা রাজপ এলাম। এগিয়ে চললাম বাজারের দিকে।

বাজারের শেষে একটা দোকানের সামনে এসে থামল সুজয়া। দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা—

AZIZ STORES
Shoe Makers. Chamba

এখানে থামল কেন ! সুজয়া কি জুতো কিনবে নাকি ? শুনেছি চাম্বা-চপ্পল খুব বিখ্যাত। কিন্তু এখন আবার জুতো কেনা কেন ? জুতো তো পরে হলেও চলত। এখন যে খিদেয় পেট পুড়ছে।

পথের পাশে দোকান। বাঁ দিকে ছোট একটি ঘর। ডান দিকে দরজা। সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল সুজয়া। আমরা তাকে অনুসরণ করি। একটু এগিয়েই বড় একখানি ঘর। তিন দিকের দেওয়ালের সঙ্গে ছাদ পর্যন্ত কাঠের শেল্‌ফ। তাতে থরে থরে জুতোর বাক্স। মেঝেতে কার্পেট পাতা। কয়েকখানি কাঠের চেয়ার ও একখানি টেবিল। ঘরের এক কোণে একটা বেসিন। সামনেই সাবান ও তোয়ালে রয়েছে।

কার্পেটের ওপর শুয়ে ছিল দুজন। একজন পুরুষ ও একজন নারী। তারা ঘুমোচ্ছিল।সুজয়া ডাক দেয়, 'আজিজ সাহেব, আজিজ সাহেব।'

'জী।' লোকটির ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠে বসে। পরনে পায়জামা ও কামিজ। ছোট-খাটো স্বাস্থ্যবান ও ফর্সা লোকটি। মুখভর্তি কাঁচাপাকা বড় বড় দাড়ি।

'আরে আপনারা এসে গেছেন ?' লোকটি সুজয়া ও তার স্বামীকে সেলাম করে। তারপরে আমাদেরও সেলাম জানিয়ে করজোড়ে বলে, 'বসুন।'

আমরা চেয়ারে বসি। সুজয়া বলে, 'বলে গিয়েছিলাম আসব। ঠিক এসেছি।'

'ভারী খুশি হলাম আপনাকে দেখে।' অজিজ উঠে দাঁড়ায়। নিদ্রিতা মহিলাকে জাগায়।

মহিলা উঠে বসে। সে-ও সেলাম করে আমাদের। মধ্যবয়সী স্বাস্থ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী। গায়ের রং খুব ফর্সা না হলেও মহিলা সুন্দরী। তার পরনে সালোয়ার পাঞ্জাবী। সে উঠে দাঁড়ায়। সুজয়া তাকে বলে, 'আমাকে চিনতে পারছেন ?'

'হ্যাঁ। বহিনজী গিয়া সাল এসেছিলেন এখানে। বলে গিয়েছিলেন, ফের আসবেন।'

'তাই তো এসেছি। কিন্তু খানা-টানা কিছু আছে কি ?'

'খানা—' আজিজ চিন্তা করে।

আমরাও চিন্তিত হই।

আজিজ বলে, 'ডাল পরোটা ও মাংস আছে।কিন্তু সবজী তো হবে না বহিনজী।'

'না হোক। ডালেরও দরকার ছিল না, যখন পরোটা ও মাংস পাওয়া যাচ্ছে, কি বলুন ?'

আমরা তাকে সমর্থন করি।

সুজয়া বলে, 'যা আছে, তাই দিন আজিজ সাহাব। আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'তা তো পাবেই। আপনারা হাত ধুয়ে বসুন, নতুন সাবান ও ধোয়া তোয়ালে আছে। আমি দশ মিনিটের মধ্যে খানা লাগাচ্ছি।'

স্বামী ও স্ত্রী চলে যায় সামনের ছোট ঘরে। একটু বাদে ফিরে আসে আজিজ। একটা টুল নিয়ে দোয়ালের ধারে যায়। টুলের ওপর দাঁড়িয়ে জুতোর বাক্স নামাতে শুরু করে। জুতোর বাক্সের পেছনে থরে থরে সাজানো রয়েছে চীনামাটি ও কাচের বাসনপত্র—কাপ-প্লেট গ্লাস ও জলের কুঁজো। কয়েকটা জিনিস নামিয়ে জুতোর বাক্স আবার ঠিক করে রাখে

আজিজ। বেরিয়ে যায় বাইরে।

আমরা হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে বসি। ধোয়া বাসনপত্র নিয়ে আজিজ ফিরে আসে। টেবিল সাজায়। কাচের কুঁজোয় জল নিয়ে আসে। আমি কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি—সুজয়া ঠিকই বলেছে। চাম্বার মতো পাহাড়ী জনপদে এমন পরিচ্ছন্ন বাসনপত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা।

হিমালয়ের মানুষেরা জলকে ভয় করে। স্নান তারা বড় একটা করে না, কাপড়-চোপড় ও বাসনপত্র ধোয়া তো দূরের কথা। তাই আমরা যখন হিমালয়ে আসি, তখন নোংরা শব্দটাকে মনের অভিধান থেকে মুছে ফেলি। কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে আহার্যের স্বাদ গন্ধ ও বর্ণ সম্পর্কে একটা নিস্পৃহ ভাব গড়ে তুলি মনে মনে। নইলে হিমালয়ের পথে পদচারণা অসম্ভব।

অথচ আজ পরিষ্কার বাসনপত্রের সঙ্গে সুস্বাদু খাবার পেয়েছি। সত্যিই ভাগ্যবান আমরা। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেন অসিতবাবু, 'আচ্ছা, এটা আপনার হোটেল না জুতোর দোকান ?'

'দুটোই। তবে প্রথমতঃ জুতোর দোকান। আমি স্পেশাল খানা ছাড়া তৈরি করি না। আর আমার খদ্দেরও সব স্পেশাল। এই যেমন আপনারা।'

"বিচিত্র ব্যবসায়ী," মানসী হঠাৎ বলে ওঠে।

চাম্বাকে হারিয়ে ফেলি। ফিরে আসি মানালীর পথে। বড় রাস্তায় এসে গেছি। চাম্বার হোটেলে কথা বন্ধ করে, মানালীর রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করি।

চায়ে চুমুক দিয়ে মানসী ছিঁড়ে যাওয়া সূত্রটিকে যুক্ত করতে আবার বলে, "সত্যই অদ্ভুত। এমন হোটেলের কথা কখনও শুনি নি।"

"আমিও দেখি নি। দেখে মনে হয় অবস্থা ভালোই। কিন্তু যতবার তার দোকানে গেছি, দেখেছি কোনো খদ্দের নেই। ভাবতে বাধ্য হয়েছি, লোকটার চলে কী করে ? স্থানীয় কারও কারও মতে—জুতোর দোকান ও হোটেল তার লোক-দেখানো ব্যবসা। আসলে তার অন্য আয় আছে। কেউ বলেন—আজিজ স্পাই। কেউ বলেন—আজিজ স্মাগলার। আমি কিন্তু তাদের কথা মেনে নিতে পারি নি। তবে লোকটি যে বিচিত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিচিত্র আজিজকে আমি বিস্মৃত হব না কোনদিন।"

রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে মানসী বলে, "আজিজের কথা থাক, আপনি চাম্বার কথা বলুন।"

ট্যারিস্ট বাংলোর পথে চলতে চলতে বলতে শুরু করি—

আজিজ-স্টোরস থেকে খানা খেয়ে ফিরে এলাম রাবী-ভিউ রেস্টহাউসে। একটু বিশ্রাম করেই আবার বেরিয়ে পড়ি চাম্বার পথে। তখন গোধূলির ছায়া নেমেছে শৈলসুন্দরী চাম্বার পথে ও ক্ষেতে, রাজপ্রাসাদের অলিন্দে আর মন্দিরশীর্ষে।

আমরা মন্দিরে চললাম। লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। একটি নয়, দুটি নয়, পাশাপাশি ছটি মন্দির। যেমন সুন্দর, তেমনি শান্ত—পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তীর্থস্থান সম্পর্কে আমাদের মনে যে ধারণাটা সজীব হয়ে আছে, তার সঙ্গে কোন মিল নেই এ মন্দিরের।

রাজপথ থেকে বাজার ছাড়িয়ে, রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে সংকীর্ণ চড়াই পথ বেয়ে, আমরা মন্দির তোরণে উপস্থিত হলাম। তোরণের সামনে গরুড় মূর্তি। গরুড়দেব এ রাজ্যের রক্ষক।

কথিত আছে—মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পরে প্রতিরাত্রে চাম্বা নগরে একটি যুবতী নিহত হত। রাজা প্রমাদ গনলেন। কিন্তু সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করেও সে হত্যা বন্ধ করা গেল না। রাজা তখন মুক্ত কৃপাণ নিয়ে নিজে পাহারা দিতে এলেন। গভীর রাতে রাজা দেখলেন, কেউ মন্দিরে আসছেন। রাজা তার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে ?

—আমি নারায়ণ। আগন্তুক উত্তর দিলেন।

—লক্ষ্মীদেবী কোথায় ?

—রাতে আমি একাই আসি।

—তাহলে আপনিই প্রতিরাতে এখানে নারীহত্যা করছেন।

—তুমি রাজা। তোমার তা দিয়ে কি দরকার ? তুমি রাজস্ব নিয়ে থাক।

—তা কেমন করে সম্ভব ! অমি প্রজাপালক। তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে আমার ওপরে। আমি বেঁচে থাকতে এ অন্যায় আপনি করতে পারবেন না। আর কোনো যুবতীকে হত্যা করার পূর্বে আমাকে হত্যা করতে হবে আপনার।

ভগবান অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা তখন গবুড়দেবকে আহ্বান করলেন। ভক্তের ডাকে সাড়া দিলেন গবুড়। তিনি অবির্ভূত হলেন রাজার সামনে। রাজা সমস্ত ঘটনা বললেন তাঁকে। প্রার্থনা করলেন—আপনি এই রাজ্যে চিরস্থায়ী হন।

—তথাস্তু।

সেই থেকে গবুড়দেব রয়েছেন এখানে। অন্যায় ও অবিচারের বিবুদ্ধে সর্বদা সজাগ রয়েছেন তিনি। আর সেই থেকেই নাকি নারীহত্যা রহিত হয়েছে চাম্বায়।

তোরণ পেরিয়ে আমরা অঙ্গনে প্রবেশ করি—পাথরে বাঁধানো অঙ্গন। তারপর নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরের ডানদিকে ধর্মশালা ও মন্দিরের দপ্তর।

বিরাট এক ঘন্টা ঝুলছে নাট-মন্দিরের দ্বারে। আমরা ঘন্টা বাজিয়ে ভেতরে আসি। কেন্দ্রস্থলে অনেকটা জায়গা জুড়ে পাথরের বেদী—ফরাস পাতা। কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন সেখানে। ভক্তি সহকারে আরতি দর্শন করছেন।

সন্ধ্যারতি শুবু হয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে। ঢাক-ঢোল, কাঁসর ও সানাইয়ের সম্মিলিত সুরধ্বনির সঙ্গে সমতা রেখে পূজরী প্রদীপ হাতে আরতি করছেন। এ নিয়মটি চলে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। তবে সেকালে রাজবাড়ির বাসিন্দারা প্রতিদিন আসতেন এখানে, বসতেন ঐ বেদীর ওপরে। আসতেন রাজা-রাণী, পাত্র-মিত্র ও সভাসদ। আসতেন পূজোর সময়। আসতেন আরতি দেখতে আর লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে রজ্যের মঙ্গলকামনা করতে। রাজার দৈনিক কর্মতালিকায় মন্দিরের একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্তন হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে পথের দূরত্ব সামান্য কিন্তু মনের দূরত্ব বেড়ে গেছে। তাই এখন আর রাজবাড়ির কেউ বড় একটা আসেন না মন্দিরে।

না আসুন। রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চাম্বায়। চাম্বা এখন আর দেশের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। সে এখন স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই রাজার বদলে প্রজারা আজ আরতি দর্শন করতে এসেছে। এসেছি আমরা। সমবেত হয়েছি লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপালাভ করতে, কেবল চাম্বার নয় সারা ভারতের মঙ্গলকামনা করতে।

নাট-মন্দিরের পরে সবু একফালি জায়গা তার পরেই মূল মন্দিরের দ্বার। শ্বেতপাথরের

অপূর্ব সুন্দর নারায়ণমূর্তি—লক্ষ্মীনারায়ণ। রূপোর বেদীর ওপরে সোনার সিংহাসনে দণ্ডায়মান মূর্তি। শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি। সার্থক হয়েছে সেই রাজপুত্রদের আত্মদান। যাঁরা এই মূর্তি নির্মানের পাথর আনতে গিয়ে দস্যুহস্তে নিহত হয়েছেন। সার্থক আমাদের জীবন, এই অপূর্ব মূর্তি দর্শনের সৌভাগ্য হল।

স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত মূর্তি। নাভিদেশ ও ললাটে দুখানি মূল্যবান হীরা জ্বল জ্বল করছে। আরও অনেক মূল্যবান অলঙ্কার ছিল। কিন্তু বছর দশেক আগে একবার মন্দিরে আগুন লাগে। সেই ডামাডোলের মাঝে বহু অলঙ্কার অপহৃত হয়ে যায়। জানি না, নারায়ণ সেই অপহরণকারীদের কি শাস্তি দিয়েছেন ?

প্রধান পুরোহিতের আরতি শেষ হল। কয়েকজন ভক্ত ভেতরে প্রবেশ করলেন। কেউ স্নান করলেন না, পট্টবস্ত্র পরিধান করলেন না। যে যার নিজ বেশে প্রবেশ করলেন পবিত্র মন্দিরে। ভগবান তো ভক্তের অন্তরে। মন শুদ্ধ থাকলে বাহ্যিক শুদ্ধি অবান্তর। মনের পবিত্রতাই ভক্তকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়।

পুরোহিত বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। ভক্তরা ধূপকাঠি অথবা মোমবাতি দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের আরতি শুরু করলেন। আর প্রদীপ হাতে নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে প্রধান পুরোহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। আমরা অনুসরণ করি তাঁকে। প্রদক্ষিণ শেষে প্রসাদ নিয়ে পরবর্তী মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি।

পাশাপাশি ছটি মন্দির আছে এখানে। তিনটি বিষ্ণু ও তিনটি মহেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। প্রতিটি মন্দিরের একই গড়ন। আয়তনে ও উচ্চতায় কেবল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি একটু বড়। অন্যান্য মন্দিরে বিষ্ণু, হর-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে। অপূর্ব সুন্দর সব মূর্তি। অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্য প্রতিটি মন্দিরে। আয়তনে ও উচ্চতায় ছোট বা বড় হলেও সব মন্দিরের গড়নই উড়িষ্যার রেখ-দেউলের মতো। কিন্তু শিল্পকর্মে রাজস্থানী প্রভাব সুস্পষ্ট। চাম্বার রাজাদের আদি নিবাস ছিল রাজস্থান। রাজস্থানী প্রভাবের কারণ বুঝতে পারি কিন্তু উড়িষ্যা ? কোথায় উড়িষ্যা আর কোথায় চাম্বা !

এখানকার সব কটি মন্দিরই শিখরযুক্ত পাথরের মন্দির। গায়ে অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য। কেনই বা হবে না, এ যে ঐশ্বর্যশালিনী চাম্বা রাজ্যের রাজমন্দির।

ছটি মন্দির ছাড়াও এখানে আছে মহাকালী ও মহাবীরের মন্দির। আর আছে চমৎকার একটি মন্দির প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখা যায় শান্ত ও সুন্দরী চাম্বাকে।

কোমর সমান দেয়াল ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গণ। আমরা সেই দেওয়ালের ওপর এসে বসলাম।

যেমন মন্দির, তেমনি শহর। মন্দির সুন্দর, মন্দিরের পরিবেশ শান্ত অথচ সজীব। শহরও কোলাহলমুখর নয়। চাম্বার মানুষরা আস্তে আস্তে কথা বলে। চীৎকার করে অন্যের শান্তি নষ্ট করে না।

নিচে রাস্তা। লোকজন যাওয়া আসা করছে। বড় ভালো লাগছে ওদের দেখতে। ওদের নেই কোনো অহেতুক কৌতুহল। কেউ জিজ্ঞেস করছে না—আমরা কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব ? আমরা ট্যারিস্ট্ কিনা ? অথচ ওরা পর্যটকদের ভালবাসে। যখন যার কাছে যে সাহায্য চেয়েছি, তৎক্ষণাৎ তা পেয়েছি। সত্যই সুন্দরী চাম্বা। সুন্দর তার মানুষ, সুন্দর তার মন্দির, সুন্দর এই শৈলশহর।

মন্দির থেকে বেরিয়ে খানিকটা চড়াই ভেঙ্গে আমরা প্রাসাদ তোরণে উপস্থিত হলাম।

মন্দিরের পাশেই প্রাসাদ। কিন্তু তোরণে পৌঁছতে খানিকটা হাঁটতে হল। তিনখানি বাড়ি মিলিয়ে রাজপ্রাসাদ। রঙমহল, ভারমৌরী মহল ও রাজমহল।

রাজা সহিলভার্মা ভারমৌর থেকে চাম্বাতে এসে রঙমহল নির্মাণ করেন। কথিত আছে রাজা শীতকালে এই প্রাসাদ তৈরি আরম্ভ করেন। তখন গদ্দী বা উচ্চ-হিমালয়ের মেষপালকরা শীতের জন্য নেমে এসেছে চাম্বায়। রাজা বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাসাদ নির্মাণের কাজে নিয়োজিত করলেন। রাজার আদেশ অমান্য করলে মৃত্যু। তাই গদ্দীরা নীরবে প্রাসাদ তৈরি করতে থাকল। শীত শেষ হয়ে গেল কিন্তু প্রাসাদ তৈরি শেষ হল না। এদিকে গদ্দীদের তখন গাঁয়ে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। তাদের ভেড়া চড়াতে যেতে হবে। তারা রাজাকে বলল—মহারাজ এখন আমাদের ফিরে যেতে দিন। আগামী শীতে এসে আপনার প্রাসাদ তৈরি করে দেব।

—না। আমার প্রাসাদ তৈরি হবার আগে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না।

কিন্তু রাজার আদেশ অমান্য করতে চাইল গদ্দীরা। রাজা তখন তাদের বন্দী করলেন। একটা বড় ঘরের ভেতর তাদের আটকে রাখা হল। গদ্দীরা তবু রাজার কাছে নতি স্বীকার করল না। তারা মণিমহেশের কাছে মুক্তি কামনা করে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে গদ্দীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারিদিক আলো হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসল তারা। সবিস্ময়ে দেখল, আগুন লেগে ঘরের দরজা পুড়ে গেছে। বাইরে কোনো প্রহরী নেই।

গদ্দীরা এলো ঘরের বাইরে। কেউ কোথাও নেই। তারা নির্বিঘ্নে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলো। মনে মনে মুক্তিদাতা মণিমহেশকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে ছুটে চলল গাঁয়ের পথে।

ভারমৌরী মহল ও রাজমহল নির্মাণ করেছেন চাম্বারাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ভুরি সিং। তাঁর আগে আরও একত্রিশ জন রাজা রাজত্ব করে গেছেন চাম্বার সিংহাসনে। কিন্তু বর্তমান চাম্বার যাবতীয় উন্নতির মূলে মহারাজ ভুরি সিং। রাজ্যের প্রতি মহল থেকে একজন করে রাণী নিয়ে এসেছিলেন ভুরি সিং। কিন্তু তাঁর প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন ভারমৌরী রাণী। তাঁরই জন্য মহারাজ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন ভারমৌরী মহল আর অন্য রাণীদের জন্য রাজমহল।

বর্তমান রাজা লছমন সিং এর কোন মহলেই বাস করেন না। তিনি বাস করেন নবনির্মিত বাংলোতে—এক ফার্লং দূরে। তিনি ভুরি সিং-য়ের পৌত্র। অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও মাতাল। তাই ১৯৫৯ সালে রাণীর অনুরোধে তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার শ্রী আর. সি. পাল সিং এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিয়ে দেন। সেই থেকে রাজা ক্ষমতাহীন। এমন কি তাঁর মাসোহারার টাকা পর্যন্ত রাণীর স্বাক্ষর ছাড়া পাবার উপায় নেই।

প্রাসাদের এই অংশ এখন বিদ্যায়তন ও পাঠাগার—কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরী। আমরা লাইব্রেরীতে এলাম। বহুলোক পড়াশুনা করছে। বেশ শান্ত পরিবেশ। আমিও একখানি সানডে স্ট্যান্ডার্ড কাগজ নিয়ে বসে পড়লাম।

সেদিন ছিল ৫ই সেপ্টেম্বর, রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। জনৈক পি. রাজেশ্বর রাও রাষ্ট্রপতির জীবনালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর কিছু বাণী উদ্ধৃত করেছেন। কথাগুলি বড়ই ভালো লাগল। আজও পরিষ্কার মনে আছে আমার। শ্রী রাও লিখেছেন—

'He (Radhakrishanan) quoted from Zulu dictionary, he said that

man was an animal tamed and trained by an woman. An educated daughter is the pride of the family.....Acccording to "Mrichhakatika" a woman is naturally learned while a man's learning is based on books....He argues that if love without marriage is illegal, marriage without love is immoral.....Love is not sex. Love has its peaks which only one in a million is able to climb through mature and responsible love.'

"মনে হচ্ছে আমাকে শোনাবার জন্যই সেদিন রাষ্ট্রপতির বাণী মুখস্থ করে ফেলা হয়েছে।"

মানসীর কথায় চাম্বার কথা থামাতে হয়। কিন্তু বলতে হয় নিজের কথা। বলি, "কি জানি হয়তো মন জানত, মানালীতে মানসীর সঙ্গে দেখা হবে। তাই মন রাষ্ট্রপতির কথাগুলি মনে রেখেছে।"

"তবে কথাগুলি ভারী সুন্দর।" মানসী বলে।

"তাহলে মুখস্থ করে অন্যায় করি নি কিছু ?"

"না ! কিন্তু এখন দেরি করলে অন্যায় করবেন। চলুন কাপড়-চোপড়, জলের বোতল ও ক্যামেরা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। নইলে বাসে জায়গা পাওয়া যাবে না।"

আমরা ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে এসে গেছি। আর কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে ঘরে আসি। সারাদিন কাটবে বাইরে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসি পথে। একটু বাদে মানসী বলে, "এবারে তাহলে চাম্বার বাকি কাহিনীটুকু শেষ করে ফেলুন।"

"সাড়ে আটটা বেজে গেছে। সাড়েনটায় নাগরের বাস ছাড়বে। টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। এখন সময় নষ্ট না করে চলুন তাড়াতাড়ি পা চালানো যাক।"

"চালান না, কে নিষেধ করেছে ? কেবল চলতে চলতে চাম্বার কথা বলুন। সত্যি বলছি বড় ভাল লাগছিল শুনতে।" মানসী মিনতি করে।

আমি বলতে শুরু করি—

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে আমরা রওনা হলাম ওপরে—চামুণ্ডা মন্দির দর্শন করতে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই মন্দির। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চড়াই পথ ভেঙ্গে আমরা মন্দিরে পৌঁছলাম। তিনটি মন্দির রয়েছে একই চৌহদ্দির মধ্যে—শিব মন্দির, চৌতরা মন্দির ও চামুণ্ডা মন্দির।

পশ্চিমমুখী চামুণ্ডা মন্দির। মন্দির শীর্ষে পেতলের শিখর-কলস ও ছত্র। মন্দিরের সামনে পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে একটা বেদীর ওপরে সিংহমূর্তি—দেবীর বাহন। মন্দির তোরণে বিরাট একটা ঘন্টা ঝুলছে।

প্রাঙ্গণ থেকে পনেরো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নাট-মন্দির। নাটমন্দিরেও বহু ঘন্টা ঝুলছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরও দেখেছি সর্বত্র এমনি ঝুলন্ত ঘন্টা। কেবল তাই নয় চাম্বার যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি মন্দিরে মন্দিরে এমনি ঘন্টা। ঘন্টা না হলে যে মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় না।

কিন্তু ঘন্টার কথা থাক, চামুণ্ডা মন্দিরের কথাই বলা যাক। কাঠের মন্দির। নাট-মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে যজ্ঞকুণ্ড ও ছাদে কাঠের ওপরে খোদাই-কাজ।

নাট-মন্দিরের পরে গর্ভ-মন্দির। ছোট মন্দিরের চার কোণে চারটি ও প্রত্যেক পাশে

দুটি করে কারুকার্য খচিত কাঠের স্তম্ভ। গর্ভ-মন্দিরের দরজাটি ছোট। মেঝে শ্বেত পাথরে বাঁধানো। ভেতরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। উজ্জ্বল আলোয় মন্দির দর্শন করলাম। পেতলের সিংহাসনে বসে আছেন দেবী চামুণ্ডা। পেতলের মূর্তি কিন্তু ভারী সুন্দর। দেবীর দুপাশে দুটি ছোট সিংহমূর্তি। পেছনে দেওয়ালের সঙ্গে কালী ও দুর্গার দুখানি ছবি। সিংহমূর্তি দুটির মাঝখানে একটি বেদীর ওপরে অন্নপূর্ণার মূর্তি। পেতলের মূর্তি আর পেতলের বেদী। বেদীতে তিন সারি খোদাই করা লিপি—

> 'শ্রীবীরবিক্রম সম্বত ১৯৮৮ চৈত্র প্রবিষ্ট পঞ্জী শ্রী বড়ক্কু খেলওয়া
> রামদাসাত্মজ কর্ম সিংহ মজিস্ট্রেট জী নেঠ ঠেরা শিব শরণকে
> হাত সম্বতরা করকে শ্রীভগবতী চামুণ্ডাজীকো প্রদান কিয়া।'

দেবী চামুণ্ডাকে প্রণাম করে আমরা এলাম চৌতড়া মন্দিরে। ছোট মন্দির—ভেতরে মহিসাসুরমর্দিনীর মূর্তি। দেবী অতিশয় জাগ্রতা এখানে। প্রতিবছর বৈশাখ মাসে চুরা গ্রাম থেকে বৈরুয়ালীদেবীর মূর্তিসহ পাঁচ-ছ হাজার পূণ্যার্থী আসেন এখানে। দশ দিন ধরে দেবীপূজা চলে—পাঁঠা ও ভেঁড়া বলিদান করা হয়। আগে নাকি নরবলি হত।

দেবী দশভূজা বাঙ্গালীর পরমারাধ্যা। বাংলা থেকে হিমাচল বহুদূর। কিন্তু দেবী এখানেও পরমারাধ্যা। মানুষে মানুষে কতো পার্থক্য কিন্তু কি নিবিড় ভাবগত ঐক্য। ভক্তির অচ্ছেদ বন্ধনই এই বিরাট ও বিচিত্র দেশের মিলনসূত্র। ধর্মই ভারতকে মহাভারতে পরিণত করেছে।

এলাম শিব মন্দিরে। সাদাসিধে সাধারণ মন্দির। ভেতরে লিঙ্গমূর্তি। তবে মন্দিরটির গড়ন উড়িষ্যার রেখ-দেউলের মতো। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরেরও গড়ন একই রকম। হিমাচলের বহু জায়গাতেই উড়িষ্যার স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণ দেখেছি। এই সব শিল্পকর্মই সুপ্রাচীন।

কোথায় উড়িষ্যা আর কোথায় হিমাচল! তবু যেন কতো কাছে। সত্যই তাই। কলের গাড়ি না চললেও দূরত্বের ব্যবধান বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, আসাম থেকে সিন্ধু পর্যন্ত একই সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল। এই সাংস্কৃতিক বন্ধনই বিরাট ও বিচিত্র ভারতের ক্ষীয়মান মিলনসূত্রটিকে সুদৃঢ় করতে পারে।

শিবমন্দিরের সামনে একটি অশ্বত্থ গাছ। শাখা-প্রশাখায় সমস্ত প্রাঙ্গণটিকে ছায়াশীতল করে রেখেছে। বৃক্ষতলে বসে বিশ্রাম করি আর চাম্বা শহর ও উপত্যকাকে দেখি। সুজয়া আপন মনে বলে ওঠে, "The Vale of milk and honey, sparkling springs and impetuous streams.'

সত্যই তাই। এখান থেকে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। অসিতবাবু ছবি নিলেন।

উৎরাই পথ বেয়ে আমরা নেমে এলাম বড় রাস্তায়। এ রাস্তায় মোটর চলে। নিচে শহর। দেখতে দেখতে পথ চলি। প্রায় মাইলখানেক চলে একসারি সিঁড়ির সামনে আসি। সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে—সুহ বা সুইদেবীর মন্দিরে। আবার এক একসারি সিঁড়ি এখান থেকেই নেমে গেছে নিচে—বাজারে। আমরা মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙ্গতে শুরু করি।

একটি টিলার ওপর মন্দির। দেয়ালবিহীন ছয়টি স্তম্ভ যুক্ত ছ'কোণা ছোট মন্দির। সামনে সাদা ও নীল রংয়ের পাথর বাঁধানো অঙ্গন। ভেতরে দেবীর আবক্ষ মূর্তি ও ত্রিশূল। এ দেবী স্বর্গের ভগবতী নয়, মর্ত্যের মানবী। মন্দিরের পাঁচ দিকে পাঁচখানি ছবিতে আঁকা রয়েছে তাঁর জীবনকাহিনী—এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। রাজ্যের প্রয়োজনে রাণীর আত্মোৎসর্গের এক অবিস্মরণীয় উপাখ্যান।

ভারমৌর থেকে রাজধানী এলো চাম্বায়। রাজা এলেন, রাণীরা এলেন, রাজপরিবারের সবাই এলেন। এলেন রাজপুরুষগণ আর দেশের সাধারণ মানুষের দল। জনবিরল উপত্যকা জনবহুল নগরীতে পরিণত হল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এক মহাসমস্যা দেখা দিল। জল মানুষের জীবন। সে জলাভাব দেখা দিল নগরীতে। দূর পাহাড়ের এক ঝরণা থেকে নালা কেটে জল আনা হয়েছিল, সেই নালা গেল শুকিয়ে। নগরীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল। নিরুপায় রাজা ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালেন। অনেক আলোচনার পরে তাঁরা রাজাকে বিধান দিলেন—আপনার কোন রাণী কিংবা পুত্র যদি ঐ ঝরণায় প্রাণ বিসর্জন দেয়, তাহলেই নালায় জল বইবে।

রাজা ফিরে গেলেন অন্তঃপুরে। নয় রাজপুত্র মারা গেছেন লক্ষ্মীনারায়ণের জন্যে শ্বেতপাথর আনতে গিয়ে। দশম পুত্র যুগকর কেবল আছে বেঁচে। সে জীবন উৎসর্গ করলে যে রাজবংশ লোপ পাবে। তাই রাজা সহিল ভার্মা এলেন রাণীদের কাছে। একে একে রাণীদের বললেন এ কথা। কেবল কনিষ্ঠা মহিষী সুনয়না বা সুইদেবী তখন ছিলেন না প্রাসাদে। অন্য রাণীরা কেউ বা ব্রাহ্মণদের বিধানকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেন, কেউ বা অন্য কোন রাণীকে মেরে ফেলার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাজা তাতে সম্মত হলেন না। হত্যা নয়, আত্মোৎসর্গ। স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতে হবে। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য জীবনদান করতে হবে।

সুনয়না তখন ছিলেন রাজোদ্যানে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মালা গাঁথছিলেন। বয়সে তিনি সর্বকনিষ্ঠা। তাঁর কাছে এ প্রস্তাব অসঙ্গত। তবু রাজা এলেন সেখানে। সুনয়না উঠে দাঁড়ালেন মালা হাতে। রাজা হেসে বললেন, 'কারজন্য মালা গাঁথছো, আমার জন্য নিশ্চয়।'

'না' রাণী বলেন, 'লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য। বিকেলে মন্দিরে যাব।'

'লক্ষ্মী-নারায়ণ ভাগ্যবান।' রাজা হেসে বলেন।

কি যেন একটু ভেবে সহসা রাণী সেই মালা পরিয়ে দিলেন রাজার গলায়। তিনি রাজাকে প্রণাম করলেন।

রাজা বিস্মিত হলেন। বললেন, 'এ ভুল কেন করলে ? দেবতার মালা পরিয়ে দিলে আমাকে।'

'ঠিকই করেছি।' রাণী বললেন, 'আমার কাছে যে তোমার চেয়ে বড় কেউ নেই। তুমিই আমার জীবনদেবতা।'

রাজা রাণীকে বুকে টেনে নিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে রাজা ব্রাহ্মণদের বিধানের কথা বললেন। রাণী জিজ্ঞেস করেন, 'দিদিরা কেউ বুঝি রাজি হলেন না।'

'না।'

'আশ্চর্য ! এত বড় মহৎ কাজ করতে রাজি হচ্ছেন না। ওরা এতো ভয় পায় মরতে। অথচ,' রাণী হাসেন, 'সবাইকেই তো একদিন মরতে হবে।'

রাজা চুপ করে থাকেন। রাণী আবার বলেন, 'তুমি ভেবো না কিছু। আমি জীবন উৎসর্গ করব ঐ ঝরণায়। তুমি আয়োজন করো।'

'তুমি !' রাজা আঁতকে উঠেন।

'হ্যাঁ।' রাণী অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেন।

'তুমি যে সবার ছোট।'

'তাই তো তোমার ওপর আমার দাবী সবচেয়ে বেশি। তুমি আপত্তি ক'রো না, তোমার পায়ে পড়ি। আর আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি মরব না, আমার মৃত্যু নেই। আমি বেঁচে থাকব সেই জলধারায়। তোমার মনে আর নগরী চাম্বার জন-জীবনে।'

সে আশা মিথ্যে হয় নি। সেই মহিয়সী রমণী আজও আছেন বেঁচে। এখনও চৈত্র মাসে মেলা বসে এখানে—এই মন্দিরতলে। দূর দেশের মানুষরা এসে আজও সুইদেবীর অমর আত্মাকে প্রণাম জানিয়ে যায়। আসুন, আমরাও প্রণাম করি।

॥ ছয় ॥

বাস ছাড়ল সকাল সাড়ে নটায়। আমি ও মানসী নাগর চলেছি। একই সিটে বসেছি দুজনে। পরশু পরিচয় হয়েছে, সেই থেকে এক সঙ্গেই আছি, কিন্তু এমন পাশাপাশি আর বসি নি কখনও। খারাপ লাগছে বলতে পারি না তবে সংকোচ বোধ করছি সন্দেহ নেই। অথচ মানসীর মাঝে কোনো সংশয় দেখতে পাচ্ছি না। সে বেশ সহজভাবে কথাবার্তা বলছে।

মানালী থেকে নাগর যাবার দুটি পথ। একটি বিপাশার ওপার দিয়ে, একটি এপার দিয়ে। আমরা ওপারে পথে গিয়ে এপারের পথে ফিরব। ফেরার কথা পরে হবে, এখন যাবার কথা ভাবা যাক।

কিন্তু মানসীর মনে অন্য ভাবনা। নাগর নয়, চাম্বা। চাম্বার কথা বলতে হবে তাকে। চাম্বার কথা বলছি আজ সকাল থেকেই। বাকিটুকু না হয় পরে বলতাম কিন্তু সে রাজি নয়। বলে, "অনেক কথাই তো বলেন নি। বলেন নি, ভুবি সিং মিউজিয়ামের কথা। বলেন নি, চাম্বার মানুষ আর হিমালয়ের কথা। সর্বোপরি বলেন নি, রাবী-ভিউ রেস্টহাউসের কথা।"

"কথা শুনে মনে হচ্ছে" আমি বলি, "যাদের কথা বলি নি, তাদের সঙ্গে আপনার চাক্ষুস পরিচয় না থাকলেও, তারা আপনার অপরিচিত নয়।"

"পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, তাই শুনতে চাইছি।" একবার থামে সে। তারপরে সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, "বলা না-বলা আপনার বিবেচ্য। অসুবিধে হলে, বলবেন না।"

কি সর্বনাশ! একি অভিমান নাকি। যতই হিমালয়প্রীতি থাক, মানসী মানুষী। এখনই হয়তো দুফোঁটা মুক্তো গড়িয়ে পড়বে তার দুচোখের মণি থেকে। তাই তাড়াতাড়ি শুরু করি—

সুইদেবীর মন্দির দর্শন করে নেমে এলাম বাজারে। একটা চায়ের দোকানে বসে একটু বিশ্রাম ক'রে নিলাম। তারপরে এলাম ট্যুরিস্ট অফিসে। মণিমহেশ যাত্রার খবরাখবর নিলাম। পথ ভাল নয়। অতিরিক্ত বর্ষার জন্য রোজই পথে ধস নামছে। বাসে কতদূর যেতে পারব ঠিক নেই, তবে বাস চলে দুর্গেঠী পর্যন্ত। চাম্বা থেকে ২৯ মাইল। সেখান থেকে মণিমহেশ হাঁটাপথে ৩৬ মাইল। যদিও জীপ চলে আরও ১৫ মাইল—ভারমীর পযন্ত। কিন্তু ট্যুরিস্ট অফিসার আমাদের হেঁটে যাবারই পরামর্শ দিলেন।*

অসিতবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ট্যুরিস্ট অফিসার বললেন, 'চাম্বা হিমাচল-পথের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ। হিমাচলের অন্তরলোক থেকে বহু পথ এসে মিলেছে এখানে। তাই চাম্বা পদযাত্রীদের এত প্রিয়।'

---

* এখন ভাল রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কাজেই এখন সবাই ভারমৌর পর্যন্ত গাড়িতে যায়।

'চাম্বা থেকে তিশা, ট্রেল্‌লা, সক্কুন্দিতো ও বিন্দ্রাবনী হয়ে একটি পথ গেছে কিলার—পাঙ্গী উপত্যকার সদর। ৪২ মাইল বাসে গিয়ে তিশা। সেখান থেকে ১৪ মাইল জীপ ও ৩৬ মাইল হেঁটে পৌঁছতে হয় সেই ৮৪২৯ ফুট উঁচু বিচিত্র উপত্যকায়। পথে পেরোতে হয় চাম্বা জেলার সবচেয়ে বড় বন ও 'সাচ্ গিরিবর্ত্ম'।

'তিশা থেকে দেবীকোঠি, আল্যাস ও মিনঢাল হয়ে কিলার যাবার আরও একটি পথ আছে। এই পথে তিশা থেকে কিলার হাঁটাপথে ৪৩ মাইল। পথে ছিনি গিরিবর্ত্ম পেরোতে হয়। কিলার থেকে শ্রীনগর ও মানালীর পথ আছে।

'ভারমৌর থেকে আল্যাস যাবার পথ আছে। একটি নয়, তিন তিনটি পথ—কালিছো, চোবিয়া অথবা কুগতি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে।'

'জানি' সুজয়ার কথায় থামতে হয় ট্যুরিস্ট অফিসারকে। সুজয়া বলে, 'আমরা কুগতি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে ত্রিলোকনাথ ও কেলং যাব।'

'তাই নাকি!' খুশি হন ট্যুরিস্ট অফিসার। আরও কিছু খবরাখবর তিনি দেন আমাদের। তার পরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই।

ট্যুরিস্ট অফিস থেকে খানিকটা হেঁটে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে আসি। দেখা করি তার সঙ্গে। কর্মব্যস্ত মানুষ। তবু কিছুক্ষণ গল্প করলেন আমাদের সঙ্গে। কথায় কথায় বললেন, 'কাছাকাছি যাবার মতো অনেক জায়গা আছে। মণিমহেশ, ত্রিলোকনাথ ও কিলার ছাড়াও আছে সরোল, সলুনি ও ভাণ্ডাল উপত্যকা। সরোল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। চাম্বা থেকে মাত্র সাত মাইল। পাঁচ মাইল বাস ও দু মাইল হাঁটাপথ।

'ছ' হাজার ফুট উঁচু সলুনিও একটি সুন্দর শৈলাবাস। একটি গিরিশিরার ওপরে অবশিত এই রমণীয় স্থান। সেখান থেকে তুষারবৃত হিমাচলের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। চাম্বা থেকে বাসপথে ৩৫ মাইল। আপনারা যদি যান, থাকার কোন অসুবিধে হবে না। পি. ডবলু. ডি. রেস্টহাউস আছে। আমি পারমিট দিয়ে দেব।'

সুজয়া সবিনয়ে বলে, 'পরশু আমরা মণিমহেশ রওনা হচ্ছি।'

'বেশ তো ফেরার পথে যাবেন।' ডেপুটি কমিশনার বলেন।

অসিতবাবু জানান, 'আমরা তো আর এ পথে ফিরছি না। আমরা মণিমহেশ থেকে ফেরার পথে হাডসার থেকে কুগতি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে ত্রিলোকনাথ দর্শন করে কেলং চলে যাব।'

'ভেরীগুড।' বলে ওঠেন ডেপুটি কমিশনার, 'আমি আপনাদের আন্তরিক সাফল্য কামনা করি। আবার যদি কখনও চাম্বা আসেন অবশ্যই সরোল, সলুনি ও ভাণ্ডাল উপত্যকা বেড়িয়ে যাবেন।'

'ভাণ্ডাল কত দূর?' জিজ্ঞেস করি।

'চাম্বা থেকে ৪৯ মাইল, সলুনি থেকে ১৪ মাইল। চিরসবুজ ভাণ্ডাল উপত্যকা চাম্বার সঙ্গে কাশ্মীরের যোগসূত্র। আপনারা ইচ্ছে করলে ভাণ্ডাল থেকে শ্রীনগর চলে যেতে পারেন। ভাণ্ডালেও থাকার কোনো অসুবিধে হবে না। পি. ডাবলু. ডি. এবং ফরেস্ট রেস্টহাউস আছে।'

বড় ভাল লাগল ভদ্রলোককে। চাম্বা জেলা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কতো কাজ। তবু এতো কথা বললেন আমাদের সঙ্গে। চাইতেই চাল ও কেরোসিন তেলের পারমিট দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরে চলি রেস্টহাউসে।

রাবী-ভিউ রেস্টহাউস—সারাদিন সারারাত রাবীর রাগিণীতে মুখরিত। ইরাবতী কিন্তু দূরে। প্রায় চার শ ফুট নিচ দিয়ে যাচ্ছে বয়ে। এখানে বাঁক ফিরেছে—দিক পরিবর্তন করেছে। আর তাই বোধ করি সে এতো সুন্দর, এমন সঙ্গীতময়ী।

যেমন রাবী, তেমনি বিশ্রাম ভবন। ভারী সুন্দর। সামনে সবুজ একফালি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। তাতে মরশুমী ফুলের সমারোহ। ঝাউ দেওদার আর ইউক্যালিপটাসের ছায়া। নদীর ধারে বসবার জায়গা। সারাদিন বসে থাকা যায়। এপারের পথ আর ওপারের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ইরাবতীর গান শুনতে থাকলে সময়ের জ্ঞান থাকে না।

ভেতরের ব্যবস্থাও খুবই ভাল। খান পাঁচেক বেশ বড় বড় ঘর নিয়ে বিশ্রাম ভবন। মেঝে কার্পেটে মোড়া, জানলা-দরজায় দামী পর্দা। চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী প্রভৃতি আসবাবে সজ্জিত। প্রতি ঘরের সঙ্গে বাথরুম। তার ওপর আমরা পেয়েছিলাম নদীর ধারে একখানি ঘর। কাজেই তিনটি দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলাম না।

তবে আমরা ঘরের থেকে বাইরেই বেশিক্ষণ থাকতাম। সেদিন দুপুরেই গিয়েছি ভুরি সিং মিউজিয়ামে। প্রাচীন শিলালিপি, প্রস্তরমূর্তি, চিত্রকলা, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র ও তামার তৈজসপত্র প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

এই জাদুঘরের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের নাম। তিনিই ১৯০৮ সালে এই সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন। তিনি তখন লাহোরের কমিশনার ছিলেন। রাজা ভুরি সিংয়ের অর্থানুকূল্যে ও তৎকালীন নর্দান আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের সুপারিনটেন্‌ডেনট্ প্রত্নতত্ত্ববিদ সুপণ্ডিত মিঃ ফোগেলর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

সবার শেষে আবার বলব চৌঘানের কথা। গড়ের মাঠকে বাদ দিয়ে যেমন কলকাতাকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি চৌঘান ছাড়া চাম্বা কল্পনাতীত। চাম্বার মানুষ সময় পেলেই চৌঘানে আসে। কেবল চাম্বার মানুষই বা বলি কেন। চাম্বা তো কেবল শৈলাবাস নয়, চাম্বা সেকালের রাজধানী, একালের জেলা সদর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। জিরা, ধূপ, ওষুধের গাছ, শাল, রুমাল, চপ্পল ও মধু রপ্তানীর একটি বড় কেন্দ্র চাম্বা। তাই সরকারী ও ব্যবসার প্রয়োজনে বহুলোক চাম্বা আসেন। তাঁরা কাজকর্মের ফাঁকে এসে চৌঘানে বসেন। কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান চৌঘানে।

ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সবারই অবসর বিনোদনকেন্দ্র চৌঘান। অনেক মানুষের মিলনক্ষেত্র চৌঘান। কিন্তু চৌঘান কেবল সুন্দর নয়, সে শান্ত। শান্তি যে চাম্বার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সম্পদশালী চাম্বা তাই চিরস্মরণীয়া।

আর তাই জেনারেল ব্রুস বলেছেন, "Chamba! Given health and strength, if I don't come back....'bust me right side inwards." এই উক্তির পরে ষাট বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু চাম্বা আজও রয়েছে তেমনি চিরস্মরণীয়া।

থামতে হয় আমাকে। শেষ করতে হয় চাম্বার কথা। আমাদের বাস এসে থেমেছে জগৎসুখ। আমি ও মানসী মানালী থেকে নাগর চলেছি। মানালী থেকে বশিষ্ঠকুণ্ডের পথে কিছুক্ষণ বাস চলেছে। পেরিয়ে এসেছি বিপাশা। বিপাশা পেরিয়ে বাস রওনা হয়েছে বশিষ্ঠকুণ্ডের বিপরীত দিকে। বিপাশার সঙ্গমে পিরিনি গ্রাম। সেই গ্রামের ভেতর দিয়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু হামতা গিরিবর্ত্মের পথ। গ্রামের ওপর থেকে নাকি স্পিতি উপত্যকার রমণীয় দৃশ্য দেখা যায়। সেই নদী ছাড়িয়ে আরও আধঘন্টা চলে আমরা পৌঁচেছি জগৎসুখ। এখন বেলা দশটা।

সেকালের রাজধানী জগৎসুখ একালের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম মাত্র। এখানকার ভগবতী

মন্দির বিখ্যাত। দেবীর স্থানীয় নাম সুন্দাদেবী। মানসী বলে, "চলুন মন্দির দর্শন করে আসা যাক। ড্রাইভার বলেছে পনেরো মিনিট বাস থামবে এখানে।"

আমরা বাস থেকে নামি। রাস্তার বাঁদিকে একটু ওপরে উঠে অনেকখানি সমতল জায়গা। তারই মধ্যস্থলে মূল-মন্দির। আমরা মন্দিরে এলাম।

মানসী মর্মাহতা হল। দেবী দর্শন হল না আমাদের। মন্দির বন্ধ। প্রভাতী পূজা শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। মধ্যাহ্ন পূজার সময় আবার মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হবে। শুনেছি ত্রিভুজাকৃতি পাথরে খোদাই ছোট একটা দেবীমূর্তি আছে ভেতরে।

দেবী দর্শন না হলেও দেব দর্শন হল। ভগবতী মন্দিরের পেছনে শিবমন্দির। আমরা শিবমন্দিরে এলাম। মূল বিগ্রহ লিঙ্গমূর্তি। পাশে রয়েছে পাথরের নয়নাভিরাম মহাদেব মূর্তি। মানসী খুশি হল। শিব কুমারী মেয়েদের পরমারাধ্য। সে ভক্তিভরে প্রণাম করে তার আরাধ্যকে। আমিও মাথা নত করি।

পাশাপাশি দুটি মন্দির কিন্তু গড়ন আলাদা। একটি স্থানীয় ছাঁচে—কুলু স্থাপত্যে, আরেকটি প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। অথচ দুটি মন্দিরই নির্মাণ করিয়াছেন কুলুরাজ জগৎ সিং। হয়তো তাই কৃতজ্ঞ জনসাধারণ এই জনপদের নাম রাখেন জগৎসুখ। সেই নামেই এই প্রাচীন নগরী আজ সর্বত্র পরিচিত। তখন কিন্তু এখানে রাজধানী ছিল না। অনেক আগেই রাজধানী স্থানান্তারিত হয়েছিল নাগরে।

জগৎসুখের প্রাচীন নাম ছিল নাস্‌ত। সিধ সিং বাদাপ্‌ফী নামে সমতলের জনৈক সেনানায়ক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই জনপদ অধিকার করে নিজেকে রাজাবলে ঘোষণা করেন। তখন বিপাশার বাঁ তীরে এবং লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা ছিল তিব্বতী সর্দারদের করতলগত। এদের মধ্যে পিট্রি ঠাকুর ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। আর বিপাশার ডান তীরে বর্তমান মানালী সহ অধিকাংশ কুলু উপত্যকা ছিল রাজপুত রাজা সিন্না রাণার অধীনে।

পিট্রি ঠাকুরের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি আছে। মনুষ্যদুগ্ধ ছাড়া তাঁর তৃষ্ণা মিটত না। তিনি নাকি নরবলি দিতেন। তাহলেও সিন্না রাণার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল। রাণা তাঁরই হাতে লাহুল উপত্যকার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন।

সিধ সিং তিব্বতীয় সর্দারদের একে একে বিপাশার বামতীর থেকে তাড়াতে থাকলেন। তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত হতে লাগল। অবশেষে তাঁর প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন সিন্না রাণা। কিন্তু মন্দার কোট দুর্গ অধিকার করার মতো শক্তি ছিল না সিধ-সিং-য়ের। তাই তিনি একজন গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করলেন। একদিন সিন্না রাণা যখন বশিষ্ঠকুণ্ডের কাছে ক্ষেত পরিদর্শন করছিলেন, তখন সেই গুপ্তঘাতক দূর থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। রাণার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পুরনারীরা মন্দার কোট দুর্গে জহরব্রত পালন করলেন। সিধ সিং-য়ের রাজ্যসীমা বিপাশার বামতীর থেকে দক্ষিণতীরে প্রসারিত হল। তিনি অনায়াসে নিজেকে কুলু উপত্যকার রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

সেই থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাড়ে তিনশ' বছরের অধিককাল, তাঁর বংশধরগণ কুলু উপত্যকায় রাজত্ব করেছেন। কাজেই এই জগৎসুখই বাদানী রাজত্বের সূতিকাগার। পরে অবশ্য এখান থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় নাগরে, সেখান থেকে সুলতানপুর অর্থাৎ কুলুতে।

কিন্তু নাগর বা কুলুর কথা এখন থাক। এখন জগৎসুখের কথা ভাবা যাক। যতটুকু সময় হাতে আছে তারই মধ্যে দেখে নিই চারিদিক।

মন্দিরের পেছনে স্কুল। সামনে একফালি মাঠ। মাঠে কয়েকটি বড় বড় গাছ। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা খেলা করছিল গাছের ছায়ায়। আমাদের দেখে তাদের খেলা বন্ধ হয়ে গেল। চারদিক থেকে তারা এসে ঘিরে ধরল আমাদের। না, আমাকে নয় মানসীকে। তাদের আনন্দ আর ধরে না। আমরা এসেছি তাদের গাঁয়ে। গাঁয়ের গল্প করে ওরা। বলে—এখান থেকে মাত্র মাইলখানেক ওপরে অর্জুন গুম্ফা। মাস্টারজীকে বললে, ওরা আমাদের নিয়ে যেতে পারে সেখানে। ওরা মানসীর হাত ধরে। তাকে নিয়ে যেতে চায় মাস্টারজীর কাছে।

বাসের হর্ণ আসে ভেসে। ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সমাগত। কিন্তু মানসী ওদের বলতে পারে না সে কথা। সে চুপ করে আছে।

আমি বলি, "আমরা তো অর্জুন গুম্ফায় যেতে পারব না।"

"না, না, যেতেই হবে। আমরা নিয়ে যাব আপনাদের।" ওরা সমবেত স্বরে দাবী জানায়।

মানসী বল্লে, "আমরা নাগরের বাসযাত্রী। বাস ছাড়বে এখুনি। আবার যদি কখনও এখানে আসি, নিশ্চয়ই তোমাদের নিয়ে অর্জুন গুম্ফায় যাব।"

"আসবেন তো আবার?" ওরা জিজ্ঞেস করে।

মানসী মাথা নাড়ে। মিথ্যা অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে ওঠে মানুষের জীবনে।

ওরা আমাদের সঙ্গে আসে। আমরা বাসে উঠি। ওরা দাঁড়িয়ে আছে করুণ নয়নে। যেন কতো কালের প্রিয়জনকে চিরকালের তরে বিদায় দিচ্ছে। মানসী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বাস চলতে শুরু করে। নাগরের বাস। আমরা মানালী থেকে নাগর চলেছি।

বাস চলেছে এগিয়ে। পেরিয়ে এলাম খাটনল নালা। ছোট একটি জলধারা। বনের ভেতর দিয়ে পথ। বাঁ দিকের পাহাড় বনময়, ডান দিকে পথের নিচেও বন। বনের শেষে ক্ষেত। ক্ষেতের শেষে নদী। নদী নয়, কুলু উপত্যকার প্রাণধারা বিপাশা। বিপাশার রুপোলী রেখা বিলীন হয়েছে দিগন্তের কাছে, সেখানে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রেখা আকাশে মিশেছে। কালো নয়, সাদা পাহাড়। তুষারমৌলি হিমালয়—হিমতীর্থ হিমাচল।

হিমতীর্থ হিমাচলের কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম তাঁর পাহাড় পথ আর পথচারীদের কথা। একটা গাছের ছায়ায় এসে বাস থেমেছে। গাছের গোড়ায় পাথরের মূর্তি—গাঁয়ের দেবতা। গাঁয়ের নাম সরসী। পথের ধারে বাড়ি-ঘর ও ক্ষেত। রামদানা ভুট্টা ও ধানক্ষেত।

ভাবনা ভঙ্গ হয়। চোখ ফিরিয়ে নিই। তাকাই আমার পাশে, মানসীর দিকে। মানসী জিজ্ঞেস করছে, "কি ভাবছেন এতো?"

"তেমন মূল্যবান কিছু নয়।" উত্তর দিই।

"তাহলে চুপ করে না থেকে, আমার সঙ্গে কথা বলুন।"

"কি কথা?"

"যা ইচ্ছে।"

"কত কথা তো বললাম পরশু থেকে।"

"কিন্তু কথা তো ফুরিয়ে যায় নি। কথার যে শেষ নেই।" মানসী আমার দিকে তাকায়।

ওর চোখে চোখ পড়ে আমার। মানসী তাকিয়ে থাকে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। বলি, "অন্তহীন কথার ফুল ফুটিয়ে কি হবে?"

"ফুলে যে মধু থাকে।"

"সব মধু তো মধুকরীর কাজে লাগে না।"

"তাতে ফুলের কি এসে যায় ? সে নিজের তাগিদেই বিকশিত হয়। মধুময়ী হয়েই তার আনন্দ, মধু বিতরণ করে নয়।"

"বেশ তবে তাই হোক।" আমি সন্ধি করি, "আমি কথার ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছি, আপনি যদি নাও শোনেন, দুঃখ করব না।"

"আপনার আশঙ্কা অমূলক। আমার মতো নিষ্ঠাবতী শ্রোতা আপনি এর আগে পান নি।"

"আশ্বস্ত হলাম।" আমি বলতে থাকি। আমার কথা নয়, হিমতীর্থ হিমাচলের কথা—

"কুল উপত্যকার ইতিহাস চাম্বার মতো নয়। চাম্বায় একই রাজবংশ প্রায় দেড় হাজার বছর রাজত্ব করেছে। চাম্বা তেমন বাইরের আক্রমণের সম্মুখীন হয় নি। বাইরের কোন শক্তি কখনই চাম্বাকে অধিকার করে রাখতে পারে নি। কিন্তু কুলু ও লাহুল উপত্যকা বার বার বাইরের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। এখানকার জনসাধারণ বহু বিদেশী শাসকের কাছে মাথা নত করেছে। এর কারণ কুলুর অবস্থান, কারণ কুলুর সম্পদ। সমতলের আর্যরা কুলুর পথে পেতে চেয়েছে পশম লবণ ও সোহাগা—মধ্য এশিয়ার অমূল্য সম্পদ। ক্ষুধার্ত তিব্বতী ও মঙ্গোলীয়রা চেয়েছে কলুর শস্য, লাহুলের বার্লি। তাই তারা বার বার হানা দিয়েছে এ উপত্যকায়।

"ছোট ছোট দলের লুঠ-তরাজ সংখ্যাতীত। সেগুলির হিসেব নেই। তবে তিনটি বড় আক্রমণ হয়েছে কুলু উপত্যকায়। প্রথমটি ১১২৫ থেকে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময় কুলু সম্ভবতঃ লাদাখ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কুলুর শাসক লাদাখের রাজাকে কর দিতেন। দ্বিতীয়বার এই উপত্যকা আক্রান্ত হয় ১৪৪০ থেকে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সেবারে কাশ্মীরের এক বৌদ্ধ সেনাবাহিনী কুলু নগরী অধিকার করে নেয়। তৃতীয়বার কুলু আক্রান্ত হয় ১৫৩০ থেকে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের মাঝে কোন সময়ে।"

"শুনেছি একবার নাকি গদ্দিরা মন্দারকোট দুর্গ আক্রমণ করেছিল ?" আমি থামতেই মানসী প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, সেটি কোন বড় আক্রমণ নয়, তাহলেও উল্লেখযোগ কারণ চাম্বা জেলার শান্ত-শিষ্ট উপজাতি সমূহের অন্যতম হচ্ছে গদ্দি। এরা মেষপালন করে জীবিকা অর্জন করে। বছরের ন'মাস হিমালয়ের পথে পথে কাটায়। কখনও কারও সঙ্গে কলহ করে না। এরা অতিশয় অতিথি বৎসল। অথচ তারাই কোন কারণে সিন্না রাণার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দারকোট দুর্গ আক্রমণ করেছিল। সিন্না রাণা বহু কষ্টে সেবারে দুর্গ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

একটি পাহাড়ী নদীর ধারে এসে আমাদের বাস থামে। দুজন যাত্রী নেমে যান বাস থেকে। নদীতীরের হাঁটা পথটি বেয়ে তাঁরা চলতে শুরু করেন। বাস এগিয়ে চলে নাগরের পথে। মানসী কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞেস করে, "ওরা কোথায় গেলেন ?"

"মালানা।" কণ্ডাক্টার উত্তর দেয়।

"মালানা তো শুনেছি মণিকরণ পথের জারীগ্রাম থেকে যায়।" মানসী বলে।

"সেখান থেকে যায়, এখান থেকেও যাওয়া যায়। আরও পথ আছে।"

আমি বলি, "যাবেন নাকি সেই বিচিত্র গ্রামে ? যে গ্রামবাসীরা কুলু উপত্যকার এতো কাছে বাস করেও এক পৃথক ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক।"

"যেতে তো চাই, কিন্তু নিয়ে যায় কে ?"

"একা পথে বেরিয়ে তো পথের সাথীর প্রত্যাশা করা ঠিক নয়।"

"পথ যেখানে দুস্তর, সেখানে যে সাথীহারা হয়ে পথ চলতে এখনও শিখি নি। যদি কোনদিন সে শিক্ষা অর্জন করতে পারি, সেদিন আর সাথীর প্রত্যাশা করব না।"

আমি আর কোন কথা বলি না। কি বলব ? চুপ করে থাকি। চেয়ে চেয়ে হিমাচলকে দেখি।

লোকালয় শুরু হয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। পথের ধারে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট ও মন্দির। শহরের এ অংশটা মোটামুটি সমতল। এর পরেই পাহাড়—পাহাড়ের ওপর সুন্দর সুন্দর বাড়ি, শৈলবাসে যেমন হয়।

শৈলবাস ? হ্যাঁ, শৈলাবাস বৈ কি। স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় শৈলাবাস। নইলে সেকালের রাজারাই বা এখানে রাজধানী নির্মাণ করবেন কেন আর একালের শিল্পীরাই বা এখানে আসবেন কেন ? বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র স্বোয়েৎলভ নাগরকেই তাঁদের সাধনপীঠ রূপে নির্বাচিত করেছিলেন।

নিকোলাস রোয়েরিক ছিলেন স্বপনচারী শিল্পী। নিঃসন্দেহে তিনি বিগত যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। হাজার হাজার ছবি তিনি এঁকেছেন—প্রত্যেকখানি অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু তিনি তো কেবল চিত্রকর ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবি, চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তিনি ছিলেন বিশ্ব-নাগরিক, সে কালের এক বিস্ময়কর প্রতিভা।

ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন, 'One of the greatest intuitive minds of the age.'

অথচ আশ্চর্য! এই মহান মানুষটিকে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময় পালিয়ে আসতে হয়েছিল এদেশে। তাঁর অপরাধ তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অসংখ্য চিত্রের ন্যায়, বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন। আধুনিক শহর সভ্যতার বাইরে নাগরের নিভৃতকুঞ্জে বাস করেও তিনি কখনও আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন নি। প্রত্যেক প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

বিস্ময়কর প্রতিভার মতো অসাধারণ কর্মদক্ষতার অধিকারী ছিলেন তিনি। ছোট বড় প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর সমান নজর ছিল। হিমালয়ের কোন বিখ্যাত বিশাল চিত্র কিংবা অখ্যাত কোন বিদ্যালয় পত্রিকার জন্য ছোট একটি বাণী রচনার সময় তিনি সমান মনোযোগী হতেন।

নিকোলাস রোয়েরিক আধুনিক কালের মানুষ হয়েও ছিলেন সেকালের ঋষি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পরমভক্ত ছিলেন তিনি। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি ভালবেসেছিলেন ভারতভূমিকে আর ভারতের মানুষকে। বলেছিলেন, 'Oh, Bharata the Beautiful ! Let me send Thee my heartfelt admiration for all the greatness and inspiration which fill Thy ancient wisdom, for glorious Cities and Temples, Thy Meadows, Thy Deobans, Thy sacred Rivers and Majestic Himalayas!'

সমতল পথটুকু ফুরিয়ে গেল। আমাদের বাস পাহাড়ে উঠছে। খানিকটা ওপরে উঠে আবার সমতল। সেখানেই বাস থামল। আমরা নাগর রাজপ্রাসাদের সামনে পৌঁছে গেছি। প্রসাদের সামনে পরিচিতি—

NAGGAR CASTLE & REST HOUSE

সেকালের সেনানিবাস একালের পান্থশালা। কেবল সেনানিবাস নয়, রাজভবনও বটে। সামনের অংশে ছিল সেনানিবাস, পেছনে প্রাসাদ। ষাটজন রাজা বাস করেছেন এখানে। তবে ঠিক এ প্রাসাদে নয়। প্রাচীন সেই প্রাসাদ ভেঙে নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন রাজা

জগৎ সিং। অথচ তিনিই পরে এখান থেকে কুলুতে রাজধানী নিয়ে যান।

১৮৪০ সালে বৃটিশ শাসক ক্যাপ্টেন 'হে' শিখদের কাছ থেকে এই প্রাসাদ গ্রহণ করে এর প্রভূত সংস্কার সাধন করেন। তারপরে কিছুকাল এটি এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নিবাস ছিল। এখন সেই রাজভবন হয়েছে পর্যটকদের বিশ্রাম-ভবন। পথের মানুষকে প্রাসাদে বাস করার সুযোগদানের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

মানসী তাগিদ দেয়, "বসে আছেন কেন, এখানেই যে নামতে হবে আমাদের।"

"ও! হ্যাঁ।" আমি উঠে দাঁড়াই।

"আপনি বড় অন্যমনস্ক।"

"অন্যগত নই তো।"

মানসী মৃদু হাসে, "বলতে পারি না, আরও দেখতে হবে।"

আমরা বাস থেকে নেমে আসি। এগিয়ে চলি প্রাসাদের দিকে। একজন মধ্যবয়সী লোক এসে সেলাম করে। বলে, "আমি এখানকার চৌকিদার, আপনাদের সেবক।"

"কি ভাবে সেবা করবে?" জিজ্ঞেস করি।

সে জবাব দেয়, "এখানে বিশ্রাম করবেন, খানা খাবেন।"

"তোমার এখানে জল পাওয়া যাবে তো? আমরা স্নান করব।" মানসী বলে।

"জী, মেমসাব।" চৌকিদার জবাব দেয়।

"বাথরুম আছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"জী, সাব।"

ঘড়ির দিকে তাকাই। মানালী থেকে নাগর আসতে দু ঘণ্টা লেগেছে। মানসীকে বলি, "আপনি কি এখুনি স্নান করতে চান নকি?"

"এখন না করলে আর কখন করব? বেলা যে বারোটা বাজে।"

"কিন্তু এখন আপনি বাথরুমে ঢুকলে যে বেড়াবার বারোটা বাজবে। আমরা তো পূণ্যস্নান করতে নাগর আসি নি, বেড়াতে এসেছি।"

"তাহলে কি স্নান করা হবে না?" মানসী করুণ কণ্ঠে বলে।

"কেন হবে না, নিশ্চয় হবে। তবে এখন নয়, ফিরে এসে। এখন আমরা চা খেয়ে ঠাবা মন্দির ও রোয়েরিক আর্ট গ্যালারী দেখতে যাব। ফিরে এসে স্নান-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে মানালী রওনা হব।"

"বেশ, তাই হবে।" মানসী সম্মতি জানায়।

প্রাসাদ-তোরণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে বহুদিন খোলা হয় না। হয়তো বা আর কোনদিন খোলা হবে না। চিরবুদ্ধ হয়ে গেছে নাগরের প্রাসাদ-তোরণ। বিশ্রাম ভবনে প্রবেশের জন্য সুবিরাট তোরণের কোন প্রয়োজন নেই, তার জন্য ভাঙ্গা দেয়ালের এই ক্ষুদ্র অংশটুকুই যথেষ্ট।

আমরা প্রাসাদে প্রবেশ করি। চারিদিকে অযত্নের আভায। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ যে কালের নিয়ম, যুগের ধর্ম। এই অভাবকে মেনে নিতে হবে।

বুঝতে পারছি প্রাসাদের এই অংশই সেকালে সেনানিবাস ছিল। মাঝখানে পাথর বাঁধানো, অঙ্গন, চারিদিকে সারি সারি ঘর—সামনে বারান্দা।

কল্পনা করি সেকালের কথা--এই পরিত্যক্ত নিবাস সর্বদা গমগম করত। কত রথী-মহারথীর পদধূলিতে প্রতিদিন ধন্য হত। তাঁরা আজ কোথায়? সবাই বিস্মৃতিতে বিলীন

হয়েছে। কিন্তু আজো আছে এই প্রাসাদ। হোক গে সে অভাবগ্রস্ত। তবু সে থাকবে আরও বহুকাল। আর এই পরিত্যক্ত প্রাসাদের পাথরে পাথরে সেদিনকার রথী-মহারথী ও রাজা-রাণীদের পরশ পাওয়া যাবে।

মানুষ মরে যায়, কিন্তু তার সৃষ্টি থাকে বেঁচে। সৃষ্টির মাঝেই বেঁচে থাকবে মানুষ। ধ্বংস নয়, সৃষ্টি। যুদ্ধ নয়, শান্তি।

কালো পাথরে নির্মিত নিবাস। সিমেন্ট জাতীয় কোন মশলা ব্যবহৃত হয় নি। কাঠের কড়িবরগা। দরজা-জানালার সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। জানালাগুলি খুবই ছোট এবং অনেকটা উঁচুতে স্থাপিত। মনে হচ্ছে দুর্গকে দুর্ভেদ্য করার জন্যই এ ব্যবস্থা।

এটি প্রাসাদের পেছন দিকে। আগে উত্তর দিক দিয়ে প্রধান প্রবেশ পথ ছিল। ছোট একটি পর্বতশীর্ষকে সুসমতল করে নির্মিত হয়েছে এই প্রাসাদ। প্রাসাদেব পূবদিকে বিপাশা। বিপাশার তীর থেকে এখানকার উচ্চতা প্রায় এক হাজার ফুট।

আমরা এগিয়ে চলি। প্রাসাদের পরবর্তী অংশে আসি। আবার তেমনি বাঁধানো অঙ্গন। ডানদিকে ছোট একটি দোতলা বাড়ি। এটি সেকালের সরাইখানা ছিল। তার পরেই সুবিরাট ও সুন্দর প্রাসাদ। আমরা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সোজা তিনতলায় উঠে এলাম। কাঠের মেঝে। মাঝে ডাইনিং হল, চারিপাশে বড় বড় ঘর। প্রতি ঘর মূল্যবান আসবাবে পরিপূর্ণ। বাড়ির তিনদিকে ঝুলানো বারান্দা—দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। দেখা যায় নাগর নগরী—বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার, পথ-পাহাড় আর বিয়াস—বিপাশা। বিয়াসের ধবলরেখা যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানেই শুরু হয়েছে হিমতীর্থ হিমাচল—রোতাং গিরিবর্ত্ম আর লাহুলের গিরিশ্রেণী। সবুজ সোনালী সাদা ও ধূসরের মেলা। চঞ্চল ও অচঞ্চলের অন্তহীন খেলা।

ভাবতে খারাপ লাগছে, এমন রমণীয় আবাসে বাস করব না আমরা। আজই চলে যাব এখান থেকে।

তবু মানসী ঘুরে ঘুরে ঘরগুলি দেখে, পরীক্ষা করে, ভাল-মন্দ বিচার করে। একখানি ঘর দেখিয়ে বলে, "আমি এখানে বিশ্রাম করব। আপনি ?"

"ডাইনিং হলে।"

"এমন সুন্দর সুন্দর ঘর থাকতে ডাইনিং হল !"

"হ্যাঁ, আমার কাছে এ প্রাসাদ যে পান্থশালা ছাড়া কিছুই নয়।"

"আপনি মশাই বড্ড বে-রসিক। কেমন করে বইগুলো লিখলেন বুঝতে পারি না।"

"কেন, আর কেউ আমার হয়ে লিখে দিয়েছে।"

"তাই হবে।" মানসী হাসতে হাসতে বলে।

চৌকিদার চা ও পকোড়া নিয়ে আসে। কথায় কথায় বলে, "আজ এখানে থেকে যান না।"

"কেমন করে থাকি, বিছানা-পত্র আনি নি যে ?" মানসী উত্তর দেয়।

"গদি চাদর আর বালিশ তো প্রতি খাটেই রয়েছে। কম্বল আমি যোগাড় করে দেব। অসুবিধে হবে না আপনাদের।"

"প্রস্তাবটা মন্দ নয় কিন্তু।" মানসী বাংলায় বলে।

"ভাল।" আমি বলি।

"তাহলে আসুন, আজ থেকে যাই এখানে। এমন চমৎকার বাড়ি। আর কেউ নেই।

শান্ত সুন্দর নির্জন নিবাস, চাঁদনী রাত। খুব এনজয় করা যাবে।"

"কিন্তু চৌকিদার আমাদের থাকতে দেবে কেমন করে? কুলুর সাবডিভিশনাল অফিসারের অনুমতি না হলে তো এখানে রাত্রিবাস করা যায় না।"

"সেটা চৌকিদারের ভাবনা। ওর ভাবনা ওকেই ভাবতে দিন না। সে যখন থাকতে বলছে, তখন সে-সব কথা ভেবেই বলেছে। আপনি থাকবেন কিনা বলুন?"

"না।"

"কেন? বে-আইনী হবে বলে?" মানসী তিক্তস্বরে বলে।

"না। প্রাণেশদের খবর পাব না বলে।"

লজ্জা পায় মানসী। "কথাটা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।" চৌকিদারকে হিন্দীতে বলে, "না ভাই, আমাদের আজই মানালী চলে যেতে হবে, জরুরী দরকার আছে।"

ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে আসি রাজপ্রাসাদ থেকে। আর রাজপ্রাসাদ নয়, বিশ্রাম-ভবন—সিভিল রেস্টহাউস। চার টাকা দিলেই একখানি ঘর পাওয়া যায় একদিনের জন্য।

আরও দুটি বিশ্রাম-ভবন আছে নাগরে। ফরেস্ট ও নির্মাণ-বিভাগের বিশ্রাম-ভবন।

বাসরাস্তা থেকে একটি প্রশস্ত পায়ে-চলা পথ আস্তে আস্তে উঠে গেছে ওপরে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। পথের পাশে আপেল ও পিচফলের গাছ। ফলে ফলে বোঝাই হয়ে আছে। মানসী বায়না ধরে, "দিন না কয়েকটা পেড়ে।"

"ফেরার পথে বাজার থেকে কিনে দেব।"

"আপনি বড্ড...."

"বে-রসিক।" সে শেষ করতে পারার আগেই আমি বলে ফেলি।

"সত্যি তাই।" জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যায় মানসী।

কাছেই একটি মন্দির রয়েছে কিন্তু সেটি না দেখে মানসী এগিয়ে চলে।

স্নিগ্ধ সুন্দর নির্জন পথ। মাঝে মাঝে ঝরণা। পাশের উঁচু জমি থেকে নেমে এসেছে। কল-কল ছল-ছল করে বয়ে চলেছে আপন পথে। কোথাও বা দু-এক ফালি ক্ষেত, কোথাও বা ঘন জঙ্গল। পথ সংকীর্ণতর হয়। আমরা পথ পরিবর্তন করি। ডানদিকে সরু একটি পথ উঠে গেছে। সেই চড়াই পথে এগিয়ে চলি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠি আসি বনাবৃত পাহাড়ের প্রশস্ত ও সমতল শিখরে। শিখর নয় সবুজ প্রান্তর। এখানে বন নেই। এটি নাগরের উচ্চতম স্থান। শহর আর উপত্যকাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

সমতল শিখরের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই মন্দির। দেয়াল-ঘেরা মন্দির। তোরণের সামনে পড়ে আছে কাঠের সুবিশাল একখানি রথ। রথের তিন দিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি খোদিত।

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেই পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ। ডান দিকে ভাণ্ডার, বাঁদিকে ধর্মশালা। সামনে তুলসীমঞ্চ তার পরে নাট-মন্দির। কাঠের দরজা, পাথরের দেয়াল, টালির ছাদ কিন্তু মাটির মেঝে। নাগরের টালির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য জায়গার মতো পাতলা স্লেটপাথরের ছোট ছোট টুকরো নয়, বেশ মোটা বড় বড় কালো পাথর। একখানির ওপর আর একখানি সাজিয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্গের ছাদও এইভাবে নির্মিত।

সুশীতল মন্দির। বাস থেকে নেমে বিশ্রাম না করে চড়া রোদে চড়াই ভেঙে এসেছি। স্বভাবতঃই শ্রান্ত বোধ করছি। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছি। পুরোহিতের

পরামর্শে একটু বসি নাট-মন্দিরে। শরীর শীতল হয়।

নাট-মন্দিরের পরেই মূল-মন্দির—স্থানীয় নাম ঠাবা মন্দির। পাথর ও কাঠের মন্দির। কাংড়া শিল্পের অনুকরণে নির্মিত। কাঠের দরজায় সুন্দর কারুকার্য।

গর্ভমন্দিরে শ্বেত পাথরের রাধা ও কালো পাথরের কৃষ্ণ মূর্তি। মূর্তি দুটি পাথরের বেদির ওপরে স্থাপিত। মাথার ওপরে রুপোর ছত্র।

মানসীর প্রশ্নের উত্তরে পুরোহিত বলেন, "পাঁচ হাজার বছরের পুরানো এ মন্দির।"

"পাঁচ হাজার!" বিস্মিতা মানসী বলে ওঠে।

"হ্যাঁ। পাণ্ডবেরা নির্মাণ করেছেন।" পুরোহিত প্রসাদ ও চরণামৃত বিতরণ করেন। ললাটে সিঁদুরের তিলক এঁকে দেন।

আমরা বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। নাট-মন্দির ও প্রাঙ্গণ পেরিয়ে প্রান্তরে আসি। উৎরাই বেয়ে জোর কদমে নিচে নামতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তার পৌঁছই। বিশ্রাম-ভবনের বিপরীত দিকে পাশাপাশি চলতে থাকি।

মসৃণ উৎরাই পথ দিয়ে, একটা ঝরণা পেরিয়ে আমরা ছোট একটি সমতল প্রান্তরে এলাম। প্রান্তরের মাঝে দুটি প্রাচীন মন্দির। অনেক লোকজন রয়েছেন। তাঁরা আসা-যাওয়া করছেন। তাঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করে মানসী, "এ মন্দির দুটির নাম কি?"

"মন্দির নয়, আশ্রম।" ভদ্রলোক উত্তর দেন। "যোগীঋষির আশ্রম ছিল এখানে। আর ঐ ওপরে যে মন্দিরটা দেখছেন, ওটাই হল গিয়ে সেই জারি মন্দির। ঐ মন্দির থেকে সুড়ঙ্গ-পথ ছিল মণিকরণের। যোগী সেই পথে প্রতিদিন মণিকরণের উষ্ণকুণ্ড থেকে স্নান করে আসতেন।"

"এখনও আছে নাকি পথটা?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"না।" ভদ্রলোক বলেন, "১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে।"

মানসী মূষড়ে পড়ে। একটু হেসে বলি, "সে সুড়ঙ্গ না থাকলেও, সে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে পারবেন আপনি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমরা কুলু থেকে মণিকরণ যাব।"

"জয় হোক আপনার।" মানসী উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

হেসে বলি, "একযাত্রায় পৃথক ফল হয় না। আমার জয় হলে আপনারও জয় অবশ্যম্ভাবী।"

"তাই তো অমন করে চেঁচিয়ে উঠলাম।"

প্রান্তরের পরে চড়াই পথ—পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠেছে। পথের ডানদিকে বনময় পাহাড়, বাঁদিকে উপত্যকা। অনেক দূরে বয়ে যাচ্ছে বিপাশা। বিপাশার তীরে তীরে সবুজ ক্ষেত। চারদিকেই সবুজের মেলা। সবুজ দেখে দেখে যেন আমার মনটাও সবুজ হয়ে গেছে।

প্রায় মাইলখানে বনপথ পেরিয়ে আমরা একটি বাগানে প্রবেশ করি। বাগান নয়, কুঞ্জবন। নানা ধরনের ফুলগাছ। ছোট বড় জানা-অজানা ফুলগাছ। গাছে গাছে রঙ্গীন ফুল। শুধু ফুল নয় ফলও আছে। বাড়ির চারিদিকে সারি সারি আপেল গাছ। রঙ্গীন আপেলের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে।

গেটের সামনেই পরিচয়লিপি—

ROERICH ART GALLERY

পথ ভুল করি নি আমরা। বাগানের পাথুরে পথ পেরিয়ে আমরা বাড়ির সামনে এলাম। এটাও বাগানেরই অংশ। তবে এখানে বড় গাছ কম। দৃষ্টি প্রসারিত হল আমাদের। নিচে নাগর উপত্যকা। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। সার্থক স্থান নির্বাচন। শিল্পীর সাধনপীঠের আদর্শস্থান। কোথায় রাশিয়া আর কোথায় ভারত। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন সংস্কৃতি। কিন্তু সমাজ ?

মানুষ ভিন্ন নয়। ভিন্ন নয় মানুষের মন, তার শিল্পচেতনা, তার প্রকৃতি-প্রেম। এপারে হিমালয়, ওপারেও হিমালয়। হিমালয় দুয়ের মাঝে যেমন বিভেদের প্রাচীর তুলেছে, তেমনি রচনা করেছে মিলনের সেতু। আমাদের মতো ওরাও হিমালয়কে ভালবাসেন। হিমালয়কে ভালবেসেছিলেন নিকোলাস রোয়েরিক। বলেছিলেন, 'Himalayas ! Here is the Abode of Rishis. Here resounded the sacred Flute of Krishna. Here thundered the blessed Goutama Buddha. Here originated all Vedas. Here lived Pandavas....Himalayas, Jewel of India. Himalayas Treasure of the world. Himalayas the sacred Symbol of Ascent.'

তাই তিনি দেশছাড়া হয়ে এসেছিলেন ভারতে, বাসা বেঁধেছিলেন নাগরে। জীবনের শেষ ঊনিষটি বছর কাটিয়ে গেছেন এই রমণীয় নিকেতনে। তিনি সাত হাজারেরও বেশি হিমালয়ের ছবি এঁকেছেন। হিমালয়কে অবলম্বন করে আর কোন শিল্পী আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর এবং এত বেশি ছবি আঁকতে পারেন নি। এই মহাপ্রাণ শিল্পী ১৯৪৮ সালে মহাপ্রয়াণ লাভ করেছেন।

তাঁর সুযোগ্য পুত্র শিল্পচার্য স্বোয়েৎলভ রোয়েরিক পিতার প্রদর্শিত পথেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনিও একজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী। তিনি চিত্রাভিনেত্রী দেবীকারাণীর দ্বিতীয় স্বামী। তাঁরা গ্রীষ্মের ছ'মাস এখানে থাকেন আর শীতের ছ'মাস বাঙ্গালোরে। সেখানে তাঁদের একটা 'এগ্রিকালচারাল ফার্ম' আছে।

রাশিয়ার মানুষ তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা স্বোয়েৎলভকে খুবই ভালোবাসেন। লেলিনগ্রাদের যে বাড়ি থেকে একদিন তাঁর পিতাকে পালিয়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছিল, এখন সেই বাড়ির নাম 'ঈশ্বর'। সেটি এখন নিকোলাস রোয়েরিকের স্মৃতিতীর্থরূপে সমাদৃত।

স্বোয়েৎলভ ও দেবীকারাণী এখন এখানে না থাকলেও তাঁরা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন কয়েকখানি অমরচিত্র। বলা বাহুল্য সেগুলি দেখতেই আমরা এখন এখানে এসেছি।

বাড়িখানি ছোট। শুনেছি এরই তিনখানি ঘরে আর্ট গ্যালারী। কিন্তু বাড়ি বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। হতাশায় ভরে ওঠে মন। এতদূর এসেও আর্ট গ্যালারী দেখা হল না আমাদের।

মানসী কিন্তু হতাশ হয় না। বলে, "আর্ট গ্যালারী না দেখে আমি নড়ছি না এখান থেকে।" সে বাড়ির পেছনে চলতে থাকে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

বাড়ির পেছনে কেয়ার-টেকারের কোয়ার্টার্স। মানসী হাজির হয় কোয়ার্টার্সের সামনে। কেয়ার-টেকাব বেরিয়ে আসেন। মানসী নমস্কার করে তাকে। সবিনয়ে বলে, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি।"

ভদ্রলোকের দয়া হয়। তিনি ভেতরে গিয়ে চাবি নিয়ে আসেন। আমরা তাঁর সঙ্গে আর্ট গ্যালারীর সামনে ফিরে আসি। রুদ্ধ দ্বার খুলে যায়। মনে মনে ধন্যবাদ দিই মানসীকে। তার আগ্রহেই আজ আমার নাগর আসা সার্থক হল।

সংখ্যায় বেশি নয়। প্রথম ঘরে ছখানি, দ্বিতীয় ঘরে চোদ্দখানি ও তৃতীয় ঘরে উনিশখানি—সব মিলিয়ে উনচল্লিশখানা ছবি। ছবি তো নয়, এ যে শিল্পসাধনার সর্বোত্তম সৃষ্টি। এ সৃষ্টি স্বর্গের চেয়ে সুন্দর মুক্তোর চেয়ে মূল্যবান আর মানুষকে করে তুলেছে মহীয়ান।

সার্থক হল আমার নাগর দর্শন। ধন্য হে তোমরা শিল্পী—পিতা ও পুত্র। প্রকৃতি-প্রেমিক রোয়েরিক, ভারত-প্রেমিক রোয়েরিক, হিমালয়-প্রেমিক রোয়েরিক, তোমাদের প্রণাম করি। আর প্রণাম করি ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতমা পথিকৃৎ বাংলার গৌরব স্বোয়েৎলভ জায়া দেবীকারাণীকে। *

---

* দুঃখের কথা কিছুদিন আগে দেবীকারানী অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছেন—

—অতীত দিনের বিশিষ্ট হিন্দি চিত্রাভিনেত্রী দেবিকারানি আর নেই। সামান্য রোগভোগের পব আজ এখানকার এক বেসরকাবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবলেন প্রয়াত বুশ চিত্রকর স্বোয়েৎলভ রোয়েরিখেব পত্নী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি।

ভারতীয় সিনেমার অস্কার, দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার প্রথম পেয়েছিলেন দেবিকা-ই। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে রুপোলি পর্দা আলোকিত করে রাখার পব, ফিল্ম সেন্সর বোর্ডেরও সদস্য হয়েছিলেন তিনি একাধিকবার। ১৯৪৫ সালে বিখ্যাত-বুশ শিল্পী রোয়েরিখের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর বাঙ্গালোরের শহরতলি এলাকায় বিস্তীর্ণ টাটাগুনি এস্টেট-ই হয়ে ওঠে একাধারে তাঁর বাসস্থান ও কর্মস্থল। শিল্প, সংস্কৃতির জগতে ডুবে গিয়ে রোযেরিখ ও দেবিকা কর্নাটক চিত্রকলা পরিষদকে দেশের এক অগ্রগণ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। সম্প্রতি, দেবিকা রানির নামে একটি প্রেক্ষাগৃহ তৈরির উদ্যোগ নেয় এই পরিষদ। শিল্প ও চলচ্চিত্রের বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের নানা কাজে উজ্জ্বল দেবিকারানির নাম।

দেবিকারানির জন্ম ১৯০৮ সালের ৩০ মার্চ। অল্প বয়েসেই চলচ্চিত্রকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। প্রথম স্বামী হিমাংশু রায়ের গড়ে তোলা বোম্বে টকিজ-এর অংশীদার ছিলেন দেবিকা। হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর অভিনয়-জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়ে প্রযোজনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন দেবিকা। পুনর্মিলন,কঙ্গন, বন্ধন, ভাবি, বসন্ত, কিসমত ও হামারি বাত তাঁরই প্রযোজিত ছবি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের একেবারে প্রথম যুগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'পদ্মশ্রী' দেবিকারানির নাম। সমাজের অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়েও তখনকার দিনে যে সব তরুণী বা যুবতী ফিল্মি দুনিযায প্রথম পা ফেলেন, দেবিকা তাঁদের অন্যতম। 'অচ্ছুৎকন্যা'র মতো সাড়া জাগানো ছবিতে দেবিকারানির অভিনয় চিরকাল মনে রাখবেন চলচ্চিত্রপ্রেমীরা। ইজ্জত, জীবন প্রভাত, বচন, নির্মলা ইত্যাদি ছবিতে নায়িকা দেবিকার অভিনয় ভোলার নয়।

ঠিক এই দিকটির কথাই উল্লেখ করে এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, চলচ্চিত্রে ভারতীয় রমণীর যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন দেবিকারানি, তার তাৎপর্য অনিঃশেষ।

দেবিকারানিকে 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের পিতামহী' আখ্যা দিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, অভিনেত্রী পাওয়া যে সময় দুষ্কর ছিল, তখনই ভারতীয় মেয়েদের পথ দেখিয়েছিলেন তিনি।

সাত

বেলা দুটোর সময় আমরা নাগর সিভিল রেস্টহাউসের ফিরে এলাম। চৌকিদার সেলাম করে। বলে, "খানা রেডী। বৈঠ যাইয়ে।"

মানসী আপত্তি করে, "একটু দেরি হবে বসতে। তুমি দুটো বাথরুমে জলের ব্যবস্থা করে দাও। খানা গরম রাখো।"

চৌকিদার সেলাম করে চলে যায়। আমরা বিশ্রাম-ভবনে প্রবেশ করি। না, আর কোন দর্শনার্থী আসে নি। রাজপ্রাসাদে আমরা একা।

বাধ্য হয়ে আমাকেও স্নান করে নিতে হয়। অবশ্য স্নান সেরে মানসীকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই। নাগর ৪১০০ ফুট উঁচু হলেও চড়া রোদ উঠেছে। এতক্ষণ রোদে ঘুরে গরম লাগছিল। স্নান করে আরাম বোধ করছি।

ডাইনিং হলে এসে একখানি ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিই। চৌকিদার খাবার নিয়ে আসে। মানসীর এখনও স্নান হয় নি। হবার কথাও নয়।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মানসী আসে। সে কচি-কলাপাতা রঙয়ের একখানি শাড়ি ও রঙ মিলিয়ে জামা পরেছে। এ রঙটা আমার বড় ভাল লাগে। ভাল লাগে মানসীকে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

মানসী একটু হাসে। বলে,"অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন ? আসুন, খেতে বসা যাক। বড্ড খিদে পেয়েছে।"

আমি নিঃশব্দে এসে ডাইনিং টেবিলে বসি। চৌকিদার খাবার দেয়। আমরা খেতে শুরু করি। কেন যেন মানসীও কোন কথা বলছে না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। চৌকিদারই বা কি ভাবছে। কিন্তু কি বলব ? অনেক ভেবেও বলার মতো আর কোন কথা খুঁজে পাই না। বলি, "এ শাড়িটা তো আর কখনও পরতে দেখি নি।"

মানসী মুখ তোলে। বলে, "আজ আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে।"

"কেন ?"

"আমার দিকে না হলেও অন্তত আমার শাড়ির দিকে নজর পড়েছে।"

"আপনার দিকে নজর দিই না, এ কথাটি কে বলল আপনাকে ?"

"এ সব কথা কারও কাছ থেকে শুনতে হয় না, আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি।"

"বোঝার মাঝে তো ভুল-বোঝারও একটা স্থান আছে।" আমি মানসীর দিকে তাকাই।

"ভুল বোঝা-বুঝির সম্পর্ক তো নয় আমাদের।" একবার থামে মানসী। সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী স্বরে বলে, "আমার দিকে আপনার নজর নেই বলেই আমি এমনভাবে আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জোর করে নজর দেবার চেষ্টা করবেন না যেন, তাহলে বান্ধবী-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।"

মানসী কি সাবধান করছে আমাকে ? ঠিক বুঝতে পারি না। আর কোন কথা না বলে খেয়ে যেতে থাকি।

খাওয়া শেষে মানসী বলে, "আমি চলে যাচ্ছি আমার ঘরে, আপনি কোথায় বিশ্রাম করবেন ?"

আমি ইশারায় ডেক-চেয়ারটা দেখিয়ে দিই। মানসী বেরিয়ে যায় ডাইনিং হল থেকে। আমি মুখ ধুয়ে এসে ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিই। কেবল তিনটে বেজেছে। প্রায় ঘণ্টা

দুয়েক বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

ঘুম ভেঙে যায়। কেউ ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে। চোখ মেলে তাকাই। মানসী। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি—এ যে মোটে চারটে। এখনই ডাকাডাকি করছে কেন? উঠে বসি। ওর দিকে তাকাই। সে বলে, "একবার বারান্দায় আসুন না।"

আবার জানি কি খেয়াল চেপেছে। প্রতিবাদ বা প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। একবার যখন খেয়াল হয়েছে, তা মেটাতেই হবে। উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "চলুন।"

মানসীর সঙ্গে বেরিয়ে আসি বারান্দায়। বাইরের দিকে হাত ইশারা করে মানসী বলে, "ঐ দেখুন।"

কি দেখব? পাহাড় প্রান্তর না নদী?

মানসী বোধ হয় বুঝতে পারে আমার দৃষ্টির অসারতা। সে বলে, "ঐ দেখুন বিশ্রাম-ভবনের পাঁচিলের পেছনে গাছে গাছে কেমন আপেল ধরে আছে।"

হায় হরি, আপেলের রাজ্যে বসে আপেল দেখাবার জন্য মানসী আমার এমন মৌ-ঘুমটা মাটি করে দিলে। বিরক্তি বোধ করি। বলি, "এ আবার একটা দেখার মতো কি হল?"

আমার কণ্ঠস্বরে মানসী বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়। একটা ঢোক গিলে বলে, "না মানে, আপেলগুলি চমৎকার, কেমন রঙ দেখছেন না। আমার থলিটা খালি করে দিচ্ছি, নিয়ে আসুন না কয়েকটা।"

"কার না কার গাছ, একটা বিপত্তি ঘটবে। বিদেশে এসে...."

"আপনি বড্ড ভীতু। কি আবার বিপত্তি ঘটবে? কেউ যদি একান্তই দেখে ফেলে, দাম দিয়ে দেব। তবে কেউ দেখবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি এখানে, কোন লোক আসে না এদিকে।"

আশ্চর্য! এত বেছে ঘুমের ঘর পছন্দ করে না ঘুমিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপেলের সৌন্দর্য দর্শন করেছিল মানসী! কিন্তু এমন আপেল বোঝাই গাছ তো ছড়িয়ে আছে কুলু উপত্যকার সর্বত্র! বলি, "কি দরকার না বলে-কয়ে পরের গাছ থেকে আপেল নেবার। তার চেয়ে বাজার থেকে কিনে নিলে হয় না।"

"না।" মানসী যেন গর্জে ওঠে, "হয় না। চুরি করে খাওয়া আর কিনে খাওয়া এক জিনিস নয়।"

"কিন্তু চুরি করলে যে মার খেতে হয়, জেল খাটতে হয়, সেটা তো আপনার অজানা নয়।"

মানসী যেন অবাক হয়। বলে, "আচ্ছা আপনি একটা কি বলুন তো? আমার মতো একজন বান্ধবীকে খুশি করতে আপনি এতটুকু ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। পৌরাণিক কাহিনীগুলো কি বৃথাই পড়েছেন?"

হাসি পায় আমার। আমি হেসে ফেলি।

"হাসবেন না তো অমন করে। আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।" মানসী রেগে গেছে। "বেশ আপনি যখন যাবেন না, আমিই যাচ্ছি। দয়া করে এখানে একটু দাঁড়াতে পারবেন কি? পারলে একটু দাঁড়ান। কোন লোক এদিকে এলে জোরে জোরে গান গেয়ে উঠবেন।"

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মানসী চলে যায় ভেতরে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি বারান্দায়।

একটু বাদে সে খালি থলি হাতে ফিরে আসে। আমি তার কাছে এগিয়ে হাত বাড়াই,

"থলিটা দিন আমাকে।"

"সুমতি হয়েছে তাহলে।"

"না হয়ে উপায় কি ? এক তো আমি থাকতে আপনি যাবেন আপেল চুরি করতে, লোকে শুনলে বলবে কি ?"

"আর ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"গান গাওয়ার চেয়ে চুরি করা অনেক সহজ।"

মানসী হেসে দেয়। আমিও হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচের তলায়। ঘাস আর ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে প্রাচীরের কাছে পৌঁছই। পুরনো প্রাচীর। মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। ভাঙা দেয়ালের ভেতর দিয়ে বাইরে আসি। বাইরে ঘন-জঙ্গল—কাঁটা আর বিছুটি গাছের জঙ্গল। পাহাড়টা খাড়া নেমে গেছে, কিন্তু জঙ্গলের জন্য বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কোন্‌খানে পা দিলে নিরাপদ। মায়াময়ী প্রকৃতি। এই জঙ্গলের ভেতরে সোনালী আপেল সাজিয়ে রেখে আকর্ষণ করেছে মানসীকে। সে যে জানে মানসী আধুনিকা হলেও মানবী, ইভের উত্তর-সাধিকা।

অনুমানে পা ফেলতে হচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই গড়িয়ে পড়ব বহু নিচে। কাঁটা গাছে পা ছড়ে যাচ্ছে। বিছুটির ঘষায় গা জ্বালা করছে। তবুও আমাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে সোনালী আপেলের দিকে। সোনা সোনালী হয়েছে। আমি আদমের প্রতিনিধি। আমাকে আপেল আনতেই হবে। আমার এ শাস্তি জন্মগত।

অনেক কাঁটার খোঁচা আর বিছুটির জ্বালা সহ্য করে, একাধিকবার আছাড় খেয়ে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম সেই সোনালী আপেল গাছের নিচে। না, মানসীর চোখ আছে বলতে হবে। সত্যি সোনা—যেমনি বড়, তেমনি পাকা। হাত বাড়ালেই ধরা যায়। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে থলি বোঝাই করতে থাকি। অনেক নিচে বিপাশার তীরে বাড়ি-ঘর ও ছোট একটি মন্দির। লোকজন চলাফেরা করছে। ওরা আবার না দেখে ফেলে। ওপরের জন্য চিন্তা করি না। ওপরে মানসী আছে। কেউ এলে সে গান গেয়ে উঠবে।

থলি বোঝাই হয়ে গেছে—কাজ শেষ। ওপরের দিকে তাকাই। কি সর্বনাশ ! তাড়াতাড়ি বসে পড়ি ঝোপের আড়ালে। সাপ কিংবা পোকা-মাকড় আছে কিনা, কে জানে। রোদে তেতে উঠেছে চারিদিক। কিন্তু না লুকিয়েই বা উপায় কি ? মানসীর পাশে চৌকিদার দাঁড়িয়ে। কিন্তু মানসী গান গাইছে না কেন ?

কতক্ষণ বসে আছি ঠিক খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি দূরের ঝোপ-ঝাড় নড়ছে। চৌকিদার ! জঙ্গল ঠেলে এদিকে আসছে। লোকটা তো সাংঘাতিক। হাতে-নাতে ধরবার জন্য একেবারে এ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। পালাবার যখন পথ নেই, তখন ধরা দেওয়াই ভাল। আমি উঠে দাঁড়াই।

"না, না, সাহেব পড়ে যান নি মেমসাব। ঐ তো ওখানে রয়েছেন। আপনি আর এদিকে আসবেন না।"

তাই তো। দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে আছে মানসী। আমি ঝোপের আড়ালে বসে পড়ায় ওরা ভেবেছে আমি হয়তো বা পড়ে গেছি নিচে। যাক চৌকিদার তাহলে চোর ধরতে আসে নি।

কাছে এসে আমার কাঁধ থেকে থলিটা হাতে নেয় চৌকিদার। তারপরে বলে, "চলুন সাব। ছিঃ ছিঃ, আপনার কি জরুরত ছিল এই ঝকমারি করার। আমাকে বললেই তো আমি এ আপেল পেড়ে দিতাম।"

চা খেয়ে চৌকিদারের পাওয়া মিটিয়ে বেরিয়ে আসি নাগর রাজপ্রাসাদ থেকে। চৌকিদার সঙ্গে আসে রাস্তা পর্যন্ত। দু' হাত জোড় করে নমস্কার জানায়। কতক্ষণেরই বা পরিচয়। তবু মায়া হচ্ছে লোকটির জন্য। সামান্য সম্বল, তবু সাধ্যমতো সেবা করেছে আমাদের। দুঃখ হচ্ছে ভেবে—ওর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না।

মানসীর মনটাও ভিজে উঠেছে। সে জিজ্ঞেস করে, "ওকে কিছু বকশিশ দিয়েছেন ?"

"ঠিক বকশিশ বলে কিছু দিই নি। তবে বেশি দিয়েছি।" আমি উত্তর দিই।

"কত দিয়েছেন ?"

"দশ টাকা।"

"আর পাঁচটা টাকা দেব ?"

"ইচ্ছে হলে দিন। ওকে দিলে তো আর অপব্যয় হবে না।"

খুশি হয় মানসী। ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার একখানি নোট চৌকিদারের হাতে দেয়। আবার সেলাম করে কৃতজ্ঞ চৌকিদার। আমরা এগিয়ে চলি নিজেদের পথে। চৌকিদার দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচ টাকার নোটটি হাতে নিয়ে।

চড়াই ভেঙে আমাদের বাস এসে দাঁড়িয়েছিল রাজপ্রাসাদের সামনে। এখানে খানিকটা জয়গা সমতল। তার পরেই পথটি নেমে গেছে নিচে। সেই উৎরাই পথে চলি এগিয়ে। পথের দু দিকেই বড় বড় গাছ। নির্জন মসৃণ পথ।

কিছুক্ষণ বাদে আমরা নেমে এলাম সমতলে। তার মানে বিপাশার বেলাভূমিতে নেমে এসেছি। এক সময় পেরিয়ে এলাম বিপাশার পুল। তার পরেও পথ তেমনি ছায়াশীতল। বরং আরও শান্ত, আরও সুন্দর। যতদূর দেখা যায় আঁকাবাঁকা জনহীন পথটি গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে নি। ঘুমোতে পারে নি। সে শুয়ে শুয়ে গান শুনছে। যৌবনের গান—ঝরণার কলতান। পথের পাশে পাশে কল-কল ছল-ছল করে একটি ঝরণা যাচ্ছে বয়ে।

আমরা দুজনে চলেছি সেই পথে। নিঃশব্দে চলছি। তবু বড় ভাল লাগছে। নীরবতার ভাষায় যে ভরে উঠেছে আমাদের মন।

হঠাৎ নজর পড়ে আমার। কেবল আমি নই, মানসীও দেখতে পেয়েছে ওদের। কিন্তু ওরা বোধ করি দেখতে পায় নি আমাদের। পথ থেকে একটু দূরে ঝোপে-ঝাড়ে ছাওয়া ঝরণার তটভূমি। সেখানেই একখানি পাথরের ওপরে বসে আছে ওরা। ঠিক বসে নেই, মেয়েটির বুকে মুখ লুকিয়ে মিলন-সুখ উপভোগ করছে ছেলেটি। এমন মিলন-মধুর গোধূলি আর এই শান্ত-সুন্দর পরিবেশ। প্রিয়ার পাশে বসে তার সুধাভরা বুকের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মেয়েটি দেখতে পায় আমাদের। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে সরিয়ে দিয়ে ঠিক হয়ে বসে। খসে পড়া ওড়নাখানি টেনে নেয় বুকে। ছেলেটি উঠে বসে। একবার আড়চোখে আমাদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

মেয়েটির দিকে নয়, নির্ঝরিণীর দিকে। সে যে বড়ই সুন্দর। কলতানে বনভূমিকে মুখরিত করে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে বিয়াসের সঙ্গে মিলিত হতে।

ওরা বসে থাকে, আমরা এগিয়ে চলি। আমরা পথিক—সকল কালের, সকল পথের পথিক। আমরা এগিয়ে চলি—দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জীবন থেকে মহাজীবনের পথে।

কেন যেন চুপ করে থাকতে পারে না মানসী। সে সহসা বলে ওঠে, "ওরাও বোধহয় আমাদেরই মতো নাগর দেখে ফিরে চলেছিল। পথের অনাবিল সৌন্দর্য দেখে বসে পড়েছে ঝরণার ধারে।

"তাই হবে।" চলতে চলতে জবাব দিই।

"ঝরণাটি সত্যিই সুন্দর।"

"হ্যাঁ।"

"আমরাও বসব নাকি একটু। অনেকটা হাঁটা হল।"

আমি মানসীর দিকে তাকাই। চোখাচোখি হয়। মানসী চোখ নামিয়ে নেয়। কাছাকাছি কোথায় যেন একটা পাখি গান গেয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্য ঝরণার কলতান যায় হারিয়ে।

হঠাৎ হেসে ওঠে মানসী। বলে, "তাই বলে ভাববেন না যেন, ঐ ছেলেটি যেভাবে বসে ছিল, সেই ভাবেই বসবার অনুমতি দেব আমি। অনেকটা দূরত্ব রেখে কেবল পাশাপাশি বসব আমরা। কেউ কোন কথা বলব না। শুধু ঝরণার গান আর বনের মর্মর শুনব।"

আমারও হাসি পায়। আমিও হেসে উঠি। মানসী চলা বন্ধ করে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "হাসছেন যে?"

হাসি থামিয়ে বলি, "ঝরণাটা সত্যি সুন্দর। কিন্তু এমন অসংখ্য ঝরণা তো ছড়িয়ে আছে হিমাচলের সর্বত্র।"

"তাহলে কি বসছি না আমরা?"

"না।"

"কেন?"

"দূরত্ব যদি বজায় রাখতেই হয়, তাহলে এখানে বসে সময় নষ্ট করা কেন? বাসেও তো পাশাপাশি বসতে হবে আমাদের।"

বাসস্ট্যাণ্ড অর্থাৎ পাতলিকুলু জায়গাটি একটি গঞ্জের মতো। বাজার আর কয়েকটি গুদাম। আপেল আর কাঠের গুদাম। নাগরের পথটি যেখানে এসে কুলু-মানালী পথে মিশেছে সেখানেই বাসস্ট্যাণ্ড। সামনে খানিকটা খালি জমি। তার পরে একটি টিলা। পথের পাশে দেওদার বন। বন-বিভাগের সম্পত্তি।

এখান থেকে মানালী যেতে এক ঘণ্টা কুলু যেতে আধ ঘণ্টা লাগে। দূরত্ব কিন্তু প্রায় সমান। সময়ের ব্যবধানের কারণ চড়াই পথ। কুলু থেকে মানালীর উচ্চতা বেশি। আমরা কুলু গিয়েও নাগরে আসতে পারতাম।

বাস এলো প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে। আমাদের ভাগ্য ভাল। বসার জায়গা পাওয়া গেল। পাশাপাশিই বসতে পেলাম আমরা। মানসী জানালার ধারে বসল। হেসে বলি, "এবারে কিন্তু আর দূরত্ব বজায় রাখা গেল না। কারণ বাসের আসনগুলি ঝরণা তীরের পাথরগুলির মতো সুদীর্ঘ নয়।"

"দুর্ভাগ্যের কথা।" মানসী গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়, "তাই বলে বেশি ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবেন না যেন।"

আমি তাড়াতাড়ি একটু সরে বসি। মানসী মৃদু হাসে। বাস চলতে শুরু করে।

একটু বাদে হঠাৎ মানসী বলে ওঠে, "দুপুর থেকে তো দিব্যি ফাঁকি দিচ্ছেন।"

"ফাঁকি?" বিস্মিত হই।

"ফাঁকি নয়তো কি ? নাগর আর পাঞ্জাবী যুবক-যুবতীর অভিসার দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু যতো বোকা আমাকে ভেবেছেন, আমি ততো বোকা নই মশাই।"

"আমি আবার কখন আপনাকে বোকা ভাবলাম ? আর ভাববই বা কেন ? আপনি তো সত্যি সত্যি বোকা নন।"

"নই বুঝি ?" মানসী আমার দিকে তাকায়।

"না।"

"তাহলে বলুন।"

"কি ?"

"মণিমহেশের কথা।"

হায় ভগবান ! এই জন্য এতবড় প্রস্তাবনা। হাসতে হাসতে বলি, "আপনার ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল।"

"কি আশ্চর্য !" মানসী যেন বিস্মিত। "আমার বাবাও যে ঐ একই কথা বলেন।"

"খুবই স্বাভাবিক—গ্রেট মেন থিঙ্ক্ এলাইকু" আমি বলি, "তাহলে আপনার বাবার আশা পূর্ণ করলেন না কেন ?"

"মেয়ে ব্যারিস্টারদের তেমন পশার হয় না বলে। আর...." সহসা থেমে যা মানসী।

"থামলেন কেন ? বলুন আর...."

"আর একজনকে ব্যারিস্টার করার জন্য নিজে ব্যারিস্টার হতে পারলাম না। বাবাকে বলে তাকেই বিলেত পাঠিয়ে দিলাম।"

"সে কে ? আপনার কি হয় ?"

কোন উত্তর দেয় না মানসী। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটুকাল চুপ করে থাকে। তার পরে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে মিনতিভরা স্বরে বলে ওঠে, "প্লিজ, আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবেন না। সে-কথা যে আমি ভুলে যেতে চাইছি তিন বছর ধরে। পারছি না বলেই এমন করে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পারছি না বলেই আপনার কাছে হিমাচলের কথা শুনতে চাইছি। আপনি বলুন মণিমহেশের কথা। আমার অতীতকে ভুলিয়ে দিন। আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করুন।"

এর পরে আর আপত্তি করা চলে না। তাই কথা না বাড়িয়ে আমি মণিমহেশ যাত্রাকাহিনী বলতে শুরু করি—

পর দিন ৫ই সেপ্টেম্বর। চাম্বা থেকে আমাদের বাস ছাড়ল সকাল সোয়া এগারোটায়। দুগেঠীর বাস। দূরত্ব ২৯ মাইল। ইরাবতীর তীর দিয়ে পাহাড়ের গা ছুঁয়ে পথ। নদীর ওপারেও পাহাড়। পাইন বনে ছাওয়া সবুজ পাহাড়। মাঝে মাঝে এপারের পাহাড়ের গায়ে গম আর ভুট্টার ক্ষেত। পথের পাশে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অজস্র বনফুল—নানা রঙের ফুল। গাছে গাছে পাখিদের মেলা আর ফুলে ফুলে প্রজাপতিদের আনাগোনা।

চাম্বা থেকে মাইল ছয়েক এসে মেহলা। আরও মাইল পাঁচেক পরে রাখ্। ইরাবতী বাঁকা নিয়েছে এখানে। বাঁকের মুখে খানিকটা সমতল জায়গা। কয়েকটি দোকান আর গুটিকয়েক বাড়ি-ঘর। পাথর আর কাঠের বাড়ি। পাশের পাহাড়ের গায়ে কয়েকফালি ক্ষেত। ক্ষেতের শেষে বন। চারিদিকের পাহাড়ী গ্রাম থেকে কয়েকটি পায়ে-চলা পথ নেমে এসেছে এখানে।

রাখ্ থেকে মাইল দুয়েক এগিয়ে বাগগা—অপেক্ষাকৃত বড় জায়গা। এখানে ইরাবতীর

ওপরে বড় পুল তৈরি হবে। চারিদিকে লোহা-লক্কড় পড়ে আছে। ওপারে পাহাড় কেটে পুল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে।

পুল অবশ্য এখনও একটা আছে। তারের দড়ি আর কাঠ দিয়ে তৈরি ঝুলন্ত পুল। এক টনের চেয়ে ভারী গাড়ি যেতে দেওয়া হয় না। জীপ যেতে পারে কিন্তু যাত্রী নিয়ে নয়। যাত্রীরা পায়ে হেঁটে পুল পার হন। কিছুদিন আগে একটি যাত্রী বোঝাই জীপ নদীতে পড়ে যাওয়ায় কয়েকজন লোক মারা গেছেন।

আমাদের বাস এপারেই থাকবে। দুর্গেঠী থেকে আর একটি বাস আসবে ওপারে। সেই বাসে চাপতে হবে আমাদের। তার মানে মালপত্র সব বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওপারে। অসিতবাবু ছুটোছুটি ও দর কষাকষি করে কুলি যোগাড় করলেন। মালপত্র সমেত নির্দিষ্ট স্থানে এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। একটু বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হল। কোথাও কোন আচ্ছাদন নেই। বৃষ্টি মাথায় করে পথে বসে থাকতে হল আমাদের।

"কেন আপনাদের সঙ্গে বর্ষাতি ছিল না।"

মানসীর প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে আসি। আমাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে একটা জনবহুল জায়গায়। আমি ও মানসীর নাগর দেখে বাসে করে মানালী ফিরে চলেছি। জানলা দিয়ে দোকানের সাইনবোর্ড দেখি—কাতরাঁই। বাস কাতরাঁই বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ থেকে ঠিক বলতে পারি না, মানসীর কাছে মণিমহেশ যাত্রাকাহিনী বলায় ব্যস্ত ছিলাম। বলছিলাম চাম্বা থেকে বাসে দুর্গেঠী যাবার কথা।

কাতরাঁই বেশ বড় ও প্রাচীন জনপদ। এখানে সেকালের একটি দুর্গ ছিল। এখনও তার কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। উচ্চতা ৪৮০০ ফুট—সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে একটি বিশ্রাম-ভবন আছে। আপেল ও ট্রাউট মাছ চাষের জন্য কাতরাঁই বিখ্যাত।

"কি ভাবছেন ? আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন ?" মানসী তাগিদ দেয়।

"দেব বৈ কি, বাস ছাড়ুক। এই ফাঁকে একটু কাতরাঁইকে দেখে নিই।"

ড্রাইভার কিন্তু দেখছি মানসীর দলে। আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। একটু হেসে মানসী বলে, "বাস ছেড়েছে। এবারে বলুন।"

"ড্রাইভারও আপনার সহায় দেখছি।"

"ড্রাইভার নয় মশাই।"

"কে ?"

"ভগবান।"

"হঠাৎ তিনি আপনার সহায় হলেন কেন ?"

"হঠাৎ নয়। মহৎ কাজে তিনি সর্বদাই সবার এমন সহায় হন।"

"মহৎ কাজ ?"

"নয় তো কি ? মণিমহেশের যাত্রাকাহিনী শোনা মহৎ কাজ নয় ?"

"শোনা যদি মহৎ কাজ হয়, তাহলে বলা ?"

"তাও মহৎ কাজ।" মানসী উত্তর দেয়।

"তাহলে ভগবান তো আমারও সহায়।"

"নিশ্চয়ই, নইলে ড্রাইভার বাস ছেড়ে দেবেন কেন ? যাক্ গে আর কথা না বাড়িয়ে বলুন তো বাগগাতে বসে আপনারা বৃষ্টিতে ভিজছিলেন কেন, আপনাদের সঙ্গে কি বর্ষাতি ছিল না ?"

"ছিল। কিন্তু সবই ছিল কিট্‌ ব্যাগের ভেতরে। পথের মাঝে প্যাকিং খুলতে রাজি হন নি অসিতবাবু।"

"বেশ জবরদস্ত নেতা তো!"

"তা বলতে পারেন।"

"আচ্ছা এবার তাহলে বলুন, তার পরে কি হল?"

আমি শুরু করি—

প্রায় আধঘণ্টা বাদে বাগগাতে দুগেঠীর বাস এলো। প্রচণ্ড গর্জনে চারিদিক কাঁপিয়ে ভীষণভাবে দুলতে দুলতে আমাদের কাছে এসে থামল। তার পরে সেই সংকীর্ণ পথের ওপরেই চালক বাস ঘোরাতে থাকল। এই একটা অদ্ভুত নিয়ম দেখেছি হিমালয়ে। বাস নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলে যাত্রীদের না নামিয়ে দিয়েই বাস ঘোরানো হয়। আব নিরুপায় যাত্রীরা প্রাণ হাতে করে বাসে বসে থাকেন।

ওপারের পথের চেয়ে এপারের পথ সংকীর্ণ, কর্দমাক্ত ও চড়াই। অর্থাৎ দুর্গমতর পথ দিয়ে এগিয়ে চলে বাস। বাগগা থেকে দুগেঠী ষোল মাইল। ইরাবতী ছিল ডানদিকে এবারে এসেছে বাঁয়ে। পথের সঙ্গে সমতা রেখে সেও সংকীর্ণতরা। তবে সে আরও বেশি উদ্বেলিতা, আরও বেগবতী, আরও সুন্দরী।

বর্ষার শেষ। মাঝে মাঝেই পথে ধস নেমেছে। ওপর থেকে মাটি আর পাথর গড়িয়ে পড়েছে পথে। শ্রমিকরা কাজ করছে। পাথর ভেঙে ও মাটি সরিয়ে পথ পরিষ্কার করছে।

প্যান্ট-কোট পরা একজন ভদ্রলোক হাত দেখিয়ে আমাদের বাস থামালেন। কয়েকজন শ্রমিক চুপচাপ বসে আছে পথের পাশে। আশ্চর্য! সুপারভাইজার সামনে রয়েছেন, আর ওরা বসে আছে!

স্থানীয় ভাষায় সুরারভাইজার আমাদের ড্রাইভারকে যা বললেন, তার সবটুকু বুঝতে পারি না। কিন্তু যতটুকু পারি, তাতেই চমকে উঠি। একটু আগে হঠাৎ ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে একজন কর্মরত শ্রমিক নিহত হয়েছে। সামনে ঐ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে তার মৃতদেহ। আমাদের ড্রাইভার যেন খবরটা দিয়ে দেয় গেহরা নির্মাণ-বিভাগের দপ্তরে।

হতভাগ্য শ্রমিক।সকালে ছেলে-মেয়ে, মা ও স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাজে এসেছে। হয়তো বলে এসেছে, সন্ধ্যায় দিন-মজুরীর পয়সা দিয়ে আটা ও আলু কিনে বাড়ি ফিরবে। ছোট ছেলেটা বার বার জিজ্ঞেস করছে, সন্ধ্যে হতে আর কত দেরি—বাবা কখন আসবে? মেয়েটা আসার সময় কানে কানে বলে দিয়েছে, একজোড়া কাঁচের চুড়ি নিয়ে যেতে। মা বকবে বলে, সে মাকে বলে নি কথাটা। তাই সে মাকে জিজ্ঞেস করতে পারছে না কিছু। কিন্তু সুযোগ পেলেই বাড়ির সামনের বড় পাথরটার ওপরে উঠে দেখছে, বাবা আসছে কিনা? ঐ পাথরটার ওপর দাঁড়ালে অনেকটা দূর অবধি দেখা যায়। বুড়ী মা-ও ইতিমধ্যে জিজ্ঞেস করেছে বৌকে—ছেলে কখন আসবে? আর স্ত্রী—তার কথাবার্তা শুনে বোঝা যাচ্ছে না, স্বামীর ঘরে ফিরে আসার প্রতি তার কোন আগ্রহ আছে। কিন্তু সেও মাঝে মাঝে পশ্চিমাচলের দিকে চাইছে আর ভাবছে—কখন সূর্য যাবে অস্তাচলে, তার মনের মানুষ ফিরে আসবে ঘরে?

আসবে না। হতভাগ্য শ্রমিক আর কোনদিন ঘরে ফিরে আসবে না। ছেলে আর ডাকবে না 'মা' বলে, বাবা আর তুলবে না কোলে, স্বামী আর নেবে না কাছে টেনে।

গেহরায় থামল আমাদের বাস। বাগগা থেকে মাইল নয় এগিয়েছি। এখান থেকে দুগেঠী সাত মাইল। এ পথের বৃহত্তম জনপদ গেহরা। চারিদিকের পাহাড়েই গ্রাম দেখতে পাচ্ছি। সামনের ইরাবতীর ওপরে পুল। ওপারে অনেক বাড়ি-ঘর। বাস থেমেছে যেখানে, সেখানে সারি সারি দোকান-পাট, পুলিস ফাঁড়ি, ডাকঘর, নির্মাণ, কৃষি ও বনবিভাগের ব্লক অফিস। এবং বিয়ারশপ—বোতল তিন টাকা।

বাস থেকে নেমে পড়ি আমরা। একটা চায়ের দোকানে বসি। ডান দিকের দুটি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একটি ছোট নদী এসে ইরাবতীতে পড়েছে। ছোট নদীর ওপরে কাঠের পুল। সেই পুল পেরিয়ে আমাদের পথ। পুলের পরে পথটা প্রায় শ' খানেক ফুট খাড়া ওপরে উঠে গেছে।

গেহরা স্লেট পাথর ও কাঠের জন্য বিখ্যাত। বন রয়েছে সব পাহাড়েই। মাইল দেড়েক দূরে আছে স্লেট পাথরের পাহাড়। একটি রোপওয়ের সাহায্যে পাথর ও কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে। কাঠ ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে নদীতে আর পাথর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লরিতে করে।

কথায় কথায় চায়ের দোকানদার বলে, 'এ পর্যন্ত তো রাস্তা খুবই ভাল—সারা বছর চালু থাকে। খারাপ রাস্তা এর পরে আরম্ভ হবে।'

'এই যদি ভাল রাস্তা হয়ে থাকে, তবে খারাপ রাস্তাটা কি রকম ?' সুজয়া জিজ্ঞেস করে।

'এবারেই দেখতে পাবেন।' দোকানদার জবাব দেয়।

কিন্তু তার আগেই দুর্ঘটনার মুখোমুখি পড়তে হল আমাদের। কিছুক্ষণ বাদে বাস ছাড়ল। ছোট-নদীর কাঠের পুল পেরিয়ে চড়াই বেয়ে উঠতে গিয়ে বাসের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বাস পেছন দিকে গড়াতে শুরু করল। যাত্রীরা চিৎকার করছে। ড্রাইভার প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক চেপে ধরেও বাসের অধঃপতন রোধ করতে পারছে না। বাস নিচে নামছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোজা গিয়ে নদীতে পড়বে। কারণ কাঠের পুলের মুখে একটা বাঁক আছে। এ অবস্থায় গাড়িকে বাঁক ফেরানো সম্ভব নয়। আমরা মৃত্যুর মুখামুখি।

কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? কৃষ্ণ নয়, কণ্ডাকটার। বাহাদুর নওজোয়ান। সে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়েছে পথে। মুহূর্তের মধ্যে পথের পাশে পড়ে থাকা দুখানি পাথর বাসের চাকার পেছনে দিয়ে দিয়েছে। বাসের অধঃপতন বুদ্ধ হল। আমাদের প্রাণ রক্ষা পেল। হৈ-হৈ করে আমরা নেমে পড়ি বাস থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ইঞ্জিন পরীক্ষার পরে ড্রাইভার ঘোষণা করল। বাস নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে সমতলে। কারণ ধাক্কা দিয়ে ইঞ্জিনের অভিমান ভাঙাতে হবে।

কাজটা মোটেই সহজ নয়। তাহলেও আমাদের সকলের সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে ড্রাইভার বাস নামিয়ে নিয়ে এলো বাসস্ট্যাণ্ডে। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরে ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ড্রাইভার খালি বাস নিয়ে চলে গেল ওপরে। আমরা পায়ে হেঁটে চড়াই পেরিয়ে সমতল পথে পৌঁছে বাসে উঠলাম। বাস চলতে শুরু করল।

কিন্তু এক সঙ্গে চলল না বেশিক্ষণ। আবার অভিমান হল। আমরা ধাক্কা দিয়ে অভিমান ভাঙালাম।

এ পথে সর্বত্র চড়াই। একটু বেশি চড়াই হলেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নামতে হচ্ছে কর্দমাক্ত পথে। প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পরে অচল যান সচল হচ্ছে।

এমনি আরোহণ ও অবরোহণের মধ্য দিয়ে বিকেল সাড়ে চারটের সময় আমরা পৌঁছলাম দুগেঠী—বাসপথের প্রান্তসীমা। পাহাড় কেটে ইরাবতীর তীরে খানিকটা জায়গা সমতল করা হয়েছে। দুটি দোকান, ডাকঘর আর নির্মাণ-বিভাগের বিশ্রাম-ভবন নিয়ে দুগেঠী। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। আমরা বৃষ্টিতে ভিজেই বিশ্রাম-ভবনে এলাম।

পথ থেকে খানিকটা উঁচুতে দুখানি ছোটখাট ঘর আর একফালি বারান্দা নিয়ে বিশ্রাম-ভবন। চৌকিদার থাকে একটু দূরে, রান্নাঘরের পাশে।

চৌকিদার এসে সেলাম করে। ঘর খুলে দেয়। আমরা খুশি মনে ভেতরে প্রবেশ করি।

আট

মানালী এসে থামল আমাদের বাস। ঘড়ি দেখে মানসী বলে, "নটা বাজে। চলুন একেবারে খেয়ে নিয়ে বাংলোয় ফেরা যাক।"

"তাই করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমি একবার খবরের কাগজের খোঁজ করব।"

"পাবেন কি ?"

"সকালে তো বলে গিয়েছি রেখে দিতে।"

আমরা নেমে আসি বাস থেকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। রাস্তার ধারে দোকানটা। সামনে আসতেই দোকানী একখানি 'ট্রিবিউটন' আমার হাতে দেয়। তাড়াতাড়ি কাগজখানি মেলে ধরি। মানসী এসে পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, "কিছু লিখেছে ওদের কথা ?"

আমি ইশারায় ওকে খবরটা দেখিয়ে দিই। মানসী পড়তে থাকে—১৯শে সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে চারটেয় তিনজন শেরপাকে নিয়ে প্রাণেশ চক্রবর্তী মানা সৃঙ্গে আরোহণ করেছে। কিন্তু পরদিন পাঁচ নম্বর শিবির থেকে নেমে আসার সময় দুজন অভিযাত্রী ও চারজন শেরপা আহত হয়েছে। শেরপাদের নাম আছে—শেরিং লাকপা, ফু তেনজিং, আঙ রিতা ও সোনা। কিন্তু নাম নেই আহত অভিযাত্রীদের। তারা কে ? এমন কি আহতরা কেমন আছে, সে খবর পর্যন্ত নেই।

"অসম্পূর্ণ খবর।" মানসী বিরক্তির সঙ্গে মন্তব্য করে, "এ খবর তো আমরা কাল রেডিওতেই শুনেছি।"

খবরের কাগজের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু কাগজ হাতে পেয়ে দুশ্চিন্তা কমল না, বরং বাড়ল। অথচ দুশ্চিন্তা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি। ওরা কোথায়, আর আমি কোথায় ? আমি যে কোন ভাবেই ওদের সাহায্য করতে পারি না।

মনে পড়ছে প্রাণেশের বাবার কথা। শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে তিনি প্রাণেশকে অভিযানে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু কেন যেন দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পান নি। তবে কি পিতার মন সেদিন বলেছিল, এমনি কোন দুর্ঘটনা ঘটবে ?

ওরা যেদিন কলকাতা থেকে রওনা হয়, সেদিন দুপুরে আমি আবার গিয়েছিলাম প্রফুল্লবাবুর অফিসে। টেবিলে মাথা রেখে বসেছিলেন তিনি। ডাক দিতেই মাথা তুললেন, তাঁর চোখে জল। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি দু হাতে চোখ মুছে নিয়ে ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'বসো।'

বসলাম, কিন্তু কোন কথা বলতে পারলাম না—কি বলব ? তিনিই কথা বললেন

একটু বাদে, 'ওরা তো আজ চলে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়ি। তিনি চুপ করে থাকেন। আমি আবার বলি, 'আপনি স্টেশনে যাচ্ছেন তো ?"

"না। আমার শরীরটা ভাল নেই। প্রাণেশের মা যাবে।'

বুঝলাম বিদায়ের দৃশ্যটা এড়াতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কেন ? নীলগিরি ও তীরশূলী অভিযানে যাবার সময় তো তিনি স্টেশনে গিয়েছেন। হাসি মুখেই ছেলেকে বিদায় দিয়েছেন।

মামুলি কয়েকটা কথা বলে সেদিন আমি পালিয়ে এসেছিলাম তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু তখন একবারও ভাবি নি, কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না তাঁকে।

কাঁধের ওপর কোমল একটা স্পর্শ পেয়ে বাস্তবে ফিরে আসি। মানসী বলে, "রাত বাড়ছে, চলুন খেতে যাই।"

"আমার খিদে নেই। চলুন, আপনি খেয়ে নেবেন।"

"তাহলে আর খাবার হাঙ্গামায় কাজ নেই। চলুন, বাংলোয় ফিরে যাই।"

"সে কি ! আপনি খাবেন না কেন ?"

"যে জন্য আপনি খাচ্ছেন না।" মানসী হাসে। "ওদের চিন্তায় উপোস করে আপনি একা পূণ্য সঞ্চয় করবেন, তাও কি হয় ?"

এতো দুঃখের মাঝেও হাসি পায় আমরা। বলি, "আমি উপোস করছি, এ কথাটা কে বললে আপনাকে ?"

"কে বলবে আবার, আমি কি একেবারেই বোকা ? কিছুই বুঝতে পারি না ?" একবার থামে মানসী। তার পরে কণ্ঠস্বরে সান্ত্বনার সুর মিশিয়ে বলে, "কি হয়েছে কিছুই যখন বোঝা যাচ্ছে না, তখন এমন ভেঙে পড়ছেন কেন ? হিমালয়-পথিক আপনি। আপনার তো এমন অধীর হওয়া সাজে না। চলুন খেয়ে নিয়ে ফিরে যাই বাংলোয়। জোশীমঠ ও কলকাতায় যখন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, খবর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।"

"কে খবর দেবে ? প্রাণেশ কি আমার জোশীমঠের টেলিগ্রাম পাবে ! রণেশদা, অমূল্য, বীরেন, সুজল, হিমাদ্রি, করুণা, বরেণ্য ও স্বপ্নন কেউ কলকাতায় নেই।"

"কোথায় গেছেন তাঁরা ?"

"নানা জায়গায়। বীরেন, সুজল, হিমাদ্রি ও বরেণ্য এখন তপোবনে।"

"কেন ?"

"আমাদের কেদারনাথ পর্বতাভিযানের সমীক্ষা করতে।"

"অন্যান্যরা ?"

"ওরাও সবাই বেড়াতে গেছে।"

"দাশরথিবাবু তো রয়েছেন কলকাতায়, তিনিই খবর দেবেন।"

বিস্মিত হই মানসীর কথায়। বলি, "আপনি দাশুকে জানলেন কেমন করে !"

একটু হাসে মানসী। বলে, "আমি গিরি-কান্তার-এর যাত্রীদের জানবো না—আমি যে আপনার অনুগত পাঠিকা।" *

"জেনে আনন্দিত হলেম যে, এ সংসারে আমার অন্তত একজন অনুগত পাঠিকা আছে।"

---

* হিমালয় (প্রথম পর্ব) দ্রষ্টব্য।

"তাহলে খেতে চলুন, পাঠিকা বাধিত হবে।"

"আপনার সত্যি ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল।" হাসতে হাসতে বলি।

মুচকি হেসে মানসী আমার মন্তব্য মেনে নেয়।

শেষ পর্যন্ত খেতে হল। খেয়ে নিয়ে আপেল বাগানের পাশ দিয়ে চড়াই পথ ভাঙতে থাকি ধীরে ধীরে। চাঁদনী-রাত কিন্তু মেঘে-ছাওয়া আকাশ। আধো-আলো আধো-ছায়ায় মানালী মোহময়ী। ফরেস্ট ডাকবাংলো পর্যন্ত আসতে অসুবিধে হয় নি কোন। এ পর্যন্ত চাঁদের আলোর আভায় মোটামুটি পথের ঠাহর পেয়েছি। কিন্তু এখন পথের দুধারে বড় বড় গাছ। মেটে জ্যোৎস্না এখানে প্রবেশের পথ পায় নি। আঁধারে ঘেরা পথ। আঁধারের রূপ দর্শন করার মতো মানসিক অবস্থা নয় এখন। তাই অনুমানে পথ চলতে থাকি। মানসী বলে, "বড্ড অন্ধকার।"

"আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে আসুন, সাবধানে চলুন।"

কিন্তু সাবধানে হবার আগেই হোঁচট খায় মানসী। আর আমি কিছু করতে পারর আগেই সে পড়ে যায় পথের ওপরে। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে এগিয়ে আসি তার কাছে। অনুমানে হাত বাড়াই। আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ায় মানসী। জিজ্ঞেস করি, "চোট লেগেছে কি ?"

"সামান্য।" সে উত্তর দেয়। বলে, "চলুন।" কিন্তু আমার হাত ছাড়ে না।

আমি আস্তে আস্তে চলতে থাকি।

হঠাৎ সুর করে বলে ওঠে মানসী, "আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।"

জাগরণ ও সুপ্তির সংমিশ্রণে ক্লান্তিকর রাত্রির অবসান হয়। তবু শয্যাত্যাগ করি না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি প্রাণেশের কথা—মানা অভিযানের কথা। আহত অভিযাত্রীরা কেমন আছে ? কেমন করে ওদের কুশল সংবাদ পাবো ? সেই সঙ্গে মনের উন্মুক্ত গবাক্ষে উঁকি দেয়, আর একজনের ভাবনা—মানসী। একটু বাদেই সে রুদ্ধ-দ্বারে আঘাত করবে। একরাশ হাসি মুখে ছড়িয়ে আমার ঘরে আসবে। আমাকে জিজ্ঞেস করবে—রাতে ঘুম হয়েছে ? ওর মুখ দেখে বোঝাই যাবে না যে, সে কাল রাতে অমন একটা কাণ্ড করেছে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখতে পাই, জানলা দিয়ে সোনালী রোদ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে আমার ঘরে। ঘড়ি দেখি—সাতটা বাজে। আশ্চর্য ! মানসী তো এখনও এলো না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসি। কোথায় মানসী ? তার দরজা বন্ধ ! তাহলে কি সে এখনও ঘুমোচ্ছে ? কিন্তু এতো বেলা পর্যন্ত তো তাকে আর ঘুমোতে দেখি নি। ফিরে আসি ঘরে। বাথরুমে ঢুকি। কিন্তু দরজায় খিল দিই না—মানসী আসবে।

মানসী আসে না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি—মানসী নেই আমার ঘরে। মানসীর দরজা বন্ধ। সাড়ে সাতটা বাজে। সে কি এখন ঘুমোচ্ছে ? ডাক দেব কি ? না না। সেটা ভালো দেখায় না।

পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিই। তবু দরজা খোলে না মানসী। কি হল ? কি আর হবে, হয়তো ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক, কাল ঘুমোতে পারে নি।

ঘরে তালা দিয়ে আমি বেরিয়ে আসি বাইরে। গেটের কাছ থেকে আর একবার পেছনে তাকাই। না, বন্ধ দুয়ার খোলে নি মানসী। আমি হাঁটতে শুরু করি।

কোথায় যাচ্ছি? কেনই বা যাচ্ছি? কথা ছিল সকালে এক সঙ্গে চা খেতে যাবো। তার পরে দর্শন করবো হিড়িম্বা মন্দির। তাহলে আমি একা পথে বের হলাম কেন? তাই বলে তো এখান থেকেই ফিরে যাওয়া যায় না। যারা আমাকে বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে, তারা কি ভাববে? আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকি। না, জায়গাটা সত্যি অন্ধকার। চাঁদের আলো কেন, সূর্যের আলো পর্যন্ত আসতে বাধা পায়। কাল রাতে এখানেই পড়ে গিয়েছিল মানসী। আমি তাকে হাত ধরে তুলেছিলাম। আমার হাত ছেড়ে দেয় নি সে। আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম ট্যুরিস্ট বাংলোয়। আজ তাহলে মানালীর পথে আমি কেন একা?

তাড়াতাড়ি ফিরে চলি। যারা আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে, তারা কি ভাববে? যা ইচ্ছে ভাবুক গে। তাদের ভাবনায় আমার কি এসে যায়?

গেট পেরিয়েই দেখতে পাই ওকে। পথের দিকে তাকিয়ে আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাসতে হাসতে এগিয়ে চলি। কেন যেন মুখ ঘুরিয়ে নেয় মানসী। ওদিকে অমন করে কি দেখছে সে?

আমি বাংলোর বারান্দায় উঠে আসি। সহসা ঘুরে দাঁড়ায় মানসী। ত্রস্ত পায়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

মানসীর দুয়ারে এসে দাঁড়াই। একবার একটু ইতস্ততঃ করি। তার পরে দরজা ঠেলে ওর ঘরে আসি। মুখ নিচু করে বসে আছে মানসী। কোন কথা বলে না সে।

আমি মৃদু হেসে বলি, "খুব ঘুমিয়ে নিয়েছেন আজ।"

মানসী চুপ করে আছে। আমি এগিয়ে আসি কাছে। এবারে দেখতে পাই—ওর চোখে জল। মানসী কাঁদছে। কিন্তু কেন?

আমি চুপ করে থাকি। নীরবে কেটে যায় কিছুক্ষণ। জিজ্ঞেস করি, "কাদছেন কেন?"

আঁচলে চোখ মোছে মানসী। বলে, "আমাকে না ডেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কেন?"

"আপনার দরজা বন্ধ ছিল বলে, আর ডাকি নি আপনাকে।"

"কিন্তু কাল তো আমি....." অভিমানী মানসী শেষ করতে পারে না। আর সামলাতে পারে না নিজেকে। সে কেঁদে ফেলে।

সান্ত্বনার স্বরে বলি, "কাল আপনি আমাকে ডেকেছিলেন, তবু আমি আজ ডাকতে পারি নি আপনাকে।"

"কেন?"

"আমি যে সখা। সখীর মতো সহজ হওয়া সম্ভব নয় আমার।"

চোখ মোছে মানসী। সে তাকায় আমার দিকে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "লেখকের সুনাম নষ্ট হত?"

"না।" অকম্পিত কণ্ঠে জবাব দিই, "পাঠিকার দুর্নাম রটতে পারত।"

কি বলতে গিয়েও যেন থেমে যায় মানসী। একটু বাদে বলে, "তাই বলে আমাকে এভাবে একা ফেলে রেখে আপনি বেরিয়ে গেলেন।"

"আপনি তো একাই পথে বেরিয়েছেন।"

"কিন্তু আমি যে পথ চিনি না।"

বলতে চাই—চিনে নিতে হবে। কিন্তু পারি না। আমি চুপ করে থাকি।

আমার নীরবতায় খুশি হয় মানসী। সে তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলে ওঠে, "শুধু কি মানালীর পথে পথে টহল মারা হয়েছে, না চাও খেয়ে আসা হয়েছে?"

"আমি তো মানালীতে একা নই যে একা-একা চা খেয়ে আসব।"

"তা এতো বেলা পর্যন্ত নির্জলা উপোস থাকার কারণ কি?

"আমার পথের সাথী যে উপোসী রয়েছে।"

"ধন্যবাদ। এবার তাহলে উপবাস ভঙ্গ করতে যাওয়া যাক।"

"উত্তম প্রস্তাব।"

আবার বেরিয়ে পড়ি পথে। এবারে আর একা নই আমি। মানসী রয়েছে আমার সঙ্গে।

চা খেয়ে পথে বেরিয়ে মানসী বলে, "কাল সকালে তো চলেই যাচ্ছি মানালী ছেড়ে। আজ আমরা তাই সারাদিন মানালীর পথে পথে কাটাবো।"

"লেখক সানন্দে পাঠিকার সঙ্গী হবে।"

"আর লেখক নয়।"

"তাহলে কি?"

"সখা।"

"সখী বলে ডাকলে, সাড়া পাওয়া যাবে তো?"

"পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

"পারেন নয়, পারো।"

"বেশ মেনে নিলাম।"

"খুশি হলেম।"

"কিন্তু হাসি-খুশি মন নিয়ে কোথায় যাওয়া হবে এখন?" মানসী প্রশ্ন করে।

"হিড়িম্বা তথা দুংরি মন্দির দর্শন করতে।" জবাব দিই।

"সেটি কোন্ পথে?"

"ঠিক জানি না। চিনে নিতে হবে।"

"সখা যখন সঙ্গে রয়েছে, তখন সখীর ভাবনা কি? সখাই তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

আমরা বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। ঘন পাইন বনের মধ্য দিয়ে পথ। হিড়িম্বার নামে উৎসর্গীকৃত আর কোথাও কোন মন্দির আছে বলে আমার জানা নেই। হিড়িম্বা ছিলেন রাক্ষসী। কুলু উপত্যকার অধিকাংশ মন্দিরের বিগ্রহই দানব কিংবা রাক্ষসের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। আজও তাঁরা পরমসমাদরে পূজিত হচ্ছেন। হিড়িম্বা মন্দির মানালীর প্রাচীনতম মন্দির। সাড়ে ছ শ' বছর আগে নির্মিত হয়েছে।

কথিত আছে তৎকালীন রাজার আদেশে জনৈক শিল্পী এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির দেখে বড়ই খুশি হলেন রাজা। তিনি চাইলেন, এমন মন্দির যেন আর নির্মিত না হয়। তাই তিনি শিল্পীর ডানহাতখানি কেটে ফেললেন। শিল্পী পালিয়ে গেলেন রাজ্য ছেড়ে। অকৃতজ্ঞ রাজাকে সমুচিত জবাব দেবার জন্য তিনি বাঁ হাতে খোদাই কাজ শিখতে শুরু করলেন। আপন অধ্যবসায় বলে কয়েক বছরের মধ্যেই শিল্পী বাঁ হাতে তেমনি কাজ করতে সক্ষম হলেন। তখন তিনি লাহুল উপত্যকার ত্রিলোকনাথ মন্দির নির্মাণ করলেন। শিল্পকর্মে

সে মন্দির হিড়িম্বা মন্দিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। রাজশক্তি ব্যর্থ হল, শিল্পীর সাধনাই হল জয়যুক্ত।

বন ক্রমেই ঘন হচ্ছে। চড়াই পথ বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি আমরা। চলতে চলতে ভাবছি সেই কাহিনী—ধরে নিয়ে যেতে এসে, ধরা দিয়েছিলেন হিড়িম্বা।

জতুগৃহ দাহের পর মা কুন্তীদেবীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব হিড়িম্বক বনে প্রবেশ করলেন। দুর্গম পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। মা বললেন—জল না পেলে আর যে চলতে পারছি না।

ভীমসেন তখন চার ভাই ও মাকে একটা বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বলে, জল আনতে চললেন। দু ক্রোশ দূর থেকে নিয়ে এলেন জল। কিন্তু এসে দেখেন মা ও ভাইরা পড়েছেন ঘুমিয়ে। ভীম ভাবলেন, খানিকক্ষণ বরং বিশ্রাম করুন ওঁরা। তিনি জেগে রইলেন তাঁদের শিয়রে।

এদিকে নিশাচর রাক্ষস হিড়িম্ব মানুষের গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল। বোন হিড়িম্বাকে নিয়ে সে উপস্থিত হল সেখানে। কিন্তু নিজে কাছে না এসে হিড়িম্বাকে বলল—চারদিন ধরে উপোসী রয়েছি। মানুষের মাংস বেশ মজা করে খাওয়া যাবে আজ। তুই ওদের ছ'জনকে ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে।

হিড়িম্বা কিন্তু দূর থেকে ভীমসেনকে দেখেই তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। আপন মনে বলে উঠলেন—

'এহেন সুন্দর রূপে, নাহি দেখে ইহলোকে,
যক্ষ রক্ষ মনুষ্য ভিতরে।
মোর ভাগ্য হেতু বিধি মিলাইল হেন নিধি,
স্বামী করি বরিনু ইহারে।'

তিনি কামরূপা কামিনীর রূপ নিয়ে ভীমসেনের কাছে উপস্থিত হলেন। সলাজ স্বরে প্রেম নিবেদন করলেন আর বললেন ভাই হিড়িম্বার কথা। তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। বললেন—

'আজ্ঞা কর এই ক্ষণে, লৈয়া যাব অন্য স্থানে,
পর্বত কন্দর রম্যবনে।'

ভীম কিন্তু সম্মত হল না। বললেন—মা ও ভাইদের ছেড়ে তোর সঙ্গে কোথায় যাব ?

এদিকে হিড়িম্বার দেরী দেখে হিড়িম্ব আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারল না। সে এলো সেখানে। আক্রমণ করল ভীমসেনকে। মা ও ভাইরা জেগে উঠলেন। কিন্তু ভাইদের সাহায্য ছাড়াই ভীম হিড়িম্বকে বধ করলেন। ক্রুদ্ধ বৃকোদর তখন হিড়িম্বাকেও মেরে ফেলতে চাইলেন। মা ও ভাইরা বাধা দিলেন তাঁকে। কুন্তী ও যুধিষ্টিরের আদেশে ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করলেন। তার পরে তারা নাকি হিমালয়ের বিভিন্ন রমণীয় বনে মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছিলেন। এইসব বনের মধ্যে মানালী অন্যতমা। মানালীর যে মধুময় স্থানে ভীম ও হিড়িম্বা মধুযামিনী যাপন করেছিলেন, সেখানেই নির্মাণ করা হয়েছে হিড়িম্বা মন্দির। বীর ঘটোৎকচের সেই জন্মভূমিতে আজ উপস্থিত হয়েছি আমরা—আমি আর মানসী।

বেশ বড় কাঠের মন্দির। ৭০/৮০ ফুট উঁচু—চার স্তরের চৌ-চালা মন্দির। ৪৬ ফুট লম্বা ও ২৮ ফুট চওড়া মূল মন্দির। দেয়ালে অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্য। চারিদিকে বহু মূর্তি খোদিত। তবে মন্দির বিগ্রহশূন্য। বিগ্রহ থাকে পূজারীর বাড়িতে। প্রতিমাসের পয়লা তারিখে শোভাযাত্রা সহকারে বিগ্রহ নিয়ে আসা হয় মন্দিরে। ছোট পেতলের বিগ্রহ—ইঞ্চি তিনেক

একটি হিড়িম্বা মূর্তি। সেদিন মহা ধূমধাম করে পূজো করা হয়—রাক্ষসী হিড়িম্বা দেবী রূপে মানুষের পূজা পায়। পূজো শেষে আবার বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয় পূজারীর বাড়িতে।

৫০/৬০ বছর আগেও কিন্তু এ নিয়ম ছিল না। বিগ্রহ এখানেই থাকত তখন। নিয়মিত পূজো হত। ভক্তদের ভিড়ে মন্দির সব সময় গমগম করত। এক কালে কুলু উপত্যকার সবচেয়ে জাগ্রতা দেবী ছিলেন হিড়িম্বা। কুলুর রাজপরিবারের আরাধ্যা ছিলেন তিনি। সবাই তাঁকে হিড়মা বলে অভিহিত করতেন।

তার পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। রাজার রাজত্ব যাবার পরে ধীরে ধীরে ভক্তদের ভিড়ও এসেছে কমে। তাই আজ সে মন্দির এমন মূল্যহীন। পূজারী মন্দিরে বাস করা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেউই থাকেন না এই বনমন্দিরে। পাছে অরক্ষিত মন্দির থেকে বিগ্রহ চুরি হয়ে যায়, তাই পূজারী বিগ্রহ নিয়ে গেছেন বাড়িতে—ভালই করেছেন। যে যুগে, যেমন নিয়ম।

হিড়িম্বা মন্দির দর্শন করে ফিরে চলেছি আমরা। চলতে চলতে মানসী বলে, "বীর দম্পতির স্থান নির্বাচনের প্রশংসা করতে হয়—আইডিয়েল হনিমুন স্পট।"

"কেমন করে বুঝলে? অভিজ্ঞতা আছে নাকি?"

"না থাকাই বিচিত্র নয় কি?" মানসী পাল্টা প্রশ্ন করে।

বিপাক বুঝে চুপ করে থাকি।

কিন্তু চুপ করে থাকার পাত্রী নয় মানসী। হঠাৎ আমার একেবারে পাশে এসে প্রশ্ন করে, "বেশ তো জঙ্গলে ঘুরিয়ে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে।"

"আমি নিরুপায়, ঘটোৎকচ—জনক-জননী যে জঙ্গলের মাঝেই মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছিলেন।"

"তা তো দেখতেই পেলাম। কিন্তু দেখবার পরেও কি সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে, না যে প্রসঙ্গটা কাল রাতে শিকেয় তুলে রেখেছেন..."

"রেখেছেন নয়, রেখেচো।" আমি ওকে শুধরে দিই।

"আন্তরিক দুঃখিত।" মানসী বলে।

"কেবল দুঃখ প্রকাশ করলেই হবে না। অভ্যেস পালটাতে হবে।"

"অভ্যেস পালটাতে একটু সময় নেবে।"

"তাহলে দুগেঠীর প্রসঙ্গটাও শিকে থেকে যথা সময়ে নামানো হবে।"

"ঘাট হয়েছে। এই যে তুমি বলছি। এবারে বলতে শুরু করো।"

পথ চলতে চলতে মণিমহেশ যাত্রার কথা শুরু করি—

দুগেঠীর ডাকবাংলোয় পরদিন সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙল, তখন সহযাত্রীরা সবাই ঘুমে বিভোর। স্লিপিং ব্যাগের জীপ খুলে আমি উঠে বসি। একে তো ছোট ঘর, তার ওপর মালপত্র ও আমরা এতগুলি মানুষ। সারা ঘর জুড়েই বিছানা পড়েছে। বেশ শীত, তবু সুজয়া শোবার আগে একটা জানলা খুলে দিয়েছিল। বোধহয় ভয় পেয়েছিল, পাছে 'অন্ধ-কূপ হত্যা' হয়ে যায় দুগেঠীর ডাকবাংলোয়।

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাই—হাওয়ায় দুলছে একটি সূর্যমুখী, যেন মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সুপ্রভাত জানাচ্ছে আমাকে। সূর্যমুখীর পেছনে গাছে ছাওয়া একফালি সবুজ পাহাড় আর মেঘে ছাওয়া সাদা আকাশ। জানলা নয়, ফ্রেমে আঁটা একখানি হিমালয়ের ছবি।

আমি অপলক নয়নে চেয়ে থাকি সেদিকে আর শুনি ইরাবতীর সামগীতি। বিরামহীন সে সঙ্গীত। সেদিন খাজিয়ার থেকে চাম্বা আসার পর থেকেই শুনছি, কিন্তু খারাপ লাগছে না।

কাল রাতে ইরাবতীর গীত শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের ঘোরে হারিয়ে ফেলেছিলাম তাকে। ঘুম ভাঙতেই সে আবার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুণ্যতোয়া ইরাবতী। কতো নামে ডেকেছে তাকে—যুগে যুগে দেশে দেশে। ইরাবতী সবাইকে সাড়া দিয়েছে। আর্যরা বলতেন—হাইড্রেটস্ (Hydrates), টলেমি-আদ্রিস (Adris), প্লিনী—ফুয়াডিস (Phuadis)। বেদে বলা হয়েছে পরুষণি কিংবা পুরষণি, সংস্কৃত সাহিত্যে ইরাবতী আর আইন-ই আকবরীতে ইরাওয়াদি।

পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর অন্যতমা ইরাবতী। চন্দ্রভাগা ও শতদ্রু উপত্যকার মধ্যবর্তী ভূভাগ দিয়ে সে প্রবাহিতা। রোতং গিরিবর্ত্মের নিকটবর্তী বাঙ্গাল (৩২°২৬ উত্তর ও ৭৭° পূর্ব দ্রাঘিমা) থেকে সৃষ্ট হয়ে রায়না নামে প্রবাহিতা হয়ে কুলু উপত্যকা থেকে চাম্বা জেলায় প্রবেশ করেছে। নাম পরিবর্তন করেছে। রায়না হয়েছে ইরাবতী। ইরা শব্দের অর্থ জল।

তার পরে শিখদের বিখ্যাত তীর্থ ডেরা বাবা নানক শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিতা হয়েছে। ১৮৭০ সালে ইরাবতীর বন্যায় সেই শহরের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। গুরুদাসপুর ও অমৃতসর জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিতা হয়ে ইরাবতী লাহোর জেলায় প্রবেশ করেছে। লাহোর মহানগরী ইরাবতীর তীরে অবস্থিত। পশ্চিম পাকিস্তানের আহমদপুরের কাছে চন্দ্রাভাগা ও ঝিলমের মিলিত ধারায় মিশে ইরাবতী তার সাড়ে চারশ' মাইলের যাত্রাপথ শেষ করেছে। তিন নদীর সেই মিলিতধারার নাম চন্দ্রভাগা।

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে এই ইরাবতীর তীরে দশার্জন যুদ্ধ হয়েছিল। রাজা সুদাস একা হয়েও প্রায় তিরিশ জন নরপতিকে পরাজিত করে সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও পরুষণির (ইরাবতী) কৃপায় তিনি সেই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই ইরাবতী পুণ্যতোয়া।

নীলমাতা পুরাণে বলা হয়েছে ইরাবতীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করলে সারাজীবনের পাপমুক্ত হওয়া যায়। বিষ্ণুধর্মসূত্র অনুযায়ী ইরাবতীর তীরে শ্রাদ্ধ করলে পূর্বপুরুষদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

মৎস্য, বামন ও বায়ু পুরাণে ইরাবতীর উল্লেখ আছে। নিরুক্ত ও মহাভারতেও ইরাবতীর কথা বলা হয়েছে। মদ্র ও বহ্লিক দেশ নাকি এই পুণ্যতোয়ার তীরেই অবস্থিত ছিল। সতী সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি মদ্রদেশের রাজা ছিলেন।

দুগেঠীর ডাকবাংলোয় বসে ইরাবতীর গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম সেই পুণ্যতোয়ার কথা। কিন্তু সে ভাবনাকে আর দীর্ঘস্থায়ী করা গেল না। সহযাত্রীদের ঘুম ভেঙে গেছে। ওরা উঠে বসেছে। ইরাবতীর ভাবনা ছেড়ে আমি অসিতবাবুর দিকে তাকাই।

অসিতবাবু বলেন, 'কাল রাতে নিচের দোকানে গিয়ে শুনলাম, ছাতরারী এখান থেকে মোটে চার মাইল।'

'তাই নাকি!' সুজয়া বলে, 'তবে যে শুনেছি গেহরা থেকে ছাতরারী যেতে হয়।'

'সাধারণতঃ পর্যটকরা গেহরা থেকেই ছাতরারী যান, কিন্তু এখান থেকে ছাতরারী যাওয়া নাকি খুবই সহজ।'

'তাহলে যাব।' সুজয়া বলে, 'আজকের দিনটা দুগেঠী থেকে ছাতরারী দেখে নেয়া

যাক। কাল মণিমহেশের পথে রওনা হওয়া যাবে।'

তার স্বামীও সমর্থন করে।

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' অসিতবাবু আমার দিকে তাকান।

আমি বলি, 'উত্তম ভাবনা, আপত্তি করব কেন ?'

ভেবেছিলাম সকাল আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। চা ও জল-খাবার খেয়ে দুপুরের জন্য রুটি ও আলুসিদ্ধ সঙ্গে নিতে হল। রওনা হতে ন'টা বেজে গেল।

রওনা হলাম মানে পেছোতে শুরু করলাম। যে পথে কাল চাম্বা থেকে দুর্গেঠী এসেছি, সেই বাসপথ দিয়েই গেহরার দিকে হেঁটে চলেছি।

মাইল খানেক হেঁটে একটি পাহাড়ী নদী—বড়ই সুন্দর। পথের পাশের পাহাড়টার বুক চিরে একটি সুনীল জলধারা যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মাটিতে। এসে মিশেছে ইরাবতীর অশান্ত প্রবাহে। না মেশেনি—ইরাবতী সাদা আর সে নীল। সঙ্গমের খানিকটা অংশকে সে সর্বদা নীলাভ করে রেখেছে।

পাহাড়ী নদীর ওপরে ছোট একটি কাঠের পুল। পুলের আগে পথটি বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে। এই পুল পেরিয়ে বাঁকের মুখে বাস ঘোরাবার সময় কাল ড্রাইভারকে অনেক কসরৎ করতে হয়েছিল।

সেই বাঁকের মুখে পথের পাশে বসে পড়ে সুজয়া। অসিতবাবুকে বলে, 'ছবি নিন। এমন চমৎকার জায়গার একটা ছবি থাকবে না।'

অসিতবাবু ছবি নেবার পরে আবার চলতে শুরু করি—বাসপথ দিয়ে নয়, সেই পাহাড়ী নদীর পাশে পাশে পাহাড়ে উঠে যাওয়া সংকীর্ণ চড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি।

বাঁ দিকে নীল নদী, ডান দিকে সবুজ পাহাড়। পাহাড়ে বনফুলের মেলা নানা রঙের ফুল—লাল নীল সাদা হলুদ বেগুনী আরও কতো রঙ।

প্রস্তরময় চড়াই পথ, বৃষ্টির জলে পিচ্ছিল। এ যাত্রায় এর আগে আর এমন দুর্গম পথ পাড়ি দিই নি। তাই কিছুক্ষণ বাদে বাদে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। কিন্তু ক্লান্ত হলেও পথ চলার উৎসাহ কমছে না। পথ যে বড়ই সুন্দর। আর পথের চেয়ে সুন্দর ঐ পাহাড়ী নদী—নদী তো নয় যেন সুনীল নির্ঝরিণী। তাই বিশ্রাম নিতে বসে কেবল চেয়ে চেয়ে তাকে দেখছি। সকল শ্রান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। আবার চলা শুরু করছি।

মাইল তিনেক চড়াই ভেঙে একটা বাঁক ফিরতেই দৃষ্টিপথ প্রসারিত হল—সামনে সুন্দর একটি উপত্যকা। উপত্যকার বুক চিরে বয়ে আসছে নীল নদী। নদীর দু'তীরে ক্ষেত—ভুট্টা, রামদানা ডাল কুমড়া টমেটো বেগুন কোদরা ও চিনাহের ক্ষেত। কোদরা এক প্রকারের গম, ওরা রুটি বানিয়ে খায়। আর চিনাহ চালের মতো—ভাত হয়।

ক্ষেতের মাঝে পাহাড়ের গায়ে প্রশস্ত পায়ে-চলা সমতল পথ। পথের বাঁ দিকে উঁচুতে বাড়ি-ঘর। ডান দিকের ঘর-বাড়ি আছে, তবে খানিকটা দূরে—গ্রামের প্রান্তে। বাজার স্কুল আর মন্দিরও সেখানে।

বেশ বড় গ্রাম। সুপ্রাচীন জনপদ। হিমাচলের প্রাচীনতম গ্রামগুলির অন্যতম এই ছাতরারী। সুদূর অতীতে এখানকার মানুষ সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিলেন। সে আমলের কিছু স্মৃতি আজও বেঁচে আছে এখানে। সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজা মেরু ভার্মা এখানে যে মন্দির নিমার্ণ করিয়েছিলেন, সেই মন্দির দর্শন করতে এসেছি।

চলতে চলতে দেখছি ছাতারারীকে আর ভাবছি মহারাজ মেরু ভার্মার কথা। রাজপুত্র ছিলেন না তিনি। ছিলেন দুঃসাহসী এক রাঠোর রাজপুত বীর। হিমালয়ের হাতছানিতে ঘর ছেড়েছিলেন কি রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশায় দুর্গম গিরি অরণ্য পেরিয়ে এখানে এসেছিলেন, তা বলতে পারি না। তবে তিনি এসেছিলেন এবং আপন বীরত্ব ও অধ্যবসায় বলে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তখন এ অঞ্চলে ছিল সন্ন্যাসীদের বাস। মেরু ভার্মা তাঁর দলবল নিয়ে প্রথমে নিকটবর্তী ওলহানশা গ্রামে আসেন। সন্ন্যাসীরা তাঁর এই অনধিকার আগমনে বিরক্ত হলেন। কিন্তু স্বভাবের মাধুর্য দিয়ে সন্ন্যাসীদের হৃদয় জয় করলেন মেরু ভার্মা। সন্ন্যাসীরা তখন তাঁকে ভারমৌর উপত্যকার কথা বললেন। সেখানে গেলে সুখে ও শান্তিতে বাস করতে পারবেন তিনি। মেরু ভার্মা তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলে গেলেন ভারমৌর। আরম্ভ হল ভার্মা রাজবংশের রাজত্বকাল। সেই সঙ্গে চাম্বার ইতিহাস। ঐতিহাসিকদের মতে সেটি ৬৮০ খৃষ্টাব্দ।

তার পর থেকে ২৪০ বছর ধরে ভারমৌর ভার্মা রাজ্যের রাজধানী ছিল। ছাতরারীও সেই আমলেই একটি বৃধিষ্ণু জনপদ রূপে গড়ে ওঠে। এই সময়ে যে সব রাজারা ভারমৌরের সিংহাসনে বসেছেন, তাঁদের মধ্যে জয়স্তম্ভ, জলস্তম্ভ দেব, মন্দার, কান্তার, অজয় ও মরুৎ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রিয়তমা কন্যা চম্পাবতীর অনুরোধে সহিল ভার্মা ভারমৌর থেকে রাজধানী নিয়ে যান চাম্বা। কিন্তু চাম্বার কথা তো আর এখন নয়, এখন যে ভারমৌরের কথা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে ছাতরারীর কথা। আমরা ছাতরারীর সব চেয়ে ঘন-বসতিপূর্ণ অংশে পৌঁছে গেছি।

সারি সারি বাড়ি। পাথর মাটি আর কাঠের তৈরি। দু-সারি বাড়ির মাঝে সরু স্যাঁতস্যাঁতে গলি, পাহাড়ী গ্রাম যেমন হয়। মেয়েরা ভিড় করেছে বাড়ির দাওয়ায়, পথের পাশে আর ঝরণার ধারে। তারা দেখছে, আমাদের, আমরাও দেখছি তাদের। দেখতে দেখতে পথ চলেছি—ছাতরারী গাঁয়ের পথ।

সহসা বৃষ্টি নামল। আমরা তাড়াতাড়ি একটা ঘরের দাওয়ায় আশ্রয় নিলাম। কয়েকটি মেয়ে উল বুনছিল, তারা ঘরের ভেতরে বসতে দিল। আলাপ করল সুজয়ার সঙ্গে। একটি শশা খেতে দিল তাকে। বলা বাহুল্য আমরাও ভাগ পেলাম। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থামলে বিদায় নিলাম সে বাড়ি থেকে।

অবশেষে রাজকীয় উচ্চ মাধ্যমিক পাঠশালা অর্থাৎ ছাতরারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সামনে পৌঁছলাম। মন্দিরের সঙ্গেই স্কুল। বেশ বড় দোতালা বাড়ি, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। তবে পুরনো। আগে ধর্মশালা ছিল, এখন পাঠশালা হয়েছে। শুনলাম প্রায় আড়াই শ ছাত্র-ছাত্রী আছে। পাঁচ-ছ মাইল দূর থেকে ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে। স্কুলের সামনে একফালি মাঠ। তার পরেই দোকানপাট। বাড়ি-ঘর রয়েছে চারিদিকেই।

আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা বেরিয়ে আসে বাইরে। শিক্ষকরাও ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে আসেন। তাঁরাও ছেলে-মেয়েদের মতই নিরীক্ষণ করতে থাকেন আমাদের। আমরা যেন আজব দেশের মানুষ, এমন মানুষ জীবনে দেখে নি ওরা।

কিন্তু কেবল দেখে মোহিত হবার পাত্র-পাত্রী নয় ছাতরারীর ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা তাই আমাদের, বিশেষ করে সুজয়াকে, লক্ষ্য করে নানা রকম উক্তি করতে শুরু করে দিল, সেই সঙ্গে বিশ্রী ধরনের মুখভঙ্গি। মনে পড়ল খাজিয়ার বিদ্যালয়ের কথা। কিন্তু এর জন্য তো

ছেলে-মেয়েরা দায়ী নয়। দায়ী তারা, যারা ঐ দূরে দাঁড়িয়ে ওদের এই অশালীন আচরণ দেখে মুচকি হাসছেন, উপভোগ করছেন—এই অনুপযুক্ত শিক্ষকের দল।

আমরা ওদের অপমান গায়ে না মেখে এগিয়ে চলি। একটা চায়ের দোকানে এসে বসি। কয়েকটা ছেলে ধাওয়া করেছে এ পর্যন্ত। ওরা দোকানের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। দেখছে নয়, গিলছে। আমরা দোকানীকে চায়ের ফরমাশ করে খাবারের থলি খুলি।

অসিতবাবুকে পকেট থেকে পার্স বের করতে দেখে একটি ছাত্র অবিষ্কার করে, 'ঐ টাকামাথা মানুষটাই খাজাঞ্চী।' সঙ্গীরা সমর্থন করে তাকে।

মানসী হো হো করে হেসে ওঠে। ছাতারারীর কথা থামাতে হয় আমাকে। হাসি থামিয়ে মানসী জিজ্ঞেস করে, "অসিতবাবুর মাথায় বুঝি টাক পড়েছে ? বয়স কতো ভদ্রলোকের ?"

"টাক পড়ার মতো নয়।" অমি উত্তর দিই, "একটু অসময়ে টাকটা পড়েছে। তবে তার জন্য তিনি মোটেই দুঃখিত নন। কারণ তাতে তাঁর সুবিধেই হয়েছে। আমাদের কাছে সিনিয়রের ভূমিকা দাবী করতে পারছেন।"

অসিতবাবুর প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেছে, তবু ছাতরারীর প্রসঙ্গ শুরু করতে পারি না। মানসীর আকস্মিক প্রশ্নে ছাতরারী থেকে মানালী চলে এসেছি। হিড়িম্বা মন্দির দর্শন করে আমরা টুরিস্ট-বাংলোয় ফিরে চলেছি। মানালীর পথে চলতে চলতে মানসীকে ছাতরারীর কথা বলছিলাম।

"চুপ করে রইলে কেন ?" মানসী প্রশ্ন করে। "তার পরে কি হল ? চা খেয়ে তোমরা কি মন্দিরে এলে ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু মন্দিরের কথা বলার আগে, চায়ের দোকানটির কথা আরেকটু বলে নিতে হয়।"

"বেশ বল।" মানসী সম্মতি দেয়।

আমি আবার শুরু করি—

ছাতরারীর সেই চায়ের দোকানে আলাপ হল কয়েকজন গদ্দির সঙ্গে। হাঁটু পর্যন্ত পশমের আলখাল্লা, কিন্তু খালি পা। কোমরে পশমের দড়ি জড়ানো—ওরা বলে শিবের জটা। মণিমহেশের পরম ভক্ত গদ্দিরা। ওরা মণিমহেশের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান যাত্রী। ওদেরই কোন পূর্বপুরুষকে দর্শন দিয়েছিলেন মণিমহেশ। শেষ পর্যন্ত তাকে অবশ্য মণিমহেশের অবাধ্য হবার জন্য পাথরে পরিণত হতে হয়েছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। তবে গদ্দিদের সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলে নিই।

গদ্দিরা চাম্বা জেলার যাযাবর উপজাতি সমূহের অন্যতম। এদের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। এরা বছরের ন-মাস ভেড়া নিয়ে দুর্গম গিরি-কান্তারে কাটায়, আর তিন মাস বাড়িতে থাকে। এদের বাড়ি-ঘর কিন্তু খারাপ নয়—বেশ আরামদায়ক। এদের স্বভাব ভাল, ব্যবহার ভাল। চেহারা ভাল, পোশাক ভাল। এরা বড়ই সৎ। জেনারেল ব্রুস এদের সম্পর্কে বলে গেছেন—'The Gaddis were very interesting, and the little children, the most interesting little people, quite independant and full of play.'

চা খাওয়া হলে উঠে দাঁড়াই, আর একবার ভাল করে দেখে নিই দোকানখানি। যতই জরাজীর্ণ হোক, দর্শনীয়। হিন্দী ছবির নায়ক-নায়িকা থেকে জওহরলাল, লালবাহাদুর ও রবীন্দ্রনাথের একখানি করে ছবি টাঙানো আছে। প্রধানমন্ত্রীদের ছবি থাকতে পারে। তাই বলে ছাতরারীর চায়ের দোকানে রবীন্দ্রনাথের ছবি। ছাতরারী মানুষ রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে

পরিচিত নয়, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে তারা জানে। রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বের দরবারে ভারতের পরিচয়।

আমরা আবার স্কুলে এলাম। স্কুল পেরিয়ে পাথর বাঁধানো বিরাট অঙ্গন। সেই আঙ্গিনার একপাশে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় মন্দির। মন্দিরের তিন দিকেই আঙ্গিনা।

পশ্চিম-মুখী চৌ-চালা মন্দির। স্লেট পাথরের চাল। মন্দির শীর্ষে পেতলের শিখর-কলস। শিব ও শক্তির মন্দির। শক্তির সাধক ছিলেন মহারাজ মেরু ভার্মা।

পাঁচ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আবার আট ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে মন্দিরের দ্বার। মন্দিরের চারিদিকেই বারান্দা।

কাঠের দরজা, স্তম্ভ ও চাঁদোয়ায় অপূর্ব সুন্দর খোদাই কাজ। দারুশিল্পের এমন উৎকৃষ্ট নিদর্শন এর আগে আমি আর দেখি নি। সেকালের শিল্পীদের এই অমর সৃষ্টি দর্শনের জন্যই বর্ষণাসিক্ত দুর্গম পথ পেরিয়ে ছুটে এসেছি ছাতরারী। সার্থক হয়েছে সকল শ্রম।

গর্ভগৃহটি পাথরের তৈরি। কেবল কাঠ নয়, পাথরের ওপরের অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকর্ম। তিন দিকের দেয়াল—যেন শিল্পীর মানসপীঠ।

দুঃখের কথা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই অমর শিল্পসৃষ্টি দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ মন্দির সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের সম্পত্তি। কিন্তু তাঁরা রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাই করেন নি। সামান্য মাসোহারার বিনিময়ে একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার একার পক্ষে এ মন্দিরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা অসম্ভব।

॥ নয় ॥

কাল সকালে মানসী দরজা খোলে নি, সে আমার আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল। আর আমি ছিলাম ওর করাঘাতের প্রতীক্ষায়। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা ও প্রতীক্ষাই সার হয়েছে। মাঝখান থেকে মানসীর অভিমান ভাঙাতে নাজেহাল হতে হয়েছে।

আজ তাই ঘুম ভাঙতেই শয্যা ত্যাগ করি। বাথরুম সেরে বাইরে বেরিয়ে আসি। মানসীর রুদ্ধদ্বারে আঘাত করি।

দ্বার খুলে যায়। মানসী যেন আমার আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল। খুশিভরা স্বরে বলে, "সুপ্রভাত।"

"সুপ্রভাত।" আমি সাড়া দিই।

মানসী বলে, "গুড বয়।"

আমি বলি, "গুড গার্ল।"

মানসী হাসে। আমি হাসি।

হাসি থামলে মানসী বলে, "ভাল ছেলে ও ভাল মেয়ে কি এবারে চা খেতে যাবে ?"

"গেলে তো ভালই হয়।"

"তাহলে তাই হোক।"

আমরা বেরিয়ে আসি টুরিস্ট-বাংলা থেকে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলি। তার পরে মানসীকে বলি, "আজ তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি মানালী ছেড়ে ?"

"হ্যাঁ।" মানসী বলে।

"ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। মানালী বড় সুন্দর।"

"সুন্দর যে চিরকাল ক্ষণস্থায়ী। এই যে আমাদের পরিচয়, হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা—এও তো ক্ষণস্থায়ী। একদিন আমাদের দুজনকেও বিদায় নিতে হবে দুজনের কাছ থেকে আর সেদিন তো খুব দূরে নয়। কিন্তু তাতে এই সুন্দর দিনক'টির সৌন্দর্য ফুরিয়ে যাবে না। এরা চিরসুন্দর হয়ে রইবে আমাদের মনের মণিকোঠায়।"

আমি নির্বাক। মানসীও আর কিছু বলে না। সে নীরবে পথ চলে আমার পাশে পাশে।

কিন্তু বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারি না আমি। আস্তে আস্তে বলি, "তোমার কি এই দিনগুলির কথা মনে থাকবে মানসী ?"

"থাকবে।" একবার থামে মানসী। তার পরে হঠাৎ হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই অভিযোগ করে, "কিন্তু আমাকে মানসী বলে ডাকা হচ্ছে কেন ? আমি তো অমন করে নাম ধরে ডাকার অধিকার দিই নি।"

"কোন অধিকার কেউ কাউকে দেয় না মানসী ! অধিকার অর্জন করতে হয়।"

চা ও জলখাবার খেয়ে কুলি ঠিক করে আমরা ফিরে আসি টুরিস্ট-বাংলোয়। স্নান করে মালপত্র গুছিয়ে নিই। কুলি এসে যায়। মালপত্র নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসি। টিকেট করে বাসে উঠি। সাড়ে দশটায় বাস ছাড়ে। আমরা বিদায় নিই মানালীর কাছ থেকে। মানসীর মতে সুন্দরী-মানালীর কাছে। কারও কারও মতে স্বর্গীয় কুলু উপত্যকার নন্দনকানন থেকে।

আঁকাবাঁকা মসৃণ উৎরাই পথ। পথের দু ধারে ক্ষেত-খামার, বাড়ি-ঘর আর বন।বহুদূরে নীল আকাশের গায়ে হিমালয়ের রূপোলী রেখা। কিছু কাছে পাহাড়ের কালো রেখা। আর বনের ধারে সবুজ পাহাড়। চারিদিকে নানা রঙের ছড়াছড়ি। এই রঙের জন্যই কুলু উপত্যকা এমন সুন্দর। যাঁরাই এসেছেন এখানে, তাঁরাই কুলুর রঙ দেখে মোহিত হয়েছেন। মেজর ব্রুসের কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন—

'The colouring of the Kulu Valley is almost impossible to express in words. Artists should make it their own....Kulu colour is in a class one, and this richness and brilliance gives a charm and character peculiar to itself.'

ব্রুস লিখেছেন ১৯১২ সালের কথা। তার পরে জগতের কতো পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কুলু উপত্যকার সৌন্দর্য আজও অম্লান। কুলু আজও তেমনি রঙীন।

কিছুক্ষণ বাদে বাদে অবশ্য দৃশ্যপট পরিবর্তিত হচ্ছে। কারণ প্রকৃতি পরিবর্তনশীলা। কিন্তু তার মাঝেও কোন পরিবর্তন নেই বিপাশার। সে একইভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ছুটে। কখনও পাহাড়ের পা ছুঁয়ে, কখনও অরণ্যতটকে সিক্ত করে, কখনও বা গমের শিষে দোলা দিয়ে বিপাশা চলেছে বয়ে।

কুলুর কথা ভাবতে গিয়ে বিপাশার কথা ভাবতে বসেছিলাম। ভাবছিলাম বিপাশার কোন পরিবর্তন নেই। ভুলেই গিয়েছিলাম আমার পাশের মানুষটির কথা। বুঝতে পারছি, তাকে বিস্মৃত হওয়া উচিত হয় নি আমার। কারণ সেও যে বিপাশারই মতো। কুলু উপত্যকার এই পরিবর্তনশীলা প্রকৃতি বোধকরি তারও কোন পরিবর্তন করতে পারে নি। আর তাই সহসা সে বলে উঠেছে, "আচ্ছা, ছাতরারী থেকে তোমরা তো আবার ফিরে এলে দুগেঠী ?"

মানসীর দিকে চোখ ফেরাই। কুলু উপত্যকাকে হারিয়ে ফেলি। মানসীর দুচোখে মৌন জিজ্ঞাসা। আমি উত্তর দিই, "হ্যাঁ।"

"তারপরে ?"

"পরদিন সকালে দুগেঠী থেকে শুরু হল পদযাত্রা—মণিমহেশ যাত্রা। আমরা ভারমৌর রওনা হলাম।"

"চুপ করলে কেন, বল না সে যাত্রার কথা। আমার তো যাওয়া হবে না কোনদিন।" মানসী বলে।

"কেন হবে না। তেমন কিছু কঠিন নয় সে পথ, দীর্ঘ তো নয়ই। মাত্র দিন পাঁচেকের হাঁটাপথ। চাম্বা ফিরে আসতে আট-নয়দিন সময় লাগে।" আমি বলি।

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার পক্ষে তো একা যাওয়া সম্ভব নয়। পথের সাথী পাব কোথায় ? আমি যে সাথীহারা।"

"আপত্তি না থাকলে সাথী হতে রাজী আছি।"

"আমিও অরাজি নই কিন্তু...."

"থামলে কেন ?" জিজ্ঞেস করি।

মানসী বলে, "কিন্তু তুমিই তো লিখেছ—পথের পরিচয়কে পথেই বিদায় দিতে হয়। পথের প্রীতি নাকি ঘরের বন্ধ হাওয়ায় বিষাক্ত হয়ে যায়।"

"যারা ঘরের মানুষ, কথাটা তাদের বেলায় সত্যি। কিন্তু যারা পথের মানুষ, তাদের বেলায় তো একথা খাটে না মানসী।"

"না, না...অমন করে বলো না, আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, আর দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাই না।" মানসীর চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। তাড়াতাড়ি চোখ মোছে সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে—নিজেকে সামলে নেয়। তার পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলে, 'তার চেয়ে তুমি মণিমহেশের কথা বলো, আমি শুনি। তোমার কাছে হিমালয়ের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে—আমি যে তোমার অনুগত পাঠিকা। সেদিন মানালীতে তোমাকে যখন আবিষ্কার করলাম, তখুনি ঠিক করলাম এ যাত্রায় আর তোমার সঙ্গ ছাড়ছি নে।"

"তাই তো আমি তোমার সঙ্গী হতে চাইছি।"

"আমি তো তোমার সঙ্গেই রয়েছি সখা। কিন্তু একসঙ্গে এই পথ-চলার পালা পাঠানকোট সাঙ্গ করে দিতে হবে। একে আমি কিছুতেই কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাব না। কলকাতা যে বড়ই কঠিন।"

"বেশ তাই হবে।"

"এবারে তাহলে মণিমহেশ যাত্রার কাহিনী শুরু কর।"

একবার বাইরে তাকাই। মসৃণ উৎরাই পেরিয়ে বাস ছুটে চলেছে—চলেছে মানালী থেকে কুলুতে।

"চুপ করে আছো কেন ?" মানসী তাগিদ দেয়, "ছাতরারী থেকে শুরু করো।"

"বেশ," আমি বলতে থাকি। মানসী ঠিক হয়ে বসে। আমি বলে চলি—

মন্দির দর্শন করে ছাতরারী থেকে দুগেঠী রওনা হলাম। আবার বৃষ্টি নামল। কিন্তু আমরা থামলাম না। বৃষ্টি মাথায় করেই সে পিচ্ছিল উৎরাই পথ পেরিয়ে নেমে এলাম নিচে। দু ঘন্টা বাদে ফিরে এলাম দুগেঠী বিশ্রাম ভবনে।

আমাকে চুপ করতে দেখে মানসী বলে ওঠে, "একি থামলে কেন ?"

"ছাতরারীর কথা শেষ হয়ে গেল বলে।"

"তুমি দেখছি বড্ড ফাঁকিবাজ। কিন্তু সংসারে সবাইকে ফাঁকি দেয়া যায় না।" মানসী একবার থামে। তারপর বলে, "আমি ভুল বলেছিলাম তখন। আমি শুনতে চাই না ছাতরারীর কথা, আমি শুনতে চাইছি দুগেঠী, ভারমৌর আর মণিমহেশের কথা।"

অগত্যা শুরু করতে হয় আমাকে—

পরদিনও খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল আমার। মুক্ত বাতায়ন দিয়ে বাইরের বিশ্বকে দেখলাম—আধো-আলো, আধো-ছায়ায় ঢাকা মোহময়ী বসুন্ধরা। তবে সে অসীমা নয়। কেবল সামনের পাহাড়টার খানিকটা আর একমুঠো আকাশ নিয়ে তার বিস্তার। তবু আমি অপলক নয়নে চেয়েছিলাম তার দিকে। মুগ্ধ আবেশে দেখছিলাম পাহাড় আর আকাশের রঙ-বদলের পালা। পাহাড়টা ছিল কালো আর আকাশটা ধূসর। পাহাড়টা ধীরে ধীরে ধূসর হচ্ছিল আর আকাশটা সাদা। এতক্ষণ পাহাড়টা যেন কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল। সেই পর্দাখানি কেউ নিয়েছে সরিয়ে। পাহাড়ের বুকে তাই জেগে উঠেছে গিরি-শিরার অচঞ্চল ঢেউ, যেন শব্দহীন সমুদ্রের স্তব্ধ ঊর্মিমালা।

একটু একটু করে পাহাড়টা সবুজ হল! ঝরণার মালা পরে সে হাসতে হাসতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ভেবেছিলাম আকাশটা নীল হবে, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হল না। সে আমাকে নিরাশ করল—মেঘে ঢাকা আকাশ। সে আমার অভিমানী মানসীর মতো গম্ভীর হয়ে রইল।

"এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" মাঝখান থেকে মানসী বলে ওঠে।

আমি হেসে ফেলি। মানসী আবার বলে, "পাহাড় আর আকাশের কথার মাঝে আমার কথা কেন?"

"তুমি যে মানসী। শিল্পীর মানসলোকের কল্পনা-সুন্দরী—

'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।'..."

"তাই তো আমার ওপরে পড়েছে তোমার প্রদীপ্ত বাসনা—অর্ধেক মানবী আমি, অর্ধেক কল্পনা।" আমি থামতেই মানসী বলে ওঠে।

আমি হেসে বলি, "ঠিক তাই।"

"কিন্তু আমি তো বক্তার কল্পনা-সুন্দরীর কথা শুনতে চাই নি। আমি শুনতে চাইছি, দুগেঠী থেকে ভারমৌর যাবার কথা।"

আর কথা না বাড়িয়ে আমি আবার বলতে শুরু করি—

কাজেই দুগেঠীর বিশ্রাম ভবনে বসে আর সূর্যের সঙ্গে দেখা হল না। সে জন্য দুঃখ করি নি। সূর্যের জন্য তো হিমাচলে আসি নি, হিমালয়ের জন্যই হিমাচলে এসেছি। হিমালয় স্বাগত জানাচ্ছিল।

দুটি ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে সকাল সওয়া আটটার সময় আমরা নেমে এলাম পথে। বর্ষণসিক্ত হলেও মসৃণ প্রশস্ত পথ—সামান্য চড়াই। দুগেঠী থেকে ভারমৌর ১৫ মাইল। পনেরো মাইলে মাত্র দু' হাজার ফুট উঠতে হবে। কারণ দুগেঠীর উচ্চতা ৫০০০ ফুট আর

ভারমৌর ৭০০০ ফুট। এ পথে জীপ চলাচল করে। কিন্তু আমরা জীপে যাবার জন্য কোন চেষ্টা করি নি। জীপে করে গেলে যে হিমাচলের সীমাহীন সৌন্দর্য দর্শন করতে পারব না।

কিছুদূর এসে পথের ধারে সাইনবোর্ড—

Maternity & Child Welfare Centre.

এখানে তাহলে একটা প্রসূতি সদন ও শিশু চিকিৎসালয় আছে। ভারী আনন্দ হল। কিন্তু তার পরেই ভাবলাম, চিকিৎসালয় তো আছে কিন্তু চিকিৎসক আছে কি ? হিমালয়ের অধিবাসীদের সবচেয়ে বড় শত্রু অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য। প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত সামান্য হলেও, সরকার কোথাও কোথাও এমনি চিকিৎসালয় খুলেছেন। কিন্তু ডাক্তারের অভাবে সেগুলি সাধারণতঃ বন্ধই থাকে।

পথের বাঁ দিকে ইরাবতী, ডান দিকে পাহাড়। কোথাও পাহাড় পথের পাশে, কোথাও বা একটু দূরে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে কিংবা পথের ধারে ছোট ছোট ক্ষেত। বাড়ি-ঘর বড়একটা দেখছি না।

ইরাবতীর ওপারেও পাহাড়। হিমাচল যে পাহাড়-সর্বস্ব। তবে ওপারের পাহাড় এপারের মতো নয়। ওপারের পাহাড় ইরাবতীর গা থেকে খাড়া উঠে গেছে ওপরে—অনেক ওপরে। ওপারের পাহাড়ে গাছপালা নেই বললেই চলে। কিন্তু রুক্ষ হলেও ওরা রূপহীন নয়। অদ্ভুত তাদের গড়ন। তারা বহুবর্ণময়। মনে হচ্ছে কেউ যেন খোদাই করা পাথরের প্রাচীরে রামধনু এঁকে রেখেছে।

ডান দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরণা নেমে এসেছে। মাদ্রাজী বাবা স্নান করছিলেন ঝরণাধারায়। মাদ্রাজীবাবার কথা বলা হয় নি তোমাকে। আগের দিন সন্ধ্যার দুর্গেঠীর মুদি দোকানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমাদের। তিনি হিমালয়ের প্রায় তাবৎ তীর্থ দর্শন করেছেন। এখন মণিমহেশ দর্শন করে ফিরছেন। তিনি মাদ্রাজীবাবা নামে পরিচিত হলেও সন্ন্যাসী নন, জ্যোতিষী। পাঠানকোটে বাস করেন। ঠিকানা দিয়েছেন। ফেরার পথে তাঁর আস্তানায় যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। যাবে নাকি ?

"না।" মানসী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

"কেন ?"

"কি হবে হাত দেখিয়ে। আমার ভাগ্য পরিবর্তন করার সাধ্য নেই তোমার মাদ্রাজীবাবার। যাক্ গে, ওসব বাজে কথা রেখে, যা বলছিলে বল।"

আমি বলতে শুরু করি—

মাদ্রাজীবাবার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। কিছুদূর এসে আর একটা সাইনবোর্ড—

Boundary, Trehla Forest Range–Chamba,

চারদিকে তাকাই। কোথায় ফরেস্ট ? দুদিকেই বনহীন প্রস্তরময় পাহাড়।

ডান দিকের পাহাড়টি বড়ই বিচিত্র। পাহাড় নয় যেন একটি পাথরের উপত্যকা। আস্তে আস্তে নেমে এসেছে। তবে শুধুই পাথর—ছোট বড় পাথর। পাথর না হয়ে মাটি হলে এখানে বেশ বড় একটি গ্রাম গড়ে উঠতে পারত।

'দেখুন দেখুন, মেঘ কেটে গেছে। কেমন সুনীল আকাশ। আর আকাশে চাঁদ।' সুজয়া চলতে চলতে বলে ওঠে।

'তাই তো।' অসিতবাবু উত্তর দেন, 'এ তো ভারী মজা দেখছি।'

সত্যই তাই। আকাশ নয় যেন একখানি ঘননীল চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিতা পৃথিবী। নীলের মাঝে সাদা চাঁদ—বাঁকা একফালি চাঁদ। হিমালয়ের সূর্য তাকে আকাশ থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

চাঁদ নয়, আমি ভাবছিলাম সূর্যের কথা। হিমালয়ের সূর্য সবল নয়, তবু সে অপরিহার্য পথচারীদের কাছে। সূর্যের সাহায্য ছাড়া সফল হয় না কোন হিমালয় অভিযান। সূর্যই পর্বতাভিযাত্রীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

তিন মাইল এসে খারামুখ। ইরাবতী ও বুর্ডঢাল নদীর সঙ্গম। বুডঢাল এসেছে চোবিয়া গিরিবর্ত্ম থেকে। বুডঢালের তীরেই ভারমৌর। আমরা ভারমৌর যাচ্ছি। কাজেই এবারে বিদায় নিতে হবে ইরাবতীর কাছ থেকে। মায়াবতী ইরাবতী—অমরাবতী চাম্বার প্রাণধারা। সেদিন খাজিয়ার থেকে চাম্বা আসার পথে তার সঙ্গে সেই যে দেখা হয়েছিল, তারপর থেকে সে ছিল সর্বদা আমার সঙ্গে। আজ যেতে হবে তাকে ছেড়ে। উপায় নেই আমি যে পথিক—হিমালয় পথিক। পথই আমার সব। পথের জন্য ঘর ছেড়েছি। পথের জন্যই আজ ইরাবতীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

ইরাবতীকে বিদায় দিয়ে বুডঢালের সঙ্গী হতে হবে। ওপারে সঙ্গম। কাজেই ওপারে যেতে হবে। কাজটি খুব সহজ নয়। এখানে পুল নেই। পুল প্রায় মাইল খানেক আগে—যেখানে ইরাবতী সবচেয়ে সংকীর্ণা। এক মাইল চড়াই ভেঙে সেই কাঠের পুল পেরিয়ে আবার এক মাইল পেছিয়ে এসে বুডঢালের সঙ্গী হতে হবে।

তবে অদূর ভবিষ্যতে মণিমহেশ যাত্রীদের আর এক চড়াই পেরোতে হবে না। খারামুখে পুল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ পুল তৈরি হলে, যাত্রীরা সোজা পথে ইরাবতী পেরোতে পারবেন।*

খারামুখে কোন গ্রাম নেই। আছে একটা শিব-মন্দির। পথের বাঁ দিকে—নিচে, ইরাবতীর বেলাভূমিতে। ওরা বলে শঙ্করজীর মন্দির। কেবল মন্দির নয়, সেখানে সরাই আছে একটি। নিরাশ্রয় তীর্থযাত্রীদের আশ্রয় মেলে সেখানে। তবে সেটি কয়েকজন সাধুর স্থায়ী আশ্রয়। পথ থেকে মন্দির ও সরাই ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

খানিকটা এগিয়ে এক বিচিত্র ধসের সম্মুখীন হলাম। ডানদিকের গোটা পাহাড়টা যেন পড়ছে ধসে। ধসের সঙ্গে ছিন্নমূল বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ে পথ হয়ে উঠেছে দুর্গম। নির্মাণ-বিভাগের শ্রমিকরা পথ পরিষ্কার করছে।

বিচিত্র ধস ছাড়িয়ে বিচিত্র আশ্রয়। পথের পাশে একখানা বড় পাথরের নিচে গর্তের ভেতরে সুন্দর আশ্রয়টি। পাথরখানির ওপরে লেখা—'গন্দাকী বিমারী কী জ্বর হ্যায়।'

অসিতবাবুর শখ হল ছবি নেবার। সুজয়াও কোন আপত্তি করল না। ক্ষণকালের জন্য আমরা সেই বিচিত্র আবাসের বাসিন্দা হলাম। অসিতবাবু ছবি নিলেন।

ডান দিকের খাড়া শ্লেট পাথরের পাহাড়। এই পাহাড়টার পরেই সেই কাঠের পুল, যে পুল পেরিয়ে আমরা ওপারে যাব। ওপারের পথটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ওপারে যাবার পরে তাকে আর এমন সুন্দর দেখাবে না। সুন্দরকে দেখতে হয় দূর থেকে। কাছে গেলে, সুন্দর তার সৌন্দর্য ফেলে হারিয়ে।

---

* এখন খারামুখের পুল তৈরি হয়ে গিয়েছে ভারমৌর পর্যন্ত বাসপথ প্রসারিত হয়েছে। চাম্বা থেকে এই ৪৪ মাইল পথ বাসে আসতে ঘন্টা ছয়েক সময় লাগে।

"কথাটা আবার ভুলে যেও না যেন।" মানসী হঠাৎ কথা বলে ওঠে।

থামতে হয় আমাকে। দুগেঠী থেকে ভারমৌর যাবার কথা বন্ধ করে হেসে মানসীকে বলি, "ভুল তো মানুষ স্বেচ্ছায় করে না, ভুল হয়ে যায়। যদি কখনও ভুল করি, নিশ্চয়ই ও কথাটা ভুলে গিয়েই ভুল করব। তবে ভয় কি, ভুল ধরিয়ে দেবার মানুষ তো সঙ্গেই রয়েছে।"

"আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে, এখন ভারমৌর পথের কথা বলো।"

"আমি বলতে থাকি—

পথের পাশে একখানি পাথরে লেখা, 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ।' আমরা দুগেঠী থেকে চার মাইল এগিয়েছি। দেড় ঘন্টায় চার মাইল, মোটেই খারাপ নয়। বিশেষ করে সঙ্গে সুজয়া রয়েছে।

আবার বাধা দেয় মানসী। থামতে হয় আমাকে। মানসী আমার উক্তির প্রতিবাদ করে, "তিনি সঙ্গে না থাকলেও তোমরা এর থেকে বেশি হাঁটতে পারতে না।"

"কেমন করে জানলে ?" আমি প্রশ্ন করি।

মানসী উত্তর দেয়, "তোমারই কাছ থেকে। তুমিই বলছো—সুজয়াদেবী দার্জিলিং থেকে পর্বতারোহণ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি আগামী বছর বাংলার প্রথম মহিলা পর্বতাভিযাত্রী দলের ম্যানেজোর হয়ে রোন্টি অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। কাজেই তাঁর জন্য তোমাদের গতিবেগ মন্থর হতে পারে না।"*

মানসীর উক্তিতে বিস্মিত হই না। মেয়েরা একে অপরের যতো সমালোচনাই করুক, নিজেদের ব্যাপারে ওরা সবাই একজোট। কাজেই আমি মানসীর কথার কোন প্রতিবাদ না করে বলতে শুরু করি—

একটি নয়, পর পর দুটি কাঠের পুল পেরিয়ে ইরাবতীর অপর তীরে পৌঁছলাম। উল্টো দিকে হেঁটে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় বুডঢাল ও ইরাবতীর সঙ্গমে এলাম। ছোট সঙ্গম, কিন্তু বড়ই সুন্দর। মণিমহেশের চরণামৃত বহন করে এনে ইরাবতীকে সমর্পণ করছে বুডঢাল। সে এসেছে স্বর্গলোক থেকে, তাই তার গতিবেগ এতো দুর্বার, সে এমন আবেগে উদ্বেলিত—তার শিবসেবা সাঙ্গ হল।

বুডঢালের তীর দিয়ে চড়াই পথ। সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চলি।ইরাবতী পড়ে থাকে পেছনে। বহুদিন ছিলাম একসঙ্গে। বিরহের বেদনা বোধ করছি কিন্তু বিচলিত হচ্ছি না। এই যে সংসারের নিয়ম। কেউ চিরকাল থাকে না পাশে। একদিন এমনি করেই আপনজনের কাছ থেকে নিতে হয় বিদায়—চির বিদায়।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারি—ইরাবতী যদি হয় মায়াবতী, বুডঢাল তাহলে মায়াময়। আমরা বুডঢালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলাম। তাকে পেয়ে ইরাবতীর অভাব বিস্মৃত হলাম। আশ্চর্য মানুষের মন। সে বড়ই স্বার্থপর।

দু'পাশে আঁকাবাঁকা আকাশ-ছোঁয়া খাড়া পাহাড়। তাদেরই বাঁকে বাঁকে বয়ে আসছে বুডঢাল। যেন সুবিরাট সাদা একটা সরীসৃপ শুয়ে আছে।তার মাথার মণি সূর্যালোকে জ্বল জ্বল করছে। হিমালয় তার গিরিবাহুপাশে বন্দী করতে পারে নি তাকে। হিমাচল তার রূপের মোহ ছড়িয়ে ভোলাতে পারে নি তাকে। সে স্বর্গের সদা জাগ্রত সেবক, মর্ত্যলোকের শ্রান্তিহীন

---

* লীলাভূমি-লাহুল দ্রষ্টব্য।

পথিক। মণিমহেশের করুণাবারি বহন করে নিয়ে আসছে অনন্তকাল ধরে।

ওপারের পাহাড়গুলি তেমনি খাড়া, তাদের বুকে তেমনি বহুবর্ণের সমারোহ। তবে মাঝে মাঝে সবুজ ঝোপঝাড় থাকায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

এপাড়ের পাহাড়ও রূপহীন নয়। এক একটি গিরিশিরার এক এক রূপ। প্রায় প্রত্যেকের আলাদা রঙ—কোনটি সবুজ, কোনটি বাদামী, কোনটি লাল, কোনটি বা কালো। অপরূপ এই হিমাচল।

সহসা চলা বন্ধ করতে হল। অসিতবাবু ক্যামেরা খুললেন। সুজয়া মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। সামনের পাহাড়টির পেছনে সূর্য রয়েছে লুকিয়ে। আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তার কিরণসম্পাতে সমৃদ্ধ হয়েছে আকাশের ঐ সজল মেঘ। সূর্য তার কোমল অঙ্গে রামধনুর পরশ বুলিয়েছে। নীলাকাশে রঙের আগুন লেগেছে।

পথের পাশে পাহাড় সরে গেল দূরে। দৃষ্টি প্রসারিত হল। আমরা একটি সুপ্রশস্ত সবুজ উপত্যকায় উপনীত হলাম। পথের দুপাশে ওপরে ও নিচে ক্ষেত-খামার--রামদানা, ভুট্টা, কুমড়া, বেগুন, ইত্যাদি। ওপরের দিকে বাড়িঘর। নদীর ওপারেও পাহাড়ের গায়ে ক্ষেত আর বাড়ি।

এ গ্রামের নাম লাহাল। দুর্গেঠী থেকে আট মাইল এসেছি। এখান থেকে ভারমৌর সাত মাইল।

পথের ডানদিকে খানিকটা উঁচুতে কয়েকটি বাড়ি। তারই একটি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে একজন মধ্যবয়সী লোক আমাদের আমন্ত্রণ জানায়, 'আইয়ে মেমসাব, আইয়ে সাব—মিঞাকা হোটল। খানা মিলেগা, চায় মিলেগী।'

দুর্গেঠী ডাকবাংলোর চৌকিদার বলে দিয়েছিল এই হোটেলের কথা। মালিক নাকি অতিশয় সজ্জন ও অতিথিবৎসল। কেবল খাবার নয়, প্রয়োজনে আশ্রয় পাওয়া যায়।

আমরা উঠে এলাম ওপরে। মিঞা পিঠ থেকে বুকস্যাক নামাতে সাহায্য করলেন। ঠাণ্ডা জল দিলেন। শরীর শান্ত হল। একটু বাদে গরম চা এলো। মিঞা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি খাবেন ?'

অসিতবাবু বলেন, 'রুটি আমাদের সঙ্গে আছে। আপনি সবজি ও ডিমসিদ্ধ দিতে পারবেন কি ?'

'কেন পারব না।' মিঞা বলেন, 'ডাল ডিমসিদ্ধ সবজি সবই পেয়ে যাবেন। একটু বসলে ভাতও ফুটিয়ে দিতে পারি। কি পাবেন না আমার কাছে ? বিয়ার পর্যন্ত পেতে পারেন।'

'না, না, সে সবের দরকার নেই।' সুজয়া যেন ভয় পায় তাঁর কথা শুনে। 'আপনি ডাল ডিমসিদ্ধ আর সবজি দিন।'

আমরা মৃদু হাসি। মিঞাও হেসে ভেতরে চলে যান।

মিঞার নাম পৃথ্বিচন্দ্র কটোচ। তিনি জাতিতে রাজপুত। এদেশে সবাই সম্মান করে রাজপুতদের মিঞা বলে।

বেলা সাড়ে বারোটার সময় মিঞার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। রাস্তার ওপরেই একটা জলের কল। ওপরের ঝরণা থেকে পলিথিনের পাইপ দিয়ে জল এনে কল। হিমালয়ের প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য এই ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। নানা রকমের ধাতব লবণ মিশ্রিত পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা জলধারা

আমাশয় গলগণ্ড প্রভৃতি রোগের জীবাণু বহন করে আনে। পাইপ দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে এইভাবে পানীয় জল নিয়ে এলে রোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। কিন্তু কটা গ্রামেই বা এ ব্যবস্থা আছে। লাহাল বেশ বড় গ্রাম, তাই এখানে জলের কল। কিন্তু লাহালে পোস্ট অফিস নেই। পোস্ট অফিস আছে ওপরের খনিগ্রামে।

কিছুদূর এগিয়ে একটা সাইনবোর্ড—

SOIL CONSERVATION AFFORESTATION
Siridi–Supa, Area 250 Acres.

ক্ষেতের ভিতর দিয়ে পথ। খানিক বাদে চান্নিগ্রাম। জনসংখ্যা ২৪৩, চল্লিশ ঘর গৃহস্থের বাস। এ গ্রামটিও বেশ উর্বরা। পথের দুদিকেই সবুজ আর সোনালী ক্ষেত।

লাহাল থেকে চার মাইল এসে চালেড় ধার। সরকারী নাম মারু-চালেড্। রাস্তাটা পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী 'U' অক্ষরের মতো বাঁক নিয়েছে। পথের পাশে একেবারে খাড়া পাহাড়। বৃক্ষহীন প্রস্তরময় পাহাড়। ভাঙনের নেশায় সে সর্বদা মশগুল। একটু বৃষ্টি হলেই ভাঙতে শুরু করে। ওপর থেকে অতর্কিতে পাথর পড়ে পথে। পথচারীর ভাবলীলা সাঙ্গ হয়। চালেড়-ধার ভারমৌর পথের মৃত্যুফাঁদ। কিন্তু সে বড় সুন্দর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা তাকে দেখি। সুজয়া বলে, 'ছবি নিন।'

ডাক-রাণার দুখরিয়া সিং সঙ্গী হয় আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে পথ চলে আর নিজের কথা বলে—লাহাল থেকে ভারমৌর এই সাত মাইল পথের ডাক-হরকরা সে। আর একজন হরকরা দর্গেঠী থেকে লাহাল পর্যন্ত যাতায়াত করে। দুখরিয়া বিশ বছর ধরে এই সুখের কাজ করছে। সে বেশ সুখী—একশ' চল্লিশ টাকা মাইনে পায়। দোতলা বাড়ি আর কিছু ক্ষেতি করেছে লাহালে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। মেয়ে-জামাই ও ছেলে চাম্বাতে থাকে। জামাই নির্মাণ বিভাগের ওভারসিয়ার আর ছেলে বন-বিভাগের ক্লার্ক।

'ছেলের বিয়ে দাও নি?' সুজয়া প্রশ্ন করে।

'জী মেমসাব। দিয়েছিলাম।'

'বউ মরে গেছে বুঝি?' অসিতবাবু জিজ্ঞেস করেন।

'তাহলে তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু সে বেটি যমেরও অরুচি। বেঁচে থেকে আমাকে জ্বালাচ্ছে।'

'ছেলের কাছেই আছে তো?' আমি বলি।

রেগে যায় দুখরিয়া, 'সেই মেয়েটাকে আমার ছেলে ঘরে রাখবে! আমার ছেলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে তার বাপ-মায়ের কাছে আছে। এতো দিনে কবে আমি আবার ছেলের বিয়ে দিয়ে নতুন বউ ঘরে আনতাম। কিন্তু লেখা-পড়া শেখা আজকালকার ছেলে। কিছুতেই রাজি হচ্ছে না আবার বিয়ে করতে। তবে মেয়ে ঠিক করে রেখেছি। দেখতে অবশ্য তেমন ভাল নয়, কিন্তু বাপের অবস্থা খুবই ভাল। ওর মায়ের অসুখ বলে মিথ্যে খবর পাঠিয়েছি ছেলেকে। বাড়ি এলে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেব এবারে।'

'আগের বউ দেখতে কেমন?' সুজয়া জিজ্ঞেস করে।

'না দেখতে মেয়েটা ভালই। কাজ-কর্মও জানে।'

'খুব ঝগড়াটে বুঝি?

'না...ঠিক তাও নয়।'

'তাহলে তাকে ঘরে নিচ্ছ না কেন?' অসিতবাবু বললেন।

'ওর বাবার জবানের ঠিক নেই।'

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। দুঃখ হচ্ছে নিরপরাধ মেয়েটির জন্যে। তার দরিদ্র পিতা সম্ভবতঃ দুখরিয়া সিংয়ের দাবী পূরণ করতে পারে নি, তাই সে স্বামীর ঘর করতে পারছে না।

'বাপ-মা কোথায় থাকে ?' সুজয়া জিজ্ঞেস করে।

'জী, চাম্বাতে।' দুখরিয়া উত্তর দেয়। 'তাই বলে আমার ছেলে কখনই তার কাছে যায় না।'

'তুমি বুঝি মাঝে মাঝে চাম্বাতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসো ?' অসিতবাবু প্রশ্ন করেন।

'না জী। আমি আর কোথায় যেতে পারি ? আমাকে সারা বছর চাকরি আর ক্ষেতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে ছুটি-ছাটাতে ছেলে বাড়ি আসে, তখন সে যা বলে।'

ছেলে কি বলে, তা দুখরিয়া বলে না আমাদের। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, সে বাপকে যা বলে, তা সত্য নাও হতে পারে। লেখা-পড়া জানা ছেলে। সুন্দরী শহুরে বউ। দুজনেই বাস করছে চাম্বায়—ছোট শহর চাম্বা। বাপ বলছে ছেলে বউকে ছেড়ে দিয়েছে, অথচ বউয়ের কোন দোষ নেই। আর ছেলে রাজি হচ্ছে না আবার বিয়ে করতে।

বাঁক ফিরেই থমকে দাঁড়াই আমরা। সামনে সুবিস্তৃত সবুজ উপত্যকা—ভারমৌর। চাম্বা রাজত্বের সূতিকাগার। কেন যেন দুহাত জোড় করে প্রণাম করে দুখরিয়া। কাকে প্রণাম করছে জানি না, তবু আমরা তাকে অনুসরণ করি। তিনি কে জানি না। তবে দুখরিয়ার দেবতা যে আমাদেরও প্রণম্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই হাতজোড় করে আমরাও প্রণাম করি তাঁকে।

'এ কি, থামলেন কেন ?" আমাকে চুপ করতে শুনে চেঁচিয়ে ওঠে মানসী।

"আপনি বললে বলে।" আমি গম্ভীর স্বরে জবাব দিই।

"সে তো তুমি থামার পরে।" মানসী বলে।

"বলবে বুঝতে পেরে থেমে গেলাম আমি।"

"ইস্, একেবারে অন্তর্যামী। কিন্তু প্রভু ! আমি তো তারপরে তুমি বলেছি, তাহলে ভারমৌরের কাহিনী শুরু হচ্ছে না কেন ?"

"শুরু হবে না বলে।"

"কারণ ?"

"আমরা কুলু উপত্যকার সদর সুলতানপুরে এসে গেছি।" হাসতে হাসতে বলি।

এতক্ষণে বাইরের দিকে নজর পড়ে মানসীর। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে ওঠে, "আরে তাই তো, খেয়ালই যে করি নি।"

"কেমন করে করবে ? তুমি তো আর তোমাতে ছিলে না।"

"তা যা বলেছো, অমিও তোমার পাশে পাশে পথ চলছিলাম—চলেছিলাম মণিমহেশের পথে। সত্যি বলছি, বড় ভাল লাগছিল শুনতে।" মানসী বলে।

"তাই বলে, এখন আর শুরু করছি না সে পথের কাহিনী। একটু বাদেই বাস থেকে নামতে হবে আমাদের।

"তাহলে এখন থাক্। বাকিটা পরে শুনব।"

বাস চলেছে শহরের ভেতর দিকে। বাঁ দিকে বিপাশা, ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে বাড়ি-

ঘর, দোকান-পাট। শায়রা বাজারে এসে থামল আমাদের বাস। এটি সুলতানপুরের বড় বাজার। বাস অফিস, বড় বড় দোকান আর আড়ত, শিখ গুরুদ্বার, আর্য সমাজ মন্দির ও ধর্মশালা সবই শহরের এই অংশে। কয়েকজন যাত্রী নেমে যাবার পরে আবার বাস চলল।"

বাজারের পরে খানিকটা জায়গায় জনবসতি সামান্য। তার পরেই একটা পুল পেরিয়ে বাস পৌঁছল শহরের দ্বিতীয় অংশে। আবার শুরু হল ঘনবসতি। বাঁ দিকে বাসপথের নিচে খাড়া বাজার। চড়াই পথ পেরিয়ে বাস এসে থামল ঢালপুর ময়দানে।

মানসীর সঙ্গে বাস থেকে নেমে আসি। মাল-পত্র নামালাম ছাদ থেকে। তারপরে মানসীকে মাল-পত্রের পাহারায় রেখে, আমি চলি ট্যুরিস্ট্ অফিসে—আশ্রয়ের সন্ধানে।

আশ্রয় পাওয়া গেল, কিন্তু মানসীর জন্য আলাদা ঘর পাওয়া গেল না। দুজনেই ডরমিটারীতে জায়গা পেলাম। আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু ফল হয় নি কোন।

ফিরে এসে ভয়ে ভয়ে কথাটা বলি, "ছ'খানি খাটিয়া আছে ঘরে। আপাতত আমাদের তিনজন প্রতিবেশী রয়েছেন ঘরে। পরেও আরও একজন আসতে পারেন।"

সব শুনে মানসী চুপ করে থাকে।

আমি বলি, "কি করব বল, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কিছুতেই তোমার জন্য আলাদা ঘর পাওয়া গেল না।"

এবারে মানসী মৃদু হেসে বলে, "তাতে কি হয়েছে?"

"না, এতগুলো মানুষের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে তোমার অসুবিধে হবে।"

"অসুবিধে!" মানসী আবার হাসে। "রুমমেটরা যদি মানুষ হয়, মানসীর কোন অসুবিধে হবে না। মানালীতে দেখো নি, এক ঘর ভিনদেশী ছেলের সঙ্গে কেমন মহানন্দে রাত্রিবাস করেছি।"

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হই। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে আমরা ট্যুরিস্ট্ বাংলোর দিকে পা বাড়াই।

॥ দশ ॥

একালের হিমাচল সেকালের পাঞ্জাব-হিমালয়ের একটি অংশ। অবিভক্ত ভারতবর্ষে পাঞ্জাব-হিমালয় ছিল একটি চতুর্ভুজ সদৃশ পার্বত্য অঞ্চল—তিন শ' মাইল দীর্ঘ দেড় শ' মাইল প্রস্থ, সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ভুভাগ। পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী প্রবাহিত হয়েছে এই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। ২৬,৬২০ ফুট উঁচু নাঙ্গাপর্বত সহ বহু ছোট-বড় পর্বত শৃঙ্গ এই অঞ্চলে অবস্থিত।

ভারত বিভাগের পরে নাঙ্গাপর্বত সমেত পাঞ্জাব-হিমালয়ের একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অপর অংশটি রয়েছে ভারতে। প্রাক্তন পাঞ্জাব-হিমালয়ের এই ভারতীয় অংশটি এখন হিমাচল বলে পরিচিত। পাঞ্জাব-হিমালয় এখন কেবল টিঁকে আছে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে। ভারতের পাঞ্জাব এখন হিমালয়হীন।

চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গমালা আর চিরসবুজ অরণ্য, সঙ্গীতময়ী স্রোতস্বিনী আর রমণীয় হ্রদ, অনিন্দ্যসুন্দর উপত্যকা আর কোমল তৃণভূমি নিয়ে হিমাচল। বহু বিখ্যাত শৈলাবাস রয়েছে হিমাচল প্রদেশে—শিমলা, সোলন, চেইল, নারকাণ্ডা, কুফরি,কলপা, ডালহাউসী, খাজিয়ার, কসৌলী, মানালী, কেলং, কাজা, ধর্মশালা, জ্বালামুখী নাগর ও যোগিন্দর নগর

প্রভৃতি। রয়েছে রেণুকা, রেওয়ালসার, গোবিন্দসাগর, ও মণিমহেশের ডাল হ্রদ। রয়েছে কাংড়া, কুলু, লাহুল,স্পিতি, ক্রির, পার্বতী, চাম্বা, পাঙ্গী ও ভারমৌরের মতো আরও অনেক বিখ্যাত উপত্যকা।

উপত্যকার মধ্যে সবার ওপরে কুলর স্থন। সেকালের রাজধানী সুলতানপুর, একালের জেলাসদর। এখানে আসার তিনটি পথ। একটি পাঠানকোট থেকে ছোট-রেলগাড়িতে যোগিন্দর নগর এসে, সেখান থেকে বাসে। এই পথে আমরা পাঠানকোট ফিরে যাব। আর একটি পাঠানকোট থেকে সোজা বাসে। এই পথে আমি অসিতবাবুদের সঙ্গে কুলু হয়ে মানালী চলে গিয়েছিলাম। মানসীও এই পথেই মানালী গিয়েছে। তৃতীয় পথটি কুলুতে এসেছে শিমলা থেকে। আগে এই পথটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। ইদানীং অবশ্য বিমানে করেও কুলু আসা যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে দিল্লী চণ্ডীগড় ও কুলুর মধ্যে দৈনিক বিমান চলাচল করে। সুলতানপুর থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে ভুন্টারে বিমানক্ষেত্র আছে।

সুলতানপুর এখন কুলু শহর নামেই পরিচিত। শহরের আয়তন এক-বর্গমাইল, উচ্চতা ৪২০০ ফুট। এখানে বেড়াতে আসার সময় এপ্রিল থেকে জুন ও সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। এই সময়ের তাপমাত্রা ৬৪° থেকে ৮৭° ফারেনহিট।

গাছে ছাওয়া তৃণাচ্ছাদিত ঢালপুর ময়দান। এই সুবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর কুলু শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বিশ্বাস করা কঠিন যে এটি মানুষের তৈরি নয়, প্রকৃতির অবদান।

ঢালপুর ময়দানের একপ্রান্তে এসে থেমেছিল আমাদের বাস—মানালী থেকে মাণ্ডী যাবার বাস। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই রাজ্যসরকারের ট্যুরিস্ট্ অফিস। এই ময়দানের চারদিকেই অন্যান্য সরকারী দপ্তর।

মানালী-মাণ্ডী মূল পথটি ময়দানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। সেই পথ থেকে চারিদিকে ছোট ছোট কয়েকটি পথ প্রসারিত হয়েছে ময়দানের বুক চিরে। তারই একটি পথ দিয়ে আমি ও মানসী চলেছি হেঁটে। চলেছি ট্যুরিস্ট-বাংলোয়। এখানে আছে সিভিল ও ফরেস্ট রেস্টহাউস। আছে ডাকবাংলো, ট্যুরিস্ট-হাউস ও ট্যুরিস্ট-বাংলো ক্লাশ টু—যেখানে চলেছি আমরা! এই সব পর্যটক-নিবাসের ভাড়া সামান্য। কিন্তু আগের থেকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা না করে রাখলে ঠাঁই পাওয়া কঠিন। কুলু ভারতের জনপ্রিয় শৈলাবাস-সমুহের অন্যতম।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা জগৎ সিং নাগর থেকে এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন। তার পরেই গড়ে ওঠে এই শহর। বহুকাল থেকেই কুলু পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড তাঁর প্রথম হিমালয় ভ্রমণকালে লাহুলের পথে কুলু এসেছিলেন।

১৮৬৯ সালে এ উপত্যকার ওপরে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ বচনা করেন ক্যাপ্টেন এ. এফ. পি. হারকোর্ট। বইখানির নাম—'The Himalayan Districts of Kooloo, Lahoul and Spiti'. এই বইখানি থেকে সেকালের কুলু সম্পর্কে অনেক খবর পাওয়া যায়।

এম. সি.ফরবেস নাম জনৈক ইংরেজ ১৯১০ সালে শিমলা থেকে কুলু আসেন। তখনও কুলু পর্যটকদের স্বর্গ। ফরবেসের ভাষায়—'For an artist, whether with brush or camera, Kulu is indeed a paradise–the villages, with their dark wide-roofed houses and carved temples under huge trees are most picturesque, the people are often extremely good-looking with their wealth

of barbaric jewellery.....in spite of flat faces and small eyes.

'In the rains flowers of Kulu must be marvellous....even as the winter draws on, from the hill-top to valley some blossoms linger....' তাই শীতেও কেউ বলতে পারে না, শরৎ বিদায় নিয়েছে কুলু উপত্যকা থেকে। আর একথা সেদিনের মতো আজও সমান সত্য।

শ্যামল কোমল ময়দানের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি টুরিস্ট-বাংলোর পথে। এ পথটি মূল বাসপথ থেকে ডাইনে প্রসারিত হয়ে কিছুটা ওপরে উঠে গেছে। বাড়ি-ঘর সবই প্রায় ময়দানের প্রান্তে। কাজেই পথের ধারে দু-একটি সরকারী ভবন ছাড়া কোন লোকালয় নেই। মাঠ ও পথ প্রায় জনহীন। অথচ বছরের বিশেষ একটা সময়ে জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে এই ময়দান। দশেরার সময় দশদিন ব্যাপী মস্ত মেলা বসে এখানে। সেটি কুলু উপত্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। সেই কথাই ভাবছিলাম মনে মনে। ভাবতে ভাবতে পথ চলেছিলাম।

আশ্চর্য! মানসী কি সত্যিই মানসী! নইলে সে আমার মনের খবর পেল কেমন করে? চলতে চলতে জিজ্ঞেস করে, "এই ময়দানেই কি দশেরার মেলা হয়?'

"হ্যাঁ।" বিস্মিত স্বরে উত্তর দিই। "বছরে দুবার মেলা বসে এখানে। তবে দশেরার মেলাই দেখার মতো।"

"বেশ বড় মেলা বুঝি?"

"হ্যাঁ। ভারতের খুব কম জায়গাতেই দশেরা উপলক্ষে অতো বড় মেলা হয়। সারা শহর তখন উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। এটি হিমাচলের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয়, সমাজিক ও অর্থনৈতিক সম্মেলন।

"কুলু উপত্যকা কেবল রমণীয় নয়, সে বরণীয়ও বটে—সে দেবভূমি। উপত্যকার প্রায় প্রত্যেক বড় বড় গ্রামের নিজস্ব দেবতা আছেন।

"এঁরাই দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক। প্রতিনিধি মারফৎ দেবতারা সম্পত্তি রক্ষা করেন। এক দেবতা আর এক দেবতার সম্পত্তি বে-দখল করলে আদালতে মামলা শুরু হয়। নিজ নিজ প্রতিনিধির সাহায্যে তাঁরা মামলা চালান। দেবতারা মানুষ জজের রায় মেনে নেন। অনেক সময় জেল পর্যন্ত খাটেন।

"কুলুর দেবতারা মোটেই অসামাজিক নন। তাঁরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। এক দেবতা আর এক দেবতার বাড়ি দেখা করতে এলে, সে দেবতাও সুবিধা মতো তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। তাই কুলুর পথে প্রায়ই দেখা যাবে সুসজ্জিত বিগ্রহকে কাণ্ডিতে বসিয়ে, পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পেছনে চলেছে ভক্ত ও বাজনদারের দল।

"রঘুনাথজী হচ্ছেন সবার ওপরে। তাই দশেরার সময় উপত্যকার অন্যান্য দেব-দেবীরা রঘুনাথজীর আতিথ্য গ্রহণ করতে এখানে আসেন। শোভাযাত্রা সহকারে তাঁদের নিয়ে আসা হয় এখানে। তাঁরা সবাই ঢালপুর ময়দানে আশ্রয় নেন। প্রত্যেক দেব-দেবীর জন্য পৃথক পৃথক তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়।

"উৎসবের প্রথম দিন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পুষ্পসজ্জিত রথে রঘুনাথজীর সোনার বিগ্রহ স্থাপন করেন। গান-বাজনা ও জয়ধ্বনির সঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে অন্যান্য দেবতারাও একে একে উপস্থিত হন সেখানে। দেব-সভা শুরু হয়।

"রাজপরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নেতৃত্বে গণ্যমান্যরা তিনবার দেবসভা প্রদক্ষিণ করেন। তার পরে রঘুনাথজীর যাত্রা শুরু হয়। গান-বাজনা ও জয়ধ্বনি চলতে থাকে। অন্যান্য দেবতারা রঘুনাথজীকে অনুসরণ করেন।

"তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রঘুনাথজীর রথ এসে থামে ঢালপুর ময়দানে—উৎসব-প্রাঙ্গণে। উৎসব শুরু হয়—নাচ-গান আর রামলীলা, সেই সঙ্গে কেনা-বেচা। আলো আর হাসিতে ভরে ওঠে এই ময়দান। সে হাসির ছোঁওয়া লাগে সারা শহরে, সারা জেলায়, সারা হিমাচলে।

"সমাপ্তি-উৎসবের দিন তেমনি শোভাযাত্রা সহকারে রঘুনাথজীর রথ নিয়ে যাওয়া হয় ময়দানের শেষপ্রান্তে—বনের ধারে, বিপাশার তীরে। অন্যান্য দেবতারাও উপস্থিত হন সেখানে। মহাসমারোহে মোষ বলি দেওয়া হয। তার পরে বনের কোন শুকনো গাছে আগুন লাগানো হয়। অর্থাৎ রাবণ বধের পরে সোনার লঙ্কায় আগুন ধরানো হল। আর সেই সঙ্গে শেষ হয় উৎসব—শেষ হয় মেলা।"

"আর শেষ হল আমাদের পথ চলা। আমরা পৌঁছে গেছি ট্যুরিস্ট্-বাংলোয়।" আমি থামতেই বলে ওঠে মানসী।

আশ্রয় পেতে দেরি হল না। রিজার্ভেশন শ্লিপ দেখাতেই বেয়ারা আমাদের নিয়ে আসে নির্দিষ্ট ডরমিটারীতে। বেশ বড় একখানি ঘর। আলমারী, আলনা, ড্রেসিং-টেবিল, চেয়ার—সবই আছে। আছে লাগোয়া বাথরুম আর ছ'খানি খাট। দু-সারিতে সাজানো। আমাদের রুম-মেটরা রয়েছেন ঘরে। তাঁরা তিন জন—স্বামী স্ত্রী ও মা। ভদ্রলোক আমাদের মালপত্র গোছাতে সাহায্য করলেন।

আমাদের পেয়ে তাঁরা খুশি হলেন। কিন্তু আমরা খুশি হতে পারলাম না। ওঁরা বাঙালী। আমার সঙ্গে মানসী। মহা মুশকিলে পড়া গেল।

ট্যুরিস্ট-অফিসারকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল রুম-মেটদের নাম। তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, তাঁরা বাঙালী। তখন হয়তো বলে কয়ে অন্য কোন ঘরে একটা ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু এখন যে নিরুপায়।

মানসী কিন্তু নির্বিকার। সে মালপত্র গুছিয়ে, খাটিয়া ঝেড়ে, বিছানা পাতে। তার পরে বাথরুমে চলে যায়। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করেন। কথা বলতে বাধ্য হই। ভয়ে ভয়ে জবাব দিই। আর ভাবি—কি বোকামিটাই না করেছি! প্রায় এক মাইল পথ হেঁটে এলাম মানসীর সঙ্গে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কি বলা হবে, অন্তত ঠিক করে নেওয়া উচিত ছিল। তা নয়, সারা পথে কেবল কুলুর কথা বলেছি। এদিকে যে মান-সম্মান সব যায়। আমি যা বলছি, সে যদি ঠিক ঠিক তা না বলে—তবেই হয়েছে। বাথরুম থেকে বেরুলেই তাকে নিয়ে বাইরে চলে যেতে হবে।

কেবল আমার কথা জিজ্ঞেস করেই ক্ষান্ত হন না ভদ্রলোক। নিজের কথাও বলেন—তাঁর নাম নির্মল সাহা, স্ত্রীর নাম শ্যামলী। আসানসোলে থাকেন—রেল কর্মচারী। পুজোর ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ধর্মশালা, কাংড়া, জ্বালামুখী ও বৈজনাথ দেখে পরশু বিকেলে এখানে এসেছেন। আরও তিন দিন থাকবেন। এখান থেকে মানালী যাবেন।

মানসী বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াই আমি। বলি "চল, খেয়ে আসা যাক।"

"যাচ্ছি।" ভেজা জামা-কাপড় মেলে দিতে সে বাইরে চলে যায়। একটু বাদে ফিরে

এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন, যাও হাত মুখ ধুয়ে নাও। বাথরুমে সাবান ও তোয়ালে রেখে এসেছি।"

ওকে এদের সামনে একা রেখে আমার বাথরুমে যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। নির্মলবাবুর মা ও স্ত্রী ওর সঙ্গে আলাপ অর্থাৎ ওকে জেরা করার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন। আমি আড়ালে গেলেই প্রশ্নবান নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করবেন। তাই বলি, "আমি ডাইনিং হলেই হাত ধুয়ে নেব।"

"হ্যাঁ, তা না হলে আর নোংরামি হবে কেমন করে?"

মানসীর কথা ও কণ্ঠস্বরে ওঁরা সবাই হেসে ওঠেন। মানসী শ্যামলীকে বলে, "সত্যি বলছি ভাই, একদম জলের কাছে যাবে না।"

শ্যামলী এবার জোরে জোরে হাসতে থাকে। মানসী প্রসাধনে লিপ্তা হয়। আমি ক্ষুণ্ণ মনে বাথরুমে প্রবেশ করি।

কোনমতে চোখে মুখে জল দিয়ে হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসি। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। নির্মলবাবুর মা মানসীকে জেরা করছেন, "তোমাদের বিয়ে হয়েছে?"

আমার বুক কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকাই। আশ্চর্য! মানসী হাসছে—সলাজ হাসি।

সে একবার শ্যামলীর দিকে তাকায়। বোধহয় তার মনোভাবটা বুঝতে চায়। তার পরে নির্মলবাবুর মায়ের দিকে চেয়ে লাজনম্র স্বরে বলে, "হ্যাঁ মা! তিন বছর।"

"আমিও তো তাই ভাবি, নইলে কি আর এমন করে তোমরা এক সঙ্গে থাকতে পারো! কিন্তু...." মা থামেন।

আমি চমকে উঠি—কি বলতে চাইছেন তিনি?

মা বলেন, "কিন্তু তোমার হাতে নোয়া নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই?"

সর্বনাশ! একেবার মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। এমন প্রশ্ন যে হতে পারে, মোটেই ভাবি নি। অথচ ভাবা উচিত ছিল। খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু এখন কি বলবে মানসী—আমরা যে ধরা পড়ে গেছি।

অসহায় দৃষ্টিতে মানসীর দিকে তাকাই। আশ্চর্য! মানসী এখনও হাসছে।

তেমনি ধীর স্বরেই সে বলে, "আমাদের যে ও-সব পরতে নেই মা!"

"কেন?" বৃদ্ধা বিস্মিতা।

বিস্মিত আমিও। কি বলতে চাইছে মানসী?

"আমরা যে হিন্দু নই।" মানসী বলে।

"হিন্দু নও?" বৃদ্ধা বিচলিতা।

"না।" মানসী বলে, "আমরা খৃষ্টান।" সে বুকের ওপরে ক্রুশ আঁকে। আনন্দে আমার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার উপায় নেই। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিই।

কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠেন মা, "খেরেস্তান...."

"হ্যাঁ, মা।" মানসী শান্ত স্বরে জবাব দেয়।

"বৌমা!" শাশুড়ী পুত্রবধূকে বলেন, "জলের কুঁজোটা পথ থেকে সরিয়ে আমার খাটের পেছনে রেখে দাও তো!" তিনি শুয়ে পড়েন।

ছেলে ও বউ লজ্জা পান। কিন্তু লজ্জা পাই না আমি। জাত খুইয়ে মান রেখেছে মানসী।

খেয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়ি আমরা। নির্মলবাবুরা ঘরেই রয়েছেন। গতকাল ওঁরা মণিকরণ গিয়েছিলেন, আগামীকাল নাগর যাবেন। তাই আজ বিশ্রাম করছেন। ওঁরা যে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে এসেছেন।

বারান্দা পেরিয়ে ডাইনিং হলে আসি। আরও অনেকে এসে গেছেন। চায়ের ফরমাশ করে আমরা চেয়ারে বসি। এটি ট্যুরিস্ট-বাংলোর কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন। দাম একটু বেশি হলেও খাবার ভাল। তা ছাড়া সুবিধাও অনেক। এখান থেকে বাজার প্রায় এক মাইল। অতদূরে গিয়ে খেয়ে আসা কষ্টকর। আজ দুপুরেও এখানেই খেয়েছি আমরা।

চা খেয়ে পথে বেরিয়ে পড়ি। মানসী জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাবে ?"

"সুলতানপুর রাজপ্রাসাদ আর রঘুনাথজীর মন্দিরে।"

"বিজলী-মহাদেবের মন্দিরে যাবো না ?"

"যাবো বৈকি। শুনেছি সে মন্দিরের শিল্পকলা ও ষাট ফুট উঁচু দণ্ডটি দেখার মতো। তবে মন্দিরটি একটু দূরে—বিপাশার ওপারে, ঐ পাহাড়ের ওপরে। তাই আজ নয়, কাল আমরা যাবো বিজলী-মহাদেবের মন্দিরে।"

"বেশ তাই হবে।" মানসী বলে, "কিন্তু মন্দিরটির এমন একটা বিচিত্র নাম হল কেন ?"

"শুনেছি প্রতিবছর বর্ষাকালে অন্তত একদিন নাকি বজ্রপাত হয় মন্দিরে আর তাতে শিবলিঙ্গটি যায় ভেঙে। বৃষ্টি বন্ধ হবার পরে সেই ভাঙা শিবলিঙ্গকে জোড়া দিয়ে মহাসমারোহে বিজলী-মহাদেবের পূজো করা হয়।"

"ভারী অদ্ভুত তো।" মানসী মন্তব্য করে, "প্রতি বছর বজ্রপাত হয় মন্দিরের ওপরে, তাতে মন্দিরের কিছু হয় না, কেবল শিবলিঙ্গটি ভেঙে যায়। কথাটা যেন কেমন ঠেকছে।"

হেসে বলি, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

মানসীও হাসে। হেসে বলে, "বেশ, বিশ্বাস করলাম।"

"কাকে ? বিজলী-মহাদেবকে না আমাকে ?"

"দুজনকেই।" মানসী গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়।

আমি আর কথা না বলে নীরবে পথ চলতে থাকি। ভাবি—মানসী কি সত্যিই বিশ্বাস করে আমাকে ?

কিছুক্ষণ বাদে মানসী জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা তখন তো কেবল কুলুর দশেরা মেলার কথাই বললে। হিমাচলে আর কোথাও বড় মেলা বসে না ?"

"বসে বৈ কি।" আমি উত্তর দিই, "মেলার জন্য বিখ্যাত হিমাচল। প্রত্যেক বড় শহর ও তীর্থস্থানেই মেলা বসে। এই সব মেলার মধ্যে চাম্বার মিনজার এবং রামপুরের রেণুকা ও লাবির মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাম্বার মেলা বসে অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে আর রামপুরে নভেম্বর মাসে।"

আমি থামতেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মানসী। জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা এখানে বন্য জন্তু-টন্তু, মানে ভালুক-টালুক নেই ?"

হেসে বলি, "এখানে ভালুক থাকবে কেমন করে, এটা যে শহর—এখানে মানুষেরই জায়গা হচ্ছে না ঠিকমতো। তবে বন-সম্পদের মতো পশু-সম্পদেও সমৃদ্ধ হিমাচল। অসংখ্য জাতের পাখী আর হরিণ, বিভিন্ন ধরনের বাঘ, ভালুক, শুয়োর, ছাগল ইত্যাদি আছে এ প্রদেশে। লাল ভালুক এখনও দেখতে পাওয়া যায় হিমাচলে। এ ছাড়া মৎস্য শিকারের আদর্শ ক্ষেত্র হিমাচল। বিপাশা ও উল নদীর ট্রাউট ও যমুনার মহাশোল ভারত বিখ্যাত।"

আমরা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। বাসপথ থেকে একটি সংকীর্ণ চড়াই পথ ধরতে হল। অনেকটা চড়াই পেরিয়ে একটি জলধারা—শর্বরী ঝরণা। তার পরে পথের প্রান্তে মন্দির—রঘুনাথজীর মন্দির। অবস্থানটি মোটেই ভাল নয়। শহরের প্রায় জনবসতির মধ্যে অবস্থিত। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে জরাজীর্ণ প্রাসাদ।

আমরা প্রথমে প্রাসাদের সামনে আসি। রাজা জগৎ সিং নাগর থেকে রাজধানী নিয়ে এসেছিলেন এখানে। কিন্তু জগৎ সিং নির্মিত সে প্রাসাদ ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে। তারপরে তৈরি হয়েছে এ প্রাসাদ। তাও আজ ভগ্নপ্রায়।

কাঠ আর পাথরে নির্মিত-দুটি মহলে বিভক্ত। প্রাসাদ তোরণের ছাদে ও গায়ে কাঠের ওপরে কোথাও কোথাও সুন্দর কারুকার্য। তবে অধিকাংশ আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুকাল আগে একবার আগুন লেগেছিল এই প্রাসাদে।

ভেতরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম। দ্বারোয়ান মানসীকে দেখিয়ে আমাকে বলে, "মাঈজী যেতে পারেন, কিন্তু আপনার প্রবেশ নিষেধ। ভেতরে মেয়েরা রয়েছেন।"

আমি মানসীকে বলি, "তাহলে তুমি বরং গিয়ে দেখে এসো ভেতরটা। আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি।"

"আচ্ছা তুমি আমাকে কি ভাবো বল তো ?"

সংগতিহীন প্রশ্নে বিস্মিত হই। তাহলেও হেসে বলি, "কি আবার ভাবি, ভাবি মানসী—অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক মানবী।"

"না, না, ঠাট্টা নয়।" মানসী গম্ভীর স্বরে বলে, "আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি আমাকে এতটা স্বার্থপর ভাবলে কেমন করে ?"

"স্বার্থপর ? তোমাকে ?" আমি ওর অভিযোগের কারণ বুঝতে পারি না।

"তাছাড়া কি ? একসঙ্গে এসেছি। তুমি ঢুকতে পারবে না ভেতরে আর আমি একা গিয়ে দেখে আসব !"

হেসে বলি, "তোমাকে স্বার্থপর ভেবে ভেতরে যেতে বলি নি, আমি স্বার্থপর বলেই তোমাকে দেখে আসতে বলেছি।"

"মানে ?"

"তুমি গিয়ে দেখে এলে, আমি জানতে পারব ভেতরের কথা—লিখতে পারব প্রাসাদের বর্ণনা।"

এতক্ষণে মানসীর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু সে সম্মত হয় না আমার প্রস্তাবে। একটু হেসে বলে, "আমি ছেলেমানুষ নই যে এই সব বাজে কথা বলে ভোলাবে। তোমার লেখার রসদ যোগাড় করার জন্য অমন স্বার্থপর হতে পারব না আমি। দরকার নেই তোমার সুলতানপুর প্রাসাদের অন্দরমহলের কথা লিখে। এবারে চলো ফিরে যাওয়া যাক।"

মানসী ফিরে চলে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

খানিকটা পথ নীরবে পার হয়ে আসি। তারপরে মানসী বলে, "অবস্থা দেখে মনে হল, বর্তমান রাজাদের রাজপ্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য পর্যন্ত নেই, অথচ শুনেছি এদের নাকি রুপোর খনি আছে।"

"আছে নয় ছিল। পার্বতী উপত্যকায় অর্থাৎ মণিকরণের কাছে।" উত্তর দিই।

"এখন বুঝি নেই ?" মানসী প্রশ্ন করে।

"জায়গাটা যাবে কোথায়, জায়গাটা আছে। আগে বলত ওয়াজিরী রূপি, এখন শুধু

রূপি নামেই পরিচিত। মণিকরণ ছাড়িয়ে পার্বতী নদীর তীর ধরে খানিকটা উঠে গেলে ধর্মগঙ্গা ও পার্বতীর সঙ্গম। সঙ্গম পেরিয়ে মণিকরণ অঞ্চলের শেষ উষ্ণকুণ্ড। মূল মণিকরণ থেকে প্রায় এক মাইল। পুণ্যার্থীদের ধারণা গঙ্গা পার্বতী নামে প্রবাহিত এই পুণ্যতীর্থে। নিকটবর্তী ক্ষীরগঙ্গার তীরে হর-পার্বতী তপস্যা করেছেন। কুলু উপত্যকার দেবতারা অনেকেই মণিকরণ যাত্রায় যায়। পাণ্ডবদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত পার্বতী উপত্যকা। পাণ্ডবরা নাকি পার্বতীর ওপরে একটি পুল তৈরি করেছিলেন। তারা ধানের চাষ করেছিলেন এ উপত্যকায়। আজও সেই ক্ষেতে ধান হয়।

"পার্বতী উপত্যকার রুদ্রনাগ গ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে ব্রহ্মগঙ্গা। ব্রহ্মগঙ্গা এসেছে হরেন্দ্র পর্বতের ব্রহ্ম-সরোবর থেকে। সেই সরোবরের তীরে ব্রহ্মা তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মগঙ্গা থেকে আধ মাইল এগিয়ে অগ্নিতীর্থ। সেখানেও বহু ছোট উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে।

"পার্বতী উপত্যকা এ অঞ্চলের সুন্দরতম উপত্যকাগুলির অন্যতম। বেশ ঘন বসতি— অসংখ্য ছোট বড় গ্রাম গড়ে উঠেছে পার্বতী উপত্যকায়।"

"এই তোমার এক দোষ।" মানসী বাধা দেয়, "কানের কথা জানতে চাইলে, ধানের কথা বলতে শুরু করা। জানতে চাইলেম রূপির কথা, তুমি আরম্ভ করলে পার্বতী উপত্যকার বিবরণ। পরশু যখন মণিকরণ যাচ্ছি, সে উপত্যকা তো চর্মচক্ষেই দেখে আসব।"

"বেশ, বলছি।" আমি হেসে দিই। "মণিকরণের শেষ উষ্ণকুণ্ড ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেলে রসকুণ্ড নামে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ঝরণা আছে। অনেক উঁচু থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে নিচে। দূর থেকে মনে হয়, স্বর্গধারা এসেছে মর্ত্যালোকে। কেবল দেখতেই সুন্দর নয়, বড়ই মিঠে ঝরণার জল।

"ঝরণার কাছে একটি ছোট গ্রাম রসকুণ্ড। এই গ্রামর অনতিদূরেই সেই রুপোর খনি। কুলুর রাজাদের সম্পত্তি ছিল এটি। তবে শোয়া শ' বছরের বেশি হল এখান থেকে রুপো উত্তোলন করা হয় নি।"

"কেন ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"বিশেষজ্ঞরা বলেন, রুপোর পরিমাণ বড়ই কম অথচ পরিবহনের ব্যয় অত্যন্ত বেশি। খরচ পোষাবে না।"

"শোয়া শ' বছর আগে কেমন করে পোষাতো ?"

"তখন পরিবহনের ব্যয় কম ছিল।" আমি বলি।

"তেমনি রুপোর দামও কম ছিল।" মানসী বলে।

"অনেকের ধরণা সেকালের বিশেষজ্ঞরা আকরিক রুপো থেকে রুপো নিষ্কাশনের একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি জানতেন। যার ফলে তখন পুষিয়ে যেত।"

"আমরা এখন সে পদ্ধতি অনুসরণ করছি না কেন ? বিজ্ঞান তো কতো উন্নত হল।"

"সেটাই আশ্চর্যের। তবে এ সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।"

"তা সে কথাটি না বলে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন ?"

নাঃ। একে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। এমন মাস্টারী করতে হবে জানলে....কি আর করতাম ? বাধ্য হয়ে বলতে থাকি, "সিধ সিং প্রতিষ্ঠিত বাদানী রাজবংশের রাজা জিৎ সিং। তিনি ১৮০৭ থেকে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কুলুর রাজা ছিলেন। কথিত আছে হুকমু ও গোহন নামে তাঁর দুজন মন্ত্রী ছিলেন। এঁরাই রুপোর খনির কাজ দেখাশোনা করতেন। তাঁদের কাছেই ছিল রুপো নিষ্কাশনের সেই গোপন সূত্র আর রাজবংশের ইতিহাস।

কুচক্রীদের প্ররোচনায় রাজা তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নাগরে চলে গেলেন এবং তাঁদের দুজনকে ডেকে পাঠালেন সেখানে।

"হুক্‌মু ও গোহন জানতে পারলেন রাজা তাঁদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং হয়তো বা রাজরোষে তাঁদের প্রাণ যাবে। তবু তাঁরা এলেন নাগরে। না এসে উপায় নেই। রাজার আদেশ অমান্য করে বেঁচে থাকা যায় না। তবে তাঁরা নাগর রওনা হবার আগে রুপো নিষ্কাশনের গোপন সূত্র এবং রাজপরিবারের ইতিহাস তাঁদের স্ত্রীদের কাছে দিয়ে বললেন—আমরা যদি ফিরে না আসি অর্থাৎ রাজা যদি আমাদের হত্যা করেন, তাহলে এগুলো পুড়িয়ে ফেলো।

"রাজার সঙ্গে দেখা করতেই রাজা তাঁদের বললেন তাঁর অভিযোগের কথা। তাঁরা অস্বীকার করলেন। রাজা বললেন—তোমরা বিশ্বাসঘাতক, তোমরা মিথ্যেবাদী, আমি তোমাদের হত্যা করব।

"তাঁরা বললেন—তাতে আপনার কোন লাভ হবে না মহারাজ, বরং লোকসান হবে। আমাদের মেরে ফেললে, রূপির খনি ও রাজপরিবারের ইতিহাসকেও হারিয়ে ফেলতে হবে।

"ক্ষিপ্ত রাজা জিৎ সিং তবু নৃশংসভাবে হত্যা করলেন হুকুম্ ও গোহনকে। তার পরে তিনি নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন রূপি।

"কিন্তু কথাটা আগেই গিয়েছিল রটে। রাজা রূপিতে পৌঁছবার পূর্বেই ভস্মীভূত হল রুপো নিষ্কাশনের সূত্র আর বাদানী রাজবংশের ইতিহাস।"

গল্প করতে করতে আমরা এসে পৌঁছুই রঘুনাথজীর মন্দিরের সামনে—কুলু উপত্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়ে। প্রাচীন প্রাসাদের মতো জীর্ণ না হলেও এ মন্দিরও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভূমিকম্পে। আগে ছাদের ভেতর দিকে লাল নীল ও সোনালী রঙের চিত্র অঙ্কিত ছিল, এখন তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ভূমিকম্পের করাল স্পর্শ লেগে আছে মন্দিরের সর্বত্র। মহাকালের ছায়া নেমেছে তার সারা অঙ্গে।

আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। সামনেই উঠান। তার পরে মন্দির। রুপোর সিংহাসনে রেশমের গদির ওপরে লাল ও হলুদ রঙের পোশাক পরে বসে আছেন রঘুনাথজী। ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ মণি-মুক্তো খচিত সোনার রামচন্দ্র মূর্তি। পাশেই একখানি ছোট সিংহাসনে নরসিংহ—দেহহীন, কেবল পাথরের মুখ। আর রঘুনাথজীর সামনে লাল পোশাক পরে হাত জোড় করে বসে আছেন রামভক্ত হনুমান।

শুনেছি রঘুনাথজীর মূর্তির ওজন ৬৬ তোলা এবং তা খাঁটি সোনা নয়। অষ্ট-ধাতুর ওপরে সোনার পাতে মোড়া। দেখে মনে হচ্ছে অনুজ্জ্বল সোনালী রঙের মূর্তি। কিন্তু পুরোহিতরা বলেন, এ মূর্তির প্রকৃত রঙ লাল, তবে দিব্যদৃষ্টি না থাকলে সে রঙ দর্শন করা যায় না। তাঁরা বলেন, রঘুনাথজী খুশি থাকলে মূর্তির রঙ হয় সাদা আর রেগে গেলে হয়ে যায় কালো। এ রকম পরিবর্তন নাকি প্রায়ই হয়।

একজন পুরোহিত সামনে বসে মন্ত্র পড়ছেন। মানসী ফুলের মালা ও মিষ্টি তাঁর হাতে দিল। তিনি পুষ্পমাল্য নিবেদন করলেন শ্রীরামচন্দ্রকে। আশীর্বাদ ও প্রসাদ বিতরণ করলেন আমাদের।

মানসীর প্রশ্নের উত্তরে জনৈক পূজারী জানালেন, একটু বাদেই আরতি আরম্ভ হবে।

মানসী আমার মুখের দিকে তাকায়।

হেসে বলি, "আমি আপত্তি করব কেন ? মন্দির এসেছি, আরতি দেখে যাবো। এ

তো ভাল কথা।"

"তাহলে চলো ওখানটায় গিয়ে বসা যাক।"

বাংলা না জানলেও পূজারী বুঝতে পারেন মানসীর কথা। বলেন, "আমার সঙ্গে আসুন, আমি ভাল জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি।"

আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি নির্দিষ্ট জায়গাটি দেখিয়ে দেন। আমরা বসি। পূজারীর বোধহয় এখন হাতে কোন কাজ নেই। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন কাছে। সুবিধা পেয়ে মানসী জিজ্ঞেস করে, "রঘুনাথজীর পুজো হয় কখন ?"

"দুপুরে।" পূজারী উত্তর দেন। তিনি আমাদের পাশে বসেন।

মানসী আবার বলে, "পুজোর কী নিয়ম ? অর্থাৎ কি ভাবে পুজো হয় ?"

পূজারী বলতে থাকেন, "সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নেন রঘুনাথজী। কিছুক্ষণ বাদে শুরু হয় স্তোত্র। তার পরে ভোগ।"

"রুপোর রেকাবিতে কয়েকখানি লুচি ও একবাটি দুধ এনে রাখা হয়। সামনের ঐ পরদাখানি ফেলে দিয়ে সবাই বেরিয়ে আসি বাইরে। রঘুনাথজী আহার গ্রহণ করেন।

"ভোগের পরে উৎসর্গ।"

"কি রকম ?" মানসীর প্রশ্নে থামতে হয় পূজারীকে।

পূজারী বলেন, "ছোট একটি রুপোর বেদি ঐ সিঁড়ির ওপরে রেখে তাতে খানিকটা কর্পূর ঢেলে আগুন জ্বালানো হয়। তার পরে সেই আগুনে চাল, ফল, ঘি, মধু ও মশলা আহুতি দেয়া হয়। আহুতি প্রদানকালে প্রধান পুরোহিত বলতে থাকেন—হে পরমারাধ্য রঘুনাথজী, তুমি আমাদের নিবেদন গ্রহণ করো।

"আগে কয়েক ঘন্টা ধরে এই উৎসব হত, এখন কয়েক মিনিটে শেষ হয়ে যায়।

"উৎসর্গের পরে বাজনা বাজতে থাকে। সামনের পরদাখানি তুলে দেয়া হয়। প্রধান পুরোহিত কিছুক্ষণ ধরে আরতি করে বাজনদারদের সঙ্গে নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। অবশেষে রঘুনাথজী ও নরসিংহকে নিয়ে যাওয়া হয় শয়ন কক্ষে—দিবা নিদ্রার জন্য। দিনের পুজো শেষ হয়।"

থামেন পূজারী। আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিই তাঁকে। তিনি মন্দিরে চলে যান। এখুনি সন্ধ্যারতি শুরু হবে।

কিছুক্ষণ বাদেই ঢোল ও বাঁশির শব্দে সচকিত হয়ে উঠি। শুরু হয় আরতি। তাড়াতাড়ি উঠে আমরা মন্দিরদ্বারে আসি। বাজনার তালে তালে ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে রঘুনাথজীর আরতি করছেন প্রধান পরোহিত। বড় ভাল লাগছে। আমরা সমস্ত মন ও প্রাণ দিয়ে এই শুভ-উৎসব উপভোগ করি।

এক সময় আরতি শেষ হয়, বাজনা থেমে যায়। আমাদের চমক ভাঙে। রঘুনাথজীকে প্রণাম করে দুজনে বেরিয়ে আসি মন্দিরের বাইরে। বিদায় নিই পূজারীর কাছ থেকে। সংকীর্ণ উৎরাই পথ বেয়ে নেমে চলি বড় রাস্তার দিকে।

বড় রাস্তায় এসে মানসী বলে, "সেই কখন এক কাপ চা খাইয়ে মাইলের পর মাইল টহল দিইয়ে নিচ্ছ।"

"চা খাবে ?"

"নইলে আর বলছি কেন ?"

"বেশ, চলো।"

বড়রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা চায়ের দোকানে এসে ঢুকি। বেয়ারা স্বাগত জানায়। দুজনে একটা টেবিলের দুদিকে বসি। তারপরে মানসীকে জিজ্ঞেস করি, "কি খাবে ?"

"বললাম তো চা।" মানসীকে উত্তর দেয়।

"চা-য়ের সঙ্গে আর কি খাবে ?"

"কিছু না, কেবল চা। তুমি কিছু খাবে ?"

"ভাবছি....খেলে মন্দ হত না।"

"তাহলে আমিও খাব।"

"কী ?"

"তুমি যা খাবে।"

রেস্তোরাঁয় বিল মিটিয়ে বেরিয়ে আসি পথে। ঘড়ি দেখে মানসী। রাত আটটা বেজে গেছে। রাস্তায় আলো আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বড়ই কম। তাহলেও পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে না, চাঁদনী রাত। মেঘমুক্ত আকাশ। আকাশে চাঁদ আর লক্ষ তারার দেয়ালী।

বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। ঢালপুর ময়দানের ভেতর দিয়ে চলেছি হেঁটে। চলেছি মানসীর পাশে পাশে—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শ্যামল-কোমল প্রান্তর পেরিয়ে।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে মানসী, "আরও একটা দিন ফুরিয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, জীবনের মালা থেকে একটি ফুল পড়ল খসে।"

"জীবনের কথা ভাবছি না আমি।"

"কি ভাবছ তাহলে ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ভাবছি এই দিনগুলোর কথা। তোমার আর আমার কথা।"

আমি নীরবে পথ চলি। মানসীও আর কোন কথা বলছে না। না। কথা বলে মানসী। বলে, "এসো না, একটু বসা যাক। এমন সুন্দর রাত। এই স্বর্গীয় পরিবেশ। আর কদিনই বা আছি এক সঙ্গে।"

"বেশ, চলো।" আমি সম্মতি দিই।

পথ থেকে খানিকটা সরে এসে মাঠের মাঝে বসি দুজনে। সত্যই সুন্দর। দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা আর কাছে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কুলু উপত্যকা। পাশে মানসী। একটু আগে সে বলেছে, আর কদিনই বা আছি এক সঙ্গে। সত্যি তাই। হিমাচল পরিক্রমার আরও একটা দিন গেল ফুরিয়ে। বাকি দিনকটিও একে একে এমনি করে যাবে চলে। তখন হয়তো আজকের এই সন্ধ্যাটিকে মনে হবে স্বপ্ন বলে।

মানসী আমার চিন্তায় ছেদ টানে। বলে, "এত গল্প করলে অথচ বললে না, রঘুনাথজী মন্দিরের ইতিহাস।"

"শুনবে ?"

"হ্যাঁ।"

আমি বলি, "জগৎ সিং বাদানী রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ছিলেন বীর ও কর্মঠ। তাঁর নির্মিত জগৎসুখ মন্দির ও নাগর রাজপ্রাসাদ তুমি দেখেছো।"

মানসী মাথা নাড়ে। তার কানের দুল দুটি চাঁদের আলোয় ঝকমক করে ওঠে।

আমি বলতে থাকি, "রাজা জগৎ সিং একদিন সুলতানপুরের পথে রাজকার্যে বেরিয়েছেন। মেয়েরা ঝরণা থেকে জল নিয়ে ঘরে ফিরছিল। রাজদর্শনের লোভ সামলাতে

পারে না। পথের ধারে পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাজাকে দেখে। রাজাও দেখেন তাদের। একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারেন না রাজা। স্বর্গের অপ্সরী। রাজা ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে যান তার কাছে। ওরা ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজা মেয়েটিকে নাম জিজ্ঞাসা করেন। সে নতমস্তকে কোন মতে জবাব দেয়। রাজা তার পরিচয় জেনে নিয়ে ঘোড়ায় ওঠেন। টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসেন রাজবাড়িতে। নগর কোটালকে ডেকে পাঠান। বলেন—দুর্গাদত্তের মেয়েকে আমার চাই।

"নগর কোটাল আসেন দুর্গাদত্তের কাছে। সসম্মানে তিনি বসতে বলেন কোটালকে। আসন গ্রহণ করে কোটাল তাঁকে বলেন সব কথা। ব্রাহ্মণ বুঝতে পারেন, রাজার কু-নজরে পড়েছে তাঁর সুন্দরী যুবতী কন্যা। মৃত্যু ছাড়া এ নজর এড়াবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু সেকথা বললে তিনি মরতেও পারবেন না, পারবেন না মেয়ের সতীত্ব রক্ষা করতে। তাই তিনি রাজার প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য সময় চাইলেন কোটালের কাছে। রাজা ভাবলেন ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই কাল সম্মত হবে তাঁর প্রস্তাবে। কালই কোটাল দুর্গাদত্তের সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে আসবে অন্দর-মহলে। রাজা জগৎ সিং-য়ের অশান্ত-চিত্ত শান্ত হবে।

"পরদিন সকালেই কোটাল এসে খবরটা দিলেন রাজাকে। রাজা ছুটে গেলেন দুর্গাদত্তের বাড়িতে। সব শেষ হয়ে গেছে। মেয়েকে রাজপুত রাজার কামনাবহ্নি থেকে বাঁচাতে ঘরে আগুন দিয়ে ব্রাহ্মণ দুর্গাদত্ত স্ত্রী পুত্র ও কন্যাসহ আত্মহত্যা করেছেন। তাঁদের বিকলাঙ্গ মৃতদেহগুলির দিকে তাকিয়ে রাজা বার বার শিউরে ওঠেন। অথচ ওরই একটি দেহের জন্য কাল পাগল হয়েছিলেন রাজা জগৎ সিং।

"অনুশোচনায় ক্লান্ত রাজা ফিরে আসেন রাজবাড়িতে। ব্রহ্মহত্যার পাপে দগ্ধ হতে থাকেন তিনি। চোখ মেললেই রক্ত দেখতে পান—ব্রহ্মরক্ত। যা কিছু আস্বাদন করেন, তার মধ্যেই তিনি রক্তের স্বাদ পান। যা কিছুর ঘ্রাণ নেন, তার মধ্যেই জেগে রয়েছে রক্তের গন্ধ। যা কিছু স্পর্শ করেন, তাই কঠিন। তিনি ঘুমুতে পারেন না, চোখ মেলতে পারেন না, কোন কাজ করতে পারেন না।

"অর্ধ উন্মাদ রাজা ছুটে এলেন রাজগুরুর কাছে। রাজগুরু বললেন—ব্রহ্মহত্যার পাপমুক্ত হতে হলে তোমাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব হতে হবে। বিষ্ণুর প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যশাসন করতে হবে।

"কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেই বিষ্ণু-বিগ্রহ?

"দামোদর দাস নামে জনৈক রাজকর্মচারী গেলেন অযোধ্যায়। সেখানকার কোন মন্দির থেকে রঘুনাথজীর এই বিগ্রহ অপহরণ করে নিয়ে এলেন। নির্মিত হল মন্দির। ১৬৬১ খৃস্টাব্দে মহাসমারোহে রঘুনাথজীকে প্রতিষ্ঠিত করা হল এই মন্দিরে। রাঠোর রাজপুত রাজা বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

"শাক্ত জগৎ সিং হলেন বৈষ্ণব। বিষ্ণুর প্রতিনিধি রূপে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকলেন। শান্তি ফিরে এলো তাঁর মনে।"

"এবার চলো বাংলোয় ফেরা যাক। নটা বেজে গেছে।" মানসী উঠে দাঁড়ায়।

আমরা ফিরে আসি পথে। পাশাপাশি পথ চলি।

একটু বাদে মানসী বলে, "একটা কথা কদিন থেকেই বলব ভেবে আর বলা হয়ে উঠছে না।"

"এখুনি বলে ফেল তাহলে।"

"হ্যাঁ, দেখো এই খরচ-টরচগুলো বড্ড এক তরফা হয়ে যাচ্ছে। মানে প্রায় সব খরচই তুমি করছ।"

"তাই তো করার কথা।"

"কেন ? তুমি আমার কে ?"

"কেউ নই।"

"তাহলে তুমি আমার জন্য খরচ করবে কেন ? কালই একটা হিসেব করে দিও।"

"পারব না।" আমি বলি।

"কেন ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"সংসারে সবাই সমান হিসেবী নয়।"

"কথাটা যে আমার।" মানসী বলে।

"তাইতো বললাম।"

"না, না। সত্যি বলছি। সেদিন মানালীতে দেখা হবার পর থেকে আমার জন্য তোমার কত খরচ হয়েছে বলে দিও।" মানসী গম্ভীর স্বরে বলে।

আমি একটু হেসে বলি, "সব দেনা শোধ করে দিতে চাও ?"

মানসী থমকে দাঁড়ায়। আমার দিকে একবার তাকায়। তার পরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করে।

নিস্তব্ধ পৃথিবী, নির্জন পথ, নীরব যাত্রী। চাঁদের আলোয় রাতের কুহেলী। মোহময়ী রাত্রি।

খানিকক্ষণ পথ চলার পরে আবার প্রশ্ন করি, "আমার কথার উত্তর দিলে না যে ?"

"কি উত্তর দেব ?" মানসী পাল্টা প্রশ্ন করে।

"আমার কাছে তোমার যদি সত্যই কোন ঋণ হয়ে থাকে, তা কি সবই শোধ করে দেবে ?"

"সব ঋণ তো শোধ করা যায় না সখা !"

মানসীর একখানি হাত হাতে তুলে নিই। কোন আপত্তি করে না সে। কোন কথা বলে না। আমারও সব কথা গেছে হারিয়ে। আমি কেবল মানসীর হাত ধরে পাশাপাশি পথ চলি—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হিমাচলের পথ।

বাকি পথটুকু পেরিয়ে আসি নিঃশব্দে। ট্যুরিস্ট-বাংলোর আলো দেখা যায়। মানসী হাত ছাড়িয়ে নেয়।

হঠাৎ গম্ভীর স্বরে সে বলে ওঠে, "কারও দুর্বলতার কখনও এমন সুযোগ নিতে নেই।'

"সুযোগ ?" আমি চমকে উঠি।

"নয়তো কি ? রাতের নির্জন পথে অনাত্মীয়া নারীকে পাশে পেয়ে তার পাণিপীড়ন করাকে, সুযোগের সদ্ব্যবহার ছাড় আর কি বলব ?"

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। তবু কোনমতে বলি, "তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না মানসী ?"

"করি।" অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয় সে। "আর করি বলেই ভয় পাচ্ছি। আমার এতো বড় বিশ্বাসের যদি অমর্যাদা ঘটে।"

॥ এগারো ॥

আমরা ডাইনিং হলে এলাম। একেবারে খেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকব। ময়দানে বসেই সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু খেতে বসে নিশ্চয় করে বুঝতে পারছি, কাজটা ঠিক হয় নি। ওষুধটা কিনে আনা উচিত ছিল। বছর দুয়েক হল, আমার এমনি হঠাৎ হাঁপানির টান ওঠে। আগে ধারণা ছিল হাঁপানি বৃদ্ধ বয়সের রোগ। নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছি ধারণাটা ভুল।

কখন হঠাৎ আক্রান্ত হব, আগের থেকে বুঝতে পারি না। তাই আমি সব সময়ে বেটনেসল ট্যাবলেট সঙ্গে রাখি। এবারও নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেদিন খোকসারে ফুরিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম মানালীতে ফিরে কিনে নেব। কিন্তু মানালীতে মানসীর সঙ্গে দেখা। রোগের কথা তো বটেই, নিজের কথাই যে গিয়েছি ভুলে। ওষুধ কেনার কথা মনেই হয় নি এ ক'দিন। আর ভাবতেও পারি নি আজ এ সময়ে হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হব।

কথাটা কিন্তু চেপে গেলাম মানসীর কাছে। কি হবে ওকে বলে ? কেবল দুশ্চিন্তার জাল বোনা ছাড়া আর কি সাহায্য সে করতে পারে ? রাত দশটা বাজে। শীতের শহর—বাজার বন্ধ হয়ে গেছে বহুক্ষণ। তাছাড়া বাজার এখান থেকে প্রায় এক মাইল। গাড়ি-ঘোড়া কিছু নেই।

'হ্যাঁ', 'না' করে মানসীর কথার জবাব দিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে ঘরে এলাম। নির্মলবাবু ও তাঁর স্ত্রী কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মা শুয়ে শুয়ে গীতাপাঠ করছেন। আমরা আসতেই তিনি গীতাখানি রেখে দিলেন। চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা শুরু করলেন। খৃষ্টানের সামনে গীতাপাঠ ! তাঁর মতে বোধহয় শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

কিন্তু আমার এখন এসব ভাবার মতো শারীরিক অবস্থা নয়। আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। চোখ বুজ ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু টানটা যে ক্রমশই বাড়ছে। বড়ই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কি করব বুঝতে পারছি না। মানসীকে বলব কি ?

কি লাভ হবে ? কেবল তার দুশ্চিন্তা বাড়বে। এতো রাতে সে কোথায় ওষুধ পাবে ? তাছাড়া সে-ও পরিশ্রান্ত। তার চেয়ে কষ্ট করে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দিই। কিন্তু রাত যে এখনও অনেক বাকি। পারব কি কাল সকাল পর্যন্ত সহ্য করতে, চুপ করে থাকতে ?

বাথরুম থেকে ফিরে আসে মানসী। বেড়াবার জামা-কাপড় গুছিয়ে রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে। একটু বাদে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "জল খাবে ?"

মাথা নাড়ি। ওয়াটার বটল থেকে জল নিয়ে আসে মানসী। উঠে বসে জলটা নিঃশেষ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। কোন কথা বলি না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। মানসীর বোধ করি কোন সন্দেহ হয় নি। সে আবার আসে। বলে, "বাতি নিবিয়ে দিই ?"

আমি তেমনি মাথা নাড়ি।

বাতি নিবিয়ে দেয় মানসী কিন্তু ঘর আঁধারে ঢেকে যায় না। বারান্দার আলো জ্বলছে। কাঁচের জানালা দিয়ে সে আলোর অনেকখানি এসেছে এই বন্ধ ঘরে।

মানসী এসে তার বিছানায় বসে—শুয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বলে, "গুড নাইট।"

আমি শুভ-রাত্রি জানাতে পারি না। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকি।

কিন্তু চেষ্টায় কি সব হয় ? আমার যে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস নিতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। বাধ্য হয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে শুরু করি। কতক্ষণ এভাবে সংগ্রাম করতে হবে ?

চুপ করে থাকি। যে ভাবেই হোক শারীরিক কষ্টকে গোপন করে রাখতে হবে। মানসী যেন টের না পায়। কিন্তু কতক্ষণ পারব কে জানে ? শ্বাসকষ্টটা ক্রমেই বাড়ছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। নিস্তব্ধ রাত্রি—বন্ধ ঘর। নিঃশ্বাসের শব্দকেই সোরগোল বলে মনে হয়।

আমার সকল চেষ্টা বৃথা হল। মানসী টের পেল। সে টর্চ জ্বালায়। বলে ওঠে, "কি হয়েছে তোমার ? ওবকম করছ কেন ?"

সে তাড়াতাড়ি উঠে আসে। আমার খাটিয়ায় এসে বসে। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। বলে, "কথা বলছ না কেন, কি হয়েছে তোমার ?"

মানসী বোধহয় ভুলেই গিয়েছে একটু দূরে ঘুমিয়ে রয়েছে সাহা পরিবার। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার। তবু কোনমতে বলি, "হাঁপানির টান উঠেছে।"

"হাপানি..... ?" আরও কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। বোধহয় খেয়াল হয় সাহা পরিবারের কথা। আমার হাঁপানির সংবাদ তার অজানা থাকার কথা নয়। তাই একটু থেমে নিচু হয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "কখন টান উঠেছে ?"

"খেতে বসে।"

"এতক্ষণ বল নি কেন ?"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী যেন ভেঙে পড়ে। সে আমার বুকে হাত বোলাতে থাকে। ভাল লাগে, কিন্তু রোগের দাপট কমে না।

"ওষুধ নেই সঙ্গে ?" একটু বাদে মানসী প্রশ্ন করে।

"না।"

"পাহাড়ী পথে একা একা ঘুরে বেড়াও। সঙ্গে ওষুধ রাখো না !"

একবার ভাবি বলি, নিয়ে এসেছিলাম, ফুরিয়ে গেছে, আর কেনা হয় নি। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আর কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি চুপ করে থাকি।

মানসী বলে, "কি ওষুধ খেলে তোমার কষ্ট কমে ?"

আমি নাম বলি। মানসী নামটা দু-তিনবার আবৃত্তি করে। তার পরে সহসা উঠে দাঁড়ায়। বলে, "আমি যাচ্ছি।"

"কোথায় ?"

"ওষুধ আনতে।"

"এত রাতে কোথায় যাবে তুমি ?" আমি তার হাতে ধরতে চাই। সে দূরে সরে যায়। আলো জ্বালায়। মিসেস সাহার ঘুম ভেঙে যায়। আমি অসহায়।

মানসী মিসেস সাহাকে বলে, "ওর আবার হাঁপানির দোষ আছে। হঠাৎ টান উঠেছে। আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি। আপনি একটু সজাগ থাকবেন ভাই।"

"এত রাতে একা ওষুধ আনতে যাচ্ছেন ? কোথায় ?" মিসেস সাহা সবিশেষ বিস্মিতা।

"কেন, বাজারে।"

"দোকান খোলা পাবেন কি ? আর একা একা যাবেনই বা কেমন করে ?"

"কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। ওর যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। যে ভাবেই হোক, ওষুধ আনতেই হবে। শহর যখন, নিশ্চয়ই কোন ডিসপেনসারীতে নাইট-সার্ভিসের ব্যাবস্থা আছে !" মানসী ওভার-কোট গায়ে দেয়। টর্চ ও টাকা নেয়।

স্বামীকে দেখিয়ে মিসেস সাহা বলে, "আমি বরং ওনাকে ডাকছি, আপনার সঙ্গে যান।

আপনি একা একা এই অচেনা জায়গায় কোথায়·যাবেন ?"

"না, না।" প্রতিবাদ করে মানসী। "উনি ঘুমোচ্ছেন। আপনি ভদ্রলোককে ডিস্টার্ব করবেন না। আমি দেখছি চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি কিনা ?"

মিসেসকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মানসী দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। আমি অসহায় দৃষ্টিতে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকি।

মিসেস আবার শুয়ে পড়ে। কিই বা করবে বসে থেকে। তার আর সাড়া পাচ্ছি না। সে কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ?

সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু ট্যুরিস্ট্-বাংলোর এই ডরমিটারীতে নয়, গ্রামেগঞ্জে শহরে-বন্দরে শ্রান্ত মানুষ পড়েছে ঘুমিয়ে। ঘুমের দেশে কেবল আমি রয়েছি জেগে।

না, আমি একা নই। জেগে আছে মানসী। আমারই জন্য সে এই গভীর রাতে পথে বেরিয়েছে। অথচ আজই সন্ধ্যায় সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আমি তার কে ? বলেছিল, সে নাকি আমার কাছে অনাত্মীয়া নারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কতক্ষণ পরে জানি না, ফিরে আসে মানসী। আমার দুশ্চিন্তার অবসান হয়। দরজায় খিল দিয়ে সে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে আমার কাছে। ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, "খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?"

আমি মাথা নাড়ি।

"ওষুধ নিয়ে এসেছি, এবারে কমে যাবে।" মানসী আমাকে সান্ত্বনা দেয়। সে জল নিয়ে আসে ওভার-কোটের পকেট থেকে ওষুধ বের করে। আমাকে ওষুধ খাওয়ায়। আলো নিবিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসে। মাথার কাছে বসে। আমার বুকে হাত বুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, "এবার ঘুমোবার চেষ্টা করো। ঘুমুতে পারলেই সব যন্ত্রণা কমে যাবে।"

"কিন্তু তুমি আমার জন্য কেন এতো কষ্ট করলে মানসী ?" আমি ওর একখানি হাত ধরি।

সে আমার কানের কাছে মুখ এনে ধমক লাগায়, "চুপ। ওঁরা জেগে আছেন। সন্দেহ করবেন।"

"তুমি এবারে গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"আগে তুমি ঘুমোও। তোমাকে ঘুম না পাড়িয়ে আজ যে ঘুম আসবে না আমার।"

"কাল রাতে আমি কিছু বলি নি বাছা, কিন্তু ধন্যি মেয়ে তুমি।"

ঘুম ভেঙে যায় আমার। কাঁচের জানালা দিয়ে প্রভাতী রোদ এসেছে ঘরে। ইস, এ যে দেখছি বেশ বেলা হয়ে গেছে। খুব ঘুমিয়ে নিয়েছি। কিন্তু নির্মলবাবুর মা কাকে বলছেন ওকথা। মানসীকে ? হ্যাঁ। তবে কি তিনি টের পেয়েছেন সব ! আমি আবার চোখ বুজি।

না। আমার সন্দেহ মিথ্যে। বৃদ্ধা বলছেন, "ঐ রাত দুপুরে ডাক্তারকে জাগিয়ে ওষুধ নিয়ে এলে। অচেনা শহর। এতটা পথ। পথে যদি একটা বিপদ-আপদ হত ?"

"ওষুধ না আনলে যে আরও বড় বিপদ হতে পারত মা।" মানসী জবাব দেয়। হয়তো বা আমার দিকে তাকায়। আমি চোখ বুজে থাকি।

বৃদ্ধা বলেন, "তাই তো বলছি, ধন্যি মেয়ে তুমি। দেখে রাখো বউমা।" শাশুড়ী পুত্রবধূকে বলেন, "স্বামীকে এমনি করেই ভালবাসতে হয়। সাবিত্রী সত্যবানের জন্য যমালয়ে গিয়েছিল।" কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই খেয়াল হয় তাঁর। তিনি মানসীকে বলেন, "কিন্তু

তোমরা তো খেরেস্তান। তোমাদের মধ্যে নাকি এমন হয় না।"

"যা শুনেছেন, তা সত্য নয় মা। ভালবাসাই সব ধর্মের মূল কথা। প্রেমের জন্যই প্রাণ দিয়েছেন যীশু।"

মানসী বোধহয় বুকে ক্রুশ আঁকে। কিন্তু দেখতে পাই না আমি। আমি চোখ বুজে আছি। মানসীকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি চোখ মেলে তাকাই। মানসী বাথরুমে চলে যায়।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে বৃদ্ধা আমার কাছে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, "এখন কেমন আছো ?"

"ভাল।"

"থাকতেই হবে। এমন লক্ষ্মী বউ যার। সারারাত মেয়েটা মাথার কাছে বসেছিল। তুমি সত্যি ভাগ্যবান।"

নিজের অলক্ষ্যেই বলে ফেলি, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

মানসী ঘরে আসে। মিসেস সাহা খিলখিল করে হেসে ওঠে। আমি চুপ করে থাকি।

মানসী মিসেসকে জিজ্ঞেস করে, "কী ?"

"আপনি ভাগ্যবতী।" মিসেস হাসতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে যান সাহা পরিবার। ওঁরা আজ নাগর যাচ্ছেন। ওঁদের বিদায় দিতে মানসী বেরিয়ে যায় রর থেকে। ফিরে এসে আমার খাটিয়ার পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, "কষ্ট কমেছে ?"

"হ্যাঁ। না কমে উপায় আছে। সাবিত্রী সঙ্গে রয়েছে যে।"

"বাজে কথা ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, ওষুধ খেয়ে নাও। আমি চা পাঠাতে বলে এসেছি।"

"যাচ্ছি, কিন্তু তুমি নাকি কাল সারারাত আমার শিয়রে বসেছিলে ?"

"হুঁ।"

"কেন ?"

"তুমি বসিয়ে রেখেছিলে বলে।"

"আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে তুমি গিয়ে শুয়ে পড়লেই পারতে।"

"হ্যাঁ। পারতাম বৈকি। যতবার হাত ছাড়িয়ে নিতে গেছি, ততবার আরও শক্ত করে ধরে রেখেছো। জোর করি নি, পাছে তোমার ঘুম ভেঙে যায়।"

"আমার জন্য তুমি কেন এত কষ্ট করলে মানসী ?" আমি হাত বাড়িয়ে ওর একখানি হাত ধরতে চাই।

দূরে সরে যায় মানসী। কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে, "কাল রাতের আঁধারে ঘুমের ঘোরে রোগের দাপটে যা করেছেন, আজ দিনের আলোতে জেগে থেকে সুস্থ শরীরে, তা করতে চাইবেন না।"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়।

বেয়ারা চা নিয়ে আসে। তার পেছনে মানসীও ঘরে ঢোকে। বলে, "যাও, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসো। ওষুধ খেতে হবে। চা জুড়িয়ে যাবে।"

চায়ের কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে মানসী বলে, "আজ কিন্তু আমাদের কোন প্রোগ্রাম নেই।"

"কেন ?" আমি বিস্মিত হই, "কাল যে কথা হয়েছিল আজ আমরা বিজলী-মহাদেবের মন্দিরে যাব।"

"মহাদেব মাথায় থাক আমার। এবেলা তুমি এ ঘরের বাইরে পা দিতে পারবে না, আজ তোমার কমপ্লিট রেস্ট। কেবল বিকেলে একবার বাজারে যাব।"

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। বোধহয় কাল রাতের সেই ডাক্তারের নির্দেশ। তবু বলি, "সারাদিন কি করব তাহলে ?"

"ঘরে থাকব।"

"ঘরে বসে থাকব ?"

"না। শুয়ে থাকবে। কমপ্লিট রেস্ট।" মানসী যেন আদেশ দেয়।

মেনে নিতে হয়। চা খেয়ে শুয়ে পড়ি। মানসী নিজের একখানি কম্বল এনে আমার গায়ে দিয়ে দেয়। আমার কম্বল নেই। কুলুতে দিনের বেলা স্লীপিং ব্যাগে ঢোকা কষ্টকর।

আমি বলি, "তুমিও তো একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো।"

"ঘুম পেলে নিশ্চয়ই ঘুমোব। আমার কথা ভাবতে হবে না, নিজের কথা ভাবো।" ব্যাগ থেকে কলম ও ইনল্যান্ড কভার বের করে মানসী টেবিলের ধারে গিয়ে বসে। কাকে যেন চিঠি লিখছে। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে থাকি।

একটু বাদে মানসী বলে, "এখান থেকে আমরা তো যোগিন্দর নগর যাচ্ছি ?"

"হ্যাঁ।"

"তার পরে ?"

"পাঠানকোট।"

"তাহলে বাবাকে কোথায় কোন ঠিকানায় চিঠি লিখতে বলব।"

"যোগিন্দর নাগরে ডাকবাংলোয় আর পাঠানকোটে কেয়ার স্টেশন মাস্টার ?"

কিছুক্ষণ বাদে ইনল্যান্ড লেটারটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখে মানসী ফিরে আসে নিজের খাটিয়ায়। বলে, "বাবার চিঠি পাচ্ছি না কেন বল তো ?"

"হয়তো ব্যস্ত আছেন বলে চিঠি লিখতে পারছেন না।" আমি বলি।

"কিন্তু বাবা তো কখনও এমন করে না। শত কাজের মাঝেও আমাকে চিঠি লেখে। কিছুদিন থেকে শরীরটা ভাল নেই। তাই বড্ড চিন্তা হচ্ছে।"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

"বড়লোকের যা হয়, হার্ট ট্রাবল্‌স।"

"তাহলে তুমি বড়লোকের মেয়ে ?"

"তা বলতে পারো। কেবল মেয়ে কেন, বড়লোকদের বোন। আমার দাদারাও গরীব নয়। কিন্তু মজা কি জানো ?"

"কী ?"

"আমি বড়ই দরিদ্র।" মানসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

"কেন ?" বুঝতে পারি না আমি।

"তোমার মা বেঁচে আছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তুমি বুঝতে পারবে না।" মানসী আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বলে, "শৈশবে যারা মাকে হারায় তাদের মতো দুঃখী আর হয় না এ সংসারে।" একবার থামে মানসী।

তার পর বলে, "তবে এক দিক থেকে আমার ভাগ্য বড়ই ভাল। আমার বাবার মতো স্নেহপ্রবণ মানুষ খুব কমই হয়। পিতা-মাতার যৌথ স্নেহে বাবা আমাকে মানুষ করেছেন। অথচ সেই বাবাকে আমি কতো বড় আঘাত দিয়েছি।"

"কেমন করে ?"

"আমি তাঁর কথা শুনি নি। তাঁর পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করি নি।"

"কেন ?"

"নিজের পছন্দের ওপরে বেশি বিশ্বাস ছিল বলে।"

"সে বিশ্বাস কে ভেঙে দিল ?"

"যেই দিক।" মানসী উঠে দাঁড়ায়। একটু হাসে—করুণ হাসি। তার পরে আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে, "তুমি কেন বিশ্বাসভঙ্গ করেছ ?"

"আমি ?" বুঝতে পারি না।

মানসী আবার খাটিয়ায় বসে। তার পর শুয়ে পড়ে। বলে, "হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে শর্ত ছিল, কখনও আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করবে না।"

আমি চুপ করে থাকি।

মানসী পাশ ফিরে শোয়। বোধহয় চোখ বোজে। সে কি ঘুমোবার চেষ্টা করছে ? না, নিজের বিগত জীবনের কথা ভেবে চলেছে !

সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারব না। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবু আমি মানসীর কথাই ভাবতে থাকি।

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। মানসী জিজ্ঞেস করে, "তোমার শরীর কেমন আছে ?"

"ভাল।" উত্তর দিই।

মানসী আমার দিকে ফেরে। বলে, "শ্বাসকষ্ট কমেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ?"

"না।"

"তাহলে চুপ করে আছো কেন ? আর কদিনই বা আছি এক সঙ্গে। বল না ভারমৌরের কথা।"

"ভারমৌর ?"

"হ্যাঁ। কাল সেই মানালী থেকে কুলু আসার সময় মণিমহেশযাত্রা কাহিনী বলছিলে। তোমরা দূর থেকে চাম্বা রাজত্বের সূতিকাগার ভারমৌর উপত্যকা দেখতে পেলে। ডাকরাণার দুখরিয়া সিং দু-হাত জোড় করে কাকে যেন প্রণাম করল। তোমরা বুঝতে পারলে না, কে তার প্রণম্য। তবু তার দেখাদেখি প্রণাম করলে। কিন্তু কাকে প্রণাম করল দুখরিয়া, তা কিন্তু এখনও বল নি আমাকে, বল নি ভারমৌরের কথা।"

"এখন আবার সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করব ?"

"হ্যাঁ।" মানসী উত্তর দেয়, "যে দিনগুলিকে ভুলে যাবার জন্য আমি হিমালয়ে আসি, আমার সেই দুঃখময় অতীত আজ আবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে তুমি দূর করে দাও, আমাকে তুমি ভুলিয়ে দাও সে অতীত। তুমি হিমালয়ের কথা বলো, আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করো।"

আর আপত্তি না করে আমি বলতে শুরু করি—

কয়েক পা এগিয়েই জানতে পারি, কার উদ্দেশে প্রণাম করেছে দুখরিয়া। সে নিজেই বলে, 'মণিমহেশ মন্দির।' ইশারা করে দেখিয়ে দেয়।

অনেক দূরে, তবু বাড়ি-ঘর আর গাছপালার ওপর দিয়ে মন্দিরচূড়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মণিমহেশে কোন মন্দির নেই। থেকেই বা লাভ কি ? বছরের কয়েকটা দিনই কেবল পূণ্যার্থীরা সেই দুর্গম হিমবাহ অঞ্চলে যেতে পারেন। কে বারো মাস পুজো করবেন সেখানে ! তাই তীর্থপথের শেষ বৃহত্তম জনপদ ভারমৌরে নির্মিত হয়েছে মণিমহেশ মন্দির। ভারমৌরের মন্দিরেই বারোমাস মণিমহেশের পূজা হয়।

পথটি বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে একটি ঝরণা। সেখান থেকে একটা পায়ে-চলা পথ উঠে গেছে ডানদিকের পাহাড়ে—৭৯০০ ফুট উঁচু ঘরারু গ্রামে। সেখানে বন-বিভাগের বিশ্রাম ভবন। আমরা গেলে আশ্রয় পেতাম। কিন্তু আমবা যাবো না। আমরা তো স্বাস্থ্যান্বেষী নই, আমরা মণিমহেশের যাত্রী। আমরা থাকব মণিমহেশ মন্দিরের কাছে। বিশ্রাম ভবন মন্দির থেকে এক মাইল। চরাই-উৎরাই পথ। ঘরারুতে বাস করে ভারমৌরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা কষ্টকর।

ঘোড়াওযালা এগিয়ে গেছে। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে। বলেছে, প্রেমলালজীর দোকানে মাল রেখে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমরা ঝরণা পেরিয়ে তাড়াতাড়ি এগিযে চলি।

বাঁকের পর থেকেই ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে বাড়ি-ঘর। পথের বাঁ দিকেও মাঝে মাঝে বাড়ি তবে ক্ষেতই বেশি। সুজলা ও শ্যামলা ভারমৌর উপত্যকা। আর তাই রাজপুতানা থেকে এসে মেরু ভার্মা এখানেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। ক্ষেতের শেষে বুড়ঢাল—ভারমৌরের প্রাণধারা।

ছোট ছোট পথ ওপর ও নিচ থেকে এসে মূল পথে মিশেছে। আমরা মূল পথ ধরেই এগিয়ে চলি। এখন পথের দুদিকেই বাড়ি-ঘর। দোকানের দাওয়ায় কিংবা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকে আমাদের দেখেছে। ওরা বুঝতে পারে আমরা তীর্থযাত্রী। ওরা খুশী হয়। মণিমহেশের তীর্থযাত্রী সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ সাধু ও স্থানীযরাই যাত্রায যান। পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে দু-চার দল যাত্রীও আসেন মাঝে মাঝে।

বাঙ্গালীর কাছে মোটেই জনপ্রিয় গিরিতীর্থ নয় মণিমহেশ। অথচ এ তীর্থপথ অতি সুন্দর ! পরম পবিত্র তীর্থ মণিমহেশ। পরম রমণীয় উপত্যকা ভারমৌর।

খুব কম বাঙ্গালীই মণিমহেশ দর্শন করেছেন। এ যুগের প্রথম বাঙালী যাত্রী বোধহয় স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। তিনি তাঁর 'পূণ্যতীর্থ ভারত' গ্রন্থে মণিমহেশের কথা লিখেছেন। তার পরে এসেছেন শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায। সঙ্গে ছিল আমাদের হিমাদ্রি—পর্বতারোহী হিমাদ্রি ভট্টাচার্য। তার পরে এসেছেন—রণেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী অরুণা মুখোপাধ্যায় ও কানাইলাল ঘোষ। এখানে এসেছেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসান্যাল। তাঁরা ১৯৬২ সালে—'Bharmour, the land of Gaddis' নামে একটি তথ্যচিত্র তুলে নিয়ে গেছেন। এ ছাড়া গত কয়েক বছরে বাংলা থেকে আর কেউ মণিমহেশ এসেছেন বলে আমার জানা নেই।

কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিলেন পথের পাশে। তাঁদের একজন হিন্দীতে জিজ্ঞেস করেন, 'কোথা থেকে আসছেন ?'

'কলকাতা।' অসিতবাবু উত্তর দেন।

'বংগালী ?'আবার প্রশ্ন করেন লোকটি।

'জী।' সুজয়া উত্তর দেয়।

'ডগদারসাহেবের কোঠিতে যাবেন ?'

বুঝতে পারি না ওদের কথা। কে ডাক্তার সাহেব, তাঁর কুঠিতে কেন যাবো ? বলি, 'না। মণিমহেশ যাত্রায় এসেছি।'

আমরা এগিয়ে চলি। একটা নবনির্মিত তোরণের সামনে এসে পথটি ডাইনে বাঁক নিল। বাঁকের মুখে ডান দিকে ফরেস্ট রেঞ্জারের অফিস ও কোয়ার্টার। ভারমৌরের প্রধান সম্পদ বন। কাজেই ফরেস্ট রেঞ্জার এখানকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি।

তোরণ থেকেই মন্দিরের এলাকা। মন্দির নয় চৌরাশী। চুরাশীটি শিবমন্দির ছিল বলে মন্দির এলাকার স্থানীয় নাম চৌরাশী।

ভারমৌরের প্রাচীন নাম ব্রহ্মপুরা। প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে ভারমৌর ভার্মা বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। ৬৮০ থেকে ৭০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছে এখানকার সব মন্দির। ৯৩০ খৃস্টাব্দে মহারাজা সহিল ভার্মা চাম্বায় রাজধানী নিয়ে যান। তার পর থেকেই ভারমৌর অবহেলিত হতে থাকে। ফলে একে একে মন্দিরগুলি ভেঙে যায়। কয়েকটি মন্দিরের বিগ্রহ পর্যন্ত অপহৃত হয়। কেবলমাত্র মণিমহেশ মন্দিরটি ভারমৌরের প্রাচীন গৌরবের সাক্ষী রূপে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে স্বামী জয়কৃষ্ণ গিরিমহারাজ নামে জনৈক মারাঠী সন্ন্যাসী চাম্বা থেকে তিসা হয়ে ত্রিলোকনাথ যান। সেখানেই তিনি শুনতে পান মণিমহেশের কথা। তাই চাম্বায় ফিরে না গিয়ে, দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তিনি মণিমহেশ দর্শন করেন। ফেরার পথে আসেন ভারমৌর। অবহেলিত ভারমৌরের দুর্দশা দেখে বিচলিত হলেন তিনি। আর গেলেন না ফিরে। স্থায়ী হলেন এখানে। কোথায় মহারাষ্ট্র আর কোথায় ভারমৌর। ভারমৌরের উন্নয়নে জীবন উৎসর্গ করলেন এক মারাঠী সন্ন্যাসী।

জয়কৃষ্ণ গিরিমহারাজ ছিলেন জুনাগড় আখড়ার একজন কঠোর ও তিতিক্ষাপরায়ণ সন্ন্যাসী। কৌপীনধারী এই সন্ন্যাসীর সম্বল ছিল একটি চাটাই ও একখানি মাত্র কম্বল। চৌরাশীর চৌহদ্দির মধ্যেই তাঁর আশ্রম। সেই আশ্রমেই ১৯৬৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর রাত নটার সময় ৯৩ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন এই মহান সন্ন্যাসী।

স্বামীজী কেবল এখানকার মন্দিরসমূহ সংস্কার করেন নি। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় এখানে স্কুল, হাসপাতাল, ডাকঘর ও সরাই নির্মিত হয়েছে। দু-মাইল দূরের ঝরণা থেকে নল দিয়ে জল এনে একট জলের কল করা হয়েছে। এটি ভারমৌরবাসীদের পানীয় জলের একমাত্র উৎস। আরও অনেক জনহিতকর কাজ করে গেছেন তিনি। আজকের ভারমৌর স্বামী জয়কৃষ্ণ গিরিমহারাজেরই অবদান।

শুনেছি স্বামীজীর একজন সুযোগ্য শিষ্য এখন তাঁর আশ্রমের পরিচালক। চাম্বা থেকে সবাই আমাদের সেই সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছেন। তাঁর কাছে গেলেই তিনি নাকি আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন।

তোরণ পেরিয়ে চৌরাশীর সীমায় প্রবেশ করি। কয়েক পা এগিয়েই বাঁ দিকে গণেশমন্দির। গড়নটা অনেকটা প্যাগোডোর মতো—কাঠ ও পাথরের তৈরি। ভেতরে ঢুকেই তিনদিকে বারান্দা—বসবার জায়গা। সামনে কুটিরাকৃতি পাথরের গর্ভমন্দির। গর্ভমন্দিরের কাঠের দরজায় সুন্দর কারুকায,। ভেতরে মানুষ-সমান অষ্টধাতুর অপূর্ব সুন্দর গণেশমূর্তি। পাথরের বেদীর ওপর উপবিষ্ট।

সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম করে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। একটু এগিয়ে লক্ষ্মী মন্দির। তীর্থযাত্রীরা বলেন লছমী, আর স্থানীয়রা বলেন লক্ষ্মণা। কেউ কেউ আবার ভগবতীও বলে থাকেন। লছমী বা লক্ষ্মণার সঙ্গে ভগবতীর সম্পর্কটা বুঝে উঠতে পারছি না।

না পারলেও কিছু এসে যাচ্ছে না। দেবী মন্দিরের দিকে গিয়ে চলি। ইঁট আর মাটির দেয়াল। পাথরের টালির চাল। কাঠের দরজায় কারুকার্য। ভেতরে ঢুকে তিন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দিরে উঠে এলাম। সিঁড়ির শেষে দুদিকে দুটি কাঠের স্তম্ভ—কারুকার্য খচিত। গর্ভমন্দিরের দ্বারে ও মন্দিরের আরও কয়েকটি স্তম্ভে সুন্দর খোদাই কাজ। ভেতর অষ্টধাতুর দণ্ডায়মানা দেবী মূর্তি।

লছমী মন্দিরের সামনে বাঁ দিকে খুব ছোট একটি মন্দির। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি কার্তিক মন্দির। ফুট দুয়েক লম্বা ও ফুট খানেক চওড়া একখানি সিঁদুর মাখানো চতুষ্কোণ পাথরের ওপরে ক্ষুদ্র একটি কার্তিক মূর্তি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ধাতুমূর্তি—রণবেশে কার্তিক। ঐ পাথরখানির সমান একটি কার্তিক মূর্তি ছিল এখানে। কিছুকাল আগে লাহুলের কয়েকজন তীর্থযাত্রী চুরি করে নিয়ে গেছে সে মূর্তিটি। সেই কার্তিক মূর্তি নাকি এখন মহাসমারোহে পূজিত হচ্ছে সেখানে। কার্তিক হিমাচলের সর্বত্রই অতিশয় জনপ্রিয়। কাজেই কার্তিকের কোন ক্ষতি হয় নি। ক্ষতি হয়েছে ভারমৌর আর মণিমহেশ যাত্রীদের। সেই সুন্দর মূর্তি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না তাঁদের।

কার্তিক মন্দির দর্শন করে এগিয়ে চলি। বাঁ দিকে মণিমহেশ মন্দির। কিন্তু এদিক থেকে মন্দিরে প্রবেশ করার উপায় নেই। প্রবেশদ্বার পূর্ব দিকে, এটা মন্দিরের উত্তর দিক। খানিকটা এগিয়ে সুপ্রাচীন এক দেওদার গাছ। গাছটি দেখবার মতো। আমরা খাজিয়ারেও বহু বড় বড় দেওদার গাছ দেখেছি। কিন্তু এর কাছে তারা কিছুই নয়। গাছটি এগারোটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। কাণ্ডের পরিধি একুশ ফুট চার ইঞ্চি। উচ্চতা একশ' পঁচিশ ফুট।

কথিত আছে কৈলাসের পথে অমরনাথ মণিমহেশ রূপে একদিন সন্ধ্যাবেলা কাশ্মীর থেকে এখানে এসে পৌঁছন। কিন্তু ভারমৌর হচ্ছে ব্রহ্মপুরা—দেবী ব্রহ্মণীর পুরী। ব্রাহ্মাণীদেবী থাকেন সামনের পাহাড়টার ওপরে। মণিমহেশের এই অনধিকার প্রবেশে রুষ্টা হলেন ব্রহ্মাণীদেবী। তিনি নেমে এলেন এখানে। মণিমহেশকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু তখন রাত হয়ে গেছে। অন্ধকার রাতে কোথায় যাবেন মণিমহেশ ! তিনি ব্রাহ্মণীদেবীর কাছে একটা রাত এখানে বাস করার অনুমতি চাইলেন। ব্রাহ্মণী অসহায় মণিমহেশকে রাত্রিবাসের অনুমতি দিলেন। এই দেওদার বৃক্ষতলে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে মণিমহেশ কৈলাসের পথে রওনা হলেন। ভারমৌর পূণ্যতীর্থে পরিণত হল।

"কিন্তু অমরনাথ থেকে কৈলাস যাবার পথে মণিমহেশ ভারমৌর যাবেন কেন ?" মানসীর প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে। আমি তাকে মণিমহেশ যাত্রার কথা বলছিলাম।

উত্তর দিই, "এ কৈলাস তিব্বতের কৈলাস পর্বত নয়। মণিমহেশের তীর্থে যে পাহাড়টিতে মণিমহেশ বাস করেন, সেটিও কৈলাসাকৃতি। তাই স্থানীয়রা তাকে কৈলাস বলেই অভিহিত করেন। মণিমহেশশৃঙ্গই হিমাচলের কৈলাস—ভারতের কৈলাস। কিন্তু কৈলাসের কথা পরে বলব, এখন ভারমৌরের কথা বলে নিই।"

"তাই ভাল।" মানসী মন্তব্য করে।

আমি আবার বলতে শুরু করি—

সেই দেওদার গাছ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। খানিকটা এগিয়ে চৌরাশী এলাকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জয়কৃষ্ণ গিরিমহারাজের আশ্রম। আশ্রমে প্রবেশ করি। সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠে মাঝারী আকারের একখানি ঘর। ঘরের কেন্দ্রস্থলে সুবিরাট শিবলিঙ্গ—ভারী সুন্দর। শুনেছি এই শিবলিঙ্গ অনাদৃত অবস্থায় পড়ে ছিল বাইরে। গিরিমহারাজ এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাঁ দিকে দুখানি ছোট ছোট ঘর। একখানি ঠাকুরঘর। আর একখানিতে গিবিমহারাজের মর্মর মূর্তি।

সাধুবাবা বসতে বললেন আমাদের। আশ্রমের ভেতরে সব সময় আগুন জ্বলে, তাই ভেতরটা বেশ গরম। ভারমৌরের উচ্চতা সাত হাজার ফুট।

বাবাজীকে প্রণাম করে আমরা তাঁর কম্বলের ওপর বসলাম। চেহারার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই বাবাজীর। গেরুয়াধারী সাধারণ সন্ন্যাসী। পরে অবশ্য দেখেছি সেবাপরায়ণ এই মানুষটি অসাধারণ। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

বাবাজী জিজ্ঞেস করেন, 'কোথা থেকে আসছ তোমরা ?'

'কলকাতা থেকে। আমরা বাঙালী।' অসিতবাবু বলেন।

'ডাক্তারসাবকে একবার খবর দাও তো ! আর এদের চা দিতে বলো।' বাবাজী জনৈক সেবককে বলেন।

'আবার চায়ের কি দরকার ছিল, আমাদের একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন।' সুজয়া বলে।

হেসে বাবাজী বলেন, 'সব হয়ে যাবে বেটি ! এতটা পথ হেঁটে এসেছিস, একটু চা খেয়ে নে। আমাদের চা বোধহয় ভালই লাগবে।'

একটু বাদেই গ্লাস বোঝাই চা আসে। চুমুক দিয়ে ভালই লাগে—সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু মশলা-চা।

চা শেষ হবার আগেই বুশসার্ট ও প্যান্ট পরিহিত দীর্ঘদেহী ফর্সা একজন প্রবীণ ব্যক্তি এসে উপস্থিত হন আমাদের সামনে। বাবাজীকে প্রণাম করে তিনি আমাদের পাশে বসেন। বাবাজী বলেন, 'ডাক্তারসাব এরা আপনার দেশের মানুষ। আপনার কোয়ার্টার্সের নিচতলাটা তো খালিই পড়ে আছে।'

'হ্যাঁ অনায়াসে থাকতে পারবেন।' ডাক্তারবাবু হিন্দীতে আমাদের বলেন, 'আপনাদের মালপত্র কোথায় ?'

'লালাজীর দোকানে।' অসিতবাবু উত্তর দেন।

'ঠিক আছে। যাবার পথেই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। চলুন তাহলে। বিকেলে এসে বাবাজীর সঙ্গে আলাপ করবেন।' তিনি উঠে দাঁড়ান। আমরাও উঠি। বাবাজীকে প্রণাম করে নেমে আসি আশ্রম থেকে।

আশ্রম থেকে বেরিয়েই কিন্তু ডাক্তারবাবু বাংলা বলতে শুরু করলেন। গল্প করতে করতে আমরা সুসমতল চৌরাশীর এলাকা ছাড়িয়ে জলের কলের পাশ দিয়ে লালাজীর দোকানের সামনে পৌঁছই। আরও দ্রষ্টব্য আছে চৌরাশীতে। বিকেলে কিংবা কাল দেখা যাবে সে-সব। কাল আমরা এখানেই থাকব। পরশু সকালে যাত্রা করব মণিমহেশের পথে।

চৌরাশীর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে রাস্তার মোড়ে প্রেমলালজীর দোকান। মুদি ও মনোহারী দোকান। কিন্তু সেই সঙ্গে পুরী, কচুরি, জিলিপি, লাড্ডু ও চা পাওয়া যায়। পঁচিশ বছর আগে প্রেমলালজী এসেছিলেন এখানে। এখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। তাঁর নিজের একখানি

জীপ আছে। চাম্বা থেকে জীপে করে দোকানের মালপত্র আসে। মণিমহেশ পথের শেষ দোকান এটি। চারি-পাশের গ্রামের অধিবাসীরা সবাই তাঁর ওপরে নির্ভরশীল। প্রেমলালজী এ অঞ্চলের অতিশয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু এ প্রভাব কেবল তাঁর স্বচ্ছল অবস্থার জন্য নয়, তিনি অমায়িক ভদ্র ও পরোপকারী।

প্রেমলালজীর দোকানের সামনেই মাল রেখে অপেক্ষা করছিল ঘোড়াওয়ালা। ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করে সে। ডাক্তারবাবু বলেন, 'আমার কোঠিতে মাল তুলে দাও।'

ঘোড়ওয়ালা ঘাড় নাড়ে। ডাক্তারবাবু প্রেমলালজীকে বলেন, 'লালা, এদের জন্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও।'

লালাজী সবিনয় নমস্কার করেন। বলেন, 'আপনারা গিয়ে আরাম করুন, আমি গরম পুরী আর মিঠাই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

প্রেমালজীর দোকানের পাশেই ত্রিপল ও চটের ছাউনীতে একটা হোটেল। ডাক্তারবাবু বাংলায় বলেন, 'কাল থেকে মেলা বসবে, তাই হোটেল হয়েছে। বুটি ও ভেড়ার মাংস পাবেন এখানে। ভারমৌরে হোটেলের মাংস পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনারা ভাগ্যবান।'

দুগেঠী থেকে আসা জীপরাস্তাটি চৌরাশীর তোরণ ছাড়িয়ে ফরেস্ট অফিসের পাশ দিয়ে লালাজীর দোকানের সামনে এসে শেষ হয়েছে। এখান থেকে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ চৌরাশীর মধ্য দিয়ে চলে গেছে হাড্সার হয়ে মণিমহেশ। আর এক ভাগ পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে ওপরে—বি. ডি. ও. এবং সিকিউরিটি অফিস ছাড়িয়ে গ্রামের প্রান্তে। এই পথেই ব্রাহ্মণীদেবীর মন্দিরে যেতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণীদেবীর কথা এখন নয়।

তবে এখন আমরা সেই পথেই চলেছি ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সে। কাছেই কোয়ার্টার্স। সামান্য একটু ওপরে উঠে ডানদিকে। প্রথমে কোয়ার্টার্স—ছোট একটি দ্বিতল বাড়ি। তার পরে হেল্থ সেন্টার—স্থানীয়রা বলেন হাসপাতাল। আমাদের ডাক্তারবাবু সেই হাসপাতালের একমাত্র ডাক্তার।

আমরা কোয়ার্টার্সের সামনে উঠে এলাম। একফালি উঠান। চৌরাশী ও বুডঢালের বেলাভূমিকে চমৎকার দেখাচ্ছে এখন থেকে। বুডঢালের ওপারে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা—হিমতীর্থ হিমাচল।

খোলা বারান্দার পরে তিনখানি ঘর নিয়ে একতলা। পাশেই হাসপাতালের অন্যান্য কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স। আমরা বারান্দায় উঠে আসি।

ডাক্তারবাবু তালা খুলে দেন। আমরা ভেতরে ঢুকি। একখানি মাঝারী ও দুখানি ছোট ঘর। সুজয়া খুবই খুশি। সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে সে ডাক্তারবাবুকে বলে, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের চমৎকার কুলিয়ে যাবে।'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'যে কদিন মর্জি থাকুন কিন্তু খালি ধন্যবাদ জানালেই হবে না, একটি দাবী আছে।"

'কি ?' আমরা বিস্মিত !

হেসে ডাক্তারবাবু বলেন, 'সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ করে আমার সঙ্গে বাংলায় গল্প করতে হবে।'

বিচিত্র শর্ত। আমাদের বিস্ময় কাটে না। ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেন। তিনি আবার বলেন, 'আরে মশাই বছরের পর বছর বাংলাবাত বলতে পারি না। মাতৃভাষা যে ভুলে যেতে বসেছি। তাই একটু ঝালিয়ে নিতে চাই আপনাদের সঙ্গে বাংলা বলে।'

আমরা তাঁর কথা শুনে হেসে উঠি। কথাটা কিন্তু মোটেই হাসির নয়। আট বছর হল ডাক্তারবাবু হিমাচলে এসেছেন। প্রথম দু বছর ছিলেন চাম্বায়। তারপর থেকে ভারমৌর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি আর দেশে যান নি—ফেরেন নি ঘরে। অথচ তাঁর সবই আছে—স্ত্রী, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। বড় ছেলে চাকরি করে, ছোট ছেলে পড়ে। মেয়েটি বি.এ. পাশ করেছে। ভবানীপুরে শরৎ বসু রোডে পৈতৃক বাড়ি।

ডাক্তারবাবুর নাম নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৯১৪ সালে। ১৯৪২ সালে মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে ভারতের বাইরে চলে গিয়েছিলেন।ফিরে এসে কয়েক বছর কলকাতায় চাকরি করেছেন। কিন্তু কলকাতা ভাল লাগে নি তাঁর। তাই এসেছেন হিমাচলে। পাশ করার পরে ডাক্তাররা সবাই শহরে থাকতে চান বলে যে অপবাদটি চালু আছে আমাদের দেশে, সেটির ব্যতিক্রম তিনি।

"কিন্তু ভদ্রলোক বাড়ি যান না কেন ? স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া-টগরা করে এসেছেন নাকি ?'

মানসীর প্রশ্নে ভারমৌরের কথা থামাতে হয় আমাকে। হেসে বলি, "স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে কি আট বছর বাড়ি না এসে পারা যায় ?"

"পারা যায় না বুঝি ?" মানসীও হাসে।

"আমার তো তাই ধারণা।" আমি বলি।

"ধারণাটা তো সত্যি নাও হতে পারে।" একবার থামে মানসী। তার পরে বলে, "ঝগড়া না করেও ভালবেসে বিয়ে করা বউকে চিরদিনের মতো ভুলে যাওয়া যায় সখা !"

"কোন অভিজ্ঞতা থেকে তুমি একথা বলছ, আমি জানি না মানসী। তবে ডাক্তারবাবুর ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ও স্নেহপ্রবণ পিতা। বাড়ির চিঠি না পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন। নিয়মিত টাকা পাঠান। নস্যি নেওয়া ও বই পড়া ছাড়া তাঁর অন্য কোন নেশা নেই। তিনি স্ত্রীকে ভারমৌর নিয়ে আসেন না, কারণ তাহলে ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার ক্ষতি হবে। নিজে যান না, কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে হাসপাতালের হাল খারাপ হয়ে যাবে—লোকগুলো বিনাচিকিৎসায় মারা যাবে। মুখে বলেন— আর ক'বছরই বা বাকি আছে, রিটায়ার করে একবারে কলকাতায় ফিরব।"

"বিচিত্র মানুষ বলতে হবে।" মানসী বলে।

"সত্যই তাই।" আমি উত্তর দিই।

"কিন্তু তাঁর কথা আবার পরে শুনব। এখন তোমাকে ওষুধ খেতে হবে। তার পরে স্নান করে আমরা খেতে যাবো। আজ আর কোন অনিয়ম নয়, আজ তোমার বিশ্রাম।"

॥ বারো ॥

ডাইনিং হল থেকে ফিরে আসি ঘরে। আমি এসে বিছানায় বসি। মানসী এক গ্লাস জল এনে আমার সামনে ধরে। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিই। মানসী বলে, "জল খেয়ে শুয়ে পড়ো। আর শুয়ে শুয়ে বলতে থাকো।"

"কী ?" গ্লাসটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিই।

"কি আবার, ভারমৌরের কথা—মণিমহেশ যাত্রাকাহিনী।" গ্লাসটা রেখে দিয়ে মানসী নিজের খাটিয়ায় এসে বসে।

আমি বলি, "ব্যস্ততার কি ? আমরা তো আরো কয়েকটা দিন আছি এক সঙ্গে।"

"তোমার দিক থেকে ব্যস্ততার কিছু না থাকলেও আমার দিক থেকে আছে। তুমি লেখক, পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল বাড়িয়ে তোলাতেই তোমার আনন্দ। কিন্তু আমার বেলায় ও চালাকিটি চলছে না। শিগ্‌গীর বলতে শুরু করো, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

অগত্যা আমাকে শুরু করতে হয়—

চাম্বা রাজ্যের সূতিকাগার ভারমৌর। গদ্দি উপজাতির মাতৃভূমি এই রমণীয় উপত্যকা। তাই ভারমৌরের আরেক নাম গদ্দেরাণ। আবার কেউ বা বলেন শিবভূমি। হিমালয় শিবালয়। তার ওপরে একদা ভারমৌরে চুরাশিটি শিবমন্দির ছিল।এবং এখনও শিবতীর্থ-মণিমহেশ পথের শেষ বড় জনপদ ভারমৌর। সুতরাং ভারমৌর শিবভূমি।

ভারমৌরের প্রাচীন নাম ব্রহ্মপুরা। কেউ বলেন স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রী ব্রাহ্মণীদেবীর নাম থেকেই চাম্বারাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম হয়েছিল ব্রহ্মপুরা। আবার অনেকের মতে চাম্বারাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা মেরু বর্মণ (৬৮০ খ্রীঃ) কুমায়ুনের ব্রহ্মপুর থেকে এই উপত্যকায় যান। তাই তিনি তাঁর নূতন রাজ্যের নাম রাখেন ব্রহ্মপুরা। নামটি যে কারণেই হয়ে থাক, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে ভারমৌর শব্দটি ব্রহ্মপুরা শব্দের অপভ্রংশ।

আড়াই শ' বছর ধরে যে জনপদ রাজধানী ছিল, আজ সেটি একটি বড় গ্রাম মাত্র। সেকালের রাজধানী একালে উপ-তহশিল সদর। ২৫১টি গ্রাম আছে এই উপ-তহশিলে। জনসংখ্যা তিরিশ হাজারের মতো।

সেকালের চুরাশিটি মন্দিরের জায়গায় এখন মাত্র পনেরোটি মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে দশটিই শিব-মন্দির। সেগুলি হল—দশনাম ও হরিহর আখড়ার মন্দির, দৈবলা, সূর্যলিঙ্গ, মৌনীলিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ, মহাদেবজী, ক্রমেশ্বরজী, নকেশ্বরজী ও মণিমহেশ মন্দির। এই সবমন্দিরেই পাথরের শিবলিঙ্গ। বাকি পাঁচটি মন্দিরে রয়েছেন নরসিংহ ভগবান, লক্ষ্মীদেবী, শীতলাদেবী, গণেশজী ও নন্দজী। শীতলাদেবীর মূর্তিটি শুধু পাথরের, অন্য মূর্তি চারটি অষ্টধাতুর তৈরি। মন্দির ও মূর্তি ছাড়াও ভারমৌরের চৌরাশীতে রয়েছে ছোট একটি কুণ্ড, নাম অর্ধগয়া সরোবর।

"তার মানে সেখানে স্নান করলে গয়াস্নানের অর্ধেক পুণ্যহয়।" মানসীর মন্তব্যে বর্তমানে ফিরে আসি। কুলুর ট্যুরিস্ট্ বাংলোয় শুয়ে আমি মানসীর কাছে মণিমহেশ যাত্রার কাহিনী বলছি, ভারমৌরের কথা বলছি।

মাথা নেড়ে মানসীর মন্তব্য মেনে নিয়ে আমি আবার বলতে থাকি—

"ভারমৌরের অধিকাংশ মন্দির এবং প্রত্যেকটি প্রাচীন মূর্তি পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। লক্ষ্মী, গণেশ, নরসিংহ ও মণিমহেশ মন্দিরকে ভারত সরকার Protected Monument রূপে ঘোষণাও করেছেন, কিন্তু কেউ কোন গবেষণা করছেন বলে জানা নেই আমার।"

"আচ্ছা সবচেয়ে সুন্দর কোন্ মন্দিরটি ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"লক্ষ্মণা বা লক্ষ্মীদেবী মন্দিরের কারুকার্য সবচেয়ে সুন্দর।"

"চাম্বা জেলায় আর কোন্ কোন্ মন্দির Protected Monument?"

"চাম্বার লক্ষ্মীনারায়ণ, হরিরায়, বংশীগোপাল, সীতারাম ও চামুণ্ডাদেবী এবং ছাতরারীর শক্তিদেবীর মন্দির।"

বিকেলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আবার নেমে এলাম চৌরাশীতে। আশ্রমের সামনেই গিরিমহারাজের সমাধি মন্দির।

সমাধি মন্দিরের পেছনে নৃসিংহদেবের মন্দির। পাথর ও কাঠের কারুকার্যময় মন্দির। গড়নটা উড়িষ্যার রেখ-দেউলের মতো। সামনে উঠান। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছোট নাট-মন্দির। গর্ভমন্দিরে নৃসিংহদেবের সুবিশাল ও অনিন্দ্য সুন্দর অষ্টধাতুর মূর্তি। মন্দির হিসেবে ভারমৌরে মণিমহেশের পরেই নৃসিংহদেবের স্থান। ভারমৌরে এই দুটি কেবল শিখরযুক্ত মন্দির। রাণী ত্রিভুবনরেখা খ্রীষ্টীয় দশম কিম্বা একাদশ শতকে নির্মাণ করেছেন। ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিলের ভূমিকম্পে মন্দিরটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

নরসিংহদেব মন্দিরের উত্তরে চৌরাশীর চৌহদ্দির বাইরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। কাঠ মাটি ও পাথরের দুটি দোতলা বাড়ি। কাঠের ওপরে খোদাই কাজ। পেছনের বাড়িটা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। সামনেরটা পরে নির্মিত হয়েছে। আশ্চর্য, সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত প্রাসাদ পূরাতত্ত্ব বিভাগের সম্পত্তি নয়, পঞ্চায়েত অফিস। ডাক্তারবাবু বললেন—শিগ্‌গীরই এটা ভেঙে ফেলে স্কুল-বাড়ি তৈরি হবে।

স্কুলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। কিন্তু চাম্বার ইতিহাসের এই প্রাচীনতম সাক্ষীকে নির্মূল করা নিঃসন্দেহে নির্বুদ্ধিতা।

চাম্বার যে ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে এই ভগ্ন প্রায় প্রাচীন প্রাসাদ থেকে, সে ইতিহাস আজও নীরব। নীরব কারণ আমরা তার মুখে ভাষা দেবার চেষ্টা করি নি। নীরব কারণ ভার্মাবংশীয় রাজারা অতীত ও ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। তাহলেও চাম্বা জেলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জানা যায়, ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অর্থাৎ সম্রাট হর্ষবর্ধনের দেহরক্ষার (৬৪৮ খ্রীঃ) অনতিকাল পরেই, তিব্বতের তৎকালীন রাজার আক্রমণে ভারমৌর উপত্যকার গ্রামগুলি প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। কিন্তু ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে দিবাকর বর্মণ নামে জনৈক নৃপতি তাঁর পরিবার-পরিজন এবং দলবল নিয়ে ভারমৌর উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করেন। ইরাবতীর তীরে আবার নতুন জনপদ গড়ে ওঠে।

দিবাকরের দেহরক্ষার পরে ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ছেলে মেরু বর্মণ রাজা হলেন। তিনি চারিপাশের বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর তার অধিকার কায়েম করে ব্রহ্মপুরা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আর তখুনি ভারমৌর রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। তারপরে তের শ' বছর ধরে মেরু বর্মণের বংশধরগণ ভারমৌর ও চাম্বায় রাজত্ব করেছেন।ভারতে আর কোথাও একই রাজবংশ এত সুদীর্ঘ সময় ধরে রাজত্ব করেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালে বর্মণ রাজারা নিজেদের ভার্মা বলে পরিচয় দিয়েছেন।

৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অজয় ভার্মা ভারমৌরের সিংহাসনে বসেন। অনেকের ধারণা তাঁরই রাজত্বকালে পাঞ্জাব ও রাজপুতনা থেকে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা এই রাজ্যে আসেন। তাঁরাই গদ্দিরের পূর্বপুরুষ।

৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন মূষণ ভার্মা। কথিত আছে তাঁর বাবাকে মেরে ফেলার পরে তাঁর মা যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক গুহায় তাঁর জন্ম হয়। মা তাঁকে সেখানে ফেলে রেখেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। পরে রাজকর্মচারীরা রাজপুত্রকে নিতে এসে দেখেন কয়েকটি মূষিক তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। তাই তাঁরা নবজাতকের নাম রাখেন মূষণ। সিংহাসনে আরোহণ করার পরে তিনি রাজ্যে মূষিক হত্যা নিষিদ্ধ করে দেন। আজও চাম্বা রাজবংশের কেউ মূষিক হত্যা করেন না।

তারপরেই চাম্বা রাজ্যের উল্লেখযোগ্য রাজা মহারাজা সহিল ভার্মা। কিন্তু তাঁর কথা বলা হয়েছে আমার।

মানসী মাথা নাড়ে।

আমি আবার বলতে শুরু করি—

চাম্বার রাজারা তাঁদের রাজপণ্ডিতদের ইতিহাস রচনা করতে বলেন নি। কিন্তু প্রতিবেশী কাশ্মীর রাজ্যের পণ্ডিতগণ তাঁদের রাজাদের কথা লিখতে গিয়ে চাম্বার কথা লিখে রেখে গেছেন।

কাশ্মীরের সেই ইতিহাস তাঁরা রচনা করে গেছেন বিখ্যাত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে। রাজতরঙ্গিণী আট খণ্ডে বিভক্ত। পাঁচজন কবি বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। কাশ্মীররাজ জয়সিংহের রাজত্বকালে মহাকবি কল্হান এই গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। পরবর্তী অংশ—অর্থাৎ ১৪৫৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রচনা করেন কবি জোনারাজ। ১৪৫৯ থেকে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস রচনা করেন জোনরাজের শিষ্যকবি শ্রীবর। কবি প্রাজ্যভট্ট ও তাঁর শিষ্য শুকনামা অবশিষ্ট অংশ প্রণয়ন করেন। রাজতরঙ্গিণীতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীর ও তার প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের ইতিহাস লেখা আছে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন।

রাজতরঙ্গিণী থেকে আমরা জানতে পারি যে এই দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ যেমন হয়েছে, তেমনি আবার একটা প্রীতির সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। কাশ্মীররাজ অনন্তদেব ১০২৮ থেকে ১০৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় চাম্বা আক্রমণ করে চাম্বারাজ সালবাহন ভার্মাকে সিংহাসনচ্যুত করে সোম ভার্মাকে চাম্বার সিংহাসনে বসান। তার পর থেকে কিছুকাল চাম্বা কাশ্মীরের অধীন ছিল। কিন্তু সে অধীনতা উভয় রাজ্যের প্রীতির সম্পর্ককেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

কাশ্মীররাজ কলশদেবের রাজত্বকালে (১০৬৩—১০৮৯ খৃঃ) চাম্বারাজ অসত ভার্মা শ্রীনগরে যান। পরে তিনি কলশদেবের সঙ্গে তাঁর ভগ্নী ব্যাপিকার বিবাহ দেন। চাম্বার রাজকন্যা ব্যাপিকার পুত্র হর্ষদেব ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন।

কাশ্মীররাজ সুশলদেবের রাজত্বকালে (১১১২—১১২০ খৃঃ) জসত ভার্মা চাম্বার রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে গিয়ে প্রচুর সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় সুশলদেবকে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল। কিন্তু এক বছর পরে সুশলদেব আবার কাশ্মীরের সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং ১১২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা জসত ভার্মার পরবর্তী চাম্বারাজ ব্রহ্মজলা বহিরাক্রমণের সময় সুশলদেবকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং তারই ফলে সেবার শ্রীনগর রক্ষা পায়। সুশলদেবের রাণীদের মধ্যে দুজন ছিলেন চাম্বার রাজকন্যা—পরমাসুন্দরী দেবলেখা ও তাঁর ভগ্নী তারালেখা। স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা সতী হয়েছিলেন।

প্রাচীন রাজপ্রাসাদ দেখে আমরা ফিরে আসি চৌরাশীতে। মণিমহেশ মন্দিরের সামনে নন্দী মন্দির। কাঠের ছাউনির নিচে অষ্টধাতুর অপূর্ব সুন্দর বৃষমূর্তি—মণিমহেশের বাহন নন্দী। গলায় ও পায়ে অলঙ্কার। পায়ের কাছে খোদাই করে কিছু লেখা আছে। কেউ উদ্ধার করতে পারেন নি। পারলে হয়তো চাম্বার নীরব ইতিহাস আজ কথা বলতে পারত।

ভক্তদের তেল ও সিঁদুরে চর্চিত নন্দামূর্তি। এত বড় ও এমন জীবন্ত নন্দীমূর্তি আমি আর কোথাও দেখি নি। ভারমৌরের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তি এটি। এর পরে যথাক্রমে গণেশ ও নৃসিংহ মূর্তির স্থান।

অবশেষে এলাম মণিমহেশ মন্দিরে। পূবমুখী মন্দির। কাঠের ছোট গেট পেরিয়ে তিন ধাপ সিঁড়ি। তার পরে মন্দির চত্বরের প্রথম স্তর। একটু এগিয়ে আবার তিন ধাপ সিঁড়ি

পেরিয়ে মন্দিরের দ্বিতীয় স্তর। চত্বরের কেন্দ্রস্থলে মন্দির—মণিমহেশ মন্দির।

চত্বরে পড়ে আছে সিঁদুর মাখানো নয়টি শিবলিঙ্গ। চুরাশীটি শিবমন্দির ছিল এখানে। এর প্রতেকটি লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল পৃথক পৃথক মন্দিরে। সব মন্দিরই গিয়েছিল ভেঙে। গিরিমহারাজ প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির সঙ্গে কয়েকটি শিবমন্দিরেরও সংস্কার সাধন করেছেন। কিন্তু চুরাশীটি শিবমন্দির পুনঃনির্মাণ করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। তবে যে কয়েকটি লিঙ্গমূর্তি তিনি পেয়েছেন, সেগুলিকে হয় কোন মন্দিরে স্থাপিত করেছেন না হয় এই চত্বরে সুরক্ষিত করেছেন। এমনি একটি লিঙ্গমূর্তিই তিনি তাঁর আশ্রমেও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমরা চত্বর পেরিয়ে মণিমহেশ মন্দিরে উঠে আসি। লাল পাথরের মন্দির। কাঠের দরজায় কারুকার্য। দরজার দু-দিকে দুটি প্রস্তরস্তম্ভ।

দরজার পরে একফালি জায়গা—ছোট নাট-মন্দিরও বলা যেতে পারে। ওপর থেকে চারটি ছোট ও বড় ঘন্টা ঝুলছে।

কোমর সমান উঁচু কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করি। প্রবেশ করি মণিমহেশের মন্দিরে। কোন এক বিস্মৃত অতীতে নির্মিত হয়েছিল যে দেবালয় সেই দেবালয়ের দ্বারে আজ এসে দাঁড়িয়েছি আমি। ইতিমধ্যে জগতে কত পরিবর্তন এসেছে। সেদিনকার রাজধানী আজ গণ্ডগ্রামে রূপান্তরিত। সেদিনকার সেই প্রবল প্রতাপ মহারাজারা আজ কেউ নেই। সবাই বিলীন হয়েছেন অতীতের অন্ধকারে।কিন্তু আছে সেই দেবালয় আর আছি আমি—সকল কালের তীর্থপথের পথিক। আমি জগতের সকল পরিবর্তনকে অবহেলা করে দুস্তর ও দুর্গম পথ পেরিয়ে, যুগে যুগে এমনি করে এসে দাঁড়িয়েছি দেবালয়ের দ্বারে। মানুষের ভগবানের কাছে মানষের মঙ্গল কামনা করেছি।

প্রণাম করি মণিময় মণিমহেশকে—হরিহর শিবের সুবিশাল লিঙ্গমূর্তিকে।

পূজারী প্রসাদ ও চরণামৃত দিলেন। দর্শন শেষে বেরিয়ে এলাম বাইরে। মন্দির প্রদক্ষিণ করে নেমে এলাম চৌরাশীর প্রাঙ্গণে।

মণিমহেশ মন্দিরের দক্ষিণে সরাই। বড় একখানি ঘর। মাটির মেঝে, চারিদিকে কোমর সমান দেয়াল। ওপর দিকটা ফাঁকা। হিমালয়ের অভ্যন্তরে সাত হাজার ফুট উঁচু উপত্যকা। তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা খুবই কাছে। কাজেই দেয়ালবিহীন এই ঘরে রাত্রিবাস করা সাধারণ যাত্রদের দুঃসাধ্য। তবে সাধুদের অসুবিধে হয় না। তাঁদের সহনশক্তি বেশি। যেখানে যেতে আমাদের ট্রেকিং শু, ফেদার জ্যাকেট আর স্লীপিং ব্যাগের দরকার হয়, সেখানে ওঁরা খালি পায়ে কৌপীন পরে চলে যান।দেহ অভ্যেসের দাস।

কয়েকজন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে আছেন সরাইতে। ধুনি জ্বালাবার কোন অসুবিধে নেই। ওঁরা বাবাজীর কাছ থেকে জ্বালানী কাঠ পান। কেবল কাঠ কেন, ডাল আটা আলু তেল নুন চা চিনি দুধ সবই ওঁরা পেয়েছেন বাবাজীর কাছ থেকে। মণিমহেশযাত্রী সাধুরা সবাই সিধা পান বাবাজীর আশ্রমে। আজ নয়, গিরিমহারাজের আমল থেকেই চলে আসছে এই প্রথা।

সাধারণ যাত্রীদের জন্য কোন আশ্রয় নেই ভারমৌরে।* ভাগিস্য ডাক্তারবাবু আছেন এখানে। না হলে আমাদের কি হাল হত কে জানে। তবে শুনেছি বাবা সবাইকেই একটা ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের ভাগ্য ভাল, ডাক্তারবাবুর কৃপায় রাজার হালে আছি।

---

* এখন নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম-ভবন সহ কয়েকটি আশ্রয় হয়েছে।

অথচ আমাদের মত যাত্রীদের জন্যই মহারাজা ভুরি সিং নির্মাণ করে দিয়েছিলেন একটি ধর্মশালা। এখন সেটি পাঠশালা। হিমালয়ের উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল কিন্তু এখানে একটি স্কুল-বাড়ি তৈরি হল না।

আমরা পাঠশালার সামনে আসি। চৌরাশীর দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। যাত্রীদের আর প্রবেশাধিকার নেই যাত্রীদের জন্য নির্মিত এই আবাসে। কিন্তু বাড়ির সামনের প্রস্তরফলক খুলে ফেলা হয় নি। তাতে লেখা রয়েছে—

'SHAM SINGH MEMORIAL DHARAMSHALA

The dharamshala was erected to the memory of Raja Sham Singh and for the convenience of the pilgrims going to Mani Mahesh by H.H. Raja Sir Bhuri Singh on the 8th September, 1913.'

বলতে পারি না, হয়তো গিরিমহারাজের অনুরোধেই তিনি এ ধর্মশালা নির্মাণ করেছিলেন।

পাঠশালার পাশ দিয়েই মণিমহেশের পথ। পথের ধারে চৌরাশীর পূর্ব প্রান্তে গুটিকয়েক ছোট ছোট দোকান। চৌরাশীর এখানে-ওখানে ছোট ছোট শিবমন্দির। কোথাওবা মন্দির নেই, কেবল শিবলিঙ্গ।

কাল থেকে মেলা বসবে। তাই চট আর ত্রিপলের ছোট ছোট ছাউনি পড়েছে। দোকান বসবে—মিঠাই মনোহারী আর জামাকাপড়ের দোকান। বসবে নাচ-গানের আসর। ভারমৌরের মেলা চাম্বা জেলায় বিখ্যাত। সাধারণতঃ হাজার খানেক লোকের সমাগম হয়। সন্ন্যাসী ও স্থানীয় লোকের সংখ্যাই বেশী। তবে জম্মু-কাশ্মীর আর পাঞ্জাব থেকেও দোকানী এবং যাত্রী আসেন। ডাক্তারবাবু বললেন—১৯৫৫ সালে নাকি খুব বড় মেলা হয়েছিল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক এসেছিল সেবারে।

জন্মাষ্টমীর দিন দুয়েক আগে অর্থাৎ শ্রাবণমাসে ভারমৌর থেকে মণিমহেশ যাত্রা আরম্ভ হয়। তখনও ছোট মেলা বসে চৌরাশীতে। জন্মাষ্টমীর দিন যাত্রীরা মণিমহশে পৌঁছে স্নান করেন।

রাধাষ্টমীর আগে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে চাম্বা থেকে ছড়ি আসে ভারমৌর। তখন বড় মেলা বসে। মেলার দ্বিতীয় দিনে যাত্রীরা রওনা হন মণিমহেশ। বহু গদ্দি ভেড়া সহ তাঁদের সহযাত্রী হয়। তাঁরা ধনছোতে গিয়ে মণিমহেশের পুজো করে। ভেড়া বলি দেয়। রাধাষ্টমীর দিন যাত্রীরা মণিমহেশের ডাল হ্রদে স্নান করেন।

সেই মেলাই বসছে কাল থেকে। কাল এখানেই থাকব আমরা। আমরা ভাগ্যবান, বড় ভাল সময়ে এসেছি। মেলা দেখা যাবে, যাত্রায় অংশ নিতে পারব আর রাধাষ্টমীতে মণিমহেশে স্নান করে অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয় করব।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমরা চৌরাশীর পশ্চিমপ্রান্তে আসি। সামনেই সেই জলের কল বা ধারা—বিরামহীন জলধারা। দিবারাত্র জল পড়ছে। ভারমৌর-বাসীদের পানীয় জলের একমাত্র উৎস। কিন্তু স্নান করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা এমনকি গরু-মোষ ধোয়ানো পর্যন্ত চলেছে। ফলে কলতলাটা অত্যন্ত নোংরা। এদিকে দৃষ্টি দেওয়া বোধহয় গ্রাম-পঞ্চায়েতের কর্তব্যকর্মের অন্তর্ভূত নয়।

চৌরাশী পরিক্রমা পূর্ণ করে এসে বসি প্রেমলালজীর দোকানে। সুজয়া চায়ের ফরমাশ দেয়।

চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে আবার ভাবি ভারমৌরের কথা—ভারমৌর ভারী সুন্দর।

ভাবি আগামী কালের কথা—কাল আমরা ব্রহ্মাণীদেবীর মন্দিরে যাব আর মেলা দেখব।

ভাবি পরশুর কথা—পরশু যাত্রা করব মণিমহেশের পথে। বিদায় নেব ভারমৌরের কাছ থেকে। ফেরার পথে আর আসব না ভারমৌরে। এদিক দিয়ে ফিরব না আমরা। মণিমহেশ দর্শন করে নেমে আসব হাড়্‌সারে। সেখান থেকে ধরব কুগতি গাঁয়ের পথ। কুগতি গাঁয়ে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে শুরু করব দুর্গম থেকে দুস্তরের যাত্রা। কুগতি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে পৌঁছব পাঙ্গী উপত্যকার সদর কিলার। একটা দিন কাটাবো সেখানে—দেখব মন্দির। তার পরে পাড়ি দেব উদয়পুর হয়ে ত্রিলোকনাথের পথে। ৯৫৬৬ ফুট উঁচু ত্রিলোকনাথ বা ত্রিলোকীনাথ—লাহুল উপত্যকার শ্রেষ্ঠ তীর্থ। বোধিসত্ত্ব ত্রিলোকীনাথের মন্দির আছে সেখানে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় মেলা বসে, দূর-দূরান্তের পূণ্যার্থী মানুষ সমবেত হন সেই মন্দিরতলে। আগে তিব্বত ও চীন থেকে যাত্রীরা আসতেন। এখন সে যাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে।

ত্রিলোকনাথ থেকে যাব কেলং। সেখান থেকে রোতাং গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে মানালী।

তাই কালকের দিনটাই কেবল আছি ভারমৌরে। এমন সুন্দর শৈলপুরী থেকে এত তাড়াতাড়ি নিতে হবে বিদায়। ভাবতে খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি হিমালয়ের পথিক—পথই যে আমার জীবনের অবলম্বন।

"একস্‌কিউজ মি। এক মিনিট।" মানসী হঠাৎ বলে ওঠে।

থামতে হয় আমাকে—বন্ধ করতে হয় ভারমৌরের কথা। মানসী উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় টেবিলের ধারে। আমি চুপ করে থাকি। সে ওষুধ নিয়ে আসে।কথা বলে লাভ নেই। নিঃশব্দে তার হাত থেকে নিয়ে ওষুধ খাই। গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে মানসী ফিরে আসে। জিজ্ঞেস করে, "কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে কি ?"

"না।"

"আমি বরং তোমার খাটেই বসছি। তুমি একটু সরে শোও।"

"তাতে লাভ ?" আমি একটু সরে মানসীকে বসার জায়গা করে দিই।

মানসী আমার বিছানায় বসে। বলে, "লাভ আছে বৈকি। তোমাকে অমন চেঁচিয়ে কথা বলতে হবে না।"

"কিন্তু তোমাকে যে বসে থাকতে হবে।"

"হোক্‌গে।"একবার থামে মানসী। তার পরে বলে, "আর আমাকে যে বসেই থাকতে হবে তারই বা কি মানে আছে ? ইচ্ছে হলেই আমি তোমার পাশে শুয়ে পড়ব।"

"পারবে ?" হেসে জিজ্ঞেস করি।

"দেখতে চাও ?"

"হ্যাঁ।"

"না," মানসী গম্ভীর স্বরে বলে, "আর সময় নষ্ট না করে এবারে ভারমৌরের কথা বলতে শুরু করো দেখি।"

আমি শুরু করি—

শেষরাত থেকেই বৃষ্টির শব্দ শুনছিলাম। সকালে উঠেও দেখি বৃষ্টি পড়ছে। ঘুম পাড়িয়ে রেখে প্রকৃতি আমাদের সর্বনাশ করেছে। ভারমৌরের চেহারা পালটে গেছে। কর্দমাক্ত পথ জনমানব শূন্য। পাহাড়গুলি বৃষ্টির পরদায় ঢাকা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বেশ শীত পড়েছে।

ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁতন করতে করতে ডাক্তারবাবু উঠে এলেন নিচের থেকে। জিজ্ঞেস

করলাম, 'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'প্রদক্ষিণ করতে। আমি রোজ সকাল-বিকেল চৌরাশী প্রদক্ষিণ করি।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে ?' সুজয়া বিস্মিতা।

ডাক্তারবাবু বলেন, 'হ্যাঁ, এটা আমি এখনও বন্ধ করি না, শীত বর্ষা যাই হোক না কেন।'

'পুণ্যবান মানুষ, পুণ্যক্ষেত্রে রয়েছেন।' সুজয়া বলে।

'পাপ-পুণ্য জানি না,' ডাক্তারবাবু বলেন, 'জীবনে কোনদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করি নি। তাই পুণ্যের প্রত্যাশী নই আমি। তবে সকাল-বিকেল মন্দির দর্শন করলে মনটা ভাল থাকে। সে যাক্ গে, আপনারা মুখ ধুয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চলুন চা খেয়ে আসা যাক। যা বৃষ্টি নেমেছে, কয়েকদিন আর রোগী আসবে না। আরাম করে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

'কয়েকদিন কেন ?' সুজয়া জিজ্ঞেস করে।

'ও তা জানেন না বুঝি। এখানে বৃষ্টি নামলে অন্তত দিন তিনেক ধরে চলে।'

'তি...ন দিন !' অসিতবাবু আঁতকে ওঠেন। 'তিন দিন কি এখানে আটকে থাকতে হবে নাকি !'

'তিনদিন তো কম করে বললাম, সাতদিনও হতে পারে। বৃষ্টির পর ধস নামে, সড়ক টুটে যায়।' একবার থামেন ডাক্তারবাবু। তার পরে বলেন, 'সে যা হবার, তা হবে। এখন তো চলুন চা খেয়ে আসা যাক।'

দুপুরে খিচুড়ি রান্না করে সুজয়া। ডাক্তারবাবু গল্প করছিলেন আমাদের সঙ্গে। তাঁব সামনেও একখানি থালা দেয় সে। ডাক্তারবাবু বলেন, 'আবার আমাকে কেন ? আমার তো রান্না হয়ে গেছে।'

'হোক গে। খেয়েই দেখুন না কেমন হয়েছে ?' সুজয়া বলে।

পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে থাকেন ডাক্তারবাবু। খেতে খেতে সুজয়াকে বলেন, 'মিসেস গুহ, আপনি আমার বড়ই ক্ষতি করছেন।'

'ক্ষতি ?' বুঝতে পারে না সে।

'ক্ষতি নয় তো কি ? এই সব রান্না খাইয়ে রুচি পালটে দিয়ে যাবেন। তারপরে যে এখানকাব লোকের রান্না রুচবে না।'

'খুব রুচবে। এত বছরের বদভ্যাস কি একদিনে যায়।'

ডাক্তারবাবু সুজয়ার কথা শুনে হেসে ওঠেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিই।

খেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন তাঁর ঘরে। বর্ষাতি মাথায় দিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি পথে। বৃষ্টিটা একটু কমেছে। এভাবে চললে হয়তো বিকেল নাগাদ থেমেও যেতে পারে। কথাটা বলেছি ডাক্তারবাবুকে। তিনি একটু হেসে বলেছেন, 'একদিনে বৃষ্টি বড় বন্ধ হয় না এখানে। যদি সত্যই হয়, তাহলে বুঝতে হবে আপনারা ভাগ্যবান। কুলির জন্য চিন্তা করবেন না। বৃষ্টি থামলে কুলি পেয়ে যাবেন। আমি ফরেস্ট রেঞ্জার এবং বি. ডি. ও-কে বলে রেখেছি। কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ না হলে কোন কুলি পাবেন না। কেউ যাবে না ওপরে।'

কর্দমাক্ত চড়াই পথ বেয়ে আমরা উঠে আসি ওপরে—বি. ডি. ও. অফিসের সামনে।

এ জায়গাটি সমতল। রাস্তার দুধারে অফিস—পোস্ট অফিস, কাছারী, বি. ডি. ও এবং সিকিউরিটি অফিস। আর আছে একফালি সবুজ মাঠ। ওরা নাম দিয়েছেন—চৌঘান।

পোস্ট অফিসকে বাঁ দিকে রেখে আমরা এগিয়ে চলি। চলি পথ-প্রদর্শকের পেছনে। একজন স্থানীয় লোককে আমাদের সঙ্গে দিয়েছেন লালাজী। সেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে ব্রহ্মাণীদেবীর মন্দিরে।

একটু বাদেই আবার শুরু হল সংকীর্ণ চড়াই পথ। পাথরের নয়, কাঁচামাটির পথ—জলে কাদায় পিচ্ছিল। পথের দু-দিকে ক্ষেত। জনহীন পথ। পাহাড়ী গ্রাম। বৃষ্টি পড়ছে। সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে ঘরে। কেবল আমরা বেরিয়েছি পথে—আমরা যে হিমালয়ের পথিক।

কিছুদূর এসে একটা গ্রাম। ছোট গ্রাম। বৃদ্ধ পথ-প্রদর্শক জানায়—এ গ্রামের নাম মালকোতা। চার-পাঁচ শ' লোকের বাস।

বৃদ্ধ আরও বলে—ভারমৌর একটি উপ-তহশিল। কুগতি হল শেষগ্রাম। আর বড় গ্রামের মধ্যে বলতে হয় খনি আর ওলান শা-র নাম।

মালকোতা গ্রামের সীমান্তে পৌঁছলাম আমরা। গ্রামবাসীরা ঘরে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আমাদের। হয়তো বা পাগল ভাবল—অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। প্রতিবাদ করার কিছু নেই। হিমালয়ের প্রেমে পড়লে যে মানুষ সত্যই পাগল হয়।

সংকীর্ণ পথটি ফুরিয়ে গেছে একটা জলের কলের কাছে। ওপরের ঝরণা থেকে পাইপ দিয়ে জল আনা হয়েছে গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে।

পথের শেষে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে থাকি। বৃষ্টির জল পাহাড়ে থেকে নামছে নিচে। জলধারা আপন পথ নিয়েছে তৈরি করে। সেই জলপথ ছাড়া ওপরে ওঠা অসম্ভব। মাটি আর আলগা পাথরে পিচ্ছিল পাহাড়। জলের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। খুব সাবধানে উঠছি।

এইভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পরে একফালি সমতল প্রান্তরে পৌঁছলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। যে যার জায়গায় বসে পড়ি। জিরিয়ে না নিলে আর যে চলতে পারছি না। এখান থেকে ভারমৌর উপত্যকাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। বৃষ্টি প্রায় কমে এসেছে। মা ব্রহ্মাণী, একবার মুখ তুলে তাকাও। আমরা যেন কাল মণিমহেশ রওনা হতে পারি।

আবার চলা শুরু করি। পথের প্রকৃতি পালটে গেছে। আর তেমন পিচ্ছিল চড়াই নয়। সমতল প্রান্তরটাই আস্তে আস্তে উঠে গেছে ওপরে।

অক্লেশে উঠে এলাম—সবুজ তৃণাচ্ছাদিত সুবিশাল প্রায় সমতল একটি প্রান্তরে। প্রান্তরের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে আঁকাবাঁকা জলধারা। দু-দিকে খাড়া পাহাড়। একদিক থেকে আমরা এসেছি। আর একদিকে খাদ। খাদের শেষে অপরূপ ভারমৌর উপত্যকা।

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। মঙ্গলদায়িনী দেবী ব্রহ্মাণী। এত কষ্ট করে এসেছি তাঁর কাছে। তিনি কি আমাদের প্রার্থনা পূরণ না করে পারেন ?

ঝরণা ডিঙিয়ে এপারে এলাম। কয়েক পা এগিয়েই একটি চতুষ্কোণ কুণ্ড। পাহাড়ের গা বেয়ে জলধারা এসেছে নেমে। বহুধারায় প্রান্তরকে সিক্ত করে সঞ্চিত হচ্ছে কুণ্ডে। কুণ্ড থেকে একটি বেগবতী ঝরণা বয়ে যাচ্ছে খাদের দিকে। এই ঝরণাই আমরা কাল দেখেছি ভারমৌর আসার সময়ে—ঘরাবু পথের ধারে।

পথ-প্রদর্শক বলে, পাহাড় প্লাবিত জলধারা এ কুণ্ডের উৎস নয়। শীতকালে যখন

পাহাড় থেকে জল নামা বন্ধ হয়ে যায়, তখনও পরিপূর্ণ থাকে এই কুণ্ড। পাতাল থেকে পূর্ণ হচ্ছে কুণ্ড—দেবী ব্রহ্মাণীর করুণাবারি।

কুণ্ডের ধারে খানিকটা পাথর-বাঁধানো জায়গা। তারই এক পাশে পাথরের ওপরে পাথর সাজিয়ে তিনদিকে কোমর-সমান উঁচু দেয়াল। দেয়ালের ওপরে কয়েকখানি কাঠ—এক তৃতীয়াংশ জুড়ে কাঠের চাল। সামনে অর্থাৎ পূর্ব দিকে কোন দেয়াল নেই। এমন মন্দির—প্রবল প্রতাপশালিনী দেবী ব্রহ্মাণীর!

প্রশ্ন করার আগেই পথ প্রদর্শক বলে, 'পাকা মন্দির তো দূরের কথা, মাথার ওপর পূর্ণ আচ্ছাদন পর্যন্ত পছন্দ করেন না মা ব্রহ্মাণী।'

'তাঁর পছন্দ-অপছন্দের কথা তোমরা জানলে কেমন করে?' সুজয়া প্রশ্ন করে।

'বহুবার ভাল করে চাল তৈরি করে দেয়া হয়েছে, প্রতিবারই কয়েকদিনের মধ্যে সে চাল ঝড়ে উড়ে গেছে।'

'এই রকম আংশিক চাল করে দিলে কি ঝড়ে ভেঙে যায় না?' অসিতবাবু প্রশ্ন করেন।

'না।' বৃদ্ধ উত্তর দেয়। 'এই তো তিন সাল থেকে এই চাল রয়েছে।' বৃদ্ধ পথ-প্রদর্শক দেবী ব্রহ্মাণীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে—

ব্রহ্মাণীদেবীর নাম থেকেই এ জনপদের প্রাচীন নাম হয়েছিল ব্রহ্মপুরা, আর তা থেকেই বর্তমান নাম হয়েছে ভারমৌর। ব্রহ্মাণী মন্দির দর্শন না করলে মণিমহেশ যাত্রার ফল হয় না। তাই তীর্থযাত্রীদের যাওয়া-আসার পথে একবার আসতেই হয় এখানে। দেবী অতিশয় জাগ্রতা। সারা ভারমৌর উপত্যকা তাঁর করুণাপ্রার্থী। তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা। অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি হলে তাঁরই কাছে এসে দাঁড়ায় সবাই। তিনি করুণা না করলে মানুষের দুর্গতির শেষ থাকে না।

দেবী ভীষণ দর্শনা। তিনি নিরাবরণা। তাঁর বহিরাগত রক্তবর্ণ চক্ষু থেকে সর্বদা আগুন ঝরে।তাঁর স্তনদ্বয় পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত। তিনি ভয়ঙ্করী।

মাঝে মাঝে দেবী হঠাৎ কাউকে দর্শন দেন। তাঁর দর্শনলাভ করলে অন্তরে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি হয়। ভেড়া বলি দিয়ে, মহাসমারোহে দেবী পূজা করে, এই অন্তর্দাহ থেকে মুক্তি পেতে হয়। গ্রামবাসীরা সবাই দেবীপূজায় সাহায্য করেন। দেবী যাকে দর্শন দেন, তাকে যে সব সময় হিন্দু হতে হবে, তার কোন মানে নেই। কিছুদিন আগে দেবী একজন মুসলমান মাংস-বিক্রেতাকে দর্শন দিয়েছিলেন। সে-ও যথারীতি দেবীপূজার আয়োজন করেছিল।

মা ব্রহ্মাণীর কাছে কায়মনোবাক্যে কোন প্রার্থনা করলে তা অবশ্যই পূর্ণ হয়। তবে প্রার্থনা পূর্ণ হবার তিন বছর বাদে প্রার্থীকে একবার আসতে হয় এখানে। দ্বিতীয়বারে দেবী-পূজা করে যেতে হয়।

পথ-প্রদর্শকের মাহাত্ম্য বর্ণনা শেষ হলে আমরা মন্দিরে আসি। মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে সিঁদুর-মাখানো অসংখ্য লোহার ছোট-বড় ত্রিশূল। বাইরে অনতিদূরে দুটি কাঠের খুঁটির মাথায় একটি সাদা ও একটি লাল নিশান উড়ছে। ভেতরে সিঁদুর মাখানো কয়েকখানি পাথর আর তিনটি পাথরের ও একটি অষ্টধাতুর মূর্তি। সব কটি দেখতে এক রকম নয়, তবু বৃদ্ধ বলে—সবই দেবী ব্রহ্মাণীর প্রতিমূর্তি।

প্রার্থনা শেষে প্রণাম করি ব্রহ্মাণীদেবীকে। সুজয়া একটি টাকা রাখে দেবীমূর্তির সামনে।

আমরা বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। পথ-প্রদর্শক প্রবেশ করে মন্দিরে। টাকাটি হাতে নিয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে।

আমি বিস্মিত হই না। কিন্তু অসিতবাবু প্রতিবাদ করেন, 'দক্ষিণার টাকা তুমি নিলে কেন ?'

'আমি যে ব্রাহ্মণ—মায়ের পূজারী।'

অসিতবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিই। বলি, 'আপনি কি রূপকুণ্ড যাবার পথে কৈলু বিনায়কের সে ঘটনা ভুলে গেলেন ?'

"কোন ঘটনা ?" মানসী প্রশ্ন করে।

আমি বাস্তবে ফিরে আসি—ভারমৌরের ব্রহ্মাণীমন্দির থেকে কুলুর টুরিস্ট বাংলোয়। আমি মানসীকে মণিমহেশ যাত্রাকাহিনী বলছিলাম। কিন্তু মানসীর প্রশ্নে বিস্মিত হই আমি। সে নাকি আবার সব বই পড়েছে। হেসে বলি, "এই নাকি আমার অনুগত পাঠিকার পরিচয় ? তুমি আমার 'গিরিকান্তার' পড়ো নি ?"

"পড়েছি।" মানসী একবার থামে। তার পরে বলে ওঠে, "দাঁড়াও দাঁড়াও....কৈলু বিনায়ক....কোথায় যেন ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে।" মানসী উল্লসিতা।

"বল দেখি কোথায়, আর কি হয়েছিল ?"

"পরীক্ষা করছ ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, শোন তাহলে—কৈলু বিনায়ক পাথরনাচুনির পরে একটি গিরিবর্ত্ম। চোদ্দ হাজার...."

"একশ' সতেরো..."

"ফুট উঁচু। সেখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের এক অপূর্ব সুন্দর পাষাণ প্রতিমা আছে। তোমরা তাঁর পূজো করেছিলে, দক্ষিণা দিয়েছিলে। সেই দক্ষিণার টাকাও কুলিরা নিয়ে নিয়েছিল।" একটু থেমে মানসী আমাকে জিজ্ঞেস করে, "কি, পরীক্ষায় পাশ করেছি ?"

"হ্যাঁ।"

"কোন ডিভিশান ?"

"সেকেন্ড।"

"ফার্স্ট নয় কেন ?"

"নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে নি আর উচ্চতাটা ঠিক মতো বলতে পারো নি।"

"তুমি হলে পারতে ?"

"আমি তো অনুগত পাঠিকা নই, আমি লেখক।"

"আর তো শুধু লেখক নও।"

"তাহলে কি ?"

"পাঠিকার সখা।"

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তার পরে মানসী বলে, "চুপ করে রইলে কেন ? বিকেলে বেরোতে হবে যে। তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল ভারমৌরের কথা।"

"কিন্তু আমার নাকি আজ পরিপূর্ণ বিশ্রাম।"

"হ্যাঁ। তবে একবার একটু বাজারে যাবে আমার সঙ্গে।"

"কি কিনবে ?"

"সে তখন দেখবে, এখন ভারমৌরের কথা বল। তোমরা কি পরদিন মণিমহেশ রওনা হলে ?"

"না। রওনা হতে পারলাম কোথায় ? আবার যে বৃষ্টি নামল। আর নামল অবিশ্রান্ত ধারায়। মেলা বসল না। ডাক্তারবাবুর রোগী আসা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর অফুরন্ত অবসর। তিনি সারাদিন আমাদের ঘরেই থাকেন। নানা গল্প করেন। বলেন ও-দেশের সামাজিক নিয়ম-কানুনের কথা, বিশেষ করে বিয়ের কথা।

"সাধারণতঃ মেয়ের বয়স যখন তিন-চার আর ছেলের বয়স সাত-আট বছর, তখন মেয়ের বাবা ছেলের বাবাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। নেমন্তন্ন মানেই মদ খাওয়া, সেই সঙ্গে অবশ্য রুটি ও ভেড়ার মাংস থাকে। নেশাটি যখন জমে ওঠে, তখন মেয়ের বাবা ছেলের বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা পেশ করে। বলা বাহুল্য দেহ ও মনের সেই রঙীন অবস্থায় ছেলের বাবা তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাব অনুমোদন করে। এই কথা-বার্তাকে ওরা বলে মাংনী। বিয়ে হয় বছর দশেক বাদে।"

"বিয়েটা কি ভাবে হয় ?" মানসী প্রশ্ন করে।

ওর কৌতুহল দেখে হাসি পায় আমার। নিজেকে যতই সংস্কারমুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করুক, সহজাত প্রবৃত্তি যাবে কোথায় ! কিন্তু সে কথা না বলে, ওর প্রশ্নের উত্তর দিই, "ওদের বিয়ের পদ্ধতি প্রায় আমাদেরই মতো—তবে সারারাত ধরে মন্ত্রপাঠ চলে। আর বর-কনেকে বসে থাকতে হয় অগ্নিকুণ্ডের সামনে। তাছাড়াও বহুবিধ স্ত্রী-আচার আছে। ফলে কিশোরী মেয়েটি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

"বিয়ে বাড়ির খাওয়া-দাওয়া হয় মেয়ের বাপের খরচে। কিন্তু তাকে নগদ কিছু দিতে হয়। অবশ্য মেয়েকে ভেড়া, কম্বল, জামা-কাপড়, বাসনপত্র ও রুপোর গয়না দিতে হয়।"

"তবু তো বিয়ের আগে পণ কিংবা বিয়ের পরে জামাইকে পড়বার খরচ দিতে হয় না।" মানসী বলে।

"না, তাহয় না।"

"বেশ ভাল নিয়ম।" মানসী মন্তব্য করে।

মনে মনে ভাবি, পণ-প্রথা খারাপ হলেও তাতে তোমার কি এসে যায় ? তোমার বাবার তো টাকার অভাব নেই। মুখে কিন্তু অন্য কথা বলি, "মাংনী হয়ে গেলেই যে বিয়ে হবে তার কোন মানে নেই। অনেক সময় মেয়ে বড় হয়ে বাবার বন্দোবস্ত মেনে নেয় না। বাবার পছন্দ করা পাত্র হয়তো তার মনে ধরে না। সে অন্য কাউকে মন দিয়ে ফেলে। বাপ যদি তার কথা শোনে ভাল, নইলে বাপের অমতেই মেয়ে মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধে।

ভাবি মানসী কোন মন্তব্য করবে, তাই একবার থামি। কিন্তু মানসী কোন কথা বলে না দেখে আমি আবার বলি, "আগে ভারমৌরে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ইদানীং মেয়েদের জন্য একটা স্কুল হয়েছে। একটা হোস্টেল পর্যন্ত খোলা হয়েছিল কিন্তু কেউ হোস্টেলে মেয়ে রাখতে রাজি হয় নি বলে, সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

আমি আবার থামি। কিন্তু মানসী নীরব। তাই আমাকে বলে যেতে হয়, "অন্যান্য পাহাড়ী দেশের মেয়েদের মতোই, ভারমৌরের মেয়েরাও পরিশ্রমী। তারা সন্তান-পালন থেকে শুরু করে ক্ষেতের কাজ, ভেড়া চড়ানো, জল তোলা, রান্না করা, পুজো-পার্বণ ও নাচ-গান সবই করে থাকে। ছেলেরা বড়জোর ক্ষেতে কাজ করে, দিন মজুরী খাটে আর বাপের সঙ্গে তামাক খায়।"

আমি থামি। মানসী তবু চুপ করে আছে। আমি ওর দিকে তাকাই। চোখে চোখ

পড়ে। মানসী যেন চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলে, "এ কি থামলে কেন ?"

"কি ভাবছিলে বল।" আমি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করি।

মানসী একটু হাসে। সেদিন মানালীতে আমি ওর মুখে এমনি করুণ হাসি দেখেছিলাম। সে বলে, "কিছু ভাবছিলাম না তো। আমি তোমার কথা শুনছিলাম।"

"বল দেখি আমি কি বলছিলাম ?"

"বলছিলে ভারমৌরের মেয়েদের কথা। বলছিলে, কোন কোন মেয়ে বাবার অমতেই মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধে।"

মানসী তার পরে আর কিছু শোনে নি। বুঝতে পারি সে ভাবছিল অন্য কোন কথা। কিন্তু কি সে কথা ? জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। শর্ত ভঙ্গ হবে। আমি চুপ করে থাকি।

॥ তেরো ॥

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। সকালে ঘর থেকে বেরুতে দেয় নি আর বিকেল হতে না হতেই বেড়াবার তাড়া। মানসী আমাকে এনে হাজির করেছে ডাক্তারখানায।

অবাধ্য হয়ে লাভ নেই। তাতে কেবল অশান্তি বাড়বে। তাই ডাক্তারবাবুকে সবিস্তারে অসুখের ইতিহাস বলি। লম্বা একখানি প্রেসক্রিপশান লিখে তিনি আমার হাতে দেন। মানসী ছোঁ মেরে সেখানি আমার হাত থেকে নিয়ে নেয়। ব্যাগ খুলে ডাক্তারবাবুকে ফি দিয়ে এগিয়ে যায় কম্পাউন্ডারের কাছে। ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করে আমি বেরিয়ে আসি বাইরে। কিছুক্ষণ বাদে সে ওষুধ হাতে আমার কাছে আসে। খুশিভরা স্বরে বলে "চলো।"

"কোথায় ?"

"ট্যুরিস্ট বাংলোয়।"

"কিন্তু তা তো কথা ছিল না। তখন বলেছিলে, আমরা বেড়াতে বের হচ্ছি।"

"এই তো বেড়ানো হল। আবার কোথায় যাব ?"

"সত্যি যাবার জায়গার বড়ই অভাব কুলুতে। তাই প্রতিদিন শত শত পর্যটক আসেন এখানে। তাঁরা সবাই ডাক্তারখানায় এসে তাঁদের ভ্রমণ শেষ করেন।"

হেসে দেয় মানসী। বলে, "বেশ চল খানিকটা ঘুরে যাওয়া যাক। কোথায় যাবে, ট্যুরিস্ট অফিসে ?"

"হ্যাঁ, যাবার জায়গা ঐ একটাই আছে এখানে। তবে তাই চলো, দেখি কোন চিঠি-পত্র এলো কিনা।"

না, কোন চিঠি নেই। আমি প্রাণেশের খবরের প্রতীক্ষা করছি আর মানসী তার বাবার চিঠির পথ চেয়ে আছে। প্রাণেশের খবর আসার ঠিক সময় হয় নি। কিন্তু মানসীর বাবার চিঠি নেই কেন ?

ট্যুরিস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে মানসী বলে, "কোথায় যাবে, বাংলোয়।"

"না।"

"তাহলে কোথায় ?"

"কোথাও যাব না, এই ময়দানে বসব।"

"এখন আবার ময়দানে বসবে ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, চলো। তবে সন্ধ্যের আগেই বাংলোয় ফিরতে হবে কিন্তু।"

"না। রাত দশটা অবধি বসে থাকব।" আমি এসে একটা বড় গাছের নিচে বসি।

কাছে আসে মানসী। আমার পাশে বসে। বলে, "সন্ধ্যের পরে এখানে বসে থাকলে, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে যে!"

"লাগুক গে। এর চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা সইবার অভ্যেস আমার আছে।"

মানসী হাসে। আরও একটু কাছে এসে বলে, "রাগ করেছ?"

"তুমি আমার এই সামান্য অসুখ নিয়ে, কাল থেকে এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছো..."

"অসুখটা সামান্য কিনা জানি না, হলেই ভাল। কিন্তু তুমি তো আমার কাছে সামান্য নও সখা! আর তাই আমার এতো ভয়।" একবার থামে মানসী। তারপর বলে, 'যাক্ গে সেকথা। তুমি মণিমহেশ যাত্রার কথা বলো। বৃষ্টির জন্য তোমরা ক'দিন বন্দী থাকলে ভারমৌরে?"

"চারদিন। চতুর্থ দিন ভারমৌর থাকতে হল কুলির জন্য। বৃষ্টি হয়েছে, ওপরে বরফ পড়েছে, পথ ভেঙে গেছে। কাজেই কেউ যাবে না। শেষ পর্যন্ত বি. ডি. ও. এবং ফরেস্ট রেঞ্জারের ঐকান্তিক চেষ্টায় কুলি যোগাড় হল। তবে তারা কুগতি যাবে না। হাড্সার থেকে ফিরে আসবে।"

"তোমরা তাতেই রাজি হলে?" মানসী বলে।

"উপায় কি? তবে বি. ডি.ও. লেড়ূরাম নামে তার একজন সুপারভাইজারকে দিলেন আমাদের সঙ্গে। সে হাড্সারে কুলি যোগাড় করে আমাদের পৌঁছে দেবে কুগতি পর্যন্ত।"

"ডাক্তারবাবু কি বললেন?"

"আগের দিন রাতে তাঁর কলকাতার ঠিকানা দিয়ে বললেন—সময় করে একদিন যাবেন আমার বাড়িতে। আজ সকালে যে ছবিটা তুললেন, তার একখানি কপি আমার স্ত্রীকে দিয়ে বলবেন, আমি ভাল আছি। আর বলবেন....কোন পাহাড়ী মেয়েমানুষ ঘরে রাখি নি। বলেই হো হো করে হাসতে থাকলেন তিনি।"

মানসীও হেসে ফেলে তাঁর কথা শুনে। তার পরে বলে, "এবার তাহলে যাত্রা করো শুরু—"

আমি শুরু করি—

সজল চোখে ওরা বিদায় দিলেন আমাদের। আমরা বিদায় নিলাম ফরেস্ট রেঞ্জার, বি. ডি. ও., পোস্টমাস্টার, তহশীলদার, সিকিউরিটি অফিসার, লালাজী ও বাবাজীর কাছ থেকে। বিদায় নিলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। বিদায় নিলাম ভারমৌরের কাছ থেকে। চৌরাশির মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম করে আমরা এগিয়ে চলি মণিমহেশের পথে। তখন সকাল সাড়ে আটটা। ঝলমলে রোদে ভরে গেছে চারিদিক। কে বলবে বৃষ্টির জন্যে মেলা বসতে পারে নি, আমরা চারদিন বন্দী রয়েছি ঘরে?

বর্ষাস্নাত ভারমৌর উপত্যকাকে বড়ই সন্দর দেখাচ্ছে। বাড়ি-ঘর শেষ হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে সংকীর্ণ উৎরাই। পথের পাশে ক্ষেত। বুডঢালের গর্জন শোনা যাচ্ছে। সে ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে।

কয়েকটা বাঁক পেরিয়েই বাঁ দিকে লাসকাটা ঘর। থামল লেড়ূরাম। বলল, "আসুন আমার সঙ্গে।"

কুলিরা থামল না। তারা এগিয়ে চলল। আমরা লেড়ূরামের সঙ্গে সেই ঘরের পেছনে

এলাম। বেশ বড় একটা পাথরের বেদী—অনেকটা দোল-মঞ্চের মতো। ওপরের ধাপে একখানি শ্বেতপাথরের ওপরে খোদাই করা—

'THY WILL BE DONE SACRED
TO THE MEMORY OF
John Frederick Orchard
Lieutenant IVth Bengal N.1.
Departed his life on August 25th 1830
REQUIESCAT IN PACE'

একজন মুসলমান বেয়ারাকে সঙ্গে করে জন ফ্রেডারিক এসেছিলেন কালো ভালুক শিকার করতে। ভালুকরা দলবদ্ধ হয়ে তাড়া করে তাদের। তাঁরা পিছু হাঁটতে থাকেন। পশ্চাদপসরণের সময়ে পা ফসকে পড়ে যান নীচে। তারা মারা যান। এখানেই করব দেওয়া হয়েছে জন ফ্রেডারিক অরচার্ডকে।

মাইল খানেক এগিয়ে উৎরাই শেষ হল। শুরু হল প্রায় সমতল ও সংকীর্ণ পথ। ইতিমধ্যে বুড়ঢাল আমাদের পাশে এসে হাজির হয়েছে। বর্ষার ফলে ডানদিকের পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে ধস নেমেছে পথে। মাঝেমাঝে পুল। পুল না বলে সাঁকো বলাই ঠিক। কাঠ ও পাথর দিয়ে পাহাড়ী নদী পেরুবার বন্দোবস্ত। ভারমৌরে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছে—অনেক সাঁকো নাকি ভেঙে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ভাঙা সাঁকো চোখে পড়ছে না। কথাটা বলি লেড়ুরামকে। সে জবাব দেয়, 'বিলকুল ফোর টুয়েন্টি বাত্। সব ঠিক হ্যায়।'

লেড়ুরামের ভরসাতেই রওনা হয়েছি আজ। লেড়ুরাম চলেছে আগে আগে। তার পিঠে হ্যাভারস্যাক, হাতে ছোট একখানি ছড়ি। হ্যাভারস্যাকে কম্বল আর খাবার আছে—তিন দিনের খাবার। বউ বানিয়ে দিয়েছে। নতুন বিয়ে করেছে লেড়ুরাম।

পথ দুর্গম বলে আমরা আজ মাল বইছি না। ক্যামেরা, বাইনোকুলার, জলের বোতল প্রভৃতি নিয়েছি। কিন্তু অসিতবাবু রুকস্যাক ছাড়েন নি। আগামী বছর পর্বতারোহী সদস্য হিসেবে কেদারনাথ পর্বতাভিযানে অংশ নেবেন। তাই মাল বওয়া অভ্যেস করে নিচ্ছেন।

আড়াই ঘন্টায় ছ' মাইল পথ পেরিয়ে বেলা এগারোটায় সানধি বন-বিশ্রাম ভবনের নীচে পৌঁছলাম। ভারমৌরের ফরেস্ট রেঞ্জার এখানে বাস করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা এখানে বাস করব না। আমরা এগিয়ে চলি।

বনাবৃত সুন্দর পথ। বিগত বর্ষার রেশ রয়েছে এখনও। পাহাড়ের গা বেয়ে জল গড়াচ্ছে। ঝরণার ভরা যৌবন।

একটি নদীর ধারে এসে থামতে হল। ডানদিকের পাহাড় থেকে নদীটা নেমে এসে বুড়ঢালে মিশেছে। বেশ প্রশস্ত নদী। পুলটা গেছে ভেঙে। তবে জল মোটেই গভীর নয়। জলে নেমে নদী পার হই। এ জায়গাটার নাম প্রাঙ্গল।

প্রাঙ্গণের পরে পথ আরও সুন্দর। ডানদিকের পাহাড়টা মোটেই খাড়া নয়। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেছে। পাথর নয়, মাটির পাহাড়। বুকে ধারণ করে আছে বড় বড় ঘাস। পথের দুধারে বড বড় গাছ। ছায়া শীতল সমতল পথ। এ যেন হিমাচল নয়, গ্রাম বাংলার পায়ে-চলা পথ।

বেলা সাড়ে বারোটার সময় আমরা হাড্সার পৌঁছলাম। হাড্সার মণিমহেশ পথের শেষ গ্রাম। ভারমৌর থেকে আট মাইল। আমাদের সাড়ে তিন ঘন্টা লেগেছে। অদূর

ভবিষ্যতে মোটরপথ এই পর্যন্ত প্রসারিত হবে। (এখন হয়ে গিয়েছে।)

প্রায় পঞ্চাশ ঘর গৃহস্থ নিয়ে ছোট গ্রাম। উচ্চতা ৭০০০ ফুট। গ্রামবাসীরা সবাই ব্রাহ্মণ। এরা মণিমহেশের পূজারী। একটি মুদি দোকান, প্রাথমিক পাঠশালা, শিবমন্দির ও সরাই আছে এখানে। পথের দু দিকেই ক্ষেত আর বাড়ি-ঘর। প্রায় প্রতি বাড়ির চালে কিংবা উঠানে ভুট্টা শুকোতে দেয়া হয়েছে। দূর থেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

অনেক নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বুড়ঢাল। ওপারের পহাড় থেকে একটা ঝরণা নেমে এসেছে তার বুকে। যে যেন সচল জলধারা নয়, অচল একটি রূপোলী রেখা।

লেড়ুরাম আমাদের নিয়ে এলো রসালুজীর বাড়িতে। পথের ডানদিকে একটু উঁচুতে বেশ ভাল দোতলা বাড়ি। তিনি আমাদের একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন। সেই ঘরে মাল রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। দোকান থেকে চা আনিয়ে সঙ্গের রুটি ও তরকারী দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হল।

একান্ত প্রয়োজনীয় মালপত্র দুজন কুলির পিঠে চাপিয়ে বেলা দুটোর সময় আমরা রওনা হলাম ধনছো'র পথে। ধনছো হাড্‌সার থেকে ৭ মাইল। আজ পনেরো মাইল পথ চলতে হবে। কাল আরও বেশি। কাল আমরা ধনছো থেকে মণিমহেশ দর্শন করে ফিরে আসব হাড্‌সার। ধনছো থেকে মণিমহেশ ৬ মাইল। কিন্তু কালকের কথা এখন নয়, আজকের কথা বলে নিই।

বাকি তিনজন কুলিকে ছেড়ে দিতে হল। অনেক বলার পরেও তারা থাকতে রাজি হল না। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। কাল থেকে মেলা বসবে ভারমৌরে। মেলাই যদি না দেখতে পারল, কি হবে টাকা দিয়ে?

তারা চলে গেল। রসালুজীর বাড়িতে বাকি মাল-পত্র রেখে আমরা রওনা হলাম ওপরে। লেড়ুরামও রয়ে গেল এখানে। তাকে কুলি যোগাড় করতে হবে।

বুড়ঢাল চলে গেল কুগতি গিরিবর্ত্মের দিকে। আমরা অমরগঙ্গার তীর দিয়ে পথ চলেছি। এ অমরগঙ্গা অমরনাথের পুণ্যধারা নয়। এ অমরগঙ্গা এসেছে মণিমহশ থেকে। এনেছে মণিময় মণিমহেশের করুণাবারি বহন করে। হাড্‌সারে এসে তার যাত্রা হয়েছে শেষ। সে বুড়ঢালে বিলীন হয়েছে।

মণিময়ী অমরগঙ্গা—অমরাবতীর অমৃতধারা। শত সহস্র মণি জ্বলছে তার অঙ্গে।

পথের পাশে বিস্তৃত বন। অমরগঙ্গার ওপারে বনময় খাড়া পাহাড়। এপারে পাহাড়ের গায়ে চড়াই পথ। পথ উঠে গেছে ওপরে। কেবল পথ নয়, সেই সঙ্গে অমরগঙ্গা। সেও আমাদের সঙ্গে সমানে চড়াই ভাঙছে।

পথ কখনও বা নেমে যাচ্ছে অমরগঙ্গার বেলাভূমিতে, কখনও উঠে আসছে বনের ভেতরে। বনের বুকে বড় বড় গাছ, মানুষ-সমান উঁচু ঘাস আর নানা রঙের রকমারী ফুল।

বহুবার বিশ্রাম নিয়ে দু'ঘন্টা চড়াই উৎরাই ভেঙে বেলা চারটের সময় আমরা একটি বৃক্ষহীন প্রস্তরময় প্রশস্ত প্রান্তরে পৌঁছলাম। ডানদিকের পর্বতশ্রেণী চলে গেছে বহুদূরে। বাঁ দিকের পাহাড়টাও অমরগঙ্গা থেকে খানিকটা সরে গেছে। অমরগঙ্গা প্রশস্ততর এখানে। তবে সে অনেক নিচে। আমরা উঠে এসেছি ওপরে।

আমাদের কুলি দুজনের একজন বুড়ো আর একজন যুবক। যুবকটির নাম দাস্যা। বেশ অমায়িক ও সেবাপরায়ণ। লেড়ুরাম তাকে বলে দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে। সঙ্গেই রয়েছে সে। বুড়ো অবশ্য পড়েছে পেছিয়ে। তাতে আমাদের সুবিধাই হয়েছে।

তারও মেলায় যাবার বড়ই শখ। কিন্তু লেডুরাম তাকে যেতে দেয় নি। একজন কুলির পক্ষে সব মাল নিয়ে আসা সম্ভব নয়। ফলে বুড়ো আমাদের ওপর গোসা হয়েছে। আর তাই সুজয়া তার নাম রেখেছে গোসারাম।

অমরগঙ্গার ওপারে একটি ঘর দেখিয়ে দাস্যা বলে, 'ঐ যে ধনছো সরাই। ওখানেই থাকতে হবে আপনাদের।'

সরাই দেখে শঙ্কিত না হয়ে পারি না। পেছনে পাহাড়, তিন দিকে খোলা, ওপরে টিনের চাল। ধনছোর উচ্চতা ৮০০০ ফুট। এখানে এমন দেয়ালহীন ঘরে রাত কাটানো কষ্টকর। কিন্তু কষ্টের মধ্য দিয়েই যে কেবল পাওয়া যায় সেই পরমারাধ্যকে।

অমরগঙ্গার এপারে প্রস্তরময় প্রশস্ত প্রান্তর, ওপারে তৃণময় খাড়া পাহাড়। প্রান্তরের একাংশে পাথর আর কাঠের কয়েকটি কুটির। মেষপালকরা ভেড় চরাতে এসেছে। কুটিরে ধোঁয়া উঠছে। দিনের শেষে তারা আগুন জ্বেলেছে। আগুনই যে ওদের জীবন।

বাঁক ফিরেই পুলটা দেখতে পেলাম। অমরগঙ্গার ওপরে কাঠের পুল। পুলের পরে অমরগঙ্গা একটি ছোট জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। ফুটদশেক ওপর থেকে প্রচণ্ড আবেগে লাফিয়ে পড়ছে।

পুল পেরিয়ে এপারে এলাম। বড় বড় পাথর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কাঁটাগাছ আর বিছুটি বন। সাবধানে পথ চলে বেলা পাঁচটার সময় আমরা ধনছো সরাইতে পৌঁছলাম। দিনের পদযাত্রা শেষ হল।

কাছে এসে বুঝলাম দূর থেকে যা দেখেছি, তা আসলে কিছুই নয়। সরাইয়ের অবস্থা অনেক বেশি শোচনীয়। মাটির মেঝে। কাঠকয়লা ছাই ও পাথরে বোঝাই। বাইরে মালপত্র রেখে আমরা সরাই পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। দাস্যা সাহায্য করে আমাদের। গোসারাম ভেড়াওয়ালাদের কাছে চলে গেছে। সেখানে আগুন আছে। সে আরামে ঘুমোতে পারবে। দাস্যা আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে মালপত্র ভেতরে আনা গেল। দুদিকে বর্ষাতিগুলি টাঙিয়ে দিয়ে একটু আড়াল করে নিলাম। জায়গাটা এখন মোটামুটি বাসোপযোগী হয়েছে। কিন্তু সরাইয়ের অবস্থা দেখে বড় দুঃখ হচ্ছে। ঘরখানির দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। এখানে জ্বালানীর অভাব। তাই যাত্রীরা কাঠের পাটাতন ভেঙে জ্বালানীর অভাব মেটায়। ফলে ঘরখানি দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। যে ভাবে চলেছে, তাতে কয়েক বছরের মধ্যে মণিমহেশ পথের এই অপরিহার্য আশ্রয়টি পৃথিবী থেকে মুছে যাবে।

সুজয়া স্টোভ জ্বালিয়ে কফি বানালো। তার পরে খিচুড়ি ও চিঁড়ের পোলাও রান্না করল। কাল খুব সকালে রওনা হতে হবে। রান্নার সময় পাওয়া যাবে না।

খেয়ে নিয়ে দশটার আগেই শুয়ে পড়ি আমরা। অমরগঙ্গার গান শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

"ব্যাস, এখন এই পর্যন্ত থাক।" হঠাৎ বাধা দেয় মানসী।

আমাকে থামতে হয়। আমি ধনছো সরাই থেকে ঢালপুর ময়দানে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে কখন যে দিনের আলো নিবে গেছে, চাদের আলোয় ভরে উঠেছে চারিদিক—খেয়াল করি নি। ঘড়ি দেখি—সবে সাড়ে আটটা বেজেছে। এখানে আটটায় সন্ধ্যে হয়।

মানসী আবার বলে, "এবারে বাংলোয় চলো। বাকিটা পরে শুনব। এখানে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে।"

এবারে আর রাগ হয় না ওর এই অতিরিক্ত উৎকণ্ঠায়। হাসি পায়। হেসে বলি, "কেন এমন উতলা হচ্ছ? বিশ্বাস করো, এ ঠাণ্ডায় কিচ্ছু হবে না আমার। এমন সুন্দর পরিবেশ থেকে আমাকে এখন ঘরে নিয়ে যেও না মানসী। আমার বড় ভাল লাগছে এখানে বসে থাকতে। আর হয়তো এমন করে বসার সুযোগ পাবো না কোনদিন।"

"কেন, কাল তো এখানেই থাকব আমরা।"

"কিন্তু কাল যে সকালে উঠেই মণিকরণ রওনা হব। কখন ফিরে আসি ঠিক নেই। পরশু সকালে চলেই যাচ্ছি এখান থেকে। তাছাড়া যে মণিমহেশের যাত্রাকাহিনী শোনার জন্য তোমার এতো আগ্রহ, তা কি বাংলোর বন্ধ ঘরে বসে ভাল লাগবে? সাহা পরিবার হয়তো ফিরে এসেছেন এতক্ষণে। আজ যে আর শোনাই হবে না মণিমহেশের কথা।"

"তবে মাফলারটা ভাল করে মাথায় জড়িয়ে নাও।" মানসী শর্ত পেশ করে।

অগত্যা মাফলার মাথায় জড়িয়ে বলতে শুরু করি—

পরদিন—১২ই সেপ্টেম্বর। সুজয়ার ডাকে ঘুম ভাঙল। ধনছো সরাই যতই মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত হয়ে থাক, বেশ ভাল ঘুম হয়েছে। একবার অবশ্য ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। রাত তখন একটা। ঘুম ভেঙেছিল কুকুরের ডাকে। সরাইয়ের ওপরে পাহাড়ের গায়ে একজন মেষপালক শ'দুয়েক ভেড়া আর একটা কুকুর নিয়ে রাত্রিবাস করছিল। তারই কুকুরটা রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠেছিল। আমাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। স্লীপিং ব্যাগের জীপ খুলে তাড়াতাড়ি উঠে বসেছিলাম। টর্চ জ্বেলে মাথার কাছ থেকে একটা আইস এক্স হাতে তুলে নিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল কুকুরটা কাউকে তাড়া করেছে। ক্রমেই শব্দটা দূরে চলে যাচ্ছিল। ধনছোতে তো মানুষ নেই, চোর নেই। তাহলে কাকে তাড়াচ্ছে কুকুরটা?

এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি কাল রাতে। এক সময় আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ঘুম ভাঙল সুজয়ার ডাকে। এখন সকাল সাড়ে পাঁচটা।

দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে আজ। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। সুজয়া স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপালো। দাস্যা সাহায্য করছে তাকে। আমরা অমরগঙ্গা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এলাম। বলা বাহুল্য জল ভীষণ ঠাণ্ডা।

বিছানা ও বাসনপত্র সবই রেখে যাব এখানে। অসিতবাবু সব গুছিয়ে ফেললেন। একটু বাদে গোসারাম এসে হাজির হল। তাকে মালপত্র নিয়ে এখানে থাকতে বললাম। সে কিন্তু রাজি হল না। এতদূর এসে মণিমহেশ দর্শন না করা নাকি মহাপাপ। পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য বুড়ো আমাদের সঙ্গী হবে। কিন্তু আমরা কেন চলেছি সেই দুর্গম গিরিতীর্থে? সে-ও কি পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়?

দাস্যা ও গোসারাম গিয়ে মালপত্র মেষপালকের কাছে রেখে এলো। এসে জানালো, কাল রাতে ভেড়ার পালে ভালুক পড়েছিল। একটা ভেড়া মেরে রেখে গেছে। কুকুরের ডাকের কারণটা বুঝতে পারি এতক্ষণে।

সকাল সওয়া আটটার সময় রওনা হলাম। পুলের গোড়ায় মেষপালকের সঙ্গে দেখা। তার কাঁধে একটি রক্তাক্ত ভেড়ার মৃতদেহ। হয়তো মাংস খাবে। কিন্তু তা থেকেও তার বড় প্রয়োজন নিহত ভেড়ার চামড়াটা।

আমরা পাহাড়ে যাদের ভেড়া চরাতে দেখি, তাদের অধিকাংশই পালক মাত্র, মালিক নয়। মেষের মালিকরা অবস্থাপন্ন। তারা কেন দুঃসহ শীতে এই দুর্গম গিরি কান্তারে ভেড়া নিয়ে পড়ে থাকবে? তারা অন্য লোককে ভেড়া চরাতে দেয়। এই সব দরিদ্র লোকগুলি

সারা গ্রীষ্মকাল ধরে ভেড়া চড়ায়। হিসেব করে দেখেছি এরা জনপ্রতি বড়জোর শ'ছয়েক টাকা পায়। এই তাদের সংবৎসরের আয়—একটা পরিবারের ভরণ-পোষণের রোজগার। অবাক হয়ে ভাবি, এই অভুক্ত মানুষগুলি তবু কেমন হাসি-খুশি আর প্রাণ-চঞ্চল, কেমন অতিথিপরায়ণ ও পরোপকারী।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম—মেষপালক মৃত ভেড়াটিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কারণ ভেড়ার ছালটা মালিকের কাছে জমা দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে ভেড়াটাকে বেচে দেয় নি, ভালুকে মেরে ফেলেছে।

মেষপালকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি।

হাড্সার থেকে আসা পথটি অমরগঙ্গার পুল পেরিয়ে সংকীর্ণতর হয়ে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। ভীষণ চড়াই পথ। দেখে ভয় হয়। কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন ? আমরা যে হিমালয়ের পথিক। আমাদের নির্ভয়ে যেতে হবে এগিয়ে।

চড়াই ভাঙতে শুরু করি। কোথাও সিঁড়ি, কোথাও বা সারি সারি পাথর। কোথাও সোজা কোথাও বা আঁকা-বাঁকা। কয়েক পা উঠেই হাঁফ ধরে। তবু যথাসাধ্য জোরে জোরে চলি। পথ দীর্ঘ, পথ দুর্গম।

এ জায়গাটাকে বলে বান্দরঘাটি। যতো দুর্গমই হোক, এখন তবু একটা পথ তৈরি হয়েছে। কিছুকাল আগেও এ পথ ছিল না। অথচ মণিমহেশ যাত্রা চলে আসছে সুপ্রাচীন কাল হতে। রাজা মেরু ভার্মা যখন ভারমৌরে আসেন, তখন সেখানে কেবল সন্ন্যাসীরা বাস করতেন। তাঁরা প্রতি বছর মণিমহেশ যাত্রায় যেতেন। গাছের শেকড় ধরে ধরে এই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতেন। প্রতিবছরই বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রী পড়ে গিয়ে মারা যেতেন।

দুর্ঘটনা এখনো ঘটে। তাই এখনও যাত্রার সময় ধনছোতে মণিমহেশের পুজো করা হয়, মেষ বলি দেয়া হয়। বলির পরে মণিমহেশ নাকি কোন যাত্রীর দেহে ভর করেন। তার মুখ দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। বলেন—সেবারে বান্দরঘাটিতে তাঁর কজনের প্রাণ দরকার। আশ্চর্য্য ব্যাপার, বাবা মণিমহেশের চেলা বা চেলীরা যে ক'জনের কথা বলে, বছরের শেষে দেখা যায় ঠিক সেই ক'জন যাত্রী দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বান্দরঘাটিতে প্রাণত্যাগ করেছেন।

আগে যাত্রার সময় ছাড়া কোন যাত্রী মণিমহেশ যেতেন না। মণিমহেশ যাত্রার নিয়ম হচ্ছে—ধনছোতে পূজো দিয়ে, বাবা মণিমহেশের অনুমতি নিয়ে যাত্রা করতে হয়। এখন অনেকেই অর্থাৎ আমাদের মতো যাত্রীরা, পুজো না করেই মণিমহেশ যাত্রা করেন। তবে আনুষ্ঠানিক পূজো না করলেও মনেমনে মণিমহেশকে প্রণাম করে সবাই তাঁর অনুমতি নেন। আমরাও নিয়েছি। তিনি অনুমতি না দিলে, কি সাধ্য আমাদের, এই পূণ্যতীর্থ পরিক্রমা পূর্ণ করতে পারি ?

কিন্তু মণিমহেশের কথা এখন থাক, আগে সেই দুর্গম পথের কথা বলে নিই। মাইলখানেক বাদে সেই প্রাণান্তকর চড়াই শেষ হল। অমরগঙ্গার গা ছুঁয়ে পথ। অমরগঙ্গা নয় মণিমালা। চমৎকার একটি জলপ্রপাত সে সৃষ্টি করেছে এখানে—আমাদের ডান দিকে, পথের পাশে। অমরগঙ্গা ছিল অনেক নিচে। এখানে সে এসে হাজির হয়েছে, একেবারে পথের ধারে।

এ জলপ্রপাতটি ধনছোর প্রপাতটির চেয়ে অনেক সুন্দর। অসিতবাবু ছবি নিলেন।

তার পরে একটু বিশ্রাম করে আমরা আবার এগিয়ে চললাম। এখন বেলা সওয়া দশটা। দু ঘন্টায় মাত্র মাইলখানেক পথ পেরিয়েছি।

একটু বাদেই পৌঁছলাম একটা গ্রাবরেখার সামনে। বেশ বড় একটি প্রস্তরাবৃত প্রান্তর। ডান দিকের পাহাড়ের পা ছুঁয়ে অমরগঙ্গা উঠে গেছে ওপরে। বাঁ দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরের প্রবাহ নেমে এসেছে প্রান্তরে। শীতকালে ঐ প্রস্তর-প্রবাহ তুষার-প্রবাহ পরিণত হয়। দু-দিকের পাহাড়ই বৃক্ষলতাহীন।

সংখ্যাতীত ছোট-বড় পাথর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। কোন পাথরের পাশ কাটিয়ে, কোনটির তলা দিয়ে, কোনটির বা ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে সাদা সবুজ বেগুনী ও লাল ফুল। মাঝে মাঝে কয়েকটি ঝাউয়ের ঝোপ। বিচিত্র প্রকৃতি। এই শীতল প্রস্তরময় প্রান্তরেও ফুল ফুটিয়ে রেখেছে।

কিন্তু কেন ? কার জন্য তার এই আয়োজন ? এ ফুল কি মানুষের মন হরণ করতে, না দেবতাকে অঞ্জলি দিতে ?

দুয়ের মাঝে পার্থক্য কোথায় ? ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছে, কি মানুষ ভগবান সৃষ্টি করেছে—আজও স্থির হয় নি। তবে মানুষের জন্যই দেবতা। তীর্থযাত্রীর জন্যই তীর্থ। আমাদের জন্যই প্রকৃতির এই অভিনব আয়োজন।

আমাদের মাথার ওপরে নীলাকাশ। মাঝে মাঝে দু-একখানি ভাসমান মেঘ। মেঘের ছায়া পড়েছে পাহাড়ে আর প্রান্তরে। কেবল অমরগঙ্গা ছায়াহীন। সে যে স্বর্গের সদা চঞ্চল স্রোতস্বিনী। সূর্যের সাধ্য কি, তার বুকে কলঙ্কের কালো দাগ এঁকে দেয়।

প্রস্তরময় প্রান্তর পেরিয়ে শুরু হল চড়াই—ভৈরবঘাঁটির চড়াই। ভৈরবঘাঁটি আছে ভারতের প্রায় প্রত্যেক শৈব গিরিতীর্থের কাছে। ভৈরব শিবালয়ের রক্ষক।

প্রাণান্তকর চড়াই পেরিয়ে অবশেষে আমরা উঠে এলাম ওপরে—সবুজ প্রায় সমতল পর্বতশীর্ষে। এখানেই বাস করেন ভৈরবনাথ—এই ভৈরবঘাঁটি। এখান থেকে চারিদিক চমৎকার দেখা যায়। শিবক্ষেত্রের চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য ভৈরবকে বাস করতে হয় এমনি কোন উচ্চ স্থানে। সমস্ত ভৈরবঘাঁটির অবস্থান একই রকম।

পরিশ্রান্ত দেহে সবাই বসে পড়লাম ঘাসের ওপরে। দীর্ঘ চড়াই ভাঙার শ্রম কিন্তু কয়েক মিনিটেই মিলিয়ে গেল। আমরা আবার উঠে দাঁড়ালাম, প্রণাম করলাম সেই পরম পবিত্র পর্বতশৃঙ্গকে। ঐ আমাদের গন্তব্যস্থল। ঐ সেই শিবালয়—হিমাচলের কৈলাস। ঐ পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে দেবাদিদেব মণিমহেশকে প্রণাম জানাতে ছুটে এসেছি এতদূরে।

ভৈরবঘাঁটির পাহাড়টা আস্তে আস্তে নেমে গেছে নিচে। তার পরেই দাঁড়িয়ে আছে একটি খাড়া পাহাড়। একটা গিরিশিরা ধরে সেই পাহাড়ের ওপারে পৌঁছতে হবে। সেখানেই পরমতীর্থ—মণিময় মণিমহেশের নিবাস।

কিন্তু সেদিকে পা বাড়াতেই গোসারাম ধমক লাগায়। সুজয়া সঙ্গত কারণেই তার নামকরণ করেছে। সে সব সময়েই গোসা করে আছে। কারণে অকারণে ক্রমাগত রেগে যাচ্ছে সবার ওপরে। নিরুপায় আমরা। সেই রাগ নীরবে হজম করতে হচ্ছে। অসিতবাবু অবশ্য বলেন—রাগ নয়, অনুরাগ।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম—সামনের দিকে পা বাড়াতেই ধমক লাগায় গোসারাম। বলে, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?'

নেতা অসিত বসু সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোন দিকে যাবো তাহলে ?'

'আমার সঙ্গে আসুন।' বলে গোসারাম বাঁ দিকে চলতে আরম্ভ করে।

সুজয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা ?'

'গৌরী কুণ্ডে।' গোসারাম গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়।

মনে পড়ে আমার। গৌরীকুণ্ডের পুণ্যসলিলে স্নান করে পবিত্রদেহে পৌঁছতে হয় বাবা মণিমহেশের কাছে। অতএব আমরা গোসারামের অনুগমন করি।

বাঁ দিকে একটু ওপরে উঠেই কুণ্ড। কুণ্ডের তীরে এক জায়গায় কয়েকখানি সিঁদুর মাখানো পাথর। পাশেই খুঁটির সঙ্গে একটা নিশান—হাওয়ায় উড়ছে। নিশানে বাবা মণিমহেশের ছবি।

কুণ্ডের চারিপাশে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট ঘর বানানো হয়েছে—খেলাঘর। হর-গৌরীর উদ্দেশ্যে ভক্তবৃন্দের সশ্রদ্ধ নিবেদন এই সব প্রস্তর-পুরী।

গোসারাম আর দাস্যাও দুটি ঘর বানায়। ওদের দেখাদেখি আমরাও সেই পুন্যকর্মে প্রবৃত্ত হই। নি-খরচায় পুণ্য সঞ্চয় করতে বিরত হই কেন ?

উষ্ণ নয়, শীতল কুণ্ড। তুষার-বিগলিত গৌরীবারি। তার ওপর প্রচণ্ড বাতাস বইছে—বাতাস নয়, হিমপ্রবাহ। কিন্তু হিমতীর্থে এসে হিমকে ভয় করলে চলবে কেন ? আমরা একে একে ঝাঁপিয়ে পড়ি গৌরীকুণ্ডের হিমশীতল জলে। শরীর অবস হয়ে আসে। তবু অবগাহন করে উঠে আসি ওপরে।

পথশ্রমের সব ক্লান্তি গেল দূর হয়ে। দেহ সতেজ ও সবল হয়ে উঠল। মন পূর্ণ হল স্বর্গীয় সুষমায়। একটা অনির্বচনীয় পুলকে প্রাণ আমার উদ্বেলিত। আমি আনন্দময়।

আমি একা নয়, আমরা সবাই। বাবা মণিমহেশের জয়ধ্বনি করে এগিয়ে চলি। আমরা ছুটতে থাকি। দেহে পেয়েছি মত্ত হাতির বল আর মনে জাগ্রত যৌবনের নেশা।

নেশাগ্রস্তের মতো ছুটে চলি আমরা। চলতে চলতে দাস্যা দেখায়, 'ঐ যে ওখানে রাম কলোত্রী—আর একটা কুণ্ড। দেরি হয়ে যাবে বলে, আর যাবো না ওখানে।'

গিরিশিরা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। কেবল ওপরেই উঠছি সেই থেকে। ধনছো ৮০০০ ফুট, মণিমহেশ ১৩,৫০০ ফুট। উভয়ের দূরত্ব ৬ মাইল। গড়ে প্রতি মাইলে প্রায় হাজার ফুট চড়াই ভাঙ্গতে হচ্ছে। তবে গোসারাম বলে, 'এই শেষ চড়াই।'

আশ্বস্ত হই।

বেলা দুটোর সময়ে আমরা একটি সুপ্রশস্ত উপত্যকা সদৃশ স্থানে উপনীত হলাম। প্রায় সমতল পাথরের প্রান্তর। তবে আগেরটির মতো অতো বড়-বড় প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ নয়। আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঢালু হয়ে গেছে। অমরগঙ্গা চলে গেছে দূরে—প্রান্তরের উত্তর প্রান্তে। কিন্তু পরমতীর্থ পয়ঃহীন নয়। ঢালের শেষে অপূর্ব সুন্দর একটি জলাশয়। ওরা বলে ডাল। হ্রদের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি তুষারাবৃত শৈলশিখর। তাদেরই একটির পাদদেশ থেকে সৃষ্ট হচ্ছে অমরগঙ্গা। মণিমহেশের পাদোদক নিয়ে যাত্রা করছে মর্ত্যের মানুষের কাছে।

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ মানস-কৈলাস। কিন্তু সেই পরম পবিত্র তীর্থ আজ আমার পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে। ভারতবাসীর কাছে সেই তীব্বতী তীর্থের পথ আজ রুদ্ধ। তবু আমি মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ না করে পারি না। কৈলাস পর্বত (২২,০২৮´) দর্শনের সৌভাগ্য না হলেও, কৈলাসশৃঙ্গ (১৮,৫৫৬´) দর্শনের সুযোগ পেলাম আজ। আকারে ও কৌলিন্যে হলই বা ছোট, এও তো শিবালয়—বাবা মণিমহেশের নিবাস, অবিকল তেমনি তুষারাবৃত

একটি লিঙ্গাকৃত পর্বতশিখর।

সুজয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ১৯৬৮ সালের মে মাসের ভারত-জাপান এক যৌথ মহিলা পর্বতাভিযাত্রীদল এই শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করবেন। সুজয়া নিজেও আগামী বছর রোন্টি অভিযানে যাচ্ছে।*

দেখেছি আমরাও।দেখে যে আর আশ মিটছে না। সাধারণতঃ কৈলাস নাকি মেঘাবৃত থাকে। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল। মাথার ওপরে মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। উজ্জ্বল সূর্যালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। সামনে হিমতীর্থ হিমাচলের পবিত্রতম পর্বতশিখর। কেবল পবিত্র নয়, পরম সুন্দর। পর্বতশিখর নয়, দেবাদিদেব মহাদেবের মণিময়নিবাস—পুণ্যময় কৈলাস।

আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করি। বলি—আজি এই মেঘমুক্ত দিনে, প্রসন্ন আকাশতলে দাঁড়িয়ে, আমরা তোমাকে প্রণাম করছি। হে মানুষের ভগবান, তুমি আমাদের প্রণতি গ্রহণ করো। আমাদের সুখ দাও, স্নেহ দাও, শান্তি দাও।

কৈলাসের কোলে ডিম্বাকৃতি জলাশয়। কোথায় তিব্বত আর কোথায় হিমাচল। কিন্তু প্রকৃতি একই ছাঁচে তৈরি করেছে ঐ পর্বতশিখর আর এই হ্রদ।

সেই কৈলাস আর মানস-সরোবর।

মানসের মতো দিগন্তব্যপী বিস্তৃত না হলেও, ডাল খুব ছোট নয়। হিমবাহের মাঝে এতো বড় জলাশয় খুব বেশি দেখা যায় না। আমরা সেই বিস্ময়কর হ্রদের তীরে নেমে আসি।

স্ফটিক স্বচ্ছ জলাশয়। জল বেশি নয়। নিচের পাথর পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। কেবল হ্রদের পশ্চিমে খানিকটা জায়গা জুড়ে নীল জল। শুনেছি ওখানে ডুব দিলে আর কেউ উঠে আসে না—মণিমহেশের পদতলে ঠাঁই পায়।

সরোবরের বুকে কৈলাসের প্রতিবিম্ব পড়েছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি সেদিকে। তার পরে উঠে আসি সরাইয়ের সামনে। হ্রদের উত্তর তীরে দুখানি ঘর নিয়ে সরাই। সামনে বারান্দা। ঘরের দরজা ভেঙ্গে গেলেও চারিদিকে দেয়াল আছে। ধনছো বা ভারমৌরের চেয়ে অনেক ভাল এ সরাই। অনায়াসে রাত্রিবাস করা যায় মণিমহেশে।

মালপত্র সরাইয়ের সামনে রেখে আবার নেমে আসি হ্রদের তীরে। পশ্চিম তীরে আসি। হ্রদের মাঝে খানিকটা জায়গা জলহীন আর সেখানেই সেই পুণ্যময় তীর্থ। সামান্য জল পেরিয়ে পৌঁছই সেই তীর্থে। পৌঁছই মণিময় মণিমহেশের মন্দিরে। তুষারাবৃত পর্বত এ মন্দিরের প্রাচীর, উন্মুক্ত নীলাকাশ এর চন্দ্রাতপ, প্রস্তরময় প্রান্তর এ মন্দিরের অঙ্গন।

পাথর পেতে খানিকটা জায়গাকে সমতল করার চেষ্টা করা হয়েছে। একখানি পাথরের ওপরে মণিমহেশের একটি চতুষ্কোণ মূর্তি। নিরেট পাথরের চারিদিকে খোদাই করা চারটি শিবমূর্তি—জটাময় শিব। পেছনে অপেক্ষাকৃত বড় একটি নন্দীমূর্তি আর কাঠের খুঁটির সঙ্গে একটা বেশ বড় ঘন্টা বাঁধা। পাশেই পড়ে আছে সিঁদুর মাখানো কয়েকটি লোহার ত্রিশূল। ব্যাস, আর কিছু নেই। থাকার দরকারই বা কি ? রয়েছেন ভগবান আর তাঁর বাহন।

তিনি আছেন, নিশ্চয়ই আছেন। নইলে এই অসীম আকাশ, অনন্ত হিমালয় আর

---

* শ্রীমতী দীপালী সিন্‌হার নেতৃত্বে ১৯৬৭ সালে গাড়োয়ালে হিমালয়ের ১৯,৮৯৩ ফুট উঁচু এই রোন্টি শৃঙ্গাভিযান সফল হয়েছে।

এই অনিন্দ্যসুন্দর সরোবর সৃষ্ট হল কেমন করে ?

তিনি আছেন ঐ আকাশের নীলিমায়, এই হিমালয়ের হিমানী আর সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে। আছেন জগতের যাবতীয় বস্তুতে, প্রত্যেক জীবের অন্তরে। আছেন আমাতে ও তোমাতে।

কিন্তু তাহলে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এতদূরে আসার কি প্রয়োজন ছিল ?

প্রয়োজন ছিল বৈ কি। তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করার জন্য আমাদের এই দুর্গম গিরি-কান্তার পরিক্রমা। মানুষের মহানগরীতে আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলি। তাই তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে এসে তাঁকে খুঁজে পাই। অসীমের মাঝেই যে কেবল অনন্তকে পাওয়া যায়।

সুজয়ার ডাকে সম্বিত ফিরে আসে। সুজয়া বলে, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, এবারে পূজার আয়োজন করা যাক।'

আয়োজনের কি আছে ?' অসিতবাবু বলেন। তিনি ধূপকাঠি ধরান।

আমি মোমবাতি জ্বালাই। সুজয়া একখানি থালায় করে কয়েক টুকরো মিছরি রাখে মণিমহেশের মূর্তির সামনে। তার পরে আমরা সবাই বসে পড়ি। মণিময় মণিমহেশের ধ্যানে মগ্ন হই। মৌন পৃথিবী প্রণতি জানালো সেই সত্য ও সুন্দরকে। তাঁর আশীর্বাদ আমাদের জীবন-পথের পরম পাথেয় হয়ে রইল।

॥ চোদ্দ ॥

পরদিন। সকাল সাতটায় বাসস্ট্যান্ডে এলাম। আমি ও মানসী কুলু থেকে মণিকরণ চলেছি। ট্যুরিস্ট অফিসার পরামর্শ দিয়েছেন—যাবার পথে আমরা যেন বজৌরার বিখ্যাত মন্দিরটি দেখে যাই। তাই এখন সোজা বজৌরা যাচ্ছি। মন্দির দর্শন করে ফিরে আসব ভুন্টার। সেখানে মণিকরণের বাস পাবো। ভুন্টার এখান থেকে ছ'মাইল। আরও তিন মাইল এগিয়ে বজৌরা।

একটু বাদেই বাস এলো। বসার জায়গাও পেয়ে গেল মানসী। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। সংসারের এই নিয়ম।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। আধ ঘন্টার মধ্যে এসে পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। বজৌরা বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে দেবী সিংয়ের দোকানের সামনে বাস থেকে নামলাম। বজৌরার উচ্চতা ৩১০০ ফুট। ডাকবাংলো আছে। এখানেও প্রচুর আপেল হয়।

দেবী সিংয়ের দোকানের পাশ দিয়েই একটি পায়ে-চলা পথ। সংকীর্ণ মাটির পথ। পথের দুধারে ধানক্ষেত। ক্ষেতের শেষে বিপাশা। বিপাশার কূলে মন্দির।

মিনিট তিনেক হেঁটে আমরা মন্দিরের কাছে এলাম। কাঠের গেট ঠেলে মন্দির এলাকায় উপস্থিত হলাম। তারকাঁটার বেড়া দিয়ে একফালি তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তিন দিকে ক্ষেত ও এক দিকে বিপাশা। বিপাশার পাশে মন্দির।

চতুষ্কোণ মন্দির। রচনাশৈলী হিন্দু আমলের। গ্রীক স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে। মন্দিরশীর্ষ স্তম্ভযুক্ত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা জগৎ সিং নির্মাণ করেছেন এই বশীশ্বর শিবের মন্দির। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করেছে মানুষ। হিন্দু-বিদ্বেষী আক্রমণকারীরা বার বার এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কুলু উপত্যকার এই

সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির ওপরে। ফলে মন্দিরগাত্রের একটি মূর্তিও অক্ষত নেই।

এখানে নদীর ধারে আরও একটি মন্দির ছিল। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে সেটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। বশীশ্বর শিবের মন্দিরই এখন বজৌরার একমাত্র মন্দির।

পূবমুখী মন্দির। সেটাই স্বাভাবিক কারণ পূর্বে বিপাশা। এটি মন্দিরের পেছন দিক। মন্দিরের বাইরে তিনদিকের দেয়ালে রয়েছে বড় বড় তিনটি প্রস্তর মূর্তি। এই পশ্চিম দিকে রয়েছে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি। ওরা বলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। ভারী সুন্দর মূর্তি। অলঙ্কার ও পোশাকের কারকার্য খুবই সূক্ষ্ম ও সুন্দর।

উত্তরে কালীমূর্তি। দেবী যুদ্ধরতা—হাতে ধনুর্বাণ মশাল তলোয়ার ও ত্রিশূল। ত্রিশূলে ছিন্নমুণ্ড। চমৎকার শিল্পকলা।

অর্ধ প্রদক্ষিণ করে আমরা মন্দিরদ্বারে এলাম। ছোট চতুষ্কোণ মন্দিরদ্বার। তার পরে খানিকটা খালি জায়গা। এই অংশটিকে ক্ষুদ্র নাট-মন্দিরও বলা যেতে পারে। দুদিকের দেয়ালে খোদাই কাজ।

একই আকারের আরেকটি দরজা পেরিয়ে আমরা গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করি। দরজার ওপরে শিবমূর্তি।

প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু নাতিবৃহৎ মন্দির। মন্দিরের মধ্যস্থলে বেশ বড় বেদীর ওপরে বশীশ্বর মহাদেবের সুবিরাট লিঙ্গমূর্তি। চারিদিকের দেয়ালে প্রতিটি পাথরে কারুকার্য। পেছনের দেয়ালে পাঁচটি মূর্তি। খুবই সূক্ষ্ম তাদের শিল্পকলা—ভারী সুন্দর।

শান্ত সমাহিত মন্দির। নিয়মিত পূজা হয় কিনা বুঝতে পারছি না। তবে পূজার প্রমাণ কিছু কিছু রয়েছে ছড়িয়ে। পড়ে আছে শুকনো ফুল। আর রক্ষকহীন হলে মন্দির এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারত না। কিন্তু এখন মন্দিরে কেউ নেই। পূজারী হয়তো আরও পরে আসেন।

হঠাৎ শিবের সামনে মেঝের ওপরে বসে পড়ে মানসী। বলি, "এ কি এখানে বসলে কেন ?"

"বাঃ ! এমন মন্দির। একবার শিবপূজো করব না ?"

"কিন্তু শাড়ীটায় যে ধুলো লেগে গেল, নোংরা হল।"

"ধুলো লাগল, কিন্তু নোংরা হল না। মন্দিরের ধুলি অঙ্গে মাখলে মন পবিত্র হয়। যাক্ গে, তুমি আমার জন্য একটু কষ্ট করবে ?"

"একটু কেন, অনেক কষ্ট করতে রাজি আছি যদি দেবী কিঞ্চিৎ প্রসন্না হন।"

"তথাস্তু।" মানসী বলে, "ওয়াটার-বটলটা নিয়ে বিপাশা থেকে একটু জল নিয়ে এসো।"

"জল দিয়ে কি হবে আবার ?"

"শিবকে স্নান করাবো। আগে জানলে দুধ নিয়ে আসতাম।"

"সে জন্য জল আনার দরকার কি ? জল তো রয়েছে ওয়াটার-বটলে।"

"আশ্চর্য ! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি বই লেখো !'

নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণটা বুঝতে পারছি না। কাজেই চুপ করে থাকি।

মানসী আবার বলে, "ট্যুরিস্ট বাংলোর কলের জল দিয়ে বশীশ্বর শিবকে স্নান করানো যায় না, বুঝলে বোকারাম।"

নীরবে বোতল হাতে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

জল নিয়ে ফিরে আসি মন্দিরে। চোখ বুজে বসে আছে মানসী। মহাদেবের ধ্যানমগ্না মানসী। পার্বতীও একদিন এমনি ধ্যানে বিভোর হয়েছিলেন। সে ধ্যন বিফল হয় নি। সেই থেকে কুমারীরা যুগে শিবপুজো করে শিবের কাছে শিবের মতো স্বামী কামনা করে আসছে। কায়মনোবাক্যে কামনা করলে ভোলানাথ নাকি মনস্কামনা পূর্ণ করেন। প্রার্থনা করি বশীশ্বর মানসীর প্রার্থনা পূরণ করুন। কিন্তু কে মানসীর সেই মনের মানুষ ?

চোখ খোলে মানসী।আমার দিকে তাকায়।

"এনেছো ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" ওয়াটার-বটলটা এগিয়ে দিই।

উঠে দাঁড়ায় মানসী। সযত্নে শিবকে স্নান করায়। প্রণাম করে। প্রদক্ষিণ করে। তার পরে বেরিয়ে আসে মন্দির থেকে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

মন্দিরের দক্ষিণ গাত্রে গণেশমূর্তি—সিংহের ওপরে উপবিষ্ট। সিদ্ধিদাতা গণেশ। আমরা প্রণাম করি। তাঁর আশীর্বাদ না হলে যে মানুষের কোন যাত্রাই সফল হয় না। আমাদের মণিকরণ যাত্রা আনন্দময় হোক।

"কেবল আটটা বেজেছে। অনেক সময় হাতে আছে। চলো না একটু বিপাশার পাশে গিয়ে বসা যাক।" মানসী প্রস্তাব করে।

মন্দির চত্বরের প্রান্তে, নদীর তীরে এসে বসি দুজনে। বসে বসে বজৌরাকে দেখি। বজৌরা আর বিপাশা—ভারী সুন্দর। বিশাল সবুজ উপত্যকা—দূরে পাহাড়ের কালো রেখা। উপত্যকার বুকে বিপাশা—সদাচঞ্চল একটি রুপোলী রেখা।

হঠাৎ হেসে ওঠে মানসী। বিস্মিত হই। জিজ্ঞেস করি, "হাসছ কেন ?"

"তোমার কথা ভেবে।"

"আমার ভাবনা তোমার হাসির উদ্রেক করল কেন ?"

"সেদিন নাগর থেকে ফেরার পথে দূরত্ব বজায় রেখে সেই ঝরণার ধারে একটু বসতে চেয়েছিলাম, রাজি হও নি। আজ কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখেই বসে আছি। এখানেও কাছাকাছি কেউ নেই। আর সেদিনকার সেই ঝরণার কলতানের চেয়ে, আজকের বিপাশার সঙ্গীত বেশি সুমধুর নয় কী ?'

বজৌরা থেকে বাস ধরে বেলা নটার সময় ভুন্টার এলাম। পথের ধারে বিপাশায় তীরে বিমানক্ষেত্র। তার পরেই বাজার। সেখানেই মাণ্ডি-কুলু পথের বাসস্ট্যান্ড। আমরা বাস থেকে নেমে চা খেয়ে নিলাম।

বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি পথ চলে গেছে বিপাশার দিকে। বিপাশার ওপরে লোহার পুল। ছোট গাড়ি চলতে পারে। ছোটগাড়িই চলে ওপারে। আমরা পুল পেরিয়ে এলাম। এখানেও একটি বাজার। পুলের ধারে খানিকটা খালি জায়গা। সেখানেই মণিকরণের বাসস্ট্যান্ড। বাস দাঁড়িয়ে আছে।

বাস দেখে মানসী বলে, "একে বাস বলছ কেন, এ তো জীপ।"

"জীপের চেয়ে একটু বড়। তবে এমনি বাসই চলাচল করে হিমাচলের অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে।"

ইচ্ছে ছিল ড্রাইভারের পাশের সিট দুটি দখল করব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না এক পাঞ্জাবী নবদম্পতি বসে আছে সেখানে। বাধ্য হয়ে পেছনে উঠতে হয়। ভাগ্য ভাল,

একপাশের কোণটি এখনও খালি আছে। মানসী সেখানে বসল। আমি ওর পাশে বসি। সামনের পাঞ্জাবী নবদম্পতিকে লক্ষ্য করে মানসী বলে, "ভাল জায়গাটা নিয়ে নিলে ওরা।"

"ওদের প্রয়োজন যে আমাদের থেকে বেশি, ওরা সদ্য বিবাহিত।"

"আমাদের দেখেও তো সবাই তাই ভাবতে পারে।" মৃদু হেসে মানসী বলে।

"পারে নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

"ভাবুক তাহলে।" আমি প্রসঙ্গটার ওপরে যবনিকা টেনে দিই।

বেলা দশটায় বাস ছাড়ল। দু'সারি সীটে দশ জনের জায়গায় চোদ্দ জন বসেছি। মাঝখানের খোলা জায়গায় আরও জন পনেরো। একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থা। নড়াচড়ার উপায় নেই। পা ফেলবার জায়গা নেই। এই ভাবে বসে ১৯ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। দু'ঘন্টার সফর। মানসীর খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি ? আসার সময় যে ভাবেই হোক সামনের সীটে বসতে হবে।

অসমতল সংকীর্ণ চড়াই পথ বেয়ে বাস এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝেই জোরে জোরে দুলে উঠছে। আমরা একে অপরের গায়ের ওপর পড়ে যাচ্ছি।

বাঁ দিকে বিপাশা, ডান দিকে পাহাড়। কিছুদূর এসে বিপাশা ও পার্বতীর সঙ্গম। পার্বতীর তীর দিয়ে পথ—মণিকরণের পথ।

ভুন্টার থেকে ৬ মাইল এসে সারসারি, ৭ মাইল এসে ছানিখোর, ৯ মাইল এসে সারণি, ১০ মাইল এসে সাট, ১১ মাইল এসে ছাঞ্জাব, ১২ মাইল এসে জানু ও ১৩ মাইল এসে বাগিয়াস্তা। ছোট-বড় গ্রাম। প্রত্যেক জায়গায় বাস থামল, ভিড় বাড়ল। কিন্তু বাস থেকে নামবার সুযোগ পেলাম না। একই ভাবে বসে আছি সেই থেকে। ভিড়ের চাপ বেড়েই চলেছে।

সওয়া এগারোটার সময় বাস এসে থামল জারীতে। আমরা ভুন্টার থেকে ১৪ মাইল এসেছি। এতক্ষণে ড্রাইভারের দয়া হল। সে জানালো—এখানে দশ মিনিটের জন্য যাত্রা বিরতি। আমরা ইচ্ছে করলে বাস থেকে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিতে পারি।

তাড়াতাড়ি পথে নেমে এলাম। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম জারী। দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর,ক্ষেত-খামার আর আপেল বাগান। এখানে একটি বন-বিশ্রাম গৃহ আছে। বাসস্ট্যান্ড থেকে পায়ে-চলা পথ উঠে গেছে বিশ্রাম-গৃহে।

কেবল বড় নয়, সুন্দর গ্রাম জারী। উপত্যকার শেষে তুষারাবৃত একটি পর্বতশিখর। শিখরটি বড়ই সুন্দর। সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে।

আমরা পথে পায়চারী করতে থাকি। কথায় কথায় মানসী মালানার কথা জিজ্ঞেস করে। আমি বলি, "নাগর থেকে যেমন চন্দ্রখনি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে মালানায় যাওয়া যায়, তেমনি জারী থেকেও মালানা যাবার একটি পথ আছে। দুর্গম গিরি-প্রাচীরের অন্তরালে বিচিত্র গ্রাম মালানা। গ্রামবাসীরা বলেন—রাজ্য, জামলুর রাজ্য। জামলু গ্রামের দেবতা। সারা গ্রামখানি দেবোত্তর। জামলুর নামেই গ্রামের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। চাষীরা দেবতার জমি চাষ করে ফসল দিয়ে দেয় দেবতার ভাণ্ডারে। গ্রামের কাঠ ও ওষধি বাইরে চালান যায়। টাকা জমা হয় দেবতার ভাণ্ডারে। সেখান থেকে সবাই ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র পেয়ে থাকে। এ নিয়ম চলে আসছে বহুকাল থেকে।

"মালানা কুলু উপত্যকায়। কিন্তু, উপত্যকার সঙ্গে মালানার তেমন সম্পর্ক নেই।

সেখানকার ধর্ম, সমাজ এমন কি ভাষা পর্যন্ত ভিন্ন। কুলুবাসীরা বলেন—জামলু দেবতা নয়, দানব। তাই জামলুকে নিমন্ত্রণ করা হয় না দশেরার সময়। কিন্তু মালানার মানুষরা বলেন—জামলু নিজের রাজ্য ছেড়ে বাইরে যান না, রঘুনাথজীর কাছে নতি স্বীকার করেন না।

"মালানার মানুষরা দাবী করেন—মহামতি আকবর জামলুকে ভক্তি করতেন। তিনি একটি সোনার হাতি প্রণামী দিয়েছেন জামলুকে। ছোট হাতিটি ওরা সবাইকে দেখায়। উৎসবের সময় এখনও তাঁরা রূপোর ঘোড়া কিংবা হাতি জামলুকে প্রণামী দেয়।

"অনেকের মতে জামলু মুসলমানের দেবতা। সন্দেহটা একেবারে অমূলক নয়। উৎসবের সময় এরা পাঁঠা কিংবা ভেড়াকে বলি না দিয়ে জবাই করেন। জামলুর কোন মন্দির কিংবা মূর্তি নেই মালানায়। সামনের দুর্গম পাহাড়টির প্রকাণ্ড একখানি পাথর দেখিয়ে বলেন, সেখানেই নাকি জামলু বাস করেন।

"জামলুর রাজ্য পবিত্র। তাই কেউ জুতো পরতে পারতেন না মালানায়। আগে বাইরের কোন লোক যেতেও পারতেন না সেখানে। বিদেশী দেখলেই গ্রামবাসীরা ঢিল মেরে তাঁদের তাড়িয়ে দিতেন। তবে সাধু কিংবা ভিক্ষুক হলে তাদের কিছু বলতেন না ওঁরা। বরং তারা এক বেলা খাবার ও একখানি করে কম্বল পেত জামলুর ভাণ্ডার থেকে। এ নিয়মটি নাকি এখনও চালু আছে।

"আগে আটজন গণ্যমান্য গ্রামবাসীকে নিয়ে এঁদের নিজেদেরই আদালত ছিল। তাঁদের সিদ্ধান্ত সবাই মেনে চলতেন।

"কুলুর কাছাকাছি জামলুর কিছু জায়গা-জমি আছে। মালানার অধিকাংশ মানুষরা গ্রীষ্মকালে সেখানে গিয়ে মাসখানেক কাটিয়ে আসেন। তাই বলে তাঁরা কুলুর মানুষের সঙ্গে বড় একটা মেলা-মেশা করেন না। কেন করবেন, ওরা যে জামলুর বরপুত্র।"

বাসের শব্দে সচকিত হই। মালানার কথা ছেড়ে আমরা তাড়াতাড়ি এসে মণিকরণের বাসে উঠি। বাস চলতে শুরু করে।

ভুন্টার থেকে ১৫মাইল এসে দুনখ্‌রা, ১৭ মাইল এসে জৈন নালা আর ১৯ মাইল এসে কসোল—বাসপথের প্রান্তসীমা। পৌনে বারোটার সময় ক্লান্তিকর বাসযাত্রার অবসান হল। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম পথে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এখানে কোন জনপদ নেই। কেবল পথের বাঁ দিকে নদীর ধারে দুটি চায়ের দোকান পাশের পাহাড় কেটে গাড়ি ঘোরাবার জায়গা করা হয়েছে। ওপরে একটি বন-বিশ্রাম গৃহ আছে। এখানকার উচ্চতা ৫২০০ ফুট। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে বিজ্ঞাপন—

আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। মতিলাল, মণিকরণ।

ভদ্রলোক কে জানি না।তবে তাঁর আদর্শ কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় নেই। আমরা উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে এসেছি। বিকেলের বাসে ফিরতে যেতে হবে।

বাস যাত্রার যতি পড়লেও, বাসপথ শেষ হয় নি এখানে। পথ আরও খানিকটা গেছে এগিয়ে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে গাড়ি ঘোরাবার জায়গা নেই। তাই গাড়ি আর এগিয়ে যায় না।

আমরা বড় রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলি।রাস্তার ডাইনে পাইন বনে ছাওয়া সবুজ পাহাড় আর বাঁয়ে বয়ে যাচ্ছে পার্বতী। হিমালয় দুহিতা পার্বতীর নামে শিবতীর্থ মণিকরণের মানস-নির্ঝরিণীর নাম।

পার্বতী এসেছিলেন মণিকরণে। এসেছিলেন তপস্যাচারী স্বামীর সঙ্গে। বেশ আনন্দেই

দিন কাটছিল তাঁদের। হঠাৎ একদিন পার্বতী দেখলেন তাঁর কানে মণিকুণ্ডল নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। পাবেন কেমন করে ? পার্বতীর কান থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল মণিকণিকা—দুষ্প্রাপ্য কর্ণমণি। আর সঙ্গে সঙ্গে শেষনাগ স্বর্গের সেই অমূল্য সম্পদ নিয়ে পাতালে চলে গেছে।

পার্বতীর আকুলতায় শঙ্কর ব্যাকুল হলেন। তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। শঙ্কিত শেষনাগ নাগলোক থেকে তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে দিলেন মণিকণিকা—উষ্ণ কুণ্ডবারির সঙ্গে মণিকুণ্ডল এসে পড়ল পার্বতীর পায়ের কাছে। হারানো মণি ফিরে পেয়ে উচ্ছল হয়ে উঠলেন পার্বতী। শান্ত হলেন শিব। ত্রিভুবন রক্ষা পেল।

মণিকণিকা নিয়ে হর-পার্বতী ফিরে গেলেন কৈলাস। কিন্তু পাতালের সেই উষ্ণধারা আজও আসছে মর্ত্যলোকে। নাগলোকের সেই কুণ্ডবারিতে অবগাহন করে জীবন ধন্য করতে আমরা আজ মণিকরণ চলেছি।

পথের পাশে পাথরে পাথরে নানা জাতীয় মস আর রঙ-বেরঙের বনফুল। পার্বতীর কলতান, পাখির কলকাকলি আর প্রজাপতির অস্থির আনাগোনা। বড় ভাল লাগছে পথ চলতে।

অন্যান্য যাত্রীদের দেখাদেখি আমরাও বড় রাস্তা থেকে নেমে এলাম পাইন বনে। ছায়াঘন স্যাঁতস্যাঁতে পথ—সামান্য উৎরাই। বনের শেষে একটা ঝরণা। তার পরে বৃক্ষহীন প্রান্তরের ভেতর দিয়ে পথ। পথের পাশে প্রবহমানা পার্বতী। মোটরপথ প্রসারিত হবে। তারই আয়োজন চলেছে। কসোল থেকে মণিকরণ আড়াই মাইল।

কসোল থেকে দেড়মাইল এসে পার্বতীর পুল। মোটরপথ এই পর্যন্ত প্রসারিত হবে।*

পুল পেরিয়ে পার্বতীর পরপারে এলাম। পার্বতী এখন আমাদের ডানদিকে। এখন আর আগের মতো সমতল ও প্রশস্ত পথ নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে সংকীর্ণ চড়াই পথ। নিচে বয়ে যাচ্ছে পার্বতী।

চড়াই ভেঙে শ্রান্ত হয়ে পড়ে মানসী। পথের পাশে একখানি পাথরে বসে পড়ে সে। হেসে বলি, "এই সামর্থ্য নিয়েই মাউন্টেনিয়ার হতে চাও !'

"আমি মাউন্টেনিয়ার হতে চাই, একথা কে বলল তোমাকে ?" হাঁফাতে হাঁফাতে মানসী বলে।

---

* পথ প্রসারিত হয়েছে। ফলে নিয়মিত বাস চলাচল করছে। এখন কুলুতে বাসে উঠে সোজা মণিকরণ পৌঁছনো যায়। মাত্র ঘন্টা দেড়েক সময় লাগে।

পার্বতী নদীর বাঁ-তীরে গুরুদ্বারার উল্টোদিকে অনেকখানি জায়গাকে সমতল করে বাসস্ট্যান্ড ও বাজার করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস, হোটেল সবই এখন মণিকরণে পাওয়া যাবে। তবে তীর্থযাত্রীদের হোটেলে খাবার দরকার পরে না। সন্তজীর সেই নির্মীয়মাণ ধর্মশালা এখন সুবিরাট, সকাল থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত লঙ্গরখানা খোলা থাকে। যে কোন যাত্রী অন্তত তিনদিন সেখানে থাকতে ও খেতে পারেন। থাকার জন্য খাটিয়া ও কম্বল পাওয়া যায় আর খাওয়া মানে 'ব্রেক্-ফাস্ট', 'লাঞ্চ', 'ডিনার'—সবই। কোন খরচ দিতে হয় না। তবে সবারই সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত।

এখন মণিকরণ আপেল রপ্তানীর একটি বড় কেন্দ্র। দেশী-বিদেশী প্রচুর পর্যটক প্রতিদিন সেখানে যান। বহু হিপি মণিকরণে বসবাস করছেন।

একটি মানুষের নিরলস সাধনায় মণিকরণ আজ এত উন্নত এবং এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেবাধর্মের সেই সুমহান আদর্শ পূজনীয় সন্তজীকে পুনরায় প্রণাম করি।

"সেদিন মানালীতে অতো খোঁজ-খবর করলে।"

"খোঁজ করলেই বুঝি ট্রেনিং নিতে হয়? তুমি সত্যই বড্ড বোকা।"

হাসতে হাসতে বলি, "অথচ আশ্চর্য! সংসারে এতো বুদ্ধিমান মানুষ থাকতে, এই বোকার সঙ্গেই তুমি শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব করলে।"

"এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?" মানসী গম্ভীর।

আমি ওর দিকে তাকাই।

মানসী বলে, "আমি যে তোমার চেয়েও বোকা।"

আমি হেসে উঠি। মানসীও আমার সঙ্গে যোগ দেয়। হাসি থামলে জিজ্ঞেস করে, "পরশু বিকেলে কুলর পথে চলতে চলতে বলেছ ওয়াজিরী রূপি, ধর্মগঙ্গা, আর রসকুণ্ডের কথা। কিন্তু বল নি, তার পরে কি আছে? রসকুণ্ডেই নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যায় নি পার্বতী উপত্যকা?"

"না।" আমি উত্তর দিই, "পার্বতী নদীর ডান-তীর দিয়ে ঐ মণিকরণ গ্রাম ছাড়ালেই তুমি পাবে আপেল বাগান। আপেল পেড়ে খেতে খেতে তুমি যদি চড়াই পথে এগিয়ে চলো, একে একে পৌঁছবে রাশকার, বরশালী, পালগাঁ ও মৈথানগ্রামে আর রমণীয় ক্ষীরগঙ্গা উপত্যকায়। অবশ্য ক্ষীরগঙ্গা যেতে হলে তোমাকে পালগাঁয়ে রাত্রিবাস করতে হবে। সেখানে বন-বিশ্রাম গৃহ আছে। ক্ষীরগঙ্গায় এখনও কোন ভাল আস্তানা নেই। তবে শুনেছি অদূর ভবিষ্যতে সেখানে গুরুদ্বারা ও লঙ্গরখানা তৈরি হবে।"*

"তার পরে?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"তার পরে আর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে পার্বতীর তীর ধরে তুমি যেতে পারো এগিয়ে। পৌঁছতে পারো স্পিতি উপত্যকায়। কাজটা অবশ্য মোটেই সহজ নয়। খুবই দুর্গম পথ। তবে পথ আছে।"

"দরকার নেই বাপু সে-পথে গিয়ে, মণিকরণ যেতেই যে জান কবুল করতে হচ্ছে।" মানসী উঠে দাঁড়ায়। আমরা আবার চড়াই ভাঙ্গতে শুরু করি।

চড়াই পথের শেষে একটি কাঠের তোরণ। কিছুদিন আগে কোন কারণে কাঠ ও কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই তোরণ। বর্ষায় ও বাতাসে কাপড় ছিঁড়ে গেছে। তবে একটি খুঁটির সঙ্গে গৈরিক পতাকা উড়ছে। আর একটি খুঁটির সঙ্গে রয়েছে কেরোসিনের আলো। তোরণ থেকে পথের দুদিকেই বাগান ও ক্ষেত—ফুল, ফল ও শাক-সবজীর বাগান।

বাগানের শেষে পথের ডানদিকে পার্বতীর তীরে বাড়ি-ঘর। প্রথম ঘরখানিতে সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়। ঘোড়া দেখলে সবাই খোঁড়া হয় কিনা জানি না, তবে আমরা কলকাতাবাসীরা হিমালয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা দেখলে অসুস্থ হই। মানসী দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করে।

ডাক্তারবাবু সপ্রশ্ন নয়নে তার দিকে তাকায়। মানসী হিন্দীতে বলে, "একটা ওষুধ দিন তো।"

---

* *এখন ক্ষীরগঙ্গায় সেই প্রস্তাবিত গুরুদ্বারা ও লঙ্গরখানা তৈরি হয়ে গিয়েছে। জায়গাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে বহু হিপি সেখানে বাস করছেন। তাঁরা য়ুরোপ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন। কয়েক বছর আগে জনৈক দক্ষিণ-ভারতীয় সাধু ক্ষীরগঙ্গায় আশ্রম ও ধর্মশালা নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। ইদানীং তিনি জনৈকা অস্ট্রেলীয়ান হিপিনীকে জীবনসঙ্গিনী করেছেন। তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছে।*

"কি হয়েছে আপনার ?" ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করেন।

"চড়াই পেরোবার সময় বড্ড বুক ধড়ফড় করে।" মানসী উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বলেন, "চড়াই পথে সবারই শ্বাসকষ্ট হয়, ওর জন্য আমার কাছে কোন ওষুধ নেই। দোকান থেকে টক লজেন্স কিনে নেবেন।"

ডাক্তারবাবুর কথায় হাসি পাচ্ছে আমার। কিন্তু হাসতে পারছি না। মানসী রেগে যাবে।

মানসী কিন্তু মোটেই ঘাবড়ে যায় না। সে পাল্টা দাবী জানায়, "তাহলে আমাকে একটু হজমের ওষুধ দিন।"

এবারে ডাক্তারবাবু আর আপত্তি করতে পারেন না। উঠে গিয়ে আলমারী থেকে কয়েকটি কালো বড়ি এনে মানসীর হাতে দেন। তারপরে একখানি খাতা খুলে তাকে বলেন, "এখানে নাম ঠিকানাটা লিখে ঐ দরিদ্র ভাণ্ডারের বাক্সে কয়েকটা পয়সা ফেলে দিন।"

মানসী ব্যাগ খুলে একটি টাকা ও কলম বের করে। টাকাটা বাক্সে ফেলে দিয়ে কলম খুলে খাতাটা টেনে নেয়। আমি তার কাছে এগোতেই আমাকে দেখিয়ে ডাক্তারকে বলে, "ডগদারসাব, এনাকে নাম লিখতে দেবেন না, ইনি ওষুধ নেন নি।"

হো হো করে হসে ওঠেন ডাক্তার।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরেই একটি নির্মীয়মাণ দোতলা বাড়ি। কাঠ পাথর আর টিনের বাড়ি। আগামী দিনের ধর্মশালা।

মূল পথটি প্রসারিত হয়েছে সামনে—গিয়েছে বাজারে ও গ্রামে। বাজারের পরে পার্বতীর তীরে ও পাহাড়ের গায়ে গ্রাম—প্রাচীন গ্রাম। উচ্চতা ৫৭০০ ফুট। গ্রামে রয়েছে রঘুনাথজী ও শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দির। গ্রামবাসীরা বলে পাণ্ডবদের তৈরি, পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। কথাটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু মন্দিরদুটি সত্যই সুপ্রাচীন। সংস্কারের অভাবে খুবই জরাজীর্ণ। শুনেছি সংস্কারের পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে।

গুরু নানক জনৈক শিষ্যের সঙ্গে মাণ্ডি হয়ে সুমেরু পর্বতে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি এলেন এখানে। তখনও ছিল এই গ্রাম। কিন্তু গ্রামে প্রবেশ না করে তিনি এসে বসলেন উষ্ণকুণ্ডের কাছে, একখানি পাথরের ওপরে। পথশ্রমে ক্লান্ত শিষ্য বললেন—গুরুদেব বড়ই খিদে পেয়েছে।

গুরু বললেন—এই তো তোমার সামনেই ধূমায়মান উষ্ণকুণ্ড। রুটি বানিয়ে কুণ্ডে ফেলে দাও।

তাই করলেন শিষ্য। কিন্তু সব রুটি গেল ডুবে। শিষ্য মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

গুরু নানক হেসে বললেন—হরিহরকে বল, আমরা ক্ষুধার্ত। প্রার্থনা কর, তিনি যেন একখানি রুটি রেখে বাকি সব রুটি দিয়ে দেন আমাদের।

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলেন শিষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সব রুটি ভেসে উঠল। শিষ্য একখানি রুটি কুণ্ডে রেখে বাকি সব রুটি তুলে নিলেন। ভাসমান রুটিখানি আবার তলিয়ে গেল।

শিষ্য বললেন—দেবভূমি মণিকরণ।

গুরুদেব বললেন—হ্যাঁ। কলিযুগের শেষে, সত্যযুগের আরম্ভে তোমার পুনর্জন্ম হবে, তুমি এসে বাস করবে এখানে। শিষ্য প্রণাম করলেন গুরুদেবকে।

গুরু নানক যে পাথরখানির ওপর বসেছিলেন, সেখানি এখনও আছে এখানে। তিনি পরদিন ক্ষীরগঙ্গা ও মানতালাই হয়ে রওনা হয়েছিলেন সুমেরু পর্বতের দিকে।

গুরু গোবিন্দ সিং-ও জনৈক শিষ্যকে নিয়ে মণিকরণ এসেছিলেন।

তাই মণিকরণ হিন্দুতীর্থ হলেও শিখদের পবিত্রভূমি। যাত্রীদের মধ্যে শিখদের সংখ্যাই বেশি। একজন শিখ সন্ন্যাসী এখন মণিকরণ বাবা নামে পরিচিত। তাঁর নাম সন্ত নারায়ণ হরিজী। প্রায় তিরিশ বছর আগে তিনি এখানে এসে মণিকরণের উন্নয়নে আত্মোৎসর্গ করেছেন। মনে পড়ছে ভারমৌরের জয়কৃষ্ণ গিরিমহারাজের কথা। এঁরা না হলে হিমালয় আজ তীর্থময় হয়ে উঠতে পারত না।

মূল পথ থেকে নির্মীয়মাণ ধর্মশালার ভেতর দিয়ে এক সারি সিঁড়ি নেমে গেছে পার্বতীর বেলাভূমিতে। সেই সিঁড়ি বেয়ে আমরা নেমে এলাম সন্তজীর আশ্রমে। ডানদিকে কুণ্ড, বাঁদিকে আশ্রম। আশ্রমের কাছে উষ্ণকুণ্ডের উৎস। মাটির নিচ থেকে গরম জল ওপরে উঠে আসছে টগবগ করে জল ফুটছে, ধোঁয়া উঠছে। জলের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহিট্। এটি বিশ্বের উষ্ণতম উষ্ণপ্রস্রবন।

পার্বতীর তীরে কাঠা পাঁচেক পাথর বাঁধানো জায়গা। তারই ভেতরে সব—ধর্মশালা, আশ্রম, সেবক-সেবিকাদের নিবাস, মন্দির ও কুণ্ড। উৎস থেকে অধিকাংশ উষ্ণজল গিয়ে পার্বতীতে পড়েছে। আর একটি ক্ষীণধারায় উষ্ণজল এসে পড়ছে কুণ্ডে। একটি নয়, দুটি কুণ্ড। প্রথমটি রান্নার, দ্বিতীয়টি স্নানের। এখানে উনুন জলে না। সব কিছুই কুণ্ডে রান্না হয়। ঘড়ি ধরে রান্না করতে হয়। যেমন ভাত, ডাল, তরকারী রান্না করতে আধঘন্টা লাগে। ক্ষীর তৈরি হয় এক ঘন্টায় আর মিষ্টান্ন রাঁধতে লাগে দু'ঘন্টা।

স্নানের কুণ্ডটি বিশালতর। দুটি অংশে বিভক্ত। বাঁয়ে ছেলেদের ও ডাইনে মেয়েদের স্নান করার জায়গা। মেয়েদের অংশ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। বাঁধানো জায়গার মাঝখানে বাঁধানো কুণ্ড। কুণ্ডের চারিদিকও পাথর বাঁধানো। পার্বতীর দিকে কোমর-সমান রেলিং—স্নানার্থীরা যাতে পড়ে না যায়। নিচে বিক্ষুব্ধা পার্বতী। এই দিক থেকেই সিঁড়ি নেমে গেছে কুণ্ডের জলে।

উষ্ণকুণ্ডের উৎসের কাছেই পার্বতীর তীরে মন্দির। ছোট দোতলা পাথরের মন্দির। মন্দিরশীর্ষে ত্রিশূল ও গৈরিক পতাকা। ওপর তলার চারিদিকে কাঁচের দেয়াল। ভেতরে শ্বেতপাথরের বিষ্ণুমূর্তি। নিচের তলায় শিবলিঙ্গ। ওপরে ঝুলিয়ে রাখা একটি পেতলের ঘড়া থেকে সর্বদা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মহাদেবের মাথায়। মন্দিরগাত্রে লেখা রয়েছে—

'তত্ত্ব মসি, অহং ব্রহ্মা।' দান ধর্ম সৎসঙ্গ বিচার।

পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

কিন্তু এ সবই সন্ত নারায়ণ হরিজীর অবদান। তিনি আসার আগে মণিকরণ ছিল একটা নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর স্থান। ধূমায়মান উষ্ণপ্রস্রবণের চারিপাশে সর্বদা স্নানার্থী ও ধোবাদের ভিড় লেগে থাকত। অথচ তখনও সাত-আটটি ছোট ছোট মন্দির ছিল এখানে। বহু দূর থেকে তীর্থযাত্রীরা আসতেন। কিন্তু কেউ মণিকরণের উন্নয়নে মনোযোগী হতেন না। সন্তজী না এলে আজও হয়তো মণিকরণ তেমনি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকরই থেকে যেত।

সন্তজী বসেছিলেন আশ্রমের সামনে। সৌম্যদর্শন কর্মযোগী মহাপুরুষ। আমরা তাঁকে প্রণাম করি। তিনি আশীর্বাদ করেন, "তোরা সুখী হ'। তোদের সংসার সুন্দর হোক্।"

নীরব থাকা ছাড়া সহজ উপায় কি ? আমি নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু নীরব থাকে না মানসী। সে বলে, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি।"

"খুব খুশি হলাম। হরিহরজী তোদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন। কিন্তু আর দেরি নয়,

অনেক বেলা হল। এখন স্নান করতে চলে যা। ভাল করে স্নান করিস। শরীরের ব্যাথা-বেদনা সর্দি-কাশি সব সেরে যাবে। কিন্তু ঝুপ করে আবার জলে নামিস না যেন। একটু একটু করে গরম জল গায়ে সইয়ে নিস। তোরা স্নান করে আসার মধ্যে আমার রান্না হয়ে যাবে।"

আমরা কুণ্ডের তীরে আসি। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উষ্ণকুণ্ড আর কোথাও দেখি নি।

প্রায় আধঘন্টা বাদে জল থেকে উঠে এলাম। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। মন হয়ে উঠছে প্রফুল্ল। দেহের তাপ ও মনের পাপ ধুয়ে গেছে মণিকরণের অমৃতধারায়।

একটু বাদে মানসী আসে। ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়ে আমরা আশ্রমে আসি। বাসযাত্রীদের অনেকেই খেতে বসে গেছেন। আমরাও বসে পড়ি তাঁদের পাশে। সন্তজী নিজে পরিবেশন করেন—ভাত ডাল ও আচার। তাই অমৃত মনে হচ্ছে। মণিকরণ যে অমৃতময়। কলিযুগের শেষে ও সত্যযগের সূচনায় ভগবান প্রকট হবেন এই পরম-পবিত্র তীর্থে। মণিকরণ দর্শন করলে, সকল তীর্থদর্শন ফললাভ হয়।

খাবার পরে সন্তজী এক গ্লাস গরম চা হাতে দিলেন। বললেন, "আজই চলে যাচ্ছিস। অনায়াসে দু-একটা দিন থেকে যেতে পারতিস। বিছানাপত্র দিতে পারতাম। কোন অসুবিধে হত না।"

সবিনয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে সন্তজীকে প্রণাম করি। মানসী একখানি পাঁচ টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে রাখতেই তিনি বলে ওঠেন, "এ আবার কেন?"

মানসী বিনীত স্বরে বলে, "ঠাকুরসেবার জন্য বাবা, নইলে আপনার ঠাকুরসেবা চলবে কেমন করে?"

"ঠাকুর যে নিজেই তাঁর ব্যবস্থা করে নেন মা। আমাদের সাধ্য কি, তাঁর সেবা করি।"

সন্তজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা উঠে আসি রাস্তায়। এগিয়ে চলি কসোলের পথে। বিকেল পাঁচটায় ভুন্টারের বাস ছাড়বে।

তোরণের কাছে একটু দাঁড়াই। আর একবার ভাল করে দেখে নিই—মণিকর্ণিকার তীর্থমণি, নররূপী নারায়ণের নিবাস। মণিকরণকে প্রমাণ করি।

মানসীর সঙ্গে ফিরে চলি নিজেদের পথে। আমরা যে সাধারণ মানুষ। আমাদের জীবন মায়ার বাঁধনে-বাঁধা। সন্তজীর মতো নরনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সাধ্য কোথায়? তীর্থ থেকে তাই আমাদের ফিরে যেতে হয় ঘরে।

॥ পনেরো ॥

গতকালের মতো আজও সকাল সাতটায় ছাড়ল আমাদের বাস—একই বাস। এই বাসে করেই কাল গিয়েছিলাম বজৌরা আর আজ চলেছি যোগিন্দর নগর। পথে মাণ্ডিতে বাস বদল করতে হবে। মাণ্ডি থেকে এ বাসটা চলে যাবে চণ্ডীগড়। আমরা পাঠানকোটের বাস ধরে যোগিন্দর নগর যাবো।

কালকের যাওয়া আর আজকের যাওয়ার মাঝে অনেক তফাৎ। কাল আমরা বজৌরা ও মণিকরণ দেখে ফিরে এসেছিলাম কুলু। কিন্তু আজ কুলু থেকে চলে যাচ্ছি। মানসীর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়েছি যে রমণীয় শৈলাবাসে, আজ চলে যাচ্ছি তাকে ছেড়ে। সে

দিনগুলি আর আসবে না ফিরে।

কুলু থেকে যোগিন্দর নগর ৭৮ মাইল। আর মাণ্ডি ৪০ মাইল। এ বাসটা আসছে মানালী থেকে, যাবে চণ্ডীগড়। মানালী থেকে চণ্ডীগড় যাবার দুটি পথ। একটি মাণ্ডি ও তাতাপানি হয়ে। আর একটি নারকাণ্ডা হয়ে। দুটি পথ শিমলায় গিয়ে এক হয়েছে। নারকাণ্ডা থেকে যাওয়া যায় রামপুর ও কালপা। যাওয়া যায় হাতকোটি ও চারগাঁও।

"কি ভাবছ ?"

মানসীর প্রশ্নে আমার ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে যায়। বলি, "হিমাচলের কথা।"

"আমিও তো তাই শুনতে চাইছি। ভাবনাকে তাহলে ভাষায় রূপ দাও।"

হেসে বলি, "মণিমহেশ যাত্রার কথা তো বলা শেষ হয়েছে। আবার কি শুনতে চাইছ ?"

"মণিমহেশ যাত্রার কথা শেষ হলেও তোমার যাত্রাপথ তো শেষ হয় নি। তার পরে তোমরা কুগতি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে কিলার, উদয়পুর ও ত্রিলোকনাথ হয়ে কেলং গিয়েছ।"

"যাই নি।" মানসীকে বলি, 'মানে যেতে পারি নি।"

"যেতে পারো নি !" মানসী বিস্মিতা, "কেলং যাও নি ?" তবে যে সেদিন মানালীতে বললে...."

"হ্যাঁ। কেলং গিয়েছি কিন্তু কুগতি গিরিবর্ত্ম পেরোতে পারি নি। অনেক চেষ্টা করেও কুল পাই নি। বৃষ্টির ফলে বরফ পড়েছে, কেউ যাবে না। তাই বাধ্য হয়ে হাড্‌সার থেকে ফিরে আসতে হল ভারমৌর। সেখান থেকে গেহরা পর্যন্ত হেঁটে, বাসে চাম্বা। চাম্বা থেকে পাঠানকোট। তার পরে এই পথ, যে পথে আজ ফিরছি আমরা। মানালী থেকে রোতাং গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে লাহুল উপত্যকার খোকসার। সেখান থেকে জীপে কেলং।"

"বেশ তাই বল।" মানসী বলে।

আমি শুরু করি—

সকাল দশটায় মানালী থেকে রাহালার বাস ছাড়ল। পুল পেরিয়ে বিপাশার অপর তীরে এলাম। পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র ও বশিষ্ঠকুণ্ড ছাড়িয়ে বাস চলল এগিয়ে। বিপাশা বয়ে চলেছে পথের পাশে পাশে। মানালীর পর সে আরও সুন্দর, আরও উচ্ছল, আরও মুখর। নূপুর-কলিত ছন্দে সে অবিরাম চলেছে বয়ে।

হিমাচলের পুণ্যতোয়া বিপাশা। বিপাশা পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর অন্যতমা। মাণ্ডি থেকে সে নেমে গেছে জ্বালামুখীর দক্ষিণে—নাদুয়ানে। তার পরে পাঞ্জাবের সমতলভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিতা হয়ে খেমকরণের পুবে এন্দ্রিসায় শতদ্রুর সঙ্গে মিশেছে—তার ২৯০ মাইল পরিক্রমা পূর্ণ করেছে।

বিপাশা যগে যুগে দেশবিদেশে বহু নামে পরিচিতা। গ্রীকরা বলেন, হাইফাসিস অথবা হাইপানিস কিম্বা বিপাশিস। বৈদিক যুগে তাকে-বলা হত বিপাশ। বেদাঙ্গ-গ্রন্থ নিরুক্তে বলা হয়েছে উরুঞ্জিরা। ঋগ্বেদের সাতটি নদীর অন্যতমা বিপাশা। তবে সেখানে একে বলা হয়েছে আর্যকীয়। এখন সে বিয়াস নামেই পরিচিতা।

বিপাশা শব্দের অর্থ কূলবিপাতন অর্থাৎ যে নদী নিজেই নিজের কূল খনন করে, পথের বাধা দূরে সরিয়ে মুক্তধারায় পরিণত হয়।

বাসপথের বাঁয়ে বিপাশা, ডাইনে পাহাড় সামনে হিমতীর্থ হিমাচল। পাহাড়ের গায়ে নানা ধরনের রঙীনফুল—বেগুনী ফুলই বেশি। এই ফুল দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা মদ তৈরি করে।

ফুল নয়, আমি বিপাশাকেই দেখছি বারে বারে আর ভাবছি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের বর্ণনা—

'Beas cutting its way through sheer rock and forming a chasm two or three hundred feet deep.....foaming and tossing with tremendous force and impetus.'

স্যার ফ্রান্সিস মানালী থেকে পায়ে হেঁটে রাহালা গিয়েছিলেন। কিছুকাল আগেও রোতাং দর্শনার্থী ও লাহুল-স্পিতির যাত্রীদের হেঁটেই এই নয় মাইল পথ পেরোতে হত। এখন দৈনিক দুবার করে বাস যাতায়াত করে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের জীপ ও লরী সারাদিন যাওয়া-আসা করছে। জায়গা থাকলে সামান্য গোপন দক্ষিণার বিনিময়ে ঠাঁই পাওয়া যায়।

মানালী থেকে চার মাইল এসে নেহরু কুণ্ড। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বড়ই প্রিয় ছিল মানালী। সময় পেলেই তিনি দু-চারদিন কাটিয়ে যেতেন মানালীর ফরেস্ট রেস্টহাউসে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন এখানে। এই কুণ্ডের জলপান করতেন। এর জল স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।

আমাদের বাস থামে না এখানে। আঁকাবাঁকা চড়াই পথে এগিয়ে চলে।

কিছুক্ষণ বাদে ফরেস্ট মেকানাইজেশান প্রোজেক্টের নির্মীয়মাণ রোপওয়ে এবং নিউজ প্রিনট প্রোজেক্টের জন্য নির্বাচিত স্থান। অবশেষে আবার বিপাশাকে পেরিয়ে রাহালা পৌঁছই।

পাহাড়ের পাদদেশে ৮৫০০ ফুট উঁচু সংকীর্ণ একটি উপত্যকা—রাহালা। পাশেই প্রবহমানা বিপাশা। প্রায় সমস্ত সমতলভূমি জুড়েই অসংখ্য ছোটবড় নানা রংয়ের সরকারী ও বেসরকারী তাঁবু। বাসপথটি ওপার থেকে একটি ষাট ফুট লম্বা পুল পেরিয়ে এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে। বাসপথ শেষ হয়েছে কিন্তু পথ ফুরোয় নি। পাহাড়ের গা বেয়ে সংকীর্ণতর একটি পথ উঠে গেছে উপরে। পথের দুধারে গুটিকয়েক চা ও খাবারের দোকান—ওরা বলে হোটেল। পকোড়া, বেসমের মিষ্টি, রুটি তরকারি ডাল ও ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়। যে হোটেলটি আমাদের কাছে সবচেয়ে ভাল লাগল, তার নাম 'পর্বত হোটেল'। রাহালা ওদের গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা কেন্দ্র, শীতকালে ওরা চলে যাবে দু মাইল দূরে কোঠি গ্রামে। বাপ মা ও ছেলেমেয়েরা মিলে হোটেল চালাচ্ছে। মেয়ে দুটির ব্যবহার ভাল, দেখতে সুন্দরী, বয়সে যুবতী। অতএব এ হোটেলে ভিড় লেগেই আছে।

প্রথম নজরে রাহালাকে মনে হয় মেলা—তাঁবুর মেলা। তাঁবুর দোকান, তাঁবুর গুদাম, তাঁবুর অফিস। ওপারের পাহাড় ভেঙে রোতাংয়ের বাস রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ডিনামাইট ফাটছে, বুলডোজার চলছে। অদূর ভবিষ্যতে মানালী থেকে বাস যাবে লাহুল স্পিতি। সারা বছর চালু থাকবে এই পথ। শীতকালে পথকে বরফমুক্ত করার ব্যবস্থা থাকবে।

এখন মে থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই পথ চালু থাকে। প্রায় পাঁচ মাস লাহুল ও স্পিতি উপত্যকার সঙ্গে সমতলের কোন যোগাযোগ থাকে না। শুনেছি শীতকালে হেলিকপ্টারে ডাক পাঠাবার প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এ প্রস্তাব কার্যকরী হবে। তবে এখন শীতকালে কেবল বেতার মারফৎ যোগাযোগ থাকে। যাতায়াত ও মালপত্র পাঠানো গ্রীষ্মের ছ-সাত মাসের মধ্যেই সেরে নিতে হয়। শীত এসে যাচ্ছে। কাজেই রাহালা এখন কর্মব্যস্ত। শতাধিক ঘোড়া প্রতিদিন ওপরে যাচ্ছে ও আসছে। যাবার সময় মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে ও আসার সময় প্রায়ই খালি পিঠে ফিরছে। কারণ চাল থেকে শুরু করে কেরোসিনও যন্ত্রপাতি—সব কিছুর জন্যই লাহুল-স্পিতি আমাদের

মুখাপেক্ষী। সামান্য কিছু গম, রামদানা, ভুট্টা, আলু, শাকসব্জী ও বার্লি ছাড়া লাহুল-স্পিতির নিজস্ব কোন উৎপন্ন দ্রব্য নেই। সরকারী দপ্তরসমূহ তাদের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় রসদ পাঠাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করে থাকেন। তাই রাহালায় তাঁদের গুদাম আছে।

রোতাংয়ের পথে জীপ চলাচলের উপযোগী প্রশস্ত হলেও প্রস্তরাকীর্ণ চড়াই। জীপের চেয়ে ঘোড়ার পিঠে মাল পাঠানো নিরাপদ। প্রয়োজনের তুলনায় ঘোড়ার সংখ্যা কম। ফলে ঘোড়াওয়ালারা রাহালায় সবচেয়ে সচ্ছল ও ক্ষমতাসম্পন্ন।

আমরা বেলা সাড়ে এগারোটায় রাহালায় এসেছি। দুপুরের আগে রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করা উচিত। কারণ তার পরেই সেখানে তুষারপাত শুরু হয়। হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। তুষারপাতের চাইতে বিপজ্জনক এই হাওয়া। এ বছর জুলাই মাসে (১৯৬৬) কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ ঋষিগোপাল ভাটিয়া এই হাওয়ার কবলে পড়ে নিখোঁজ হয়েছেন। তিনি মে মাসের মাঝামাঝি তিব্বতী ও বর্মী কথ্যভাষাসমূহের উপর গবেষণার জন্য লাহুল ও স্পিতিতে এসেছিলেন। ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অনুসন্ধানী দল পাঠিয়েও তাঁর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

দুপুরের আগে রোতাং অতিক্রম করতে পারবো না বলে, আজ আমরা রাহালাতেই রয়ে গেছি। ভেবেছিলাম রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু টাঙাতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আর দরকার হয় নি। বাসের বন্ধু মাস্টারজীর মধ্যস্থতায় আলাপ হয়েছে নবম আর্মড্ পুলিশ ব্যাটালিয়ানের সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীপ্রীতম্ সিং ভট্টির সঙ্গে। পুলিশ বাহিনীর রসদ ও সাজসরঞ্জাম পাঠাবার জন্য রাহালাতে পুলিসের একটি গুদাম আছে।শ্রীসিং এই গুদামের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ভদ্রলোক অতিশয় অতিথিবৎসল। তিনি সানন্দে তাঁর তাঁবুতে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। তারপর তিনি নিজেই আমাদের ঘোড়া ঠিক করে দিলেন। ঘোড়াওয়ালা অগ্রিম নিয়ে চলে গেল। কথা রইল সে কাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় এসে আমাদের ঘুম ভাঙাবে।

আজ আর হাতে কোন কাজ নেই। বেরিয়ে পড়ি পথে। সুজয়া বলে, 'চলুন না একবার সেই স্নেক-কলোনী ঘুরে আসা যাক্।'

'স্নেক কলোনী?' বুঝতে পারেন না নেতা।

'হ্যাঁ,' সুজয়া বলে, 'জানেন না বুঝি, এখানে একটা সর্প-উপনিবেশ আছে।'

'আছে নয়,' আমি বলি, 'ছিল বলতে পারো।'

'কেন সাপগুলি কি নেই নাকি এখন?' সুজয়া জিজ্ঞেস করে।

'আছে কিনা জানি না, তবে অনেক দিন তাদের কথা কেউ বলে নি।' উত্তর দিই।

'ব্যাপারটা কি? একটু খুলে বলুন তো।' অসিতবাবু সুজয়ার দিকে তাকান।

সুজয়া বলে, 'পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, রাহালা থেকে মাইল আধেক দূরে, একখানি পাথরের আড়ালে একটি সর্প উপনিবেশ ছিল। সেই সাপগুলিকে স্থানীয় অধিবাসীরা দেবজ্ঞানে ভক্তি করতেন। প্রতিদিন তাঁরা তাদের দুধ-কলা খেতে দিতেন। আর আশ্চর্য! খাবার এনে সামনে রাখলেই তারা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খেয়ে নিত। খাওয়া শেষে আবার ভেতরে চলে যেত।'

'কতগুলি সাপ ছিলো?' অসিতবাবু প্রশ্ন করেন।

'সাধারণত দু-তিনটে বের হত, তবে কখনও কখনও আট-দশটি পর্যন্ত দেখা গেছে।' সুজয়া জবাব দেয়।

'কাউকে কামড়াতো না?'

'না।' আমি অসিতবাবুকে বলি, 'আর সম্ভবত এগুলি ছিল বিষহীন পাহাড়ীসাপ।'

'নদীর ওপারে অমন সুড়ঙ্গ কাটছে কেন?'

মানসীর প্রশ্নে রাহালাকে হারিয়ে ফেলি। ফিরে আসি বাস্তবে। বিপাশার তীর দিয়ে চলেছে আমাদের বাস। আমরা কুলু থেকে মাণ্ডি চলেছি। বাসে মানসীকে রোতাং গিরিবর্ত্মের কথা বলছিলাম। এখানে বিপাশা বাঁধের কাজ চলেছে। তাই দেখে মানসী প্রশ্নটা করেছে। আমি উত্তর দিই, "বিপাশা বাঁধ প্রকল্প। ৩৫০ কোটি টাকা ব্যায় হবে। এটি ভাকরার চেয়ে বড় প্রকল্প ৭০০০ লোক কাজ করেছেন। সব মিলিয়ে পাঁচটি টানেল কাটা হবে। এগুলির ব্যাস হবে ৩৫ ফুট ও মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৬,৫০০ ফুট।

"পাণ্ডো এবং পং-য়ে দুটি বাঁধ নির্মিত হচ্ছে। পং বাঁধটি হবে ৩৮০ ফুট উঁচু ও ৫৭৫০ ফুট দীর্ঘ—ভারতের বৃহত্তম মাটির বাঁধ। জলাধারটি নির্মিত হবে একশ' বর্গমাইল জায়গা জুড়ে।·কাংড়া জেলার ২৫০ টি পাহাড়ী গ্রাম তলিয়ে যাবে সেই জলে। ১৯৬২ সালে এই বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৭১ সালের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

'পাণ্ডো বাঁধটি হবে এখানে। ওপারে পাহাড় কেটে জলপথ তথা টানেল তৈরি হচ্ছে। এর ভেতর দিয়ে জল নিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত করা হবে। তার পরে বাঁধ নির্মিত হবে। পাণ্ডো বাঁধটি হবে ৩৮১ ফুট উঁচু ও ৬৩৯৭ ফুট দীর্ঘ। জলাধারটি ৬৬ লক্ষ একর ফুট জল ধারণ করতে পারবে।

"বিপাশা বাঁধ প্রকল্প প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করবে। হিমাচল হরিয়ানা পাঞ্জাব এমন কি রাজস্থানের খালে পর্যন্ত এখান থেকে জল সরবরাহ করা হবে।"

পাণ্ডো পুল পেরিয়ে আমাদের বাস মাণ্ডি শহরে প্রবেশ করল। পায়ে হেঁটে পুল পেরোতে হল আমাদের। এক কালে মাণ্ডি ছিল স্বাধীন রাজ্য। ছিল সুরম্য শৈলপুরী। রাজবাড়ি এখনও আছে, কিন্তু মাণ্ডি তার ধ্যানগম্ভীর রূপটি ফেলেছে হারিয়ে। মাণ্ডি হিমাচলের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তিন হাজার ফুট উঁচুতে একটি বিশাল জনপদ। এখান থেকে বাস যায় হিমাচলের সর্বত্র। হিমাচলের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবহন সংস্থা মাণ্ডি-কুলু রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র মাণ্ডি। মাণ্ডি এখন জনবহুল ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত।

বেলা দশটায় স্ট্যাণ্ডে এসে নিশ্চল হয়ে আমাদের বাস। কুলু থেকে মাণ্ডি ৪০মাইল। তিন ঘন্টা লেগেছে।

মালপত্র নামাবার পরে মানসী বলে, "তুমি একটু দাঁড়াও এখানে, আমি জেনে আসছি কোন বাসটা যোগিন্দর নগর যাবে আর কখন ছাড়বে।"

"বাসের খবর নিতে তুমি যাবে কেন?" আমি আপত্তি করি, "তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি জেনে আসছি।"

"কেন? পৌরুষে আঘাত লাগছে?"

"তা একটু লাগছে বৈ কি।"

"লাগুক।" মানসী বলে, "নইলে যে পৌরুষটা মরে যাবে।"

"তুমি তো তাকে মেরে ফেলতেই চাইছ।"

মানসী চট করে কোন জবাব দেয় না। কি জানি একটু ভাবে। একটু বাদে বলে, "সিভালরির যুগ যে বহু যুগ হল গত হয়েছে।"

"কথাটা আমার অজানা নয়।"

"তাহলে, আমাকে অবলা ভাবছ কেন ? তোমার সঙ্গে দেখা হবে জেনে তো আমি পথে বের হই নি সখা।"

কি বলব ? চুপ করে থাকি। মানসী এগিয়ে আসে কাছে। জিজ্ঞেস করে, "রাগ করলে ?"

"না। রাগ করব কেন ?"

"তাহলে আমি যাই, তুমি একটু দাঁড়াও এখানে। কেমন ?"

হাসিমুখেই বলি, "বেশ, যাও। তাড়াতাড়ি এসো।"

"আচ্ছা।" খুশিমনে মানসী চলে যায়।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু বাদে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায় মানসী। অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে খুঁজে পাই না। কেমন একটা অভাব বোধ করতে থাকি। অথচ জানি এ অদর্শন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু স্থায়ী অদর্শনের দিনও যে দূরাগত নয়।

মানসী ফিরে আসে। বলে, "পাশের বাসটাই যোগিন্দর নগর যাবে। আধঘন্টা বাদেই ছাড়বে। মাল চাপিয়ে দিয়ে চলো খেয়ে আসা যাক।"

বাসস্ট্যান্ডের পাশেই অনেকগুলি হোটেল ও রেস্তোরাঁ। কাজেই মন মতো খাবার খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না মানসীর। বেশ বড় হোটেল। ছোট ছোট টেবিলের দু-পাশে চারখানি করে চেয়ার। সব টেবিলেই লোক। একটা টেবিলে দুটি জায়গা রয়েছে। আমরা সেখানে এসে বসি।

বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে—ভাত, ডাল, তরকারী ও দই। মানসী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "মাছ কোথায় গেল ? মাছের কথা বলে এলাম যে।"

"নিয়ে আসছি মেমসাব।" বেয়ারা চলে যায়।

মানসী বলে, "খুব ভাল মাছ বুঝলে। অনেকদিন এমন ট্রাউট মাছ খাই নি।"

আমি ঘাড় নাড়ি। খেতে শুরু করি।

বেয়ারা মাছ নিয়ে আসে। মাছ দেখে মানসী খুশি হয়। তরকারী দিয়ে ভাত মেখে নিয়েছিল। মাখাভাত একপাশে সরিয়ে রেখে পাতের ওপরে মাছের বাটি উপুড় করে। তার পরেই বলে ওঠে, 'আরে বাবা, এত বড় মাছ! এ আমি খেতে পারব না।"

হাসি পায় আমার। বলি, "এই তো মাছের জন্য হা-হুতাশ করছিলে।"

"তা করছিলাম, কিন্তু এতবড় মাছ আমি খেতে পারব না।....তুমি অর্ধেকটা খেয়ে নাও।"

আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারার আগেই মানসী অর্ধেকটা মাছ আমার পাতে দিয়ে দেয়। আমাদের উল্টোদিকে বসে যে অবাঙালী ভদ্রলোকরা খাচ্ছেন, তাঁরা মৃদু হাসছেন। আমি বিব্রত বোধ করি মানসীর আচরণে। তবু চুপ করে থাকি।

"এই দেখো, কি করে ফেললাম।" মানসী অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, "তোমার খাওয়াটাই মাটি করে দিলাম।"

"না।" বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমাকে। "কি আর এমন করেছ ?"

"আমার এঁটো মাছ তোমার পাতে দিয়ে ফেললাম যে।" একবার থামে মানসী। তারপরে বলে, "কেন যেন মাঝে মাঝে আমার এমনি ভুল হয়ে যায়। জানো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটা আমাদের কলকাতার বাড়ির ডাইনিং টেবিল নয়। মাণ্ডির হোটেল আর

আমার পাশে তুমি। আমি বাড়িতে বাবা ও দাদাদের সঙ্গে খেতে বসে এমনি করি কিনা।"

হেসে বলি, "অভ্যেসটা ভালো নয়।"

"জানি। কিন্তু ছাড়তে পারি না।"

আমি নিঃশব্দে খেতে থাকি। মানসীও আহারে মনোনিবেশ করে।

কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ মুখ তোলে মানসী। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "আমি ব্রাহ্মণকন্যা। আমার পাতেরটা খেলে তোমার জাত যাবে না। তুমি অনায়াসে ঐ মাছটুকু খেয়ে নিতে পারো।"

"তাই তো খেয়ে নিচ্ছি।"

বেলা এগারোটায় বাস ছাড়ল। আমরা মাণ্ডি থেকে যোগিন্দর নগর চলেছি।

জনবহুল শহুরে পথ। ধীরে ধীরে বাস চলছে। বাজার ছাড়িয়ে রাজবাড়ির সামনে এসে বাস থামল। এখানেও পথের পাশে দোকানের সারি। পথটা খুবই প্রশস্ত। পথের ওপাশে প্রাসাদ—মাণ্ডির রাজপ্রাসাদ। সেকালে সামনের দিকটা কাছারী হিসেবে ব্যবহৃত হত আর পেছনের দিকে ছিল তোষাখানা অস্ত্রাগার ও মহাদেও মন্দির। কারুকার্য সমন্বিত সুন্দর ও প্রাচীন মন্দির।

মনে পড়ছে হতভাগ্য রাজা পৃথ্বীপালের কথা। প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা ছিলেন তিনি। মাণ্ডিরাজা সিধ সেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কোন কারণে দুজনের মাঝে মনোমালিন্য হয়। তবু শ্বশুর, জামাতার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলেন না। মেয়েকে একবার দেখতে পাবার লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি এলেন এখানে। এই প্রাসাদে।

কিন্তু আর যেতে পারেন নি ফিরে। বিশ্বাসঘাতক জামাতা স্নেহপ্রবণ শ্বশুরকে হত্যা করেছিলেন এই প্রশস্ত পথেরই কোনস্থানে।

দুজন যাত্রী তুলে নিয়ে বাস আবার চলল এগিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শহরের জনবহুল অংশ ছাড়িয়ে বিপাশার পাশে এলাম। বিপাশা বেশ প্রশস্ত এখানে। পথের নিচে বেলাভূমিতে অসংখ্য মন্দির। ছোট ছোট মন্দির, প্রায় একই ধরনের। তবে বেশ মজবুত এবং সুন্দর। অধিকাংশই শিব মন্দির। বাস থেকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

এখানে একটি ভারী সুন্দর জাপানী মন্দির ছিল গত বছর বিপাশার বন্যায় ভেঙে গেছে। অন্যান্য মন্দিরর অবস্থাও জরাজীর্ণ। এক যুগের জনপ্রিয় শিল্পসৃষ্টি আর এক যুগের অবহেলায় ক্ষীয়মাণ।

পুল পেরিয়ে বাস এপারে এলো। পাণ্ডোপুল থেকে এই পুল পর্যন্ত মাণ্ডি শহর। আমরা শহরের বাইরে এসেছি। এখনও বিপাশা রয়েছে পাশে। কিন্তু একটু বাদেই তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটবে। সে আমার চোখের আড়ালে চলে যাবে।

হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে, "কি ভাবছ?"

"বিপাশার কথা। যাবার পথে এখানেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা। তারপর থেকে বহুদিন সে ছিল আমার সঙ্গে। আজ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি দূরে।"

"তুমি বুঝি বিপাশাকে ভালবেসে ফেলেছো?"

"হ্যাঁ।"

"ভালবাসলেই তাকে চিরকাল কাছে ধরে রাখতে হবে, তার কি মানে আছে সখা! কথাসম্রাটের সেই কথাটি কখনই ভুলো না, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও

ঠেলিয়া ফেলে।"

কোন জবাব দিই না। মানসীও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পরে বলে, "রাহালার কথা তখন বলেছো, এবার তাহলে রোতাং আর লাহুলের কথা বলো!"

"এখন থাক। পরে বলব।"

"না। এখুনি বল।" মানসী মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে ওঠে। "তুমি বল, আমি শুনি। ফুরিয়ে যাক আমাদের পথ।"

একটু কাল চুপ করে থেকে আমি শুরু করি—

কথা ছিল পরদিন সকালে রাহালাতে ঘোড়াওয়ালা এসে ঘুম ভাঙাবে। আমাদের ঘুম ভাঙল যথাসময়ে কিন্তু কোথায় ঘোড়াওয়ালা? কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ঘোড়াওয়ালার প্রতীক্ষা করলাম। তার পরে বিরক্ত হয়ে শয্যাত্যাগ করি। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসি তাঁবুতে। না, ঘোড়াওয়ালা আসে নি। অসিতবাবু বলেন, 'চলো, চা খেয়ে আসা যাক।"

ভূতের মুখে রাম নাম। না করে উপায় কি? প্রচণ্ড শীত পড়েছে। নেশার জন্যে চায়ের প্রতি আসক্ত হন নি আমাদের নেতা, প্রাণের প্রয়োজনে চা খেতে চাইলেন। আমরা সানন্দে সঙ্গী হই।

বড় আশা নিয়ে ফিরে আসি তাঁবুতে। কিন্তু হায়, কোথায় ঘোড়াওয়ালা। তার পাত্তা নেই। আমরা নিজেরাই মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা শুরু করি। তাঁবুর বাইরে বের করি, সাজিয়ে রাখি। সে এলে যাতে আর সময় নষ্ট না হয়।

সব কাজ শেষ হয়ে যায় কিন্তু আসে না ঘোড়াওয়ালা।

প্রীতম সিং অন্য ঘোড়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয়ে বসে থাকি। বেলা বেড়ে চলে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়। সে আসে। আর এসেই আমাদের তিরস্কার করে, 'সে কী, আপনারা এখনও এখানে?'

'তুমি আসো নি....।'

'আমার আসার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কী? যখন দেখলেন আমার দেরি হচ্ছে, তখন আপনাদের রওনা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মাল আমি যেভাবেই হোক পৌঁছে দিতাম। ছি ছি! অযথা এত দেরি করে ফেললেন। মৌসুম খারাপ হয়ে গেলে আপনাদের কষ্ট হবে। যাক্‌গে। যা হবার হয়ে গেছে। আপনারা হাঁটতে শুরু করুন। আমি মাল নিয়ে আসছি।'

সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা রওনা হয়েছি রোতাংয়ের পথে। শ্রীসিং আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন পুলিশ চেক-পোস্ট্ পর্যন্ত। চেক-পোস্ট্ রাহালার সীমারেখা।

বাঁ দিকে পাহাড়। পাহাড়ের পাশ দিয়ে পাথর বোঝাই প্রশস্ত পথ ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে। আর পাহাড়ের গা দিয়ে সোজা উঠে-গেছে পাকদণ্ডী—ভেড়াওয়ালা ভেড়ার পাল নিয়ে সেই পথ বেয়ে নিচে নামছে। 'সুই সুই' করে শিস দিচ্ছে। আর তালে তালে ভেড়ার গলায় ঘন্টা বাজছে। বড় ভাল লাগছে শুনতে। আমরা কিন্তু এগিয়ে চলেছি প্রশস্ত পথে। জীপ যাতায়াতের পথ। তবে পথের চেহারা দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে এ'পথে জীপ যেতে পারে। সারা পথ জুড়েই ছোট বড় পাথর। মানুষের ভারেই সেগুলো নড়েচড়ে উঠছে। বেশ চড়াই পথ। তাহলেও এপথে জীপ চলে। সেটা পথের গৌরব নয়—জীপ ও চালকের কৃতিত্ব। অবশ্য সেই জীপে বসে থাকতে পারাও কম কৃতিত্বের নয়। তৎকালীন পাঞ্জাবের এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীধরম বীর জীপে করে একবার এই পথে কেলং রওনা

হয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাঁর জীপযাত্রা সফল হয় নি। পরে তিনি হেলিকপটার যোগে কেলং পৌঁছে শানসা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তাঁর আগে কোন রাজ্যপাল কেলং যায় নি। যাই হোক নতুন রাস্তা হয়ে গেলে আর হেলিকপটারের প্রয়োজন হবে না। পথচারিদেরও মাথার ঘাম পায়ে ফেলা চড়াই উৎরাই করে রোতাং পার হবার প্রয়োজন পড়বে না। বাসে বসেই কেলং কিংবা কাজা পৌঁছন যাবে। কষ্ট কমবে, সময় বাঁচবে কিন্তু পথের আনন্দ যাবে ফুরিয়ে। দুঃখকষ্ট আর গৌরবময় অনিশ্চয়তাই হিমালয় পথিকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

আমরা রাহালা থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছি। রাহালাকে এখান থেকে দেখাচ্ছে একখানি পটে আঁকা ছবির মতো। নানা রংয়ের তাবুগুলো যেন এক-একটি খেলাঘর। আর বিপাশা ? স্থির, অচঞ্চল, আঁকাবাঁকা একটি রুপোলী রেখা। কিন্তু এখানে এই পথের পাশে এখন বিপাশা নেই। সে যেন কোথায় গিয়েছে পালিয়ে। অথচ আমরা চলেছি তারই উৎস দর্শনে। তাই কি সে যেতে চাইছে পালিয়ে ?

বিপাশাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি তার গান। পথের পাশে বিপাশা না হয় নাইবা রইল, দূর থেকে তো তার সুর আসছে ভেসে। পালিয়ে গেলেও বিপাশা চলেছে আমাদের সঙ্গে। আমরা তার উপস্থিতি অনভব করছি। হিমালয়ের পথে চোখের চেয়ে কান বেশি অনুভূতিসম্পন্ন।

রোদ উঠেছে নীচে আর ওপরে। সোনালী রোদে ঝলমল করছে রাহালা, আর ওপরের ঐ তুষারধবল শিখরমালা। কিন্তু রোদ নেই এখানে। এখানে কেবল পাহাড়ের ঘন ছায়া।

রাহালাকে এখনও যাচ্ছে দেখা। ইতিমধ্যে সে তার ঝলমলে রূপ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আরও বেশি মায়াময়ী হয়েছে। কুয়াশার ছোঁয়া লেগেছে। পেছনের পাহাড়ের গায়ে, সবুজ বনে, সোনালী ক্ষেতে, আর রুপোলী ঝরণায়। বিরাট একখানি ক্যানভাসের ওপরে বিশ্বপ্রকৃতি অনন্ত সুন্দরের মূর্তি এঁকেছে। আমরা অনন্তকালের নীরব দর্শক—তৃপ্ত দর্শক।

প্রস্তরময় পথ। অসমতল। আঁকাবাঁকা খাড়া চড়াই। যেখানে পাথর নেই, সেখানে নরম মাটি। বৃষ্টি ও বরফ গলা জলে স্যাঁতসেঁতে। ঘোড়া ও ভেড়া চলে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। স্বভাবতই আমরা ক্লান্ত। কিন্তু পথের পাশে বসে একটু বিশ্রাম নিলেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

এদিকে আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগে বিপাশা বহুদূরে পালিয়ে গেছে। তার চলার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি না। তবে এ বিচ্ছেদ সাময়িক। তার সঙ্গে আবার হবে দেখা। জানি সে যেখানেই থাকুক, সেও চলেছে একই লক্ষ্যে। সে চলেছে তার পথে। আমরা চলেছি আমাদের পথে। চলেছি রোতাং গিরিবর্ত্মে। আমরা পদপরিক্রমার প্রয়োজনে, আর বিপাশা প্রাণধারণের প্রয়োজনে। আমরা চলেছি অনন্ত সুন্দরের কাছে, আর বিপাশা চলেছে তার জন্মদাত্রীর কাছে। রোতাং গিরিবর্ত্মের ওপরে বিয়াসরিখি—বিপাশার উৎস। আমরা যাচ্ছি সেই উৎস দর্শনে। বিপাশার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে সেখানে।

দু ঘন্টা একটানা চড়াই ভাঙার পর আমরা মারী পৌঁছলাম। রাহালা থেকে আড়াই মাইল। উচ্চতা বেশি নয়—বড় জোর হাজার বারো ফুট। কিন্তু শীতের জন্য বিখ্যাত এই জায়গাটি। কথিত আছে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংয়ের একদল সৈন্য একদিন সন্ধ্যায় লাদাখ থেকে লাহুল হয়ে এখানে এসে পৌঁছন। অন্ধকার রাত। অচেনা উৎরাই পথ। অথচ এ জায়গাটা সমতল। আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তাঁরা এখানেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাত চিরস্থায়ী নয়। সে রাতের অবসান হয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকেই আর দিনের আলো দেখতে পান নি। প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতের ফলে তাঁরা এখানেই মারা গিয়েছেন। সেই থেকেই এ জায়গাটির নাম হয়েছে মারী।

মরণস্মরণী মারী আজ জীবনসরণীতে পরিণত। রোতাং পথযাত্রীরা আজ মারীতে এসে জীবনের স্পর্শ পান। জায়গাটি শুধু সমতল নয়, অবস্থানটিও সুন্দর। রাহালা ও রোতাং থেকে দূরত্ব প্রায় সমান। তাই এখানে গড়ে উঠেছে নির্মাণ বিভাগের গুদাম ও কয়েকটি হোটেল। বড় দুটির নাম চাম্বা ও নেপালী হোটেল। আমরা চাম্বা থেকে এসেছি। কাজেই রাস্তার পাশে পিঠের বোঝা রেখে চাম্বা হোটেলে প্রবেশ করি।

মারীর পরে পথে কিছুটা সমতল। পাথরও অনেক কম। কিন্তু তাতে পথিকের কষ্ট কমে নি। নরম মাটির কর্দমাক্ত পথ। ডানদিকে তুষারাবৃত পাহাড়। বাঁদিকে পাহাড়ের গায়েও বরফের ছিঁটেফোঁটা। তবে পথে বরফ নেই। আজ নেই বলে এমন নয় যে কোনদিন থাকে না। এ বছরও সাতজন যাত্রী তুষারপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছেন এই পথেরই ওপর। আবহাওয়ারও কোন স্থিরতা নেই এ পথে।

নতুন পথ তৈরি হচ্ছে ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝেই ব্লাস্টিং হচ্ছে। কিন্তু সে অনেক দূরে। পুরনো পথেও নির্মাণ বিভাগের কর্মীরা কাজ করছে। কোন পাহাড়ী পথই চিরস্থায়ী নয়। সব সময়ে তার ওপর ধস নামছে কিংবা সে ধসে যাচ্ছে। তাই কর্মীরা সবাই কর্মরত।

কর্মীদের আকস্মিক হুঁশিয়ারিতে থামতে হল। ওরা আমাদের এগিয়ে যেতে বারণ করছে। সামনে পাথর পড়ছে ওপর থেকে। অগত্যা ওদের নির্দেশে পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। এইভাবেই স্থানীয়রা ভেড়ার পাল নিয়ে ওঠা-নামা করে। এতে পথ সংক্ষিপ্ত হয়। তবু আমরা ওপরে ওঠার সময়ে সন্তর্পণে এই পথ এড়িয়ে চলেছিলাম। খাড়া চড়াই বেয়ে ওঠা বড়ই কষ্টকর। ফলে পথ সংক্ষিপ্ত হলেও সময় বেশি লাগে। ভেবেছিলাম কেবল নামার সময় এই পথ ব্যবহার করব।

কিছুক্ষণ বাদে একটা যান্ত্রিক শব্দ কানে আসতেই নীচের দিকে তাকাই। একখানি সরকারী জীপ চলেছে আমাদের ফেলে আসা পথ দিয়ে। চলেছে বোধ করি মাইল পাঁচেক বেগে। অসম্ভব দুলছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে পাশের খাদে পড়ে যেতে পারে। ঐ দোদুল্যমান জীপে বসে থাকার চেয়ে চড়াই ভাঙা অনেক কম কষ্টকর। তবে এতক্ষণে বিশ্বাস হল যে এই দুর্গম পথে সত্যই জীপ চলতে পারে।

যারা ঘোড়সওয়ার হয়ে রোতাং পরিদর্শনে চলেছেন, তাঁদের হাল দেখেও বড় দুঃখ হচ্ছে। শরীরটাকে শক্ত করে, খাদের দিকে না তাকিয়ে, কোন রকমে ঘোড়ার গায়ের সঙ্গে লেগে আছেন। অনভ্যাসের জন্য সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। থামতে পারছেন না, নামতে পারছেন না, বসে থাকতেও পারছেন না। অথচ বসে থাকতে হচ্ছে। এর চেয়ে চড়াই ভাঙা অনেক সহজ।

আমরা চলেছি মজলিশী চালে। যেখানে ইচ্ছে বসছি, যতক্ষণ খুশি দেখছি। তারপর আবার গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি। আমাদের পথের আশেপাশে ঘাস ও কাটাবন। মাঝে মাঝে শ্যাওলাও রয়েছে। পাহাড় যেন আমাদের জন্য নরম গালিচা বিছিয়ে রেখেছে।

অবশেষে একসময় আরোহণের পালা শেষ হল। আমরা এক ফালি সমতল প্রান্তরে উপনীত হলাম। দুপাশে পাহাড়। মাঝখানে সমতল। পাহাড়ের গায়ে বরফ। প্রান্তর বরফাবৃত নয়। তবে এখানে ওখানে বরফ রয়েছে জমে। এই প্রান্তরটিই রোতাং গিরিবর্ত্ম।

বাঁদিকের পাহাড়গুলি খুবই কাছে। ডানদিকেরগুলো খানিকটা দূরে। গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে চলে গেছে দুটি পথ—একটি সেকালের, আরেকটি একালের। শেষেরটি শেষ হয় নি। কিন্তু হলে বোধ করি আর কারও এত আনন্দ হবে না এখানে দাঁড়িয়ে। পর্যটকরা মোটর করে পৌঁছবেন এখানে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখবেন, কয়েকটা ছবি নেবেন। তারপর পাশের হোটেল থেকে এক কাপ কফি বা চা খেয়ে আবার মোটরে উঠবেন। দুর্গম-পথের প্রান্তে পৌঁছবার আনন্দের আস্বাদ অজানাই রয়ে যাবে তাঁদের।

তাঁরা ইয়ংহাজব্যান্ডের সেই উক্তির সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবেন না—

'And when you are first at that height (Rohtang Pass), and when you are walking and not riding, and when you are walking through snow and not on hard ground, and when the sun is beating down on you as if it meant to penetrate right inside your aching head, and when the glare upward from the snow is almost as bad as the sun itself, and when in addition to everything else there is a piercing wind blowing and bitingly cold, you do feel sickness of some kind or other, whether it's a mountain or not.'

আজও আমাদের মাথার ওপরে মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ। চারিদিকের রুপোলী চূড়োয় চকচকে রোদ। রোদ পড়েছে রোতাংয়ের পথে, আর তার সবুজ ঘাসে, সাদা তুষারে ও কালো মাটিতে। কিন্তু রোদ নেই দূরের আকাশে। সেখানে চলেছে কুয়াশার লুকোচুরি খেলা। তবে পাহাড়গুলোকে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন তাদের গায়ে কেউ লাল রঙের আলপনা এঁকে রেখেছে। বন জঙ্গল ঝরণা পাথর ও বরফের ভিন্ন ভিন্ন রঙ। আবার সামনের ও পেছনের পাহাড়গুলোর রঙ একরকম নয়। কিন্তু কোনটিই তার নিজস্ব রঙ নয়। কুয়াশার ফিলটারে সবার রঙ পাল্‌টে গেছে। পাল্‌টায়নি কেবল রুপোলী রেখাগুলি। রেখা নয় ঝরণা। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে নিচে নেমে বিপাশায় বিলীন হচ্ছে। বহুবর্ণময় এই বিশাল বিচিত্র চিত্রের দিকে তাকিয়ে আমি সব কিছু ভুলে গেলাম। মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না। সম্বিৎ ফিরে আসে নেতার কথায়, 'চলো একটা হোটেলে ঢুকে চা খেয়ে নেয়া যাক। বিয়াস রিখি দেখে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে ওপারে, খোকসারে। দুটো বাজে। আর দেরি করা উচিত হবে না।'

চমকে উঠি। তাই তো! সবাই সাবধান করেছে—রোতাংয়ের আবহাওয়ার কোন স্থিরতা নেই। বেলা যতই পড়ে আসে, ততই তার মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু কোথায়! রোতাং তো আজ শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের বেশে বরণ করল আমাদের। তাহলেও আর দেরি করি না। এগিয়ে চলি হোটেলের দিকে।

পথের দুপাশে কয়েকখানি পাথরের ঘর। ওপরে ত্রিপলের ছাউনি। এগুলো স্থায়ী আবাস নয়, অস্থায়ী হোটেল। গ্রীষ্মকালে পদযাত্রীদের পরম প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ভবন। ১৩,০৫০ ফুট উঁচু গিরিবর্ত্মের ওপরে হোটেল। সত্যই বিচিত্র বৈকি।

সামনের হোটেলটিতে ঢুকে পড়ি। ঘরখানি বেশ বড়। একটিমাত্র ছোট দরজা। কোন জানলা নেই। ভেতরটা অন্ধকার। এক কোণে দুটি স্টোভ জ্বলছে। তারই আলোতে যা একটু-আধটু আবছা দেখাচ্ছে। রহস্যময় পরিবেশ।

ভেতরে ঢুকতেই কোমল কণ্ঠের আহ্বান ভেসে আসে, 'বৈঠ যাইয়ে।'

মা ও মেয়ে চা করছে ও পকোড়া ভাজছে। তাদেরই কেউ আমাদের আহ্বান জানালেন। চারখানি বেঞ্চি। বুঝলাম এর দুখানি চেয়ার আর দুখানি টেবিল। একখানি বেঞ্চিতে সাহেবী পোশাক পরা জনা পাঁচেক ভদ্রলোক বসে আছেন—চা-বিস্কুট খাচ্ছেন। আমরা অপর বেঞ্চিখানিতে আসন গ্রহণ করি। তার পরে চা ও পকোড়ার অর্ডার দিই।

হঠাৎ ওদিক থেকে ইংরেজীতে প্রশ্ন আসে, 'দেশলাই আছে ?'

বিস্মিত হই। দেশলাইয়ের জন্য নয়। এই উচ্চতায় এই পরিবেশে চায়ের পরে ধূমপান খুবই স্বাভাবিক। বিস্মিত হই কণ্ঠস্বরে। প্রশ্নটি নারী কণ্ঠের। রোদ থেকে এসেছি। তার ওপর পোশাক দেখে বোঝার উপায় নেই। কাজেই একটু আগে যাঁদের ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছিল, তাঁদের সবাই ভদ্রলোক নন। ভদ্রমহিলাও আছেন। ভাবলাম ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গীর জন্য দেশলাই চাইছেন। কিন্তু তাঁর দিকে তাকাতেই সব সন্দেহের অবসান হল। ভদ্রমহিলার হাতে চুরোট।

সবিনয়ে বলি, 'ম্যাডাম, ক্ষমা করবেন। দেশালাই সঙ্গে নেই, আছে ঘোড়ার পিঠে।'

'সে কি ? আপনারা স্মোক করেন না ?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনারা মাউন্টেনিয়ার্স ?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে এখানে এসেছেন কেন ?'

'একটু বেড়াতে।'

'আমি মাউন্টেনিয়ার। আমার মান মিস্ মালিনী প্যাটেল। মানালী থেকে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়েছি।'

'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনাদের সঙ্গে, বিশেষ করে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আবার কি দুর্ভাগ্য দেখুন যে সামান্য একটা দেশলাই দিয়ে পর্যন্ত আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না। তবে যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি।'

'কী ?'

'*ঐ স্টোভের আগুনে চুরোটটা ধরিয়ে নিন।*'

'বাই জোভ্ !' যেন ইউরেকার বদলে ব্যবহার করলেন শব্দ দুটো। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটাই আমাদের এতক্ষণ খেয়াল হয় নি !' ছেলেটির হাতে চুরোটটি দিয়ে মিস্ মালিনী আদেশ করেন, 'যাও ধরিয়ে নিয়ে এসো।' তার পরে তিনি নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করেন—মিস্ মালিনী আমেদাবাদের এক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বর্তমানে জনৈক অকৃতদার বন্ধুর সঙ্গে মানালীতে বাস করছেন। সহযাত্রী ভদ্রলোকও তাঁর বন্ধু। তিনি তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা নিয়ে মিস্ মানালীর সঙ্গে পাহাড়ে চলেছেন—কেলং যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আমেদাবাদের একজন ব্যবসায়ী। মেয়েটি বি. এস-সি. পাশ করে সেখানকার এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আর ছেলেটি হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে এ বছর কলেজে ঢুকেছে। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে মিস্ মালিনী বললেন, 'আমি মাউন্টেনিয়ার। হিমালয়ান এক্সপিডিশান আমার জীবন। কত ঘুরলাম, তবু মন ভরল না। আশ মিটল না।'

ইতিমধ্যে ছেলেটি চুরোট ধরিয়ে টানতে টানতে মিস্ মালিনীর সামনে এসে হাজির হয়। বিস্মিত হই ! বাপ-মায়ের সামনে ধূমপান—তাও কিনা এই বয়সে !

মিস্ মালিনী চুরোটটা হাতে নিয়ে ছেলের বাবাকে দেখিয়ে বলেন, 'আমার এই বয়-ফ্রেন্ডটি একেবারে বৈচিত্র্যহীন। কোন নেশাটেশা নেই। তাই আমি ওর ছেলেকে চুরোট ধরিয়ে দিয়েছি। এখানেই শেষ নয়। ছেলে-মেয়েরা কয়েকদিন থাকবে আমার কাছে। আমরা আজ খোকসার যাচ্ছি, কাল কেলং যাব। সেখানকার ডেপুটি কমিশনার আমার বন্ধু। তাই কয়েকদিন থাকব। আর সেই ফাঁকে ছেলে-মেয়েকে চুরোট আর ড্রিঙ্কস্ ধরিয়ে দেব।' হা হা করে হাসতে থাকেন মিস্ মালিনী। মা-বাবার সঙ্গে ছেলেও হাসিতে যোগ দেয়। মেয়েটিও মুচকি হাসে। অতএব আমাদেরও হাসতে হয়।

মিস্ মালিনীর বয়স বোধ করি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু কেশবিন্যাস ও কসমেটিক্‌সের পর্যাপ্ত ব্যবহারের মধ্যে বয়স কমাবার একটা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে তিনি খুব বেশি সফল হন নি। যৌবনকে বাঁধতে পারেন নি। কিন্তু যৌবনের যাতনাটুকু রয়ে গেছে। চুরোট আর ড্রিঙ্কসের প্রতি আকর্ষণ সেই যাতনারই বহিঃপ্রকাশ। হয়তো বা এই পর্বতপ্রীতিও।

চুরোটপ্রীতি যে কারণেই হয়ে থাক, মিস মালিনীর চুরোটপান পর্বটি বেশ রসিয়ে উপভোগ করেছিলাম আমরা। সে কি টান! ইন্দ্রনাথের (শ্রীকান্ত) সেই একটানে সিগারেট শেষ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তবে দুর্ভাগ্য আমাদের, বেশিক্ষণ উপভোগ করার সুযোগ পেলাম না। আমাদের চা শেষ হবার আগেই মালিনী উঠে দাঁড়ালেন, 'বাই বাই' বলে সদলবলে বেরিয়ে গেলেন হোটেল থেকে। আমরা হাতজোড় করে নমস্কার করি। দুর্ভাগ্য আমাদের, তিনি তা দেখতে পেলেন না।

বাইরে তিনটি ঘোড়া অপেক্ষা করছিল। স্বামী, স্ত্রী ও মেয়ে অশ্বারূঢ়া হলেন। ছেলেটির সঙ্গে মিস্ চললেন পদব্রজে—তিনি মাউন্টেনিয়ার।

ওদের সঙ্গে লাহুলে আবার আমাদের দেখা হয়েছিল। দিন দুয়েক আমরা একসঙ্গে ছিলাম। ফলে মিস্ মালিনীকে আরও গভীর ভাবে জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। কিন্তু সেই বিচিত্র কাহিনী আজ নয়। আজ কেবল রোতাং-য়ের কথা বলি। আর সেই সঙ্গে সংক্ষেপে বলে রাখি রোতাং গিরিবর্ত্মের পরপারে লাহুল ও স্পিতি পথের কথা।

রাহালা থেকে রোতাং পাঁচ মাইল। গিরিবর্ত্মটি প্রায় আড়াই মাইল দীর্ঘ। আর গিরিবর্ত্মের অপর প্রান্ত থেকে খোকসার ছ মাইল। অর্থাৎ লাহুল-স্পিতি পর্যটকদের কেবল এই সাড়ে তেরোমাইল দুর্গম পথ হাঁটতে হয়।*

বর্তমানে লাহুল ও স্পিতি উপত্যকায় ভ্রমণ অনেক সহজ হয়ে গেছে। রোতাং পেরিয়ে ওপারে গেলেই চন্দ্রা নদীর তীরে গ্রামফু গ্রাম।সেখান থেকে একটি মোটর পথ গেছে খোকসার হয়ে কেলং। আরেকটি গেছে চাতরু, বাতাল, লোসার, হানসে, কিওতো, লাতারচনা, কিবার ও কিয়ে হয়ে রংরিখ। এই পথে পড়ে কুমজুম গিরিবর্ত্ম। ১৫,৩০০ ফুট উঁচু এই গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে জীপ চলে। সকালে খোকসার থেকে যে জীপ ছাড়ে তা নব্বই মাইল দুর্গম পাহাড়ী পথ পেরিয়ে সন্ধ্যার সময় রংরিখ পৌঁছয়। সেখানে কোন হোটেল বা সরাই নেই। কাজেই যাত্রীদের সঙ্গে তাঁবু থাকা দরকার। রংরিখ থেকে স্পিতি মহকুমার সদর কাজা প্রায় পাঁচ মাইল। অদূর ভবিষ্যতে এই পথেও জীপ চলবে।

---

* এখন আর পায়ে হাঁটার দরকার হয় না। মানালী থেকে বাসযোগে রোতাং পেরিয়ে লাহুল-স্পিতির সদর কেলং ও কাজা পৌঁছন যায়।

গ্রামফু থেকে চন্দ্রার তীর দিয়ে খোকসার মাইল দুয়েক পথ। খোকসার লাহুল-স্পিতি উপত্যকার প্রধান বাস স্টেশন। উচ্চতা ১০,৮০০ ফুট। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বোধ করি অবস্থানের জন্যই এমন হয়েছে। ঠাণ্ডার কথা বাদ দিলে খোকসার একটি চমৎকার উপত্যকা। রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। নীচে বয়ে যাচ্ছে চন্দ্রা, ওপরে তিনদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা। মাঝখানে একটি সংকীর্ণ উপত্যকা। আছে দুখানি ঘর নিয়ে ডাকবাংলো, নির্মাণ বিভাগ ও মাণ্ডিকুলু রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অফিস। আর আছে দুটি হোটেল ও একটি ডাকবাক্স। কোন ডাকঘর নেই। উপত্যকার শেষে চন্দ্রার ওপরে লোহার পুল। পুলের গোড়ায় পুলিস পাহারা। নদীর ওপারে উঁচু জমিতে কয়েকখানি বাড়িঘর।

খোকসার থেকে কেলং ৪০ মাইল। বাসে ঘন্টাচারেক সময় লাগে। চন্দ্রা ও ভাগা নদীর তীর দিয়ে পথ। পথে পড়ে শিশু গোন্দলা ও তাণ্ডি। কেলং লাহুল উপত্যকার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। উচ্চতা সাড়ে দশ হাজার ফুট। কিন্তু অবস্থানের জন্য এটি উপত্যকার উষ্ণতম স্থান। তাই এখানেই সদর করা হয়েছে।

চায়ের দাম মিটিয়ে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে আসি। ভেতরে বসে টের পাই নি। বাইরে আসতেই বুঝতে পারি, যাঁরা দুপুরের আগে রোতাং পেরোবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরা মিথে বলেন নি। ইতিমধ্যে রোতাং রূপ পাল্টেছে। স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। নীলাকাশ অদৃশ্য হয়েছে। অদৃশ্য হয়েছে সেই সুন্দর ছবিখানি। কে যেন চারিদিকের সব কিছু সাদা চাদরে ঢেকে দিয়েছে। দূরের পাহাড় তো দূরের কথা, কাছের পাহাড়গুলি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে কুয়াশা আর তুষারপাতের আড়ালে।

হ্যাঁ। তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। এতক্ষণ ছিল শিলাবৃষ্টির মত। এখন যেন পেঁজা তুলো। আর সেই সঙ্গে বইছে হাওয়া।

বিশ্বের বহু বিখ্যাত পর্বতারোহী অতিক্রম করেছেন এই গিরিবর্ত্ম। এঁদের মধ্যে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড ও মেজর জেনারেল ব্রুসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্যার ফ্রান্সিস রোতাং ও লাহুল সম্পর্কে বলেছেন—'a fairly level stretch. Ahead was wide expanse of dazzling snow and above this, straight in front of me....was a jagged line of rock and spiky peaks.'

জেনারেল ব্রুস ১৯১২ সালের ৩রা জুন এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তার পরে বহুকাল কেটে গেছে। মানুষ রোতাংয়ের প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছে। কিন্তু তাতে তার সৌন্দর্য আর স্বভাব পালটায় নি। আজও সে তেমনি সুন্দর, আজও সে তেমনি ভয়ঙ্কর।

তবে আমাদের জনৈক লাহুলী সঙ্গী জানালেন—এ হাওয়া সে হাওয়া নয়। কাজেই আমরা নিশ্চিন্তে অগ্রসর হতে পারি বিপাশার উৎস বিয়াস কুণ্ড বা বিয়াসরিখির দিকে।

ডানদিকে একটু উঁচুতে বিয়াসরিখি। গিরিবর্ত্মের উচ্চতম স্থান। সেখানে পাথর বাঁধানো ছোট একটি কুণ্ড ও একটি পাথরের মন্দির আছে। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের সৈন্যদল কুলু উপত্যকা অধিকার করার পরে, সেনাপতি লেহনা সিং এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। তিনি খানিকটা নীচে আরও একটি কুটির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু বহুকাল হল সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

উৎস হিসেবে এটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এর চাইতে অনেক বৈচিত্র্যময় উৎস দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। তবু আমরা চলেছি। চলেছি বিপাশাকে আরেকবার দেখব বলে।

বিপাশার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা শরতের এক স্বপ্নভরা সন্ধ্যায়। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী

পথের পাশে পাশে কখন যে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করেছিল, তা ঠিক টের পাই নি। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়েছিলাম মাণ্ডির একটু আগে। দেখা হওয়া মাত্র—সে আমার সকল অবসাদের অবসান করল। আমার হৃদয় ও মন শান্ত হল। আমি কেবল তার দিকে চেয়ে রইলাম। চেয়ে চেয়ে দেখলাম তার মন-মাতানো রূপ। আর কান পেতে শুনলাম তার হৃদয়জুড়ানো গান। তার যৌবন-চঞ্চল নৃত্যের ঝঙ্কারে আমি অপ্সরীদের স্পর্শ পেলাম।

সেই বিপাশার পাশে পাশে পথ চলেছি এতদিন, আজ তার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করব না? তার শুভেচ্ছা নিয়ে যাব না?

॥ ষোলো ॥

যোগিন্দর নগর বাসস্ট্যাণ্ডে এসে থামল আমাদের বাস। এটি শহরের সব চেয়ে জনবহুল অঞ্চল। সামনেই বাজার ও রেলস্টেশন। পথের দু-পাশে সারি সারি দোকান আর হোটেল।

মালপত্র নামিয়ে আমরা একটা চায়ের দোকানে এলাম। দোকানদার রাজি হলেন মালপত্র রাখতে। চা খেয়ে নিয়ে দোকানের বাইরে এলাম। মানসী জিজ্ঞেস করে, "এখন কোথায় যাবে?"

"উল হাইডেল পাওয়ার স্টেশনে, হলেজওয়েতে চড়ার অনুমতি সংগ্রহ করতে। আড়াইটে বেজে গেছে, পাঁচটায় অফিস বন্ধ হয়ে যাবে।"

"ডাকবাংলোয় কখন যাবো?"

"ফেরার পথে।"

তাড়াতাড়ি পা চালাই। বাসস্ট্যান্ড থেকে পাওয়ার স্টেশন প্রায় এক মাইল। পথের দুপাশে দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর। তার পরে ফাঁকা মাঠ। মাঠের শেষে বাস-রাস্তার ডাইনে পাওয়ার স্টেশনের প্রাইভেট রোড। সেই রাস্তায় খানিকটা এসে গেট। বন্দুকধারী প্রহরী পরিচয় জিজ্ঞেস করে। সব বলার পরে ক্যামেরাটি জমা নিয়ে ভেতরে যাবার অনুমতি দেয়। এটি সংরক্ষিত এলাকা—ছবি তোলা নিষেধ।

একটু এগিয়েই পাওয়ার স্টেশনের বিরাট বাড়ি। ভেতরে জেনারেটার চলেছে। গুমগুম শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত। বাঁধানো পথের নিচ দিয়ে জল গিয়ে পড়ছে পাশের খালে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরে যোগিন্দর নগরবাসীদের তৃষ্ণা নিবারণ করছে। এই জলের উৎস দর্শনে যাবো আমরা।

এশিয়ার মধ্যে একক বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এটি। এই কেন্দ্রের মালিক পাঞ্জাব সরকার। কিন্তু যোগিন্দর নগর হিমাচল প্রদেশে।

আমরা অফিসে এলাম। জনৈক কর্মচারী একজন ভদ্রলোককে দেখিয়ে হিন্দীতে বললেন, "ওঁর কাছে যান, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

তাঁর কাছে এসে নমস্কার করি। তিনি প্রতিনমস্কার করে বসতে বলেন। আমরা বসি। উদ্দেশ্য বলি। ইংরেজীতেই কথাবার্তা হয়।

ভদ্রলোক স্ট্যাম্প লাগানো একখানি কাগজ দিয়ে বলেন, "দেড়টা টাকা দিন আর এই বণ্ডটা সই করুন।"

কাগজখানিতে লেখা আছে—ট্রলিতে আরোহণ কালে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, তার জন্য

কর্তৃপক্ষ দায়ী হবেন না।

ভদ্রলোক আবার বলেন, "আজ পর্যন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি, তবু আমরা এ বণ্ডটা সই করিয়ে নিই। ট্রলি চড়ার জন্য কোন ভাড়া নিই না। কারণ ট্রলি তো আমাদের কাজে রোজই যাতায়াত করছে। কেবল এই বণ্ডের স্ট্যাম্প খরচ বাবদ জনপ্রতি দেড় টাকা দিতে হয়।"

তিনটে টাকা তাঁর হাতে দিয়ে বলি, "আর একখানি ফর্ম দিন, আমরা দুজন।"

ভদ্রলোক একটু হাসেন। দেড়টা টাকা আমাকে ফেরৎ দিয়ে মানসীকে দেখিয়ে বলেন, "ওঁর আলাদা বণ্ড লাগবে না।"

"কেন?" বিস্মিত হই।

"স্বামী সঙ্গে থাকলে স্ত্রীকে কোন বণ্ড দিতে হয় না। আপনার নাম সই করে পাশে শুধু লিখে দিন—উইথ ওয়াইফ।"

মানসীর দিকে তাকাই।

মানসী শান্ত স্বরে বাংলায় বলে, "আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? যা বলছেন ভদ্রলোক, তাই লিখে দাও।"

পারমিট নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আসি। পারমিটটা বুক পকেটে রাখি। বুকের ভেতরটা যেন খচখচ করে ওঠে। ওটায় লেখা আছে—মিস্টার এ্যান্ড মিসেস....।

গেটের সামনে এসে ক্যামেরা ফেরৎ নিই। তারপরে নিঃশব্দে পথ চলতে থাকি। একটু বাদে মানসী বলে ওঠে, "একবারে যে মৌনীবাবা হয়ে উঠলে।"

"না।" একটা ঢোঁক গিলে জবাব দিই, "এমনি চুপ করে আছি। বল কি বলবে?"

"দেখো সখা...." মানসী থামে।

আমি মানসীর দিকে তাকাই।

মানসী বলে, "তুমি আমার থেকে বয়সে বড়, বিদ্যা বুদ্ধিতেও বড়। জীবনের অভিজ্ঞতাও তোমার অনেক বেশি। তবু তুমি ভুলে বসে আছো, অবস্থার বিপাকে পড়ে মানুষকে অনেক সময় এমন মিথ্যাকে মেনে নিতে হয়। এ মেনে নেওয়া নেহাৎই সাময়িক। সে সময়টুকু ফুরিয়ে গেলে মিথ্যা আবার মিথ্যাতেই পর্যবসিত হয়ে যায়। কারণ মিথ্যা কখনও সত্য হয় না।"

সত্যাই তো। মানসী মেয়ে হয়ে মিথ্যেকে মেনে নিতে পারছে আর আমি কিনা অযথা এতো অস্থির হয়ে পড়েছি। মনের সব দ্বিধাকে মুছে ফেলে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করি। বলি, "এখন তাহলে কোথায় চলেছো,"

"তুমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছ।"

"যদি বলি জাহান্নামে?"

"তাই যাবো।"

হেসে বলি, "আমরা এখন ডাকবাংলোয় চলেছি।"

"বেশ তো, চলো।"

বাস-রাস্তা থেকে ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে চলি। হাইস্কুল ছাড়িয়ে ডাকবাংলো। সুন্দর পরিবেশ। গাছে ছাওয়া চমৎকার একতলা বাড়ি। সামনে বাগান। মানসী খুশি হয়।

কিন্তু মালী জানায়—দিন দুয়েক বাদে জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসছেন। তাই ডাকবাংলো পরিষ্কার করা হচ্ছে। ঘর পাওয়া যাবে না।

বললাম—আমরা তো তাঁর আসার আগেই চলে যাচ্ছি। অনেক বোঝালাম মালীকে। কিন্তু সে অবুঝ। কি করবে বেচারা—মন্ত্রী মহোদয় আসছেন।

ঘর পেলাম না। কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান বস্তু পেলাম মালীর কাছে। চিঠি—মানসীর বাবার চিঠি। মানালীর ট্যুরিস্ট্ অফিসার এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ব্যস্ত হয়ে চিঠিটা খোলে মানসী। পড়া শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "বাবার শরীরটা একটু ভালো। বাবা লিখেছে—তাড়াহুড়া করে ফিরে যাবার দরকার নেই। লাহুল না যাবার জন্যে মন্দ বলেছেন।"

"আমরা তাহলে ফেরার পথে বৈজনাথ, কাংড়া, জ্বালামুখী ও ধরমশালা দেখে পাঠানকোট যাচ্ছি।"

"না সখা, বাবা যতই বলুক আমার আর ভাল লাগছে না। কেন জানি না, আমার বড্ড বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি রাগ ক'রো না। আবার আমরা আসবো হিমাচলে। এখন যা অ-দেখা রইল, তা তখন দেখব।"

"বেশ তাই হবে।"

ডাকবাংলোর বাগান পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসি। কিন্তু বড় রাস্তা দিয়ে না হেঁটে চৌকিদারের দেখিয়ে দেওয়া সংক্ষিপ্ত পথে এগিয়ে চলি।মানসী বলে, "তাড়াতাড়ি চলো, সন্ধ্যে হয়ে এলো। রাতের একটা আশ্রয় দরকার।"

হাইস্কুলের পাশ দিয়ে, বাড়ি ঘরের ভেতর দিয়ে, বাসস্ট্যান্ডে নেমে আসি। চায়ের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করি হোটেলের কথা। সামনের বড় বাড়িটা দেখিয়ে দেয় সে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসি। ম্যানেজার সহাস্যে জানান, "ঘর পাওয়া যাবে বৈ কি—ওয়েল ফারনিসড রুম, উইথ এ্যাটাচ্‌ড বাথ।"

বেয়ারা আমাদের একখানি মাঝারি আকারের ঘর নিয়ে আসে। কিন্তু এ তো ডাব্‌ল-বেডরুম। একসঙ্গে জোড়া দেওয়া দুখানি গদিআঁটা খাট। এরকম ঘর তো চাই নি, পাশাপাশি দুখানি সিঙ্গল-বেডরুম চাই। বেয়ারাকে বলি, "সিঙ্গল-বেডরুম নেই?"

"আছে। কিন্তু তাতে তো দুজন থাকতে পারবেন না।"

বিরক্তিকর। এক কথা জিজ্ঞেস করতে আর এক কথা বলছে। উষ্ণ স্বরে বলি, "দুখানি সিঙ্গল-বেডরুম খালি আছে কিনা, তাই বলো। না থাকলে আমাদের অন্য হোটেলে যেতে হবে।"

বেয়ারা কোন জবাব দিতে পারার আগেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে মানসী বাংলায় বলে ওঠে, "তোমার আজ কি হয়েছে বল তো?"

"কেন?" আমি মানসীর প্রশ্নে বিস্মিত হই।

মানসী আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হিন্দীতে বেয়ারাকে বলে, "ঐ চায়ের দোকানে আমাদের মালপত্র রয়েছে। একটা কুলি ডেকে সব নিয়ে এসো এখানে। তার পরে চা দাও। আমরা এই ঘরেই থাকব। বেশ ভাল ঘর।"

বেয়ারা চলে যায়। মানসী গিয়ে একখানি চেয়ারে বসে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। মানসী আমার দিকে তাকায়। বলে, "এক সঙ্গে এসে যদি আলাদা ঘরে থাকি, তাহলে এরা কি ভাববে বল তো। ছোট শহর, আমরা প্রবাসী। স্বামী-স্ত্রী বলে হলেজওয়ের পারমিট করিয়েছো। জানাজানি হলে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হবে।"

"তাই বলে আমরা এক ঘরে রাত কাটাবো!"

"একঘরে তো আমরা রাত কাটিয়েছি সখা। কেবল এক ঘরে কেন, এক বিছানায় রাত কেটেছে আমাদের।"

"কিন্তু সে ঘরে অন্য লোক ছিল, একা ছিলাম না।"

"এ ঘরেও তো একা থাকব না, দুজনে থাকব।"

"তাতেই আমার আপত্তি মানসী।"

"আপত্তিটা কি তোমার চেয়ে আমার বেশি হওয়া উচিত নয় ?"

"তোমার কথা ভেবেই আমি আপত্তি করছি।"

"আপত্তি করার কিছু নেই, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি আমার সখা।"

"কিন্তু আমি যদি সে বিশ্বাসের মর্যাদা না রাখতে পারি ? যদি দুর্বল হয়ে পড়ি ?"

"নিজের ওপর তোমার এতো আস্থার অভাব কেন ?" মানসী একবার থামে, তার পরে বলে, "আর যদি একান্তই নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে থাকো, তোমার মানসীর ওপর নির্ভর করো, সে তোমাকে সব দুর্বলতার হাত থেকে রক্ষা করবে। আমি তো কেবল মানসী নই, আমি প্রকৃতি—পুরুষের পরম-আশ্রয়।"

মানসীর দিকে তাকাই। সে-ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মানসী আমার কতো কাছে। তবু যেন মনে হয় সে দাঁড়িয়ে আছে দূরে, বহুদূরে,—আকাশের সীমা ছাড়িয়ে, লক্ষ তারার মাঝে।

"চুপ করে রইলে কেন ?" মানসী জিজ্ঞেস করে। সে আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে। আমার চোখের ওপরে চোখ রেখে বলে, "তুমি না কথার মালাকার, ভাবের তন্ত্রধারক, চরিত্রের চিত্রকর, আদর্শের স্রষ্টা—তোমার তো এমন দুর্বল হওয়া সাজে না।"

"চমৎকার", আমি বলে উঠি, "তোমার কাছে আমি যা আশা করেছি, তুমি তার থেকে অনেক—অনেক বেশি দিতে পারো মানসী।"

কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু পারল না বলতে। মাল-পত্র নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল। মানসী আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। মালপত্র গোছাতে লেগে গেল। একদিনের জন্য হলেও সংসার তো বটে। আমরা আজ নতুন ঘর-সংসার পাতছি যোগিন্দর নগরে।

গোছগাছ শেষ করে মানসী বেয়ারাকে চা আনতে বলল। হাত-মুখ ধুয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। প্রসাধন শুরু করে। আমি প্রতীক্ষা করি। যদি সে না-বলা কথাটি বলে। কিন্তু আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়। কোন কথা বলে না মানসী। সে নীরবে প্রসাধন করতে থাকে।

বেয়ারা চা নিয়ে আসে। চা খাওয়ার পরে মানসী বলে, "পোশাকটা পালটে নাও। চলো, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

ঠিকই বলেছে মানসী। বাইরে বেরুলে ভালই হবে। শত মানুষের মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলব। মনের শাসন থেকে সাময়িক মুক্তি পাবো। উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "বেড়াতে যাচ্ছি কিন্তু আবার পোশাক পালটাবার দরকার কি ?"

"দরকার এই কারণে যে এটা খোকসার নয়, যোগিন্দর নগর।" একবার থামে মানসী তার পরে বলে, "তুমি আগে বেরিয়ে যাও। সামনের ঐ সেলুনটায় দাড়ি কেটে নাও। আমি আসছি।"

প্রতিবাদ করে লাভ নেই। খেয়াল যখন হয়েছে—আমাকে পোশাক পালটে দাড়ি

কামিয়ে নিতেই হবে।

সেলুন থেকে বেরিয়ে দেখি মানসী দাঁড়িয়ে আছে পথে। সুন্দর একখানি শাড়ি পরেছে। কপালে কুমকুমের টিপ। খোঁপায় বেলফুলের মালা—বোধহয় সামনের বাজার থেকে কিনে এনেছে। এমন বেশে ওকে আর কখনও দেখি নি। ভারী সুন্দর লাগছে। কিন্তু আজ কেন ওর এতো সাজগোছ ?

আমার কাছে এসে হেসে মানসী বলে, "এই তো কেমন চেহারা ফিরে গেছে। এবারে কে বলবে পাহাড়ী সাহেব !"

"কেউ বলেছিল নাকি ? শুনি নি তো।" হেসে বলি।

"তোমাকে শুনিয়ে বলবে নাকি ?"

"তোমার কানে কানে বলেছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।" মানসী বলে, "বাজে কথা না বাড়িয়ে এবার চলো দেখি।"

"কোথায় ?"

"মন্দিরে।"

বাস-স্ট্যান্ড থেকে যে কাঁচা পথটি স্টেশনে গেছে, সেই পথের ওপরেই মন্দির—পথের ডানদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে। সঙ্গে একটি ধর্মশালাও রয়েছে। মন্দিরদ্বারে একখানি প্রস্তরফলকে লেখা—

'This Hall and the back portion has, on the inspiration of his dharmapatni Shrimati Parbati, been erected by Pt. Hulasa Ramji Rais, Mandi State.'

ভেতরে ঢুকেই বাঁধানো অঙ্গন। তিনদিকে সারি সারি ঘর। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। এর কয়েকখানি ঘরে মন্দিরের লোকজন বাস করেন। বাকি ঘরগুলি যাত্রীনিবাস।

আঙ্গিনার পরে নাটমন্দির—বেশ বড়। চারিদিকের দেওয়ালে গীতার শ্লোক লেখা।

নাটমন্দিরের পরে গর্ভমন্দির। মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি। কালো পাথরের কৃষ্ণ ও শ্বেত পাথরের রাধা। ভারী সুন্দর মূর্তি। আমরা সশ্রদ্ধ অন্তরে প্রণাম করি। মানসী ব্যাগ থেকে একটি টাকা বের করে প্রণামীর বাক্সে দেয়।

পুজারী আমাদের হাতে আশীর্বাদী ফুল ও চরণামৃত দেন। তার পরে সিঁদুরের থালা এনে আমার ললাটে তিলক কেটে দিয়ে বলেন, "মার সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দিন বাবুজী।"

চমকে উঠি, এ কি বলছেন পূজারী ! আমি ইতস্ততঃ করতে থাকি।

পূজারী তাগাদা দেন, "নিন বাবুজী, রাধা-কৃষ্ণের আশীর্বাদী সিঁদুর। আপনাদের সংসার সুখের হবে, সম্পর্ক মধুর হবে।"

হাত বাড়াতে গিয়েও বাড়াতে পারি না। আর তখনই কাণ্ডটা করে বসে মানসী। থালা থেকে খানিকটা সিঁদুর নিয়ে নিজের সিঁথিতে মাখায়। পূজারী হাসেন, আমাকে একটু হাসতে হয়।

মানসী কোন কথা বলে না। সে পূজারীকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। স্টেশনের দিকে চলতে থাকে। আমি ওর কাছে এসে বলি, "কেন এমন করলে ?"

একটু হাসে মানসী, যেন কিছুই হয় নি। স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করে, "কি আবার করলাম ?"

কুমারী মেয়েদের সিঁদর পরতে নেই।

সিঁদুর আমার কাছে খানিকটা লাল রঙ ছাড়া আর কিছু নয়। এ রঙ আমার মনে কোনও রঙ ধরাতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।" মানসী হাসে।

আমি আর কিছু বলতে পারি না। চুপ করে থাকি।

মানসী আবার বলে, "আজ আমি যা করেছি, নেহাৎই অবস্থার বিপাকে পড়ে করেছি। নিজের বিবেকের কাছে আমি কোন অন্যায় করি নি। সংসারে বাস করতে হলে এমন একটু-আধটু অভিনয় করতেই হয়। এতে এতো বিচলিত হবার কি আছে!"

"বিচলিত আমি হই নি মানসী।"

"তাহলে কথা বলছ না কেন?"

"কি বলব?"

"যা ইচ্ছে।"

আমরা সিঁড়ি বেয়ে স্টেশনে উঠে আসি। ছোট স্টেশন। ১৯৫৪ সালের ১৫ই এপ্রিল তৎকালীন রেল ও পরিবহন দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বর্গত লালবাহাদর শাস্ত্রী এই রেলস্টেশনের উদ্বোধন করেন। মহান ভারতের মহত্তম প্রধানমন্ত্রীর অক্ষয় স্মৃতির সঙ্গে এই ক্ষুদ্র রেলস্টেশন অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে।

মানসী বলে, "জিজ্ঞেস কর না রিজার্ভেশান পাওয়া যায় কিনা?"

"কোথাকার রিজার্ভেশান?"

"পাঠানকোট থেকে কলকাতার। পরশুদিন বিকেলে আমরা পাঠানকোট পৌঁছচ্ছি। সেদিনই রাতের ট্রেনে একটা বার্থ পেলে বড় ভাল হত।"

"তুমি কি সেদিনই চলে যেতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবা তো ভাল আছেন। পাঠানকোটে দু-তিনটে দিন দেরি করলে হত না?"

"কেন?"

"ইতিমধ্যে অসিতবাবুরা এসে যেতেন। এক সঙ্গে কলকাতায় ফিরতাম আমরা।"

"না সখা, তা হয় না।"

"কেন?"

"আমি চাইনে তোমার কোন দুর্নাম হোক। তা ছাড়া কেন জানি না, আমার বড্ড বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। দ্যাখো না একটু চেষ্টা করে, যদি পাঠানকোটে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে একটা বার্থ রিজার্ভ করার কোন ব্যবস্থা করতে পারো?" মানসী অনুনয় করে।

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা একটা হয়ে যায়। আমরা ফিরে চলি হোটেলে। মনটা ভাল লাগছে না। মানসী চলে যাবে। এ-ই নিয়ম। সংসারে কেউ কারও পাশে চিরকাল থাকে না। তবু যাওয়ার সময় মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে। রিজার্ভেশান করার পরে মানসীর চলে যাওয়ার চিন্তাটা আমার কাছে যেন বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

হোটেলের ডাইনিং-হল থেকে খেয়ে নিয়ে ঘরে চলি আমরা। কিন্তু মানসী আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। বলে, "তুমি একটু বারান্দায় দাঁড়াও, আমি শাড়িটা পালটে নিই।"

বারান্দার রেলিং-য়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই। নিচে আলো-ঝলমল রাজপথ। কতো মানুষ যাওয়া-আসা করছে। ওদের মাঝে কেউ কি আমার মতো আছে! ওরা কি কেউ আমার মতো হিমালয়ের পথে কোন মানসীকে পেয়েছে কুড়িয়ে? ওরা কি কেউ আমার মতো এমনি কোন হোটেলে নিঃসম্পর্কীয়া নারীর সঙ্গে এক ঘরে রাত্রিবাস করেছে?

"ভেতরে এসো। আমার হয়ে গেছে।"

মানসী দুয়ার খুলেছে। আমাকে ডাকছে। আমি ভেতরে আসি। দরজাটা খোলাই থাকে।

মানসী বাথরুমে চলে যায়। খাট দুখানির দিকে নজর পড়ে আমার। জোড়াখাট। দেখে মনে হচ্ছে যেন একখানি। এই নিয়ম। ডাব্‌ল-বেডরুম। স্বামী-স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট। আমাদেরও তাই পরিচয়।

আর ভাবতে পারি না। তাড়াতাড়ি সামনের খাটখানিকে দরজার দিকে খানিকটা টেনে নিয়ে আসি। শব্দ হয়। মানসী নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে। পাক্ গে। কিন্তু বেশিদূর টানা যায় না। আর টানলে দোর বন্ধ করা যাবে না। ফুট খানেক ব্যবধান রচিত হয়েছে দুখানির মাঝে।

মানসী ঘরে আসে। একবার তাকিয়ে দেখে। না জানি কি বলবে এখুনি। আমি উত্তরের জন্য প্রস্তুত হই।

কিন্তু না, মানসী কিছুই বলে না। সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে। একমনে চুল বাঁধতে থাকে।

শার্টটা খুলে আলনায় রাখি। পায়জামা ও গামছা নিয়ে বাথরুমের দরজা খুলি।

"সেল্‌ফের ওপরে সাবান আছে।" মানসী বলে।

"আচ্ছা।" বলে দরজা বন্ধ করে দিই।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিস্মিত হই। ভেবেছিলাম দুখানি খাটের মাঝে যে ব্যবধান রচনা করেছি তা ঘুচে যাবে। আমার সশব্দ ব্যবধান মানসী নিঃশব্দে ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু তা করে নি মানসী। সে চুপ করে বসে আছে।

"এবারে শুয়ে পড়া যাক। কাল আবার সকালে উঠতে হবে।" মানসী গিয়ে শুয়ে পড়ে।

আমি বসে থাকি। একটু বাদে মানসী আবার বলে, "দরজাটা কি সারারাত খোলাই থাকবে?"

"কোন আপত্তি আছে কি?"

"নিশ্চয়ই। তুমি না হয় মুসাফির মানুষ। বড় জোর এয়ার ম্যাট্রেস আর স্লীপিং ব্যাগটা যাবে। কিন্তু আমার বাপু গয়না-গাঁটি আছে ড্রয়ারে। মুর্শিদাবাদ সিল্কটাও একেবারে নতুন, আজই প্রথম পরলাম।"

"কারণটা কি?"

"কিসের?"

"আজ হঠাৎ নতুন শাড়ি ও গয়না পরার?"

"পরব না! এনেছি তো পরার জন্যই।"

"কিন্তু এত দিন পরতে দেখি নি, আজ হঠাৎ পরলে কেন?"

"ইচ্ছে হল তাই। যেমন তোমার ইচ্ছের তাগিদে খাট দুখানি বিযুক্ত হল?"

"তোমার দিক থেকে কোন প্রয়োজন ছিল না বুঝি?"

"না। ব্যবধানটা কি মনে আঁকা ভাল নয় সখা?"

আমি চুপ করে থাকি। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তার পরে মানসী বলে, "তুমি পুরুষ, আমি নারী। একঘরে রাত্রিবাস করছি। দেহের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হলে খরস্রোতা নদীর

ব্যবধানও দুস্তর নয়—সামান্য এই এক ফুটে কি হবে ?" চুপ করে মানসী। সে হঠাৎ উঠে বসে। খাট থেকে নেমে এগিয়ে যায় দরজার কাছে। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসে বিছানায়। বলে, "ছাই ভস্ম না ভেবে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো এবারে। কাল ছটায় উঠতে হবে।"

মেয়ে হয়ে মানসী যখন এতো সহজ, এতো স্বাভাবিক হতে পারছে, তখন তো আমার এমন করা সাজে না। আমি উঠে বাতিটা নিবিয়ে দিই। মুহূর্তের মাঝে জমাট বাঁধা কালো আঁধার ছেয়ে ফেলে আমাকে। কেবল আমাকে নয়, মানসীকেও। তবে সে তার মনের আলো রেখেছে জ্বালিয়ে। আর সেই আলোয় আলোময় করে তুলতে চাইছে আমাকে।

হাতড়াতে হাতড়াতে খাটের কাছে আসি। বিছানায় আশ্রয় নিই।

"শুয়ে পড়লে ?" মানসী কথা বলে।

"হ্যাঁ।"

"তোমার বড্ড ভয় করছে, না ?"

"ভয় ? কিসের ভয় ?" বুঝতে পারি না ওর কথা।

"লোকভয়, দুর্নামের ভয়। অনাত্মীয়া মেয়েকে নিয়ে একঘরে রাত্রিবাসের ভয়।"

"কিন্তু তুমি তো আমার অনাত্মীয়া নও মানসী !"

"তাহলেও তুমি ভয় পেয়েছো !"

অস্বীকার করতে পারি না। চুপ করে থাকি।

আমার উত্তর না পেয়ে মানসী বলে, "আমি কিন্তু ভয় পাই নি। কেন পাই নি, জানো ?"

"কেন ?"

"আমার বাবা বলেন, মানুষকে অবিশ্বাস করে জেতার চেয়ে, বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। তাই আমি সবাইকে বিশ্বাস করি। আর...একজন ছাড়া এ পর্যন্ত কেউ ঠকায় নি আমাকে।"

"সে কে ?"

"তার কথা জিজ্ঞেস করে এই সুন্দর রাতটা মাটি করে দিও না সখা ! তার চাইতে আমার কথা শোন।"

"বেশ তাই বলো।"

মানসী বলে চলে, "জীবনে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি খুব বড় নয়। তবু এই সামান্য জীবনের সামান্যতর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ভক্তি ও ভালোবাসার কাছে নর ও নারীর কোন পার্থক্য নেই। তুমি তো আমার কেবল সখা নও, তুমি আমার প্রিয় লেখক। লেখা পড়ে যাকে একদিন মনে মনে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম, ভালবেসেছিলাম, তাকে আজ আমি এতো কাছে পেয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

"পাওয়া আর না পাওয়া নিয়েই জীবন। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার দিকটা সব সময়েই বড়। কিন্তু চরম প্রতিকূলতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানই তো জীবনধারণ।

"জীবন সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা মানুষের সহজাত, বিশেষ করে কুমারী মেয়েদের। আমিও অনেক স্বপ্ন দেখেছি। সে-সব স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে। যা চেয়েছি, তা পাই নি। যা হতে চেয়েছি, তা হতে পারি নি। ব্যর্থতার বোঝা বহন করছি। কিন্তু গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে মিথ্যে পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না।

"অনেক দিন পরে, অনেক দিনের ইপ্সিতকে পেয়েছি তোমার মাঝে,এ পাওয়া যে কতো বড়, তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার মানস-লোকের

অধীশ্বরের কাছে আমি কোন অমানবিক আচরণ আশা করি না। তাই আমি পরম নিশ্চিন্তে, এই আঁধার ঘরে তোমার সঙ্গে প্রায় এক বিছানায় রাত কাটাতে পারছি।

"সংসারে সব মানুষের মানসিকতা এক নয়। কিন্তু মনের জগৎ বলে মানুষের একটা কিছু আছে, এটা আমি বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসকে সম্বল করে আমি জীবনের সঙ্গে পরীক্ষা করে চলেছি। তোমাকে নিয়েই আমার সে পরীক্ষা। জানি এ পরীক্ষায় আমি অকৃতকার্য হব না।

"বিগত কয়েক দিনের অবাধ মেলা-মেশায় যদি আমার সম্পর্কে তোমার মনে কোন সহানুভূতি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাকে ভাবাবেগের আতিশয্যে কিংবা উচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশে নষ্ট করে ফেলো না। ওগুলো বড়ই তুচ্ছ। গভীর ভালোবাসা জীবনকে আলোকিত করে তোলে, মানুষকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে না। তুমিই তো সেদিন বলেছিলে—Love is not sex. Love has its peaks which only one in a million is able to climb through mature and responsible love.

"আমার দিক থেকে বলব, আমি আমার পরিণত প্রেমের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ভালোবাসার সেই গভীরতা আমি অনুভব করছি। একে আমি সযতনে রেখে দিলাম আমার মনের মণিকোঠায়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমার এ ভালোবাসা তোমাকে ওঠাতে না পারলেও, কখনই নামিয়ে নিয়ে যাবে না।" থামে মানসী।

সে আর কিছু বলবে কি ?

না। আর কিছু বলে না মানসী। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছে সে। এবারে আমার কিছু বলার দরকার।

কিন্তু কি বলব ? মানসী তো কিছুই শুনতে চায় নি আমার কাছে।

মানসী বোধহয় পাশ ফিরল। সে নিশ্চয়ই ঘুমোবার চেষ্টা করছে। ঘুমোক মানসী। নিশ্চিন্তে ঘুমোক। তার সব কথা বলা শেষ হয়েছে।

কিন্তু আমি ? আম কি করব ? আমার যে কিছুই বলা হল না।

না হোক্। কতো কথাই তো বলা হল না এ জীবনে। না-বলা সেই কথার মালায় আজ না হয় আর কয়েকটি কথা যুক্ত হল।

আমিও পাশ ফিরে শুই। আমাকেও মানসীর মতো পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ঘুম আমাদের চাওয়া ও পাওয়ার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে, আমার সব দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের অবসান করবে।

॥ সতেরো ॥

পাওয়ার হাউসের পেছনে পাহাড়ের ধারে হলেজওয়ে স্টেশন—বাফার স্টপ্। এখানকার উচ্চতা ৪১৩১ ফুট। পাহাড়ের গায়ে রেল লাইন—আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেছে। সেই লাইনের ওপরে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রলি—স্থানীয়রা বলেন ট্রাক। কাঠের একটি ছোট কম্পার্টমেন্টের সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম। কামরায় দু-সারি সিট—জনা আটেক লোক বসতে পারে। আর পাটাতনে একখানি বেঞ্চি ও ফাঁকা জায়গা।

আমরা সেই বেঞ্চিখানিতে জায়গা নিলাম। বন্ধ কামরায় আরাম বেশি। কিন্তু আমরা আরাম করতে আসি নি, দেখতে এসেছি। এখানে বসে চারিদিক চমৎকার দেখা যাবে।

তবে বৃষ্টি নামলে ভিজতে হবে।

"তা হোক গে।" মানসী বলে।

আর মানসী যখন বাইরে বসতে চাইছে, তখন আমার অন্দরমহলবাসী হওয়া সাজে না। তবু তাকে বলি, "শুধু জল নয়, রোদও সইতে হবে।"

"তোমাকে যখন সইতে পারছি, তখন রোদ অসহ্য হবে না।" মানসী উত্তর দেয়।

"আমাকে সহ্য করা কি খুবই কঠিন ?" প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ।" মানসী আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "কারণ তুমি দিবাকরের মতো দীপ্ত, প্রভাকরের মতো পবিত্র আর সূর্যের মতোই সুন্দর।"

"একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, কানে বাধছে।"

"বাধুক গে। আমার কাছে তুমি সুন্দর—পরম সুন্দর। তাই তো তোমাকে সইতে এতো কষ্ট আমার।"

"কি করলে তোমার এ কষ্ট লাঘব হয় সখী ?"

"আপাতত এক কাপ চা খাওয়ালে। সকালে তাড়াতাড়িতে চা-টা তেমন জমে নি।"

আমার সোয়েটার ও মানসীর কোট দিয়ে জায়গা রেখে আমরা ট্রলি থেকে নেমে এলাম। পাওয়ার হাউসের সঙ্গেই কর্মচারীদের ক্যান্টিন। চা খেয়ে মানসী কিছু বিস্কুট ও মিষ্টি কিনে সঙ্গে নিল। সারা দিন থাকতে হবে। শুনেছি সেখানে বাজার আছে। কিন্তু কেমন বাজার কে জানে।

ট্রলিতে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন যাত্রী এসে গেছেন। তাঁরা কেউ বাইরে, কেউবা ভেতরে বসেছেন। আমরা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে থাকি।

ট্রলির পেছনে লোহার মোটা দড়ি বাঁধা। দড়ি চলে গেছে পরবর্তী স্টেশনে। সেখানে এই দড়িটাকে গোটাবার ও ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। দড়ি গোটালে ট্রলিটা লাইনের ওপর দিয়ে উঠে যায় ওপরে। আর ছেড়ে দিলে নেমে আসে নিচে। লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তারের মতো একসারি তার আছে। বিশেষ ধরনের একটা লাঠি দিয়ে ঐ তারটাকে আঘাত করলে ওপরে ও নিচের স্টেশনে ঘন্টা বেজে ওঠে। এই ভাবে ট্রলির সঙ্গে স্টেশনের যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এই ট্রলিটা সবচেয়ে বড়, পনেরো টন মাল বইতে পারে।

সকাল আটটায় ট্রলি চালু হবার কথা ছিল। তাই আমরা অতো তাড়াতাড়ি এখানে এসেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রলি ছাড়ল পৌনে ন'টায়।

লাইন বেয়ে ট্রলি ওপরে উঠছে। লাইনের ধারে গাছ-পালা আর বিরাট মোটা দুটি জলের পাইপ। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসেছে। ঐ জলই হাইডেল পাওয়ার স্টেশনের জীবন। ঐ জলেরই উৎস দর্শনে চলেছি।

যোগিন্দর নগরকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি। নিচের বাড়ি-ঘর, পথ ও প্রান্তর ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। পাওয়ার স্টেশনের পেছনের পাহাড়টা আস্তে আস্তে আবছা হয়ে যাচ্ছে। তার পেছনের পাহাড়গুলি একে একে জেগে উঠছে। সারি সারি পাহাড়। এক সারির পেছনে আর এক সারি। পাহাড় নয় যেন আঁকাবাঁকা ধূসর রেখা।

নীলাকাশের বুকে থোকা থোকা মেঘ আর মাটিতে সবুজের আলপনা। মাঝেমাঝে নানা রঙের ছোট ছোট ঘর—শিশুর খেলনা।

তেত্রিশ মিনিট বাদে পরবর্তী স্টেশন অডিট জংশনে এসে নিশ্চল হল আমাদের ট্রলি।

এখানকার উচ্চতা ৫৮০০ ফুট। তার মানে আমরা বাফার স্টপ্ বা যোগিন্দর নগর থেকে ১৬৬৯ ফুট উঠে এসেছি। দু স্টেশনের দূরত্ব ০.৯ মাইল।

যে লাইন বেয়ে আমাদের ট্রলি উঠে এসেছে, সে লাইনটা শেষ হয়ে গেল এখানে। কিন্তু পাশেই আর একটি লাইন। এখান থেকে ওপরে উঠে গেছে। সেই লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি ট্রলি—আকারে অনেক ছোট। এর বহন ক্ষমতা মোটে পাঁচ টন। তার মানে আগের ট্রলির এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু এ ট্রলিতেও একটি কামরা রয়েছে। তেমনি দুসারি সিট। তবে এর পাটাতনটি বড়ই ছোট। কোন বেঞ্চি নেই। কেবল কয়েকখানি সরু তক্তা লাগানো। বাইরে থাকতে হলে, তারই একখানির ওপর বসতে হয়। মানসীকে জিজ্ঞেস করি, "এবারে কি অন্তঃপুরবাসিনী হবে?"

"না।" সঙ্গে সঙ্গে মানসী জবাব দেয়।

'তাহলে যে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের ওপরে উপবেশন করতে হবে।"

"তাই করব।"

"পারবে কি বসে থাকতে? ধরে থাকার কিছু নেই।"

"কেন, তুমি থাকবে পাশে। তোমাকে অবলম্বন করেই তো হিমাচলের এই সুন্দর দিনগুলো কাটিয়ে দিলাম।" একবার থামে মানসী। তার পরে বলে, "আর পড়েই যদি যাই, কি আর ক্ষতি হবে? সংসারে আমার জন্য কাঁদার মানুষ মোটে একজন।"

"কে?"

"আমার বাবা।"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী আবার বলে, "তুমি শুধু বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে খবরটা দিয়ে এসো। দুটো সহানুভূতির কথা বলো। তাকে একটু শান্ত করতে পারলে, সেই হবে আমার সবচেয়ে বড় উপকার। অবাধ্য এই মেয়েটা যে তার বড় বেশি প্রিয়। আমার জন্যে চিন্তা করো না। হিমালয়ের বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার চেয়ে মহত্তর মৃত্যু আমার আর কি হতে পারে?"

কিন্তু আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিই না। নীরবে পথ চলে ট্রলির কাছে আসি। আসন গ্রহণ করি। একটু বাদে ট্রলি চলতে শুরু করে।

পথের পাশে রডোডেনড্রন বন।অসংখ্য গাছ। ফুল নেই। এখন ফুলের সময় নয়।

তখন কেমন দেখায়?

কেমন আবার দেখাবে? মনে হবে যেন বনের বুকে আগুন লেগেছে।

এবারের পথ আগের চেয়ে খাড়াই। পরবর্তী স্টেশন উইন্‌চ ক্যাম্পের উচ্চতা ৮৩০০ ফুট। কিন্তু দূরত্ব মাত্র আধ মাইল। অর্থাৎ আধ মাইলে আড়াই হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে। তাই দূরত্ব কম হওয়া সত্ত্বেও পরের স্টেশনে পৌঁছতে একই সময় লাগবে।

অনেকটা ওপরে উঠেছি। চারিদিকে চকচকে রোদ। দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। যোগিন্দর নগর ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই বিরাট বিশ্বের কাছে যোগিন্দর নগর কতো ছোট। আমরা কতো ছোট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়।

যোগিন্দর নগরের সীমারেখায় যে পাহাড়, যে পাহাড় যোগিন্দর নগরকে বাহির বিশ্বের কাছে আড়াল করে রেখেছে, সেই পাহাড়ের পরপারে অসংখ্য সারি সারি পাহাড়—কালো, ধূসর ও সাদা পাহাড়। না, পাহাড় নয়—হিমতীর্থ হিমাচল, অনন্ত হিমালয়—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশিঃ দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

পূর্ব্বাপরৌ তোয়ানিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥'

পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে স্নান করে, পৃথিবীর মানদণ্ডের মতো যে বিরাট দেবভূমি ভারতের উত্তর দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই নগাধিরাজই দেবতাত্মা হিমালয়।

হিমালয়ের কাছ থেকে এবারের মতো আমার বিদায় নেবার সময় সমাগত। কেবল তো হিমালয় নয়, সেই সঙ্গে বিদায় দিতে হবে মানসীকে।

এই যে সংসারের নিয়ম। সুন্দরকে চিরকাল কাছে রাখা যায় না। কিন্তু তাই বলে তারা হারিয়ে যায় না। তারা চিরকাল বেঁচে থাকে মানুষের মনের মণিকোঠায়। সুন্দর হিমাচলের মতো সুন্দরী মানসীও চিরকাল ভরে রাখবে আমার মন। আমার কাছে মানসী আর হিমাচল এক হয়ে রইবে।

যোগিন্দর নগর এখন ঠিক আমাদের নিচে। পাওয়ার স্টেশনের পেছনের পাহাড়টার শীর্ষে পৌঁছেছি আমরা। এই পাহাড়টার ওপারেই বারোট। সেখানেই যেতে হবে আমাদের। তাই ট্রলি থেকে নামতে হল। আমরা উইন্‌চ ক্যাম্প স্টেশনে এসে গেছি।

ট্রলি থেকে নেমে মানসী জিজ্ঞেস করে, "এখানে কোন ট্রলি দেখছি না তো!"

"না থাকলে দেখবে কেমন করে?"

"তাহলে কি হেঁটে যেতে হবে নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। দেখছ না সবাই হাঁটছে। সম্ভবতঃ পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল বলে এখানে ট্রলি চালানো হয় না। যাত্রীরা হেঁটে অপর পাশে পৌঁছন।"

"কিন্তু লাইন পাতা রয়েছে যে?" মানসী প্রশ্ন করে।

"মনে হচ্ছে, মাল চলাচলের জন্য।"

অন্যান্য যাত্রীরা জোরে জোরে হাঁটছে। আমরাও পা চালালাম। কিন্তু মোটেই পরিশ্রান্ত বোধ করছি না। আমরা সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে।

পাহাড়ের শীর্ষদেশ ঠিক সমতল নয়। এখানে ওখানে ছোট-ছোট টিলা আর উঁচু-নিচু জমি। ঝোপঝাড়ে ছাওয়া। তারই মাঝে খানিকটা অংশকে সমতল করে পাতা হয়েছে ট্রলির লাইন। সেই লাইনের ধার দিয়ে আমাদের পথ। সমতল পথ।

মাইল দুয়েক পথ পেরিয়ে আমরা পাহাড়টির অপর পাশে এলাম। সামনেই স্টেশন। একই রকম চেহারা। গুটি কয়েক টিনের শেড। এখানে ওখানে পড়ে আছে কিছু লোহা-লক্কড় ও যন্ত্রপাতি। দুসারি লাইন নেমে গেছে নিচে। লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটি ট্রলি। এটিও আগেরটির মতো পাঁচ টন মাল বহন করতে পারে। কিন্তু এটিতে কোন কামরা নেই। সবটা জুড়েই পাটাতন। হেসে মানসীকে বলি, "এবারে যে ঘর আর বার এক হয়ে গেল।"

"সে তো অনেক দিন আগেই হয়েছে।" মানসী হেসে জবাব দেয়।

কামরা না থাকলেও দু-সারি বেঞ্চি পাতা আছে। তারই উপরে বসলাম আমরা।

কিছুক্ষণ বাদে ট্রলি চলল। তেমনি খাড়া পথ। এতক্ষণ ওপরে উঠেছি। এবারে নিচে নামছি। শক্ত করে বেঞ্চির হাতল ধরে থাকতে হচ্ছে। পথের পাশে গাছপালা আর ঝোপঝাড়। তবে রডোডেনড্রন নেই। একই পাহাড়। কিন্তু দু-পাশের গাছপালার পার্থক্য লক্ষ্য করবার মতো।

০.৬ মাইল পথ নেমে পরের স্টেশনে পৌঁছলাম। এ স্টেশনটির নাম কাত্যারু। উচ্চতা ৭১৩৬ ফুট। তার মানে ১১৬৪ ফুট নিচে নেমে এসেছি।

একই রকম ট্রলি। কেবল বেঞ্চি দুখানি আগের মতো প্রশস্ত নয়। ধরার মতো কোন বস্তুও পাশে নেই। একটু বাদেই ট্রলি চলল।

এবারে পথটা ভীষণ খাড়া। পরবর্তী স্টেশনটির নাম—জেরো পয়েন্ট। উচ্চতা ৬১৫৩ ফুট। দূরত্ব ০.৪৫৩ মাইল। তার মানে আধ মাইলেরও কম দূরত্বের মধ্যে আমাদের প্রায় হাজার ফুট নেমে যেতে হবে। চব্বিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

ট্রলিটা একেবারে সোজা নিচে নামছে। নিচে তাকাতে ভয় করছে। মনে হচ্ছে পড়ে যাব। ভয় পায় মানসী। সে জড়িয়ে ধরে আমাকে।

খাড়া জায়গাটা শেষ হবার পর হেসে বলি, "সবাই কিন্তু দেখছে, আমাকে ধরে নিচে নামছ তুমি।"

মানসী ছেড়ে দেয় না আমাকে। নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলে, "দেখুক গে। ওরা জানে, এমন সাথী পাশে পেলে জেরো পয়েন্ট কেন, নরকে নামতেও নারাজ নই আমি। আর সে নরক আমার কাছে স্বর্গের চেয়ে সুন্দর।"

"সত্যি বলছ কি?" হেসে বলি।

"হ্যাঁ। তোমার মতো মিথ্যে বলা অভ্যেস নেই আমার।"

"সে কি! তোমার পথের সাথী মিথ্যেবাদী?"

"তা মাঝে মাঝে একটু আধটু বলে বৈ কি। তাহলেও তার সঙ্গে আমি নরকে যেতে রাজী আছি। কারণ তার মিথ্যে যে আমার কাছে সত্যের চেয়ে বেশি সুন্দর।"

আমি চুপ করে থাকি। মানসীও আর কোন কথা বলে না।

সামনের দিকে তাকাই। সামনে সংকীর্ণ একটি সুন্দর উপত্যকা। এপাশের পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নামছি আমরা। ওপাশের পাহাড়ের গায়ে গ্রাম।

উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী—উল। ইংরেজীতে লেখে—'UHL'. দেখে মনে হচ্ছে শান্তশিষ্ট স্রোতস্বিনী। কিন্তু আসলে সে ছিল বড়ই দুর্বিনীত। সে ছিল ভয়ঙ্করী। প্রতি বছর বর্ষার সময়ে প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে দিত দেশ। তাকে সংযত করার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তৎকালীন পাঞ্জাব সরকার বাঁধ দিয়ে বন্দী করলেন তাকে। নির্মাণ করলেন জলাধার। পাহাড় ভেদ করে পাইপ বসালেন। জলাধারের জল নিয়ে যাওয়া হল যোগিন্দর নগরে। অসংযমী নদীর সে উচ্ছল জলধারা দিয়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করা হল। দুর্বিনীত ও ভয়ঙ্করী উল দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করল।

ট্রলি নিশ্চল হল। আমাদের যাত্রা হল শেষ। ট্রলি থেকে নামলাম। সামনেই ছোট অফিস-ঘর আর পুলিশ চৌকি। প্রহরারত পুলিস যাত্রীদের অনুমতিপত্র পরীক্ষা করে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা। নিরাপত্তার প্রয়োজনেই এখানে ক্যামেরা আনা নিষেধ। মীরজাফর এ দেশে আজও জন্মাচ্ছে।

একটি নয়, দুটি নদী। উল এসেছে বাঁ দিক থেকে। ডান দিক থেকে আরও একটি নদী এসেছে এখানে। ছোট নদীটির নাম লামবাডাগ। উলের ধারাকে একটি বাঁধানো খালের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জলাধারে। কিন্তু লামবাডাগ নিজেই প্রবাহিত হয়েছে সেই খালের ওপার দিয়ে।

খালের এপারে বাঁধানো পথ। পথের পাশে ফুলবাগান। তার পরে খানিকটা সমতল জায়গা—ক্ষেত আর বাড়ি-ঘর। সমতলের শেষে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ। এই পাহাড়ের ওপার থেকে এসেছি আমরা। এপারে বারোট, ওপারে যোগিন্দর নগর। এপারে

জল, ওপারে বিদ্যুৎ। এপারে প্রকৃতি, ওপারে বিজ্ঞান।

জেরো পয়েন্ট স্টেশনে কিন্তু ট্রলির লাইন শেষ হয় নি। বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে খালের পাশ দিয়ে সে চলেছে আমাদের সঙ্গে। মালপত্র বয়ে নিয়ে আসার জন্য লাইনটিকে প্রসারিত করা হয়েছে।

"দেখো, দেখো কি সুন্দর!" মানসী উচ্ছল কণ্ঠে বলে ওঠে।

সত্যি তাই। আমিও দেখি, দু নয়ন ভরে দেখি, কৃত্রিম হলেও বড়ই সুন্দর। দেখে আর আশ মেটে না।

লামবাডাগ এসে মিলিত হয়েছে উলের সঙ্গে। সঙ্গমে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি কৃত্রিম জলপ্রপাত। প্রবল বেগে লামবাডাগের জলরাশি আছাড় খেয়ে পড়েছে উলের বুকে। বারিকণা নয়, যেন নীল ধোঁয়া—অনেকখানি জায়গাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর সূর্য? তার সোনালী কিরণমালায় নীলের ওপরে সোনার আভা ছড়িয়েছে।

অনিন্দসুন্দর। কিন্তু অনন্তকাল ধরে এখানে অপেক্ষা করার অবসর নেই আমাদের। আমরা পথিক। আমরা এগিয়ে চলি। মানসী কিন্তু মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। হেসে বলি, "পেছনের ডাকে সাড়া দিও না, সামনে এগোতে অসুবিধে হবে।"

মানসী মৃদু হাসে। বলে, "আজকের এই এগিয়ে যাওয়াও যে কাল পেছনে পড়ে থাকবে।"

খানিকটা এগিয়ে খালের ওপরে একটি পুল। পুলের ওপর দিয়ে একটি পথ চলে গেছে ওপারে—বাজারে। আট-দশটি দোকান আছে সেখানে।

এপারর পথ দিযেই এগিয়ে চলি। কিছুদূর এগিয়ে বারোট প্রাইমারী স্কুল। কিন্তু লোকালয় নেই এখানে। লোকালয় স্টেশন ছাড়িয়ে। ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে পড়তে আসে এখানে।

স্কুল ছাড়িয়েই অফিস আর অফিস ছাড়িয়েই জলাধার। অফিসের সামনে ছোট বাগান। বাগানে বসেছিলেন সর্দারজী। পারমিট দেখাতেই তিনি চাবি নিয়ে চললেন আমাদের সঙ্গে।

সুবিশাল জলাশয়। যেমন গভীর তেমনি সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত। বাঁধানো দীঘি বলা যেতে পারে। চারিদিক লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। চারিদিকে বাঁধানো পথ। সেই পথ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম সর্দারজীর সঙ্গে।

জলাধার জলহীন। বছরে একবার করে পরিষ্কার করা হয় জলাধার। এখন সেই পালা জলছে। সর্দারজী বলেন, "আকারে যতই বড় হোক, মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে একে জলে ভরে দেওয়া যায় কিংবা এর সব জল বের করে নেওয়া যায়।"

"এখন তাহলে কাজ চলছে কেমন করে? মানসী জিজ্ঞেস করে।

সর্দারজী উত্তর দেন, "এখন খাল থেকে জল সোজা চলে যাচ্ছে টানেলে।"

"টানেল! টানেল কোথায়?" মানসী বলে।

"একটু দূরে, এই পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। যোগিন্দর নগর থেকে রওনা হবার পরে যে দুটি জলের পাইপ দেখেছেন, টানেল থেকে জল যাচ্ছে তাদের ভেতরে।"

"কটা টানেল আছে?" জিজ্ঞেস করি।

"দুটি। তবে একটি কাজ করছে এখন। আর একটি কেবল তৈরি হয়েছে। সেটির কাজ শুরু হবে দ্বিতীয় জলাধার নির্মিত হলে।" সর্দারজী বলেন।

"আর একটি জলাধার নির্মিত হচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ। সামনে ঐ যে উপত্যকার মতো সমতল জায়গাটা দেখছেন ওখানেই তৈরি হবে দ্বিতীয় জলাধার। তখন আমরা দ্বিগুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব।"

কথা বলতে বলতে পাহাড়ের গায়ে একটা লোহার দরজার সামনে এসে থামলাম। দরজায় তালা ঝুলছে। সর্দারজী তালা খুললেন।

আমরা গুহার ভেতরে ঢুকলাম। আলো আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বড় কম। তাই ভেতরে আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলেছে। তার ওপর আমরা রোদ থেকে এসেছি। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সর্দারজী এগিয়ে চলেছেন। বাধ্য হয়ে আমাদের তাঁকে অনুসরণ করতে হয়। সর্দারজী অবশ্য বলেন, "সাবধানে চলবেন। দেখবেন আছাড় খাবেন না যেন।"

আর তাঁর বলার জন্যই কিনা জানি না, সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট্ খায় মানসী। তাড়াতাড়ি ধরে ফেলি ওকে।

"ভাগ্যিস পাশে ছিলে।" সামলে নিয়ে মানসী বলে।

"না থাকলে ?"

"আমার অধঃপতন অনিবার্য ছিল।"

"তাহলে তোমাকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করছি আমি।"

"হ্যাঁ। তুমি আমার রক্ষক।"

হেসে বলি, "তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। আর তাই তো বলি, ভুলেও ভক্ষক হতে চেয়ো না।"

টানেলের প্রান্তে পৌঁছই। সর্দারজী বলেন, "পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে চারশ' পঁচাত্তর ফুট নিচে রয়েছি আমরা। এখানে কন্ট্রোলিং মেশিন বসবে।"

"কিন্তু কন্ট্রোলার এখানে আসবেন কেমন করে ?" মানসী জিজ্ঞেস করে। "তখন তো টানেল জলে বোঝাই থাকবে।"

"পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এই পর্যন্ত লিফট চালানো হবে। সেই লিফটে করে কন্ট্রোলিং স্টাফ এখানে আসবেন, কয়লার খনিতে যেমন কর্মীরা খাদে নামেন।"

"আচ্ছা আমরা কি পাহাড়টির প্রায় প্রান্তে পৌঁছে গেছি ?" জিজ্ঞেস করি সর্দারজীকে।

"হ্যাঁ। সামান্য কয়েক শ' ফুট পরেই পাহাড় শেষ হয়ে গেছে। আর এই পাহাড়ের ওপারেই যোগিন্দর নগর। তবে যোগিন্দর নগরের থেকে প্রায় দু হাজার ফুট ওপরে রয়েছি আমরা। এখান থেকেই পাইপ লাইন আরম্ভ হবে।"

আরও বেশি জল যাবে যোগিন্দর নগরে। আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। আরও শক্তি, আরও আলো, আরও প্রগতি। দেশের উন্নয়নে আরও বড় ভূমিকা নেবে, যোগিন্দর নগর ও বারোট। এ যুগের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে ছোট এই গ্রামটির নাম।

বিকেল সাড়ে ছটার সময় ফিরে এলাম যোগিন্দর নগরে। ট্রলি থেকে নেমে এগিয়ে চললাম বড় রাস্তার দিকে। মানসী বললে, "যাবার পথে একবার ডাকবাংলো হয়ে যাবে নাকি ?"

"কেন ?"

"যদি প্রাণেশের কোন চিঠি আসে।"

আশ্চর্য ! তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে। কিন্তু মানসীর ঠিক মনে আছে। বলি, "আসবে কি ? কে জানে সে কোথায় আছে ? কেমন আছে ? আমার টেলিগ্রাম পেয়েছে কিনা ?"

"তাহলেও চলো। আমার মন বলছে চিঠি আসছে। আসতেও তো পারে।"

"বেশ চলো।" আমরা ডাকবাংলোর পথে এগিয়ে চলি।

না মানসী সত্যই মানসী। সে মনস্বিনী, মনশ্চক্ষুর অধিকারিণী। মনস্কামনা পূর্ণ হল আমার। দেখা হতেই চৌকিদার একখানি চিঠি দিল আমাকে। প্রাণেশের চিঠি।

তাড়াতাড়ি খুলে ফেলি। মানসী বাধা দেয়। বলে, "এখানে নয়, চলো বাগানের ঐ বেঞ্চিখানায় গিয়ে বসা যাক। তুমি জোরে জোরে পড়ো, অমি শুনি। আমারও আর তর সইছে না। যদিও আমার মন বলছে—তিনি ভাল আছেন—"

বাগানে এসে বসি। আমি জোরে জোরে চিঠিখানি পড়তে শুরু করি। প্রাণেশ লিখেছে—

জোশীমঠ
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

শ্রদ্ধেয় শঙ্কুদা,

আপনার টেলিগ্রাম পেলাম। নির্দেশ মতো যোগিন্দর নগরের ঠিকানায় এ চিঠি দিলাম।

পাঁচ নম্বর শিবিরে সুজয়াদির ও অসিতদার চিঠি পেয়েছিলাম। তাতেই জানতে পারি আপনারা ডালহৌসি থেকে খাজিয়ার হয়ে চাম্বা পৌঁছেছেন। আপনাদের এবারকার হিমাচল ভ্রমণ নাকি নতুনত্বের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার ভ্রমণ আনন্দময় হোক।

এবারে আমার কথা বলি। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর আমাদের অভিযানের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। ২৩,৮৬০ ফুট উঁচু মানা শীর্ষে আমরা ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবার গৌরব অর্জন করেছি। এই গৌরব শুধুমাত্র সদস্য, শেরপা ও কুলীদেরই নয়, এ গৌরব আপনাদের সকলের—আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাই আমাদের সাফল্য এনে দিয়েছে।

৭ই সেপ্টেম্বর মদন মণ্ডল, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জি ও চারজন শেরপা মানার উত্তর-পশ্চিম গাত্রে ২০,৪০০ ফুটে চতুর্থ শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। কথা ছিল তাঁরা পরের দিনই পঞ্চম শিবিরের রাস্তা দেখবেন এবং সম্ভব হলে তাঁবু ফেলবেন। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালির জন্য তাঁরা আর অগ্রসর হতে পারেন না। অত্যধিক বাতাস ও তুষারপাতের দরুণ তাঁরা তৃতীয় শিবিরে নেমে আসতে বাধ্য হন।

কিন্তু ১০ই তারিখে আবহাওয়ার অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখা যায়। তাই দলনেতা বিশ্বদেব বিশ্বাসের নির্দেশ অনুযায়ী সহনেতা নিমাই বসু ও আমি কয়েকজন শেরপা সহ উক্ত শিবির পুনর্দখল করি। পরের দিনই আমরা সেখান থেকে ২২,৮০০ ফুট উঁচুতে পঞ্চম ও সর্বশেষ শিবির প্রতিষ্ঠা করি।

চতুর্থ থেকে পঞ্চম শিবিরের রাস্তা খুবই খারাপ ছিল একটা খাড়া শক্ত বরফের পাঁচিল উঠে গেছে উপরে—৮০° থেকে ৮৫° হবে হয়তো। তিব্বতের উপত্যকা থেকে প্রবলবেগে বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে তার গায়ে। ফিক্‌সড্ রোপ লাগিয়ে ধাপ কেটে আরোহণ করা যে কতো কঠিন, তা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। হিমসিম খেয়েছি আমরা সকলে।

পাঁচ নম্বর শিবির থেকে মানা-শীর্ষ মাত্র এক হাজার ষাট ফুট। কিন্তু ফুট মেপে এ-দূরত্ব পরিমাপ করা ভুল। এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করার জন্য একাদিক্রমে আমাদের নয় রাত্রি কাটাতে হয়েছে ২২,৮০০ ফুট উঁচু পঞ্চম শিবিরে। তাতে এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে, মানুষ প্রকৃতির কাছে নেহাত শিশু হলেও, মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।

দিনের পর দিন আশা-নিরাশার দোলায় কেটেছে আমাদের দিন। রোজই ভেবেছি হয় আজ, নয়তো আগামীকাল আমরা শৃঙ্গে আরোহণ করব। কিন্তু প্রতিদিনই বাদ সেধেছে প্রকৃতি। সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ করে অবিশ্রান্ত তুষারপাত, তুষারঝঞ্ঝা চলেছে। তাঁবুর বাইরে তো দূরের কথা, ভেতরে বসে থাকাও দুর্বিষহ মনে হয়েছে এক এক দিন।

পঞ্চম শিবিরে ন' দিনের মধ্যে দুটি দিন মাত্র আবহাওয়া মোটামুটি ভাল পেয়েছিলাম। এই দুটি দিনের সদ্ব্যবহার করতে আমরা একটুও কার্পণ্য করি নি। আর তা করি নি বলেই আজ আমরা জয়যুক্ত।

১৪ সেপ্টেম্বর আমরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে শীর্ষদেশের সম্ভাব্য পথ খুঁজতে যাই। একটি দলে ছিলেন নিমাইদা ও শেরপা আঙনিমা। অপরটিতে শেরপা পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা, পাসাং শেরিং ও আমি। আমরা সরাসরি পুবদিক থেকে পথ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হই। যদিও মানা শীর্ষের কাছাকাছি টন টন ওজনের ঝুলন্ত বরফের চাঁইগুলি প্রতিমুহূর্তে বিপদের ইঙ্গিত করছিল, তবু বলব এছাড়া আর সহজতর পথ বলে কিছু ছিল না। অপরদিকে নিমাইদারা আশানুরূপ পথের সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর দলনেতার নির্দেশমত শীর্ষারোহণের পথকে আরো প্রশস্ত ও সুগম করবার জন্য পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা ও পাসাং শেরিং আরো কিছু দড়ি লাগিয়ে, ধাপ তৈরি করে ফিরে আসে। কিন্তু রাত থেকে তুষারপাত শুরু হল। পরদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যেও থেমেছিল কি-না মনে পড়ে না। তবু তারাই মধ্যে নিচ থেকে প্রদ্যোৎদা উঠে এসেছিলেন, শেরপারা এসেছিল রসদ নিয়ে।

নেতা ও তাপস ভট্টাচার্য আরো উপরে একটি তাঁবু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তুষারধসের কবলে পড়ে তাঁরা কোন মতে প্রাণ নিয়ে পঞ্চম শিবিরে ফিরে এসেছিলেন। এইভাবে প্রকৃতি আঘাত করেছে বারে বারে। তবে আমরা কখনই নিরুৎসাহ হই নি।

অবশেষে এলো সেই শুভদিন—১৯শে সেপ্টেম্বর। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে দিন। কালবিলম্ব না করে আমরা তৈরি হয়ে নিই। চারজন শেরপা—আঙ্‌রিতা, সোনা, ফু তেনজিং আর গ্যালজেন আমাদের আগে চলবে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে। কারণ একদিনের তুষারপাতের ফলে আমাদের রক্তজল করা পরিশ্রমে তৈরি রাস্তা নরম তুষারের নিচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে আমরা চারজন যাত্রা শুরু করি। তখন সকাল আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ।

উত্তরগাত্রের কাছাকাছি পৌঁছুতেই অভাবনীয়ভাবেই শুরু হল তুষারপাত। আর তার সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের আক্রমণ। নরম তুষারকণা উড়ে এসে চোখেমুখে বিঁধতে থাকে। আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি।

ঠিক হল অবস্থা যত শোচনীয়ই হোক না কেন আমরা এগিয়ে যাব। শুরু হল ফিক্‌সড্ রোপ খুঁজে বের করার পালা। আমরা আটটি প্রাণী রাশি রাশি নরম তুষারর নিচ থেকে সেই দড়ি বার করতে লেগে যাই। সে এক প্রাণান্তকর শোচনীয় পরিস্থিতি, আমাদের সবার দেহ তুষারের অতলে তলিয়ে গেল। নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো মাথা ভাসিয়ে রেখে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম সকলে।

অবশেষে দড়ি পাওয়া গেল। সেই দড়ি ধরে আমরা ধীরে ধীরে তুষারপাতের মধ্যেই আরোহণ করে উঠে এলাম উপরে। ঘড়িতে তখন বিকেল তিনটের ইঙ্গিত করছে।

শেরপা চারজনকে নিচে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে আমরা খানিকটা বিশ্রাম নিলাম।

এমন সময় তুষারপাত হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা কালবিলম্ব না করে পুনরায় শীর্ষাভিমুখে যাত্রা করলাম।

মানা শীর্ষের শেষ পথটকু অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। অপ্রশস্ত শিরার বেশির ভাগই পাথুরে। ছিটেফোঁটা তুষার লেগে তা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আমরা বেশ হুঁশিয়ার হয়ে সে পথটুকু শৈলারোহণ করি। অত উঁচুতে প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে শৈলারোহণ করা যে কি দুরূহ কাজ, তা আপনার সহজেই বোধগম্য হবে। হাত পা অসাড় হয়ে গেল। কথা বলবার মত ফুসফুসের জোর ছিল না।

শেষ পর্যায়ের শ'খানেক ফুট কঠিন বরফের আস্তরণে ঢাকা ছিল। এত শক্ত যে ক্র্যাম্পন ধরে না, তুষারগাঁইতি বিদ্ধ হতে চায় না।

কিন্তু অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রামের অবসান হয়। বেলা ৪-৪৫ মিনিটে আমরা মানা-শীর্ষে উপনীত হই। সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয় তুষারপাত। তারই মধ্যে আমরা সেখানে-ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিই। উড়িয়ে দিই পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের পতাকা। দেবতাত্মা হিমালয়ের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি—আপেল, নাসপাতি, চকোলেট ইত্যাদি। বরফ খুঁড়ে শীর্ষদেশে রেখে আসি মদনদার দেওয়া একখানি মা-কালীর ছবি আর আমার শিব-পার্বতীর ফটো। পাসাং ফুতার ওই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে হাতের দস্তানা খুলে ছবি নিতে ভুল করে না। বেচারার আঙুলগুলো আজও সাড়শূন্য। দেখতে দেখতে কেটে যায় পঁয়ত্রিশ মিনিট—আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত।

তুষারপাতের দরুণ মানা-শীর্ষ থেকে আশেপাশের দৃশ্য তেমন উপভোগ করতে পারি নি। চারিদিক ঘষা কাঁচের মত আব্‌ছা ছিল। আব্‌ছা ছায়ার মতো আশেপাশে যে-সবশৃঙ্গ দেখেছি তাদের মধ্যে দেওবন, মুকুট ও কামেট প্রধান। আর সোজা উত্তরে তিব্বতের ধূসর উপত্যকা। ইতিপূর্বে যাঁর কাছে মানা হার মেনেছে, তিনি বিখ্যাত পর্বতারোহী, বৈজ্ঞানিক ও সুসাহিত্যিক ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ। তিনি সহযাত্রী অলিভারের সঙ্গে ১৯৩৭ সালে মানা-শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁরা এখান থেকে একশ' মাইল দূরে অবস্থিত তিব্বতের গুরলামান্ধাতা (২৫,৩৫৫´) শিখর দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা ভাগ্যবান।

শীর্ষ থেকে পঞ্চম শিবিরে ফিরে আসার সময় অন্ধকারের কবলে পড়ি। মাত্র দুটি টর্চ সম্বল করে আমরা দুর্ঘটনা এড়িয়ে কিভাবে যে সেদিন ফিরে এসেছি, তা ভাবলে আজও বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। নেতা অবশ্য উদ্ধারকারীদল পাঠিয়েছিলেন। রাত প্রায় এগারোটার সময় পঞ্চম শিবিরে ফিরে আসি কোন মতে।

অসম্ভব পরিশ্রম ও ক্ষুধাতৃষ্ণার ফলে দেহমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। হাত পায়ে কোন সাড় ছিল না। তাঁবুতে ঢুকে ক্লাইম্বিং বুট খুলতেই আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। দুপায়ের বুড়ো আঙুল দুটি নীল হয়ে গেছে। অন্য আঙুলগুলোও কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তুষারক্ষত ছাড়া ওটা যে আর কিছু নয়—আমি ভাবতেই পারলুম না। কান্নায় আমার বুক ভেঙে এলো।

শঙ্কুদা, এর পরের দিনের ঘটনা আরো মর্মান্তিক। ২০ শে সেপ্টেম্বর পাঁচ নম্বর শিবির গুটিয়ে নিচে নামবার সময় যে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এই দুর্ঘটনার ফলে শৃঙ্গ বিজয়ের বিজয়োল্লাস চাপা পড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

নিচ থেকে শেরপারা যথারীতি সকালে এসেছিল। একদল মালপত্র নিয়ে নেমে যায়। আমার হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। তাই শেরপা নিমা থনডুপের পিঠে আমাকে বেঁধে নেওয়া

হয়। সামনে ও পিছনে যথাক্রমে পাসাং শেরিং ও পাসাং ফুতার আমাকে নামাতে সাহায্য করে। অপর একটি দড়িতে নামেন নেতা শেরপা সর্দারকে নিয়ে। তৃতীয় দড়িতে নামেন চারজন শেরপা—শেরিং লাকপা, ফু তেনজিং, আঙরিতা ও সোনা। ওদের পিঠে ভারী বোঝা ছিল। তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে পেছন থেকে আঙরিতার পা ফসকে যায়। অতর্কিত টানের জন্য ওরা কেউ প্রস্তুত ছিল না। ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে চারজনই শক্ত বরফের পাঁচিল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় প্রায় হাজার ফুট নিচে। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছিল। তিনজন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ফু তেনজিং-এর জ্ঞান ছিল। "কলারবোন" ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও সে কোন রকমে চতুর্থ শিবিরে নেমে খবর দেয়। সেখানে সুজন কোলে ও তাপস ভট্টাচার্য ছিলেন। তাঁরা শেরপাদের পাঠিয়ে আহতদের উদ্ধার করেন।

শেরিং লাকপা ও আঙরিতার আঘাত গুরুতর। বরফে মুখ থুবড়ে পড়ায় লাকপাব মুখ গলিত মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করেছে। আঙরিতার দুটো পায়েরই হাঁটু পর্যন্ত নীলাভ হয়ে গেছে। সোনার পায়ের গোড়ালি বোধ হয় ভেঙে গেছে।

দুর্ঘটনার খবর দিল্লীতে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্রী এইচ. সি. সারিন ও সম্পদক শ্রীরোহিণীমোহন চক্রবর্তীকে ওয়ারলেস মারফত পাঠানো হয়েছে। তাঁরা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের একটি বিশেষ হেলিকপ্টার ও উদ্ধারকারীদল পাঠাচ্ছেন। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি। আহতদের সঙ্গে আমাকেও বেরিলীতে নিয়ে যাওয়া হবে। আহতদের শেরপা ও কুলির পিঠে করে নামানো হচ্ছে।

আমাদের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। যা ঘটবার তা ঘটেছে। আমার তুলনায় ওদের চারজনের আঘাত অনেক গুরুতর। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন ওরা যেন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

আশা করি আপনারা ভালই আছেন। কলকাতায় কবে নাগাদ ফিরছেন?

শুভেচ্ছান্তে

বিনীত
প্রাণেশ

॥ আঠারো ॥

কথা ছিল সকাল সাড়ে পাঁচটায় গাড়ি ছাড়বে। গাড়ি মানে মোটর নয়, রেলগাড়ি—যোগিন্দর নগর পাঠানকোট প্যাসেঞ্জার। আজ বহুদিন বাদে রেলগাড়ির সওয়ার হয়েছি। আমরা হিমাচলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

কিন্তু এদিকে যে রেলের চাকা নড়ছে না। অথচ ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠেছি। মানে মানসীর ডাকাডাকিতে বিছানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। মালপত্র গুছিয়ে, বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছি। একটু বাদে ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। প্রাতরাশ শেষ করে কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে স্টেশনে এসেছি। তখন সকাল সওয়া পাঁচটা। হিসেব মতো গাড়ি ছাড়ার মাত্র পনেরো মিনিট বাকী। কিন্তু স্টেশন যাত্রীশূন্য। অনেক বেছে পছন্দসই ছোট একটি কামরায় জাঁকিয়ে বসেছি দুজনে। ভেবেছিলাম একটু বাদেই গাড়ি ছাড়বে। কিন্তু হায়! যেখানকার গাড়ি, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে এখনও। রেলের চাকা নড়ছে না।

স্থানীয়দের কাছে কিন্তু অজানা নয় এ ঘটনা। তাই তাঁরা হেলে-দুলে মজলিসী চালের

স্টেশনে এসেছেন। তবে তাঁদেরও অনেকে এখন যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এতো 'লেট' নাকি কোনদিন করে না। সাধারণতঃ সাড়ে পাঁচটার গাড়ি ছ'টা নাগাদ ছাড়ে।

কিন্তু সংসারের সকল অনিয়মের মতো 'লেট' বস্তুটিরও একটা সীমারেখা আছে। সাড়ে ছটার সময় গাড়িটা দুলে উঠল। যাত্রীরা জয়ধ্বনি করে উঠলেন। করাই উচিত। মানসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "বাঁচা গেল।"

অনেক দিন বাদে রেলগাড়ির সওয়ার হয়েছি। সাধারণতঃ আমরা রেলগাড়ি বলতে যেমন বুঝি, এ গাড়ি তেমন নয়। 'ন্যারো গেজ ট্রেন'—ছোট লাইনের গাড়ি। তাহলেও ভাল লাগছে। আঁকাবাঁকা উৎরাই পথে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

যোগিন্দর নগর থেকে সোজাসুজি পাঠানকোটের দূরত্ব ১০৩ মাইল, কিন্তু ১৫৪ মাইল উৎরাই পথ পেরিয়ে আমাদের এই গাড়িকে যাত্রার যদি টানতে হবে। যোগিন্দর নগর স্টেশনের উচ্চতা ৩৯০৮ ফুট আর পাঠানকোট মোটে ২৭৩০ ফুট। তার মানে আসার সময় ১১৭৮ ফুট চড়াই ভাঙতে হয় এই রেল গাড়িকে। আগে নাগরোতো পর্যন্ত এই রেলপথ ছিল। পাওয়ার স্টেশন নির্মাণের সময় মাল পরিবহনের প্রয়োজনে সেই রেলপথকে প্রসারিত করা হয় যোগিন্দর নগর পর্যন্ত। তখন অবশ্য কেবল মালগাড়ি চলাচল করত। পরে লালবাহাদুর শাস্ত্রী যোগিন্দর নগর স্টেশনের উদ্বোধন করেন—যাত্রী চলাচল শুরু হয়।

হিমতীর্থ হিমাচলের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বাড়ছে। হিমাচল অচল, সে যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে। আমি চলে যাচ্ছি দূরে। কিন্তু কেবল তো হিমাচলকে নয়, আজ যে মানসীকেও দিতে হবে বিদায়। আজই সে চলে যাবে আমাকে ছেড়ে। ভালই হল, আমার কাছে মানসী আর হিমাচল এক হয়ে রইলো।

বাইরে তাকাই। গাড়ি ছুটে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, পাহাড়ী নদীর তীরে তীরে আর সবুজ উপত্যকার বুক চিরে।

মানসীও তাকিয়ে ছিল বাইরে। হঠাৎ চোখ ফেরায় সে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "আমাদের পথ তো ফুরিয়ে এলো, কিন্তু তোমার হিমাচল পরিক্রমার কথা পূর্ণ হল না—শোনা হল না লাহুল উপত্যকার কথা।"

"সে কথা আর আজ নয় মানসী। সে কাহিনী না-বলা থাক।"

"তাতে লাভ ?"

"আশা করা যাক, সেই কাহিনী বলার জন্যে আবার একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

"কিন্তু জীবনে যে সব আশা পূর্ণ হয় না সখা।"

"তবু সে সত্যকে মানুষ মেনে নিতে পারে না। মানুষ আশা করে।"

"আর তাই মানুষ ব্যথা পায়, বিরহ-বেদনা ভোগ করে।"

"ব্যথা আর বিরহ আছে বলেই আজও পৃথিবীটা একঘেয়ে হয়ে যায় নি, এই যান্ত্রিক যুগেও জীবনে কিছু বৈচিত্র্য আছে।"

মানসী চুপ করে আছে।

আমিও নীরবে থাকি। কি বলব ? আলোচনাটা যে অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন ? হয়তো এই নিয়ম।

"চমৎকার।" মানসী হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে, "এই না হলে লেখক। কিন্তু দোহাই তোমার গায়ক হয়ো না। আবার যেন সুর করে বলে উঠো না—প্রেম যদি

জেগে রহে, দূর কভু দূর নহে।"

"কথাটা তো মিথ্যে নয়।" অমি বলি।

"একটা উদাহরণ দাও।"

"আজ আমরা পাশাপাশি বসে আছি, কিন্তু আগামীকাল এমন সময়—তুমি শেয়ালদা একস্‌প্রেসে কলকাতার যাত্রী আর আমি পাঠানকোটে আমার সহযাত্রীদের প্রতীক্ষায় বসে আছি।"

"অর্থাৎ তোমার ও আমার মাঝে বিস্তর ব্যবধান, এই তো।"

"না। প্রকৃত ব্যবধান তো দূরত্ব দিয়ে স্থির হয় না মানসী। তুমি শেয়ালদা একস্‌প্রেসে বসে আজকের কথা ভাবছ, আমিও পাঠানকোটে বসে আজকের কথা ভাবছি। আমরা দুজনে দুজনের কথা ভাবছি, আমরা তখনও এমনি কাছাকাছি।"

মানসী বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। গাড়ি চলেছে ছুটে। চলেছে যোগিন্দর নগর থেকে পাঠানকোটে।

গাড়ি থামল বৈজনাথ মন্দির স্টেশনে। যোগিন্দর নগর থেকে প্রকৃত দূরত্ব মাত্র ১৩ মাইল আর পাঠানকোট এখান থেকে ৯০ মাইল। এখানকার উচ্চতা ৩১০০ ফুট। দূরত্ব যাই হোক যোগিন্দর নগর থেকে এই পথটুকু আসতে আমাদের দুঘন্টা লেগেছে।

হঠাৎ মানসী বলে ওঠে, "একটু চা খাবো।"

আমি উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে চলি দরজার দিকে।

মানসী জিজ্ঞেস করে, "কোথায় চললে ?"

"চা আনতে।"

"আমিও নামব তোমার সঙ্গে।"

"কি দরকার ? ঐ তো সামনেই দোকান, আমি নিয়ে আসছি।"

"দরকার আছে বৈ কি। অভ্যেসটা যে খারাপ করে দিয়েছ এ ক'দিনে। কাল শেয়ালদা একস্‌প্রেসে তো আমাকে কেউ চা এনে দেবে না, নিজেকেই যোগাড় করে নিতে হবে।"

জনৈক সহযাত্রীকে আমাদের মালের ওপর একটু নজর রাখতে বলে আমরা গাড়ি থেকে নামি। বৈজনাথ মন্দির ছোট স্টেশন। শহর এখান থেকে একটু দূরে—পরের স্টেশন বৈজনাথ পাপরোলায়। কিন্তু মন্দির এখান থেকে খুবই কাছে। মন্দিরের জন্যই পর্যটকরা আসেন এখানে। প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের গঠনশৈলী অসাধারণ না হলেও, মন্দিরগাত্রের কারুকার্য বড়ই সুন্দর। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ শিবলিঙ্গ। একটি রুপোর সাপ লিঙ্গমূর্তিকে বেষ্টন করে আছে।

চা খেয়ে আমরা ফিরে আসি গাড়িতে। একটু বাদে গাড়ি ছাড়ে। মানসী বলে, "এক বৈজনাথের কথা পড়েছিলাম তোমার 'গিরি-কান্তারে'...."

"হ্যাঁ।" আমি বলি, "কুমায়ুনের বিখ্যাত উপত্যকা, কাত্যুরী রাজাদের রাজধানী বৈজনাথ।"

"আর এক বৈজনাথে এলাম তোমারই সঙ্গে। সেদিন তো ভাবতেও পারি নি যে এমনটি হতে পারে ?"

"এই তো জগতের নিয়ম মানসী ! গতকালের কল্পনা আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়। আর আজকের বাস্তব আগামীকাল কল্পনায় পর্যবসিত হয়।"

মানসী আবার বাইরে তাকিয়ে আছে। এমন অপরূপা প্রকৃতিকে দুচোখ ভরে দেখা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মানসী বোধহয় কিছুই দেখছে না—কেবল চোখ দুটিকে আমার দিকে

থেকে সরিয়ে রাখার জন্যই যেন বাইরে তাকিয়ে আছে।

আমরা শব্দহীন কিন্তু গাড়ীটা সশব্দে চলেছে এগিয়ে—চলেছে আমাদের নিয়ে। যাত্রীদের হাসি-কান্নায় ওর কি যায় আসে ?

কিন্তু মানসী কথা বলছে না কেন ? তার মনের আকাশে কি মেঘ জমছে ? এই নীরবতা কি তার না-বলা কথা বলারই পূর্বাভাস ?

অনেক মেঘ পুঞ্জীভূত হোক মানসীর মনে। তার পরে অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ শুরু হোক। আমি চাতকের মতো সেই শ্রাবণধারার প্রতীক্ষায় থাকি।

আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়। মানসী কথা বলে।কিন্তু যে-কথা শুনতে চাই, সে-কথা নয়। সে বলে, "এখানে নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ গাড়ি থামবে। চলো নেমে একটু পায়চারি করা যাক।"

ইতিমধ্যে গাড়ি এসে থেমেছে বৈজনাথ পাপরোলা স্টেশনে। বেশ বড় স্টেশন। এখানকার উচ্চতা ৩১৩১ ফুট।

মানসীর সঙ্গে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। দুজনে পায়চারি করতে থাকি।

হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে, "রাগ করলে ?"

"না। রাগ করব কেন ?"

"তাহলে কথা বলছ না যে।"

"এমনি। তুমিও তো বলছ না কিছু।"

"আমার যে বলার পালা নয়।" মানসী হাসে। "আমি তো শুনব।"

"আরও শুনতে ইচ্ছে করছে ?"

"হ্যাঁ। সারা জীবন ধরে তোমার কথা শুনতে রাজী আছি আমি।"

"তোমার অসীম ধৈর্য।" হেসে বলি।

মানসীও হাসে, "আশীর্বাদ করো চিরকাল যেন এমনি ধৈর্যশীলা হয়ে থাকতে পারি।"

নাগরোতা পেরিয়ে গাড়ি এসে থামে কাংড়া মন্দির স্টেশনে। যোগিন্দর নগর থেকে আমরা ৪২ মাইল এসেছি। এখান থেকে পাঠাকোট ৬১ মাইল। এখানকার উচ্চতা মাত্র ২১৫০ ফুট। কাজেই বেশ গরম লাগছে। কিন্তু সেকথা না বলে মানসী জিজ্ঞেস করে, "বজ্রেশ্বরী মন্দির এখান থেকে কতদূর ?"

"খুবই কাছে। গাড়ি ছাড়লে দেখা যাবে মন্দির চূড়া।"

"আমার তো আর দেখা হল না। সংক্ষেপে একটু বল না কেমন মন্দির ?" মানসী বলে।

"ইচ্ছে করলেই দেখে যাওয়া যায়। দয়া করে দুটো দিন সময় দিলে কাংড়া ও জ্বালামুখী মন্দির দেখিয়ে পাঠানকাটে পৌঁছে দিতে পারি।"

"কিন্তু আমার যে রিজার্ভেশান হয়ে গেছে।"

"ওটা ক্যানসেল করা যায়।"

"আমার যে বড্ড বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে!" মানসী আমার দিকে তাকায়।

"তাহলে থাক। আমি সংক্ষেপে কাংড়া মন্দিরের কথা বলছি।"

"বলো।" মানসী মনোযোগী হয়।

বলি, "সুবিরাট তোরণ পেরিয়ে সুপ্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ—পাথর বাঁধানো। চারিদিকে পাঁচিল। প্রাঙ্গণের মাঝখানে সুন্দর নাট-মন্দির। চারিদিকে পেতলের রেলিং। কেন্দ্রস্থলে ধর্মশিলা।

"নাট-মন্দিরের শেষে গর্ভমন্দির। ছোট কিন্তু ভারী সুন্দর। কারুকার্য খচিত। কাংড়া স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরে পাথরের বিগ্রহ। মূর্তি নয়, একখানি নিরেট পাথরে কেবল দুটি চোখ আঁকা। রূপার বেদীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে ঝুলছে অসংখ্য রুপোর ছত্র। পূজার উপকরণও সব রুপোর।

"গর্ভ-মন্দিরের পেছনে রয়েছে বিরাট একটি বটগাছ। তারই ছায়ায় আর দুটি মন্দির—শিখবও কালী মন্দির।"

কাংড়া স্টেশনে এসে গাড়ি থামে। মানসী বলে, "এখান থেকে কিছু খেয়ে নিলে হত।"

আমি নেমে গিয়ে খাবার নিয়ে আসি। একসময় গাড়ি ছেড়ে দেয়।

কাংড়া উপত্যকার ভেতর দিয়ে গাড়ি চলেছে ছুটে। বিচিত্র উপত্যকা। জেনারেল ব্রুসের ভাষায় 'a district of small broken hills usually well clothed with jungle and of rich cultivation and presenting a great contrast to the deadly plains of Punjab.'

সেই বিচিত্র কাংড়া উপত্যকার ভেতর দিয়ে পাঞ্জাবের দিকে এগিয়ে চলেছি। হিমাচল প্রদেশের কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তটি নিকটতর হচ্ছে। হিমালয়ের কাছ থেকে চলে যাচ্ছি দূরে। আবার আগামী বছর আসব হিমালয়ে। কিন্তু হিমাচলে কি আর আসা হবে ? হিমালয় অসীম ও অনন্ত, জীবন সীমিত, যৌবন স্বল্পতর, সুযোগ নেহাতই সামান্য। বছরে একবারের বেশি হিমালয়ে আসা সম্ভব হয় না। প্রতিবছর নতুন জায়গায় গিয়েও হিমালয়ের কতটকুই বা দেখতে পেরেছি, কতটুকুই বা দেখতে পারব বাকী জীবনে। কাজেই এক জায়গায় দুবার আসার প্রশ্ন অবান্তর। হিমালয়ে আসব কিন্তু হিমাচলে হয়তো আসা হবে না।

নজর পড়ে মানসীর দিকে। সে আবার তেমনি তাকিয়ে আছে বাইরে। সে-ও কি আমার মতো হিমাচলকে দেখছে, হিমাচলের কথা ভাবছে ?

আস্তে আস্তে ডাক দিই, "মানসী।"

"এ্যাঁ, হ্যাঁ....কিছু বলছো ?" মানসী যেন অন্য কোন জগতে চলে গিয়েছিল, আমার ডাকে ফিরে আসে কাছে।

"কার কথা ভাবছিলে ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তোমার কথা।" মানসী আমার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।

"হঠাৎ আমার এ সৌভাগ্য ?"

"আমি তোমার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম।"

"দুর্ভাগ্য ?"

"হ্যাঁ। আমাকে এতো কাছে পেয়েও তুমি আটকে রাখতে পারলে না।"

"স্বেচ্ছায় কেউ দূরে সরে গেলে, কেমন করে তাকে কাছে রাখি ?"

"কেন—জোর করে ?"

"সংসারের সর্বত্র কি জোর খাটে মানসী ?"

"নিশ্চয়ই খাটে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

"তাহলে বলতে হয়, আমি তেমন বীর নই।"

"কে বললে এ কথা ? তুমি যেমন তেমন বীর নও, তুমি মহাবীর।"

"প্রশংসা করছ কি ? ঠিক বুঝতে পারছি না।"

মানসী হাসে। বলে, "বুঝবে কেমন করে ? তুমি যে বড়ই বোকা।"

"শুনেছি প্রেমে পড়লে, মানুষ নাকি বোকা হয়ে যায়।"

"দোহাই তোমার, এই বয়সে আর প্রেমে পড়ো না, বড়ই বে-মানান হবে।" মানসী গম্ভীর ভাবে বলে ওঠে।

আমি হেসে জবাব দিই, "অনেকে কিন্তু বলেন, হিমলয়ের মতো প্রেমেরও নাকি বয়স বলে কিছু নেই।"

"উদারণ স্বরূপ তাঁরা বোধহয় চার্লি চ্যাপলিনের নাম করেন।" সঙ্গে সঙ্গে মানসী মন্তব্য করে, "তবে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। তাঁরা কেউ যদি মনে করেন, তোমার এখনও প্রেমে পড়ার বয়স আছে, আমার বলার কিছু নেই। তবে আমি কিন্তু মনে করি আমার প্রেমে পড়ার বয়স অতিক্রান্ত।"

"তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

"তার মানে তুমি আমার প্রেমে পড়তে বদ্ধপরিকর।"

"তা ছাড়া আর উপায় কি ? তুমি যে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছো।"

মানসী কোন কথা বলে না।

একটু বাদে আমি আবার বলি, "চুপ করে রইলে কেন ? বলো সত্যি কিনা ?"

"হ্যাঁ।" মানসী শান্ত স্বরে জবাব দেয়।

"তাহলে আজ আমাকে পাঠানকোটে রেখে তুমি চলে যাচ্ছ কেন ? এসো আমরা আরও কয়েকটা দিন একসঙ্গে থাকি, তারপর একই সঙ্গে কলকাতায় ফিরব।"

"তা হয় না সখা ! চিরস্থায়ী কোন জিনিসই মধুর হয় না। মানুষ মরণশীল বলেই জীবনটা মধুর। শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেই আমাদের এই হিমাচল-পরিক্রমাকে আজ এত মধুর বলে মনে হচ্ছে।" একবার থামে মানসী। তার পর আবার বলে, "তোমাকে আমি ভালোবেসেছি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে। তবু আমি আজ চলে যাচ্ছি তোমাকে ছেড়ে।"

"কেন ?" আমি অসহিষ্ণু স্বরে বলি।

"যাচ্ছি কারণ আমি আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তুমি আমার ভালোবাসাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করো, আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও।"

মানসী তাকায় আমার দিকে। সে আমার প্রতিশ্রুতি চাইছে।

কি বলব ? কেমন করে আমি তাকে বিদায় দেব !

মানসী এখনও তাকিয়ে আছে। আমি চোখ নামিয়ে নিই।

"কথা বলছো না কেন ?" মানসী কথা বলে, "আমি তো হারিয়ে যাবো না তোমার জীবন থেকে। আমি তোমার মনের মণিকোঠায় মণিদ্বীপ হয়ে জ্বলে থাকব। কর্মব্যস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের অবসর ক্ষণে তোমার মনে পড়বে আমার কথা। মনে পড়বে তোমার মানসীর সঙ্গে পথ চলে তুমি হিমাচল-পরিক্রমা পূর্ণ করেছো।"

গাড়ি এসে দাড়িয়েছে জ্বালামুখী রোড স্টেশনে। আমি উঠে দাঁড়াই। মানসী বলে, "কোথায় চললে ?"

"একটু প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করা যাক।"

"চলো, আমিও যাবো।"

দুজনে নেমে আসি প্ল্যাটফর্মে। ছোট স্টেশন। আমরা নীরবে পায়চারি করতে শুরু করি। হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে, "এখান থেকে জ্বালামুখী মন্দির কি ভাবে যায় ?"

"বাসে করে।" আমি উত্তর দিই।

"কতক্ষণ লাগে ?"

"প্রায় ঘন্টাখানেক।" একবার থামি। তার পরে একটু হেসে বলি, "এখুনি তো বলবে জ্বালামুখীর কথা বলো।"

মানসী হাসে। বলে, "তুমি সত্যই অন্তর্যামী। তা জানতেই যখন পেরেছো, তখন সংক্ষেপে শুনিয়ে দাও দেখি জ্বালামুখীর কথা।" একবার থামে সে। তার পরে করুণ স্বরে বলে, "সময় তো ফুরিয়ে আসছে সখা। কাল তো আর কেউ তোমার কাছে এমন করে গল্প শুনতে চাইবে না।...."

আরও যেন কিছু বলার ছিলো। কিন্তু বলতে পারল না সে। কেবল বুঝতে পারলাম অনেকগুলি না-বলা কথা তার বুকের মাঝে বন্দী হয়ে রইল।

থাকগে।যা বলে নি, তা না হয় নাই বা শুনলাম। যা বলেছে তা-ও তো মিথ্যে নয়। সেদিন মানালীতে দেখা হবার পর থেকে এ কদিন কতো গল্প বলেছি ওকে, আজ সে চলে যাচ্ছে। কাল আর মানসী আমার কাছে হিমাচলের কথা শুনতে চাইবে না।

আমি বলতে শুরু করি। "এই জ্বালামুখী রোড স্টেশন থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে জ্বালামুখী মন্দিরে। বাস গিয়ে থামে গোপীনাথ কুঠিয়াল ধর্মশালার সামনে। আরও দুটি ধর্মশালা আছে জ্বালামুখীতে। আশ্রয়ের অভাব হয় না।

"ধর্মশালার সামনেই পাহাড়ের গায়ে মন্দির—শ্বেত পাথরের মন্দির। মন্দিরশীর্ষ সোনালী পাত দিয়ে মোড়া—সোনার মতই উজ্জ্বল।

"মূল মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। নেই কোন আলো। তার দরকারও নেই। জ্যোতিস্বরূপা দেবী বিরাজ করছেন মন্দিরে। দেওয়ালে ও মেঝেতে জ্বলছে অনির্বাণ শিখা—মায়ের অগ্নিজিহ্বা। সেই আলোয় আলোকিত মন্দির।

"পেছনের দেওয়ালের মধ্যস্থলে জ্বলছে একটি স্থির অকম্পিত শিখা—দেবীর পূর্ণ রূপ। অন্যান্য শিখাসমূহ আদ্যাশক্তির এক একটি অংশ।দেবীর এমন জাগ্রত রূপ আর কোথাও নেই। দেবী নিজেই ভোগ গ্রহণ করেন জ্বালামুখী মন্দিরে।"

"এই গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।" মানসী হঠাৎ বলে ওঠে।

সত্যই তাই। তাড়াতাড়ি দুজনে এসে গাড়িতে উঠি। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আমরা নিজেদের জায়গায় বসি। মানসী বলে, "পাঠানকোট আর কতদূর ?"

"কেন ?" পাল্টা প্রশ্ন করি।

"আর কতক্ষণ আমরা এমন কাছাকাছি থাকব ?"

"বড় জোর ঘন্টা-চারেক। জ্বালামুখী রোড স্টেশন থেকে পাঠানকোট ৫২ মাইল। আমরা যোগিন্দর নগর থেকে ৫১ মাইল এসেছি।"

"ও" স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে মানসী। "তাহলে অর্ধেক পথও ফুরোয় নি। আরও চার ঘন্টা, না চার ঘন্টাই বা বলি কেন, রাত সাড়ে আটটায় শেয়ালদা একস্‌প্রেস ছাড়বে। আরও সাত ঘন্টা আমরা এক সঙ্গে থাকব।" মানসী বলে।

চুপ করে থাকি। ভাবি মানসীর কথা। আজ যেন এক নতুন মানসীকে দেখছি। মাঝে মাঝেই সে কেমন ধৈর্যহারা, বিচলিতা। তবে কখনই তার সংযমের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে না।

গাড়ি চলেছে ছুটে। এক সময় তার চলার পালা সাঙ্গ হবে। আমাদেরও পথ যাবে ফুরিয়ে।

হঠাৎ মানসী বলে ওঠে, "এ কি! এমন চুপ করে আছো কেন?"

এই নিয়ে কয়েকবার সে একই কথা বলল। সে যেন নীরবতাকে সইতে পারছে না। তবু আমাকে স্বীকার করতে হয়, "বলার মতো কোন কথাই যে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তাহলে কি এমনি মুখোমুখি বসে নিঃশব্দে এই অমূল্য সময়টুকু কাটিয়ে দেব।"

"মন্দ কি?"

"না।" মানসী বলে, "আমার একদম ভালো লাগছে না। আমি এমন চুপচাপ বসে থাকতে পারব না। তুমি বলো, যা হোক কিছু বলো, আমি শুনি।"

"বলার মতো কোন কথাই যে আমার মনে আসছে না মানসী! তার চেয়ে তুমি বলো, আমি শুনি। তুমি আজ আমাকে তোমার কথা বলো।"

মানসী চুপ করে থাকে।

আমি আবার বলি, "জানি তোমার সঙ্গে আমার শর্ত আছে। তোমাকে ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন করতে পারব না। আমি আজ সে শর্ত ভঙ্গ করছি। তোমার কথা আজ আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে বরং থাক।"

"আপত্তি?" মানসী হাসে, "সেদিন ছিল, আজ নেই। কেন জানো?"

"না।"

"সেদিনকার তুমি আজ আজকের তুমি, এক নও। সেদিন যে-কথা তোমাকে বলব না ভেবেছিলাম, আজ তোমাকে সে-কথা বলা একান্তই প্রয়োজন। তোমার জানা দরকার, কেন আমি এমন একা একা হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করছি। জানা দরকার আমার এই জীবনটার কথা। জানা দরকার সেই বঞ্চনার ইতিহাস, যা তোমার মানসীর কুমারী জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে।" মানসী থামে।

আমি ওর দিকে তাকাই। দুজনে চোখাচোখি হয়। মানসীর চোখ দুটি ছলছল করছে। সে চোখ নামিয়ে নেয়। তার পরে বলতে শুরু করে, "আমার চেয়ে ভাগ্যহীনা বড় বেশি জন্মায় না পৃথিবীতে। নিজের জীবনের বিনিময়ে মা জন্ম দিয়েছেন আমাকে। আমার জন্মক্ষণে মা মৃত্যু বরণ করেছে। আশ্চর্য! আমি কিন্তু মরি নি, আজও বেঁচে আছি।

"যে মেয়ে জীবনে মুহূর্তের তরে মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেলো না, তার চেয়ে বেশি দুঃখী এ সংসারে কে আছে বলো! অথচ সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলাম আমি। বাবা বিলেত ফেরত ডাক্তার। বাড়ি-গাড়ি, বেয়ারা-বাবুর্চি ও গভর্নেস কিছুরই অভাব হয় নি। তাদের তদারকির জন্য ছিল আমার বিধবা পিসিমা। সে কোন দিন আমাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয় নি। সবার ওপরে বাবা আর তার সীমাহীন স্নেহ। এখনও আমার কোন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে বাবা রক্ষে রাখে না। বাড়ি সুদ্ধ সকলের কৈফিয়ৎ তলব করে।

"বাবা ও পিসীমার মাত্রাহীন আদরের মধ্যে বড় হয়েছি আমি। ফলে যেমনটি হবার, তেমনটি হয়েছি। ছোটবেলা থেকেই আমি অত্যন্ত একগুঁয়ে ও জেদী। যা একবার মনে হয়, তা করতে না পারলে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করি। আর এই একগুঁয়ে স্বভাবের খেসারত দিতেই আজ আমাকে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।"

"কি রকম?" মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি।

মানসী হাসে। বড়ই করুণ হাসি। এমনি হাসি আমি দেখেছিলাম মানালীতে। তারপরে মানসীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সেই করুণ হাসি আজও তেমনি রয়ে গিয়েছে।

তবে সে-হাসি সেদিনকার মতো আজও ক্ষণস্থায়ী। একটু বাদেই মিলিয়ে যায় মানসীর

মুখ থেকে। সে গম্ভীর স্বরে বলে, "যে কথা এমন করে আর বলি নি কাউকে, সেই কথাই আজ বলব তোমাকে। কেন জানো ?"

"না।"

"বাড়ির বাইরে যে এমন আপন-জনের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।"

আমি চুপ করে থাকি।

মানসী বলে, "সে কথা শুরু করতে হবে পনেরো বছর আগের এক বাসন্তী বিকেল থেকে।" মানসী থামে। একবার বাইরের দিকে তাকায়। গাড়ি ছুটে চলেছে, আমরা চলেছি। মানসীর মানসপটে ভেসে উঠেছে তার ফেলে আসা জীবনের ছবি।

মানসী মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকায়। সে শুরু করে, "স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বাবা ছুটি নিতে পারবে না। কোথাও যেতে পারি নি। সিনেমা-থিয়েটার লেক আর রেস্তোরাঁয় বসে দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছি। এমন সময় ছোড়দা একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে, 'পুরী যাবি নাকি ? কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি দিন সাতেকের জন্য।"

"যাবো।" বলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"ছোড়দা পরামর্শ দিল, "বাবাকে বল তাহলে।'

"সন্ধ্যার পরে বাবা চেম্বার থেকে ফিরে এলে তাকে বললাম কথাটা। বাবা ছোড়দাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল সব। আমার সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ মঞ্জু হল।

"কয়েকদিন বাদেই ছোড়দা ও তার বন্ধুদের সঙ্গে রওনা হলাম নীলাচলে, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্র সৈকতে। সেই আমার প্রথম সমুদ্র দর্শন। আর সেখানেই জীবনসমুদ্রের সৈকতে দাঁড়িয়ে প্রথম যৌবনকে আবিষ্কার করলাম।"

"কি রকম ?"

"ছোড়দার চারজন বন্ধু গিয়েছিল আমার সঙ্গে। বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, যৌবনের বেলাভূমিতে কেবল পা দিয়েছে। ওরা সবাই সমান উৎসাহী হয়ে উঠল আমার সম্পর্কে গাড়িতে ওঠার পরেই আমার সর্ববিধ সুখ-সুবিধার প্রতি প্রখর নজর দিতে আরম্ভ করল। আমার মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেলো ওদের মধ্যে।

"বিমলেন্দু সে প্রতিযোগিতায় ক্রমেই পেছিয়ে পড়তে থাকল। না পড়ে উপায় কি ? সে যে ছিল সবার চেয়ে লাজুক ও মুখচোরা। তার বাবা নেই, সে বড়ই গরীব। ছোড়দারা চার বন্ধু মিলে তার পুরী বেড়াবার খরচ দিয়েছে। সে দেখতে সুন্দর, লেখাপড়ায় ভাল— ছোড়দারা ভালোবাসে তাকে।

"আমারও ভালো লেগেছিল বিমলেন্দুকে। তাই সেদিন সন্ধ্যায়...." হঠাৎ থেমে যায় মানসী।

"থামলে কেন ?" আমি বলে উঠি।

মানসী হাসে, তেমনি করুণ হাসি। বলে, "একটু আগের থেকে, মানে সেদিন বিকেলে থেকে বলতে হবে।"

"বেশ বলো।"

"সেদিন বিকেলে তাস নিয়ে বসল ওরা। ভালো ছেলে বিমলেন্দু। সে তাস খেলতে পারে না। একখানা বই নিয়ে সে বেড়িয়ে পড়ল। আমি ওদের তাস খেলা দেখতে থাকলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, কিন্তু ওদের তাস খেলা শেষ হল না। শেষ ডিলে ড্র হওয়ায়

ওরা আবার নতুন করে খেলতে বসল। বিরক্ত হয়ে আমি একাই বেড়িয়ে পড়লাম।

"একলা ঘুরতে ভাল লাগল না বেশিক্ষণ। একটু নিরিবিলি দেখে একটা উঁচু বালিয়াড়ির কোলে বসলাম, যাতে ছোড়দারা খুঁজে না পায় আমাকে।

"কিন্তু যে পথ চেয়ে বসে থাকে, তার কাছে কি হারিয়ে যাওয়া যায় ? আঁধার ছাওয়া সাগর-বেলায় সে আমাকে খুঁজে পেলো। মুখচোরা বিমলেন্দু মুখর হল। সোজাসুজি প্রেম নিবেদন করল। লাজুক বিমলেন্দু আমার সব লজ্জা দূর করে দিল। আমি যৌবনকে আবিষ্কার করলাম। পুরুষের প্রথম পরশে আমার কুমারী জীবন পল্লবিত হয়ে উঠল।

"আঁধার সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সেদিন আমি আলোময় ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর হয়েছিলাম। বিমলেন্দকে মনে হয়েছিল আমার যৌবনের আলো, জীবন নায়ের কাণ্ডারী। জানতাম না যে সেই সুদর্শন ও মেধাবী ভাল ছেলেটি আমাকে একদিন মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দিতে পারে, আর সেই আঁধার ভরা সমুদ্রের মতো আমার জীবনটাও অন্ধকারময় হয়ে যেতে পারে।"

"কেন এমন হোল ?" আমি মাঝখান থেকে প্রশ্ন করি।

"কেন ?" মানসী আবার হাসে। তেমনি করুণ হাসি। "উচ্চ-মধ্যবিত্ত মহলে জীবনটা যে পয়সার শেকলে বাঁধা। মায়া-মমতা স্নেহ-ভক্তি প্রেম-ভালোবাসা সবই যে সে সমাজে টাকা দিয়ে ওজন করা হয়।"

"কিন্তু এ-কথা তো বিমলেন্দুর বেলায় খাটে না। সে গরীবের ছেলে।"

"সব গরীবই তো চিরকাল গরীব থাকে না। কোন কোন গরীব বড়লোক হয়। বিমলেন্দু আর গরীব নেই, সে এখন মিস্টার বি. মিট্রা, বার-এ্যাট-ল।'

"বিমলেন্দু কি ব্রাহ্মণ নয় ?" আমি প্রশ্ন করি।

"না।"

"তাই কি তোমার বাবা আপত্তি করেছিলেন ?"

"না। আমার বাবা বিলেত-ফেরত ডাক্তার। ব্রাহ্মণ কায়স্থর কোন পার্থক্য নেই তার কাছে। তবে কেন জানি না—বাবা বিমলেন্দুকে কোনদিনই খুব একটা সুনজরে দেখে নি। তবু বাবা বাধা দেয় নি আমাকে। সব শুনে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—তুই কি সব কিছু ভাল করে ভেবে দেখেছিস মা ? আমি মাথা নেড়েছিলাম। বাবা মত দিয়েছিল বিয়ের।"

"বিয়ের ?" আমি চমকে উঠি।

মানসী হাসে। বলে, "হ্যাঁ সখা, তোমার মানসী বিবাহিতা।" সে একবার থামে। তার পরে বলে, "সাত পাক ঘুরে, শাঁখা সিঁদুর পরে বিয়ে হয়েছিল আমার। তাই সেদিন বলেছিলাম সিঁদুর আমার কাছে খানিকটা লাল রঙ ছাড়া কিছুই নয়। সিঁদুরের রঙ আমার মনকে আর কোনদিন রাঙাতে পারবে না।"

"ক'বছর বাদে বিয়ে হল ?" আমি প্রশ্ন করি।

"পাঁচ বছর। বিমলেন্দু তখন ল কলেজের ছাত্র আর আমি ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ি। মহা ধুমধাম করে বাবা বিয়ে দিল আমাদের। বিয়ের পরে বিমলেন্দু রইলো আমাদের বাড়িতে, আমার কাছে। মিথ্যে বলে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিমলেন্দুকে দেবার পালা শেষ হল। বিয়ের পরে সে নিজেই বাবার কাছ থেকে টাকা নিত।"

'তোমার বাবার অনিচ্ছার কি কোন বিশেষ কারণ ছিল ?"

"কেমন করে বলব, বাবা কখনও বলে নি সে কথা। তবে বাবার ইচ্ছে ছিল তার এক বন্ধুর ডাক্তার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়। বাবা নাকি কথাও দিয়েছিল বন্ধুকে।

কথা না রাখতে পারার জন্য বন্ধু মহলে বাবাকে একটু অপদস্থ হতে হয়েছিল। তবু বাবা কখনই আমার ওপরে তার ইচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দেয় নি।" মানসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, "আজ ভাবি, বাবা যদি সেদিন তা করত, তাহলে হয়তো আজ আমার জীবনটা এমন পথে পথে কাটত না।"

"কিন্তু কেন এমন কাটছে ?"

"কেন ?" মানসী একটু থামে। তারপরে বলে, "তাহলে শোন—এল. এল. বি. পাশ করার পর বিমলেন্দু ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত চলে গেল। বাবাকে বলে আমি তাকে বিলেত পাঠিয়েছি। বাবা তার ব্যারিস্টারী পড়ার যাবতীয় খরচ জুগিয়েছে। আর খরচটা সে একটু বেশিই করেছে—পরের পয়সা কি না! প্রথম দিকে বছর খানেক নিয়মিত চিঠি লিখেছে। কিন্তু ক্রমেই চিঠির সংখ্যা কমে আসতে থাকল। শেষ দিকে টাকার তাগাদা ছাড়া কোন চিঠি আসত না। টাকা মানে নিয়মিত অঙ্কের ওপরে অতিরিক্ত দাবী। আমি ভাবতাম দাবীটা যুক্তিসম্মত। বাবা হয়তো সবই বুঝতে পারত, তবু বিনা প্রতিবাদে সে বিমলেন্দুর দাবী মিটিয়ে যেত, পাছে মেয়ের মনে কোন আঘাত লাগে।"

"তার পরে ?"

"তার পরে ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এল বিমলেন্দু। এলো আমাদের না জানিয়ে। কয়েক দিন বাদে বাবা জানতে পারল খবরটা। সে তখন হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস শুরু করে দিয়েছে।"

"সে কি, সে তোমাদের বাড়িতে এলো না ?"

"না।" মানসী আবার হাসে, "কারণ তখন আর আমাকে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া আমার কাছে আসার বাধাও ছিল তার। সে একা বিলেতে গেলেও, একা ফিরে আসে নি দেশে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীকে।"

"স্ত্রীকে ? আবার বিয়ে করেছে বিমলেন্দু ?"

"হ্যাঁ। আর তা করেছে দু বছর আগে। তার মানে সেই বিয়ে করার পরেও বাবার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নিয়েছে সে।"

"প্রতারক।" আমি নিজের অজ্ঞাতে বলে উঠি।

"না। প্রতিভাবান, জিনিয়াস।" মানসী বলে, "জাতে উঠতে হলে মানুষকে এমন করতে হয়। শ্বেতাঙ্গিনীর স্বামী হবার একটা আলাদা মর্যাদা আছে আমাদের সমাজে। তবে মেয়েটির কোন দোষ নেই। সে আমার কথা কিছুই জানত না।"

"তুমি আইনের আশ্রয় নাও নি ?"

"ইচ্ছে ছিল না তবে দাদাদের জন্য বাধ্য হয়েছিলাম। বিমলেন্দু যে প্রতারণা করেছে, তার অকাট্য প্রমাণ ছিল আমাদের কাছে। বিয়ের ফটো ও তার চিঠি-পত্র। বিচারে হয়তো শাস্তি হত তার। কিন্তু...."

মানসী হঠাৎ থামে। আমি তার মুখের দিকে তাকাই। মানসী বলে, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করিয়ে মামলা মিটিয়ে ফেলেছি আমি।"

"কেন ?"

"নিরপরাধ ভিনদেশী অসহায়া মেয়েটার কথা ভেবে বিমলেন্দুকে শাস্তি দিতে পারলাম না। আমার তো বাবা আছে, দাদারা আছে, আত্মীয়-স্বজন সব আছে। কিন্তু ওর কে আছে ? ভালোবাসার জন্য যে নিজের সমাজ ও দেশ ছেড়ে এতদূরে এসেছে, তার এত বড় সর্বনাশ

আমি কেমন করে করি বলো!"

"কেবল তার কথাই ভাবলে, নিজের কথাটা ভাবলে না?"

"বিমলেন্দুকে শাস্তি দিলে যে মারিয়ার জীবনটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তাছাড়া শুনানীর আগের দিন আমাদের বাড়িতে এসে সে যে তার স্বামীর সম্মান ও নিজের শান্তি প্রার্থনা করেছিল আমার কাছে। আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। কেমন করে পারি বলো। মেয়ে হয়ে কোন মেয়ের এত বড় সর্বনাশ কি করা যায়? তাই আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, আমার যতো বড় ক্ষতিই সে করে থাক, আমি তার কোন ক্ষতি করব না।

"আমার দরখাস্তে বিমলেন্দুর শাস্তি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু পরদিন আদালতে দাঁড়িয়ে আমি জজ সাহেবকে বললাম—আমি ওকে শাস্তি দিতে চাই না ধর্মাবতার! আপনি দয়া করে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে বিমলেন্দুকে মুক্তি দিন।

"কেবল জজ সাহেব নন, আমার বাবা, দাদা, ব্যারিস্টার, সলিসিটার, এমন কি বিমলেন্দু নিজে পর্যন্ত, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। জজ সাহেব আমার এই অদ্ভুত আবেদনের কারণ জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম—বিমলেন্দু শাস্তি পেলে তো আমার সমস্যার সমাধান হবে না হুজুর! মাঝখান থেকে মারিয়ার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। তার জীবনটাকে নষ্ট করে দেবার কোন অধিকার নেই আমার। আর বিমলেন্দু আমার যত ক্ষতিই করে থাক তার কোন ক্ষতি হোক, এ তো আমি চাইতে পারি না। তাকে যে আমি ভালোবেসেছিলাম, স্বামী বলে বরণ করেছিলাম।"

"চমৎকার! এমন আদর্শ রমণী হলে যে জীবনটা সুখের হবে না, এ তো জানা কথা।" আমি বলে উঠি।

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে মানসী বলে, "তুমি শুনে অবাক হবে, মারিয়া মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তবে আমি আর বিমলেন্দুর মুখদর্শন করি নি। সে-ও সাহস করে কোন দিন আমার সামনে আসে নি, আসবেও না।" থামে মানসী।

আমি কোন কথা বলি না। কি বলব? কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তার পরে হঠাৎ হেসে ওঠে মানসী। আমি তার দিকে তাকাই। সে বলে, "বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হবার পরে আমার বাবার পদবীটা লিখতে শুরু করে দিলাম। প্রথম দিকে বেশ একটু অসুবিধা হত। কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে এলো। মানুষ অভ্যেসের দাস।

"দাদারা অবশ্য আবার পদবীটা পাল্টাবার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু আমি তা সমর্থন করি নি। কেন করব বল, যে জীবনে এতো বঞ্চনা, সে জীবনের প্রতি কি আর কোন আসক্তি থাকতে পারে?"

"বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?"

"বাবা আছে। আর কে থাকবে? দাদা ও ছোড়দা বাইরে থাকে, দুজনেই বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে আসে। আমার কাছে বাবাই সব। আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়, আমার জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তুমি আমার বাবাকে দেখো নি সখা, অমন মানুষ হয় না। তাই তো মাঝে মাঝে বলে—আমি চোখ বুজলে, কে দেখবে তোকে? আচ্ছা, এ সব অগ্রিম চিন্তার কোন মানে হয়, তুমিই বলো। কতই বা বয়েস হয়েছে। গত মাসে পঁয়ষট্টিতে পা দিয়েছে। আজকাল তো আশি নব্বুই বছর সবাই বাঁচে। আমার তো ধারণা বাবা আরও বেশি বাঁচবে।"

"তোমার পিসীমা কোথায়?"

মুহূর্তে মুখখানি করুণ হয়ে ওঠে মানসীর। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভারী স্বরে বলে,

"স্বর্গে গেছে। বিমলেন্দু বিলেত থেকে বিয়ে করে এসেছে শুনে পিসীমা সেই যে বিছানা নিয়েছিল, আর তা ছাড়তে পারে নি। পিসীমাকে মেরে ফেলেছে বিমলেন্দু। সে খুনি।"

কি বলব আমি। চুপ করে থাকি আর ভাবি—সেই খুনীকে ক্ষমা করেছে মানসী।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন পাঠানকোট পৌঁছল। মানসীর সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দুজনে ক্লোক্‌রুমের সামনে আসি। মানসী জিজ্ঞেস করে, "এখানে কেন ?"

"আমার বুকস্যাক ও কিটটা জমা রেখে দেব।"

"তার মানে, এবারে দুজনের মালপত্র আলাদা হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ। কিছুক্ষণ বাদে যে আমাদেরও আলাদা হয়ে যেতে হবে।"

"তা বটে।" মানসী শান্তস্বরে বলে।

মানসীর মুখের দিকে তাকাই। জিজ্ঞেস করি, "তোমার কি আজ না গেলেই নয় ?"

মানসী আমার দিকে তাকায়। আমি আবার বলি, "তোমার বাবা তো ভালই আছেন। দিন দুয়েক পরে রওনা হলে সবাই এক সঙ্গে কলকাতায় ফিরতে পারতাম।"

"তাতে কি লাভ হত সখা ?"

"আরও কয়েকটা দিন এক সঙ্গে থাকা যেত।"

"কয়েকটা দিন নিয়ে তো জীবন নয়। বিদায় যখন নিতেই হবে, তখন তাড়াতাড়ি নেওয়াই ভাল। তাছাড়া তোমার সহযাত্রীদের কাছে আমার কি পরিচয় দেবে ?"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী আবার বলে, "তোমাকে তো বলেছি সখা, সংসারে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। আমাকে তুমি বাবার কাছে ফিরে যেতে দাও।"

"বেশ, তাই যাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর শতায়ু হোক। কিন্তু একটা কথা—তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যেও আমাকে।"

"কি হবে আমার ঠিকানা দিয়ে ?"

"কলকাতায় ফিরে দেখা করব।"

"পথের পরিচয়কে কি পথেই শেষ করে দেওয়া ভাল নয় ? কলকাতা যে বড়ই কঠিন।"

"তা হোক গে। তুমি ঠিকানাটা দাও।"

"না নিয়ে ছাড়বে না দেখছি।" মানসী হাসে।

"না।"

"বেশ দেব। তুমি চাইলে কি আমি না দিয়ে পারি ! যাক্ গে, এখন তো তোমার মালপত্র জমা রেখে আমাকে নিয়ে চলো ওয়েটিংরুমে। আমি স্নান সেরে নেব। তার পরে একবার বাজারে যেতে হবে।"

"কেন ?" জিজ্ঞেস করি।

"বাবার জন্য এক বাক্স আপেল নিয়ে যাবো।"

আর কথা না বাড়িয়ে মাল জমা দিতে ক্লোকরুমের ভেতরে ঢুকি। কাজ সেরে মানসীকে নিয়ে আসি আপার ক্লাস লেডিজ ওয়েটিং-রুমের সামনে। বলি, "ভেতরে যাও। মালপত্র বেয়ারার জিম্মায় রেখে স্নান করে নাও। আমি একটু বাদে আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"একবার প্যাসেঞ্জার্স মেল-বক্সটা দেখে আসি। যদি কোন চিঠি-পত্র এসে থাকে।"

"হ্যাঁ, যাও। দেখে তো আমার কোন চিঠি আছে কি না। বাবার একটা চিঠি পেলে নিশ্চিন্তে গাড়িতে উঠে বসতে পারতাম। তাই বলে তুমি দেরি করো না যেন। তাড়াতাড়ি ফির এসো কিন্তু।"

"আচ্ছা।" হাঁটতে থাকি। হাসি পায় আমার। আর কতক্ষণই বা আছি একসঙ্গে। সাড়ে ছ'টা বাজে, সাড়ে আটটায় ওর গাড়ি ছাড়বে।

স্টেশন মাস্টারের অফিসের সামনে, দেযালের সঙ্গে ঝুলানো রয়েছে কাঠের একটা শেলফ্। তিনটি তাকই চিঠি-পত্রে বোঝাই। বহু টেলিগ্রামও রয়েছে। স্টেশন মাস্টারের প্রযত্নে যাত্রীদের যতো চিঠি-পত্র আসে, সবই রেখে দেওয়া হয় এখানে। যাত্রীরা যাতায়াতের পথে নিজেদের চিঠি-পত্র নিয়ে যান। বহু যাত্রী নিতে আসেন না। তাঁদের চিঠি-পত্র পড়ে আছে। কয়েকজন যাত্রী নিজেদের চিঠি খুঁজছেন। আমিও হাত লাগাই।

দাশুর চিঠি পেলাম। মানালী থেকে লেখা আমার চিঠি ও টেলিগ্রামের উত্তর। প্রাণেশ ও বিশ্বদেব ভাল আছে। শেরপারা বেরিলী হাসপাতালে। তারা সেরে উঠছে। ইচ্ছে করলে আমরা যাবার পথে বেরিলীতে নেমে তাদের দেখে যেতে পারি।

মানসীর কোন চিঠি নেই। আবার খুঁজতে থাকি। এটা কার ? হ্যাঁ তারই নাম—মানসী মুখোপাধ্যায়। কিন্তু টেলিগ্রাম কেন ? টেলিগ্রাম তো থাকার কথা আমার। মানসীর নামে টেলিগ্রাম ? তাড়াতাড়ি খুলে ফেলি।

"তুমি এখনও চিঠি খুঁজছো।"

পেছনে মানসীর গলা শুনে চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা পকেটে রাখি।

মানসী কাছে আসে। সে বলে, "দেখলে, তোমার চিঠি খোঁজার মাঝে আমার স্নান হয়ে গেলো।"

"হ্যাঁ।" স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করি।

"পেলে কোন চিঠি ?"

"এ্যাঁ, হ্যাঁ। দাশুর একটা চিঠি এসেছে।"

"কি লিখেছেন ?"

"বিশ্বদেব ও প্রাণেশ ভাল আছে। শেরপারা ভাল আছে।"

"আমার কোন চিঠি নেই ?"

"না।" একবার থামি। তার পরে হেসে বলি, "আজ যে হঠাৎ যোগিনীর বেশ ধারণ করেছ ?" সাদা শাড়ি ও সাদা জামা পরেছে মানসী।

"আজ যে মনের মানুষকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাই মনের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে পোশাক পরেছি।"

"কিন্তু সাদা পোশাক যে গাড়িতে নোংরা হয়ে যাবে।" আমি বলি।

"তাই তো পরলাম। নোংরাটা যাতে পোশাকের ওপর দিয়েই শেষ হয়ে যায়, মনের ওপরে কোন দাগ কাটতে না পারে।"

"আমি চুপ করে থাকি। মানসী বলে, "চলো, চা খেয়ে বাজার থেকে ঘুরে আসি। বাবার জন্য আপেল নিতে হবে।"

চা খেয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম। একটা রিক্শায় উঠে বসলাম। মানসী হাসতে হাসতে বলে, "শেষ বারের মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে নাও।"

আমি চুপ করে থাকি।

মানসী আবার বলে, "তাই বা বলি কেমন করে ? হয়তো কোন এক শীতের সন্ধ্যায় আবার আমরা এমনি পাশাপাশি পথ চলব। মানুষ যে আগের থেকে কিছুই জানতে পারে না।"

মানসী বলে, "মন খারাপ করছো কেন ? এই তো জীবন। পৃথিবীটা যে পান্থশালা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই হাসিমুখে প্রিয়জনকে বিদায় দিতে হয়।"

আমি হাসি। মানসী হাসে। তেমনি করুণ হাসি।

আপেল কিনে ফিরে আসি স্টেশনে। রিজার্ভেশান কাউন্টার থেকে মানসীর বার্থ নম্বর নিই। তার পরে বলি, "চলো, কিছু খেয়ে নেবে।"

"তুমি ?"

"আমিও খাবো বৈ কি।"

"আচ্ছা, তোমার থাকার জায়গার তো কোন ব্যবস্থা করলে না ?"

"করেছি। তোমার ট্রেন চলে যাবার পরে একটা রিটায়ারিং রুম পাবো।"

"ঠিক বলছো তো ?"

"হ্যাঁ।" হাসি পায় আমার। স্বেচ্ছায় আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তবু আমার জন্য ওর কতো উৎকণ্ঠা ! হয়তো এরই নাম ভালোবাসা।

মানসী বলে, "সাবধানে থেকো। ঠাণ্ডা থেকে গরমে এসেছো, একা একা কাটাতে হবে। নিজের ওপর একটু নজর রেখো।"

আমরা রিফ্রেশমেন্ট রুমে ঢুকি। মুখোমুখি দুখানি চেয়ারে বসি। বেয়ারা খাবার দেয়। মানসী বলে ওঠে, "এ কি, নিরামিষ ?"

"তাই দিতে বলেছি।"

"কেন ?"

"যাত্রাপথে নিরামিষ খাওয়াই ভাল, বিশেষ করে রেলে মাছ-মাংস না খাওয়াই উচিত।" আমি খেতে শুরু করি।

মানসীও হাত লাগায়। বলে, "তাহলে কি গাড়িতেও আমি ভেজিটারিয়ান খাবার নেব।"

"তাই তো ভাল।" আমি বলি।

"বেশ। আর তোমার অবাধ্য হব না।" মানসী খেতে শুরু করে।

"কখনও হয়েছো নাকি ?" জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ। বহুবার।" মানসী উত্তর দেয়, "মানালীতে দেখা হবার পর থেকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি, অনেক অত্যাচার করেছি, অনেকবার অবাধ্য হয়েছি তোমার। জানি তুমি কিছু মনে করো নি। তুমি উদার, তুমি অসীম, অসাধারণ তোমার ভালোবাসা। তবু তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি আমার সব অপরাধ মার্জনা করো।"

মানসীর চোখে জল। আমি মুছিয়ে দিতে পারি না। এখানে অনেক লোক। কেবল বলি, "ছিঃ, তুমি কাঁদছ মানসী ! যদি কখনও আমাকে অপ্রিয় কথা বলে থাকো, তুমি আমার পরমপ্রিয় বলেই বলতে পেরেছো, অত্যাচার যদি কিছু করে থাকো, তোমার সে অধিকার আছে বলেই করেছো। আর যে যার যতো বেশী বাধ্যের, সেই তো তার ততো বেশী অবাধ্য হয়। তোমার ক্ষমা চাওয়ার বা আমার ক্ষমা করার আর যে কোন সুযোগই নেই।"

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গেছে। মানসীর মালপত্র নিয়ে নির্দিষ্ট কামরার সামনে আসি। গাড়িতে উঠি। ওর মালপত্র গুছিয়ে রাখি। বিছানা খুলতে দেখে মানসী প্রতিবাদ করে ওঠে,

"তুমি আবার হাঙ্গামা করছ কেন ? গাড়ি ছাড়ুক, আমি বিছানা পেতে নেব। আজকাল আমি তো একাই চলা-ফেরা করি। এ-সব করার অভ্যেস আছে আমার।"

"এখনও তো একা নও তুমি। যতক্ষণ কাছে আছি, আমি করে দেব। একটু আগে কথা দিয়েছো আর আমার অবাধ্য হবে না।"

মানসী কেন কথা বলে না। আমি ওর বিছানা পেতে দিয়ে বলি, "রাতে জানালা খুলে রেখো না। একটা চাদর ওপরে রেখে দিলাম, শেষরাতে ঠাণ্ডা লাগলে গায়ে দিও। জল-খাবারগুলো এখানে রইলো, কাল দরকার মতো খেয়ো। আর দুপুরে ও রাতে নিরামিষ খাবার নিও।"

মানসী ঘাড় নাড়ে। স্টেশনের ঘন্টা পড়ে—ঢং ঢং ঢং। সময় সমাগত। আর পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ি ছাড়বে। যাঁরা আপনজনকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছেন। মানসী বলে ওঠে, 'তুমি এখুনি নেমো না, এখনও তো পাঁচ মিনিট বাকি আছে।"

তবু আমি উঠে দাঁড়াই। মানসীও উঠে দাঁড়ায়। আমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে সহসা নিচু হয়ে প্রণাম করে আমাকে।

বেরিয়ে আসি গাড়ি থেকে। প্লাটফর্মে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়াই। মানসীর চোখে জল। মানসী কাঁদছে। আমি ?

আমি পারি নি কিন্তু মানসী পারে। এতো মানুষের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে সে আমার চোখ মুছিয়ে দেয়। আমার একখানি হাত হাতে তুলে নেয়। কান্না-মাখানো স্বরে বলে, "আমি তোমার সব কথা শুনবো, তুমি আমার একটা কথা রাখবে বলো।"

"রাখবো।"

"নিজের শরীরের দিকে একটু নজর দিও। কলকাতায় ফিরে হাঁপানির চিকিৎসা করিও। এখনও তোমার অনেক কাজ বাকি। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে।"

"তোমার কথা আমার মনে থাকবে মানসী।"

গার্ডের বাঁশি বেজে ওঠে। চমকে উঠি। পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখুনি গাড়ি চলতে শুরু করবে। মানসী চলে যাবে আমাকে ছেড়ে। মানসী আমার হাতখানি দু হাতে আরও জোর করে ধরে।

গাড়ি চলতে শুরু করে। আমি মানসীর দিকে তাকাই। মানসী আমার দিকে তাকায়। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকি। মানসী দু হাতে আমার হাত ধরে থাকে।

গাড়ির বেগ বাড়ে। মানসী আমার হাত ছেড়ে দেয়।

আমি পেছিয়ে পড়ি। মানসী এগিয়ে যায়। মানসী হাত নাড়ে।

দূরে আরও দূরে। মানসী দূরে চলে যায়। মানসী অদৃশ্য হয়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়াল নেই। খেয়াল হতে দেখি প্ল্যাটফর্মে প্রায় জনশূন্য। যাঁরা প্রিয়জনকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই চলে গেছেন ঘরে। আমি কেবল ঘরছাড়া সঙ্গীহারা। মানসীও চলে গেছে। আমি পড়ে আছি একা।

কিন্তু তাকে তো কোনমতেই ধরে রাখা সম্ভব ছিলো না। তেমন জোর করে বললে হয়তো সে থেকে যেতো, কিন্তু টেলিগ্রামটা পাবার পরে আমি কেমন করে ধরে রাখি ওকে ! পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বের করি। মানসীর দাদার টেলিগ্রাম—

'Father expired. Come immediately.'

নেই। যাঁর জন্য মানসী আমাকে ফেলে চলে গেল, তিনি আর ইহলোকে নেই। যাঁর জন্য মানসী আপেল নিয়ে গেল, তিনি নেই। মানসীর বাবা আর নেই।

এতো বড় দুঃসংবাদ আমি কেমন করে দেব তাকে ? সব জেনেও আমি তাকে কিছুই জানাই নি। জানালে তার পক্ষে একা কলকাতায় ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাছাড়া কাঁদতে তো তাকে হবেই। আজও সে বলেছে, সংসারে বাবাই তার একমাত্র সম্বল। মানসীর জীবনের সেই অবলম্বন আর নেই। মানসী আজ সর্বহারা। তবু তার কান্নাকে দুটো দিনের মতো থামিয়ে রেখেছি আমি। তাকে টেলিগ্রামের কথা বলি নি।

কিন্তু মানসী বাড়িতে পৌঁছে যে একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়বে ? সে যে কিছুই জানে না। হয়তো সে ট্যাক্সি থেকে নেমে 'বাবা' 'বাবা' বলে চিৎকার করতে করতে ভেতরে ঢুকবে। তার দাদারা এসে গেছেন কলকাতায়। তাঁদের ঐ বেশে দেখে মানসী অজ্ঞান হয়ে যাবে। না, না, কাজটা ঠিক হয়নি। মানসীকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল। তাকে দু-একদিন এখানে রেখে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলকাতায় পাঠানো উচিত ছিল। আমার সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল।

এতো বড় ভুল আমি কেন করলাম ? এতোখানি নির্দয় আমি কেমন করে হলাম ?

এখন উপায় ?

একটা কাজ করা যেতে পারে। আমি মানসীর দাদাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিই। জানিয়ে দিই মানসী যাচ্ছে, তাঁরা যেন স্টেশনে লোক পাঠান। আর মানসীকে একখানি চিঠি লিখে দিই। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একখানি চিঠি লেখা আমার একান্তই প্রয়োজন।

কিন্তু....। ঠিকানা ? মানসীর ঠিকানা ?

মানসী তো তার ঠিকানা দিয়ে যায় নি আমাকে। আমি চেয়েছিলাম, সে বলেছিল দেবে। কিন্তু দেয় নি। আমিও চেয়ে রাখতে ভুলে গেছি। চরম ভুল। হয়ত এ ভুলের মাশুল দিতে হবে সারা জীবন।

আশ্চর্য! সেদিন মানালীতে তার সঙ্গে দেখা হবার সময়ও যেমন ভাবতে পারি নি মানসীকে আমি এতো আপন করে কাছে পাবো, আজ গাড়ি ছেড়ে দেবার সময়ও তেমনি ভাবতে পারি নি মানসীকে আমি এমন করে হারিয়ে ফেলব।

এই বুঝি জগতের নিয়ম। না চাইতে পায়—আবার পাওয়ার পরেও হারিয়ে যায়। মানসী হারিয়ে গেল।

কিন্তু মানসী বোধহয় এই চেয়েছিল। আমি না হয় টেলিগ্রামটা পাবার পর থেকেই বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কোনমতে তার সামনে সহজ থেকেছি, অভিনয় করেছি। ফলে ঠিকানাটা চেয়ে রাখতে ভুলে গেছি। কিন্তু মানসীর তো ভুল হবার কোন কারণ নেই। সে ইচ্ছে করেই তার ঠিকানা দেয় নি। সে যে বলেছিল—একসঙ্গে এই পথ-চলার পালা পাঠানকোটে সাঙ্গ করে দিতে হবে। একে আমি কিছুতেই কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাব না। কলকাতা বড়ই কঠিন।

তাই করেছে মানসী। সে হয়তো ভালই করেছে।

কিন্তু আমি ? যাকে একদিন দিনের আলোয় মানালীতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, আজ এই রাতের আঁধারে তাকে পাঠানকোটে ফেললাম হারিয়ে।

মানসী মিলিয়ে গেল। মানসী কি হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে ?

লীলাভূমি লাহুল

[রোতাং গিরিবর্ত্ম, লাহুল ও
স্পিতি উপত্যকা এবং ত্রিলোকনাথ]

আমার মানসী,

তোমার বোধহয় মনে আছে ? সেই সেবার তুমি শুনতে চেয়েছিলে লাহুলের কথা। কিন্তু রোতাং গিরিবর্ত্মের কথা শেষ না হতেই সেদিন আমাদের বাসযাত্রার যতি পড়েছিল যোগীন্দর নগরে। নতুন শহরের নতুন পরিবেশে পুরনো প্রসঙ্গটা গিয়েছিল হারিয়ে। লাহুলের কথা আর বলা হয় নি তোমাকে।

না-বলা সেই কথার মালা গাঁথার জন্যই আজ লেখনী নিয়ে বসেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কোনখান থেকে শুরু করব ? মানালী (৬,০০০´) থেকে কি ? মানালী থেকেই যে লাহুলের পথ। একটি নয়, দুটি পথ। প্রথমটি রোতাং (১৩,০৫০´) আর দ্বিতীয়টি হামতা (১৪,০২৭´) গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে।

তাহলেও মানালীর কথা থাক। বিপাশা বিধৌত কুলু উপত্যকার সীমান্ত মানালীর কথা আর তোমাকে নতুন করে কি বলব ! মানালীর পথেই তো তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমাদের দুজনের জীবনের অনেক মধুর স্মৃতি মিশে আছে মানালীর মালঞ্চে।

তাই মানালীর কথা থাক, রোতাং থেকেই শুরু করা যাক্। রোতাং গিরিবর্ত্মই লাহুলের প্রধান প্রবেশ তোরণ। রোতাং পেরিয়েই লাহুল—লীলাভূমি লাহুল।'

রোতাং গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ পাদদেশ রাহালায় আমাদের বাসপথ শেষ হয়ে গিয়েছিল। মানালী থেকে রাহালা ৯ মাইল। রাহালায় একরাত কাটিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে রোতাং পৌঁচেছি। কাজটি মোটেই সহজ নয়। কম তো নয়, পাঁচ মাইলে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট চড়াই। রাহালা ৮,৫০০´ আর রোতাং ১৩,০৫০ ফুট।

সেবারেই তোমাকে আমি বলেছি মানসী, রোতাং থেকে সৃষ্ট হয়েছে বিপাশা—কুলু উপত্যকার প্রাণধারা বিয়াস। হিমালয় বিশারদ কেনেথ মেসন তাঁর 'Abode of Snow' বইতে বলেছেন—

'At the head of Beas the Rohtang pass takes
a fairly easy treak to Lahoul.'

তাই বলে তুমি আবার 'fairly easy' শব্দ দুটির অর্থ করতে গিয়ে 'সহজ' শব্দটি ব্যবহার কোরো না যেন। বিপাশার উৎস রোতাং গিরিবর্ত্ম দিয়ে লাহুলের সংক্ষিপ্ততম পথ, এই পর্যন্ত।

রোতাং একটি তিব্বতী শব্দ। অর্থ মৃতদেহের স্তূপ। 'রো' মানে মৃতদেহ, 'থাং' মানে স্তূপ। রোথাং শব্দের অপভ্রংশ রোতাং। এর চেয়ে উচ্চতর অসংখ্য গিরিবর্ত্ম আছে হিমালয়ে কিন্তু এমন সঙ্কটময় গিরিবর্ত্ম খুব কমই আছে। আকস্মিক তুষার-ঝড়ের জন্য তার দুর্নাম সর্বজনবিদিত। এই ঝড়ের কবলে পড়ে বহু মানুষ ও ভারবাহী পশু মৃত্যু বরণ করেছে রোতাং গিরিবর্ত্মে। আর তাই তিব্বতীরা তার এমন নাম দিয়েছে। এই নামেই সে আজ সর্বত্র পরিচিত।

নামটি কিন্তু খুব পুরনো নয়। উইলিয়াম মূরক্রফ্‌ট ও তাঁর সহযাত্রী জর্জ ট্রেবেক যখন ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন.....।

ও ! তুমি তো আবার তাঁদের চেনো না। আচ্ছা তাঁদের সঙ্গে তোমাকে আমি একটু বাদে পরিচয় করিয়ে দেবো। আগে রোতাং-এর কথা বলে নিই।

মূরক্রফ্‌ট এবং ট্রেবেক যখন এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন, তখন এর নাম ছিল 'রিতঙ্কা জোত্'। এদেশে গিরিশিখরকে বলে জোত্। তার মানে এই গিরিবর্ত্মকে স্থানীয়রা একটি গিরিশিখর বলে মনে করতেন।

মূরক্রফ্‌ট কিন্তু সে ভুল করেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এটি একটি গিরিপথ। তবে তিনি রিতঙ্কা জোত্ নামটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

'The Ghat or pass of Ritanka Joth, which is above thirteen thousand three hundred feet high, forms a gap in the most northern and elevated mountains of Kulu, running with a tolerably level Surface, about quarter of a mile in breadth, for a short distance between mountains of not much greater elevation.'

তবে মূরক্রফ্‌ট-এর পরে রিতঙ্কা জোত্ নামটি খুব বেশীদিন প্রচলিত ছিল না। কারণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সার্জেন ডক্টর জে. সি. গেরার্ড স্পিতি উপত্যকা সমীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকেই প্রথম রোতাং নামটি পাই। তাই মনে হয় ডক্টর গেরার্ড আসার আগের থেকেই এই গিরিবর্ত্মকে রোতাং নামে ডাকা শুরু হয়ে গেছে।

তোমার নিশ্চয়ই 'বিয়াস রিখি'র কথা মনে আছে মানসী ! বিপাশার উৎস বিয়াস রিখি—রোতাং গিরিবর্ত্মের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত একটি ছোট কুণ্ড। পাশেই পাথরের ছোট্ট মন্দির। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং-এর সৈন্যদল কুলু রাজ্য অধিকার করার পরে, তাঁর সেনাপতি লেহনা সিং ঐ মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছিলেন।

মূরক্রফ্‌ট যখন রোতাং-এ আসেন, তখন সেই মন্দিরে ছোট একটি পাথরের মূর্তি ছিল। সেটি নাকি ছিল ব্যাসদেবের মূর্তি আর সেকালের বিপাশার উৎসকুণ্ডকে 'ব্যাস ঋষি' বলা হত। মূরক্রফ্‌ট নিজেই লিখেছেন—'Byas Rishi'. 'ব্যস ঋষি' 'বিয়াস রিখি' হয়েছে।

যাক্ গে, মূরক্রফ্‌ট-এর বর্ণনা থেকে তুমি আশা করি রোতাং গিরিবর্ত্মের মোটামুটি চেহারাটা বুঝতে পেরেছ। সেই সঙ্গে আমি শুধু যোগ করছি, রোতাং একফালি প্রায় সমতল প্রান্তর—উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। দৈর্ঘ্যে আড়াই মাইলের মতো আর প্রস্থে আধ মাইল।

এই গিরিবর্ত্মের উচ্চতা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন ১৩,০৫০ ফুট, কেউ ১৩,৩০০ ফুট আবার কেউ বা ১৩,৪০০ ফুট। আমি কিন্তু প্রথমটিকেই সঠিক বলে মনে করি।

গিরিবর্ত্মের বাঁ দিকে পাঁচ-ছয়শ' ফুট উঁচুতে সরকুণ্ড নামে একটি ছোট হ্রদ আছে। প্রতি বছর ২০শে ভাদ্র কুলু এবং লাহুল-স্পিতি থেকে বহু পুণ্যার্থী এই কুণ্ডে স্নান করতে আসেন। তাঁদের বিশ্বাস সেই শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে পুণ্যময় সরকুণ্ডে স্নান করলে সর্বরোগ মুক্ত হওয়া যায়।

দু'পাশে পাহাড়ের প্রাচীর থাকায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি না মানসী ! নইলে গিরিবর্ত্মের সমতল প্রান্তরে পায়চারি করার সময় দেখতে পেতাম সোনাপানি হিমবাহ এবং যুগল গেফান

পর্বতশৃঙ্গকে। সিমলাতে 'রিজ'-এর ওপরে দাঁড়িয়ে তুমি নিশ্চয়ই এই শৃঙ্গ দুটির উচ্চতরটিকে দেখেছ। দেখে বিমোহিত হয়েছ।

স্বভাবতই তুমি প্রশ্ন করতে পারো, কে বা কারা প্রথম এই গিরিপথ অতিক্রম করেছেন ? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তোমাকে ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ডুব দিতে হবে। সেকালের ভারতীয় ঋষি ও দার্শনিকরা সত্যানুসন্ধানের জন্য হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে এসে জীবন ধারণ করেছেন। ধর্মপ্রচারকরা তিব্বত, চীন ও নেপালে গিয়েছেন। হিমালয়ের এক উপত্যকার রাজা আর এক উপত্যকার রাজ্য আক্রমণ করেছেন। যেমন ধরো দ্বাদশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে কুলুর রাজারা তিনবার লাহুল আক্রমণ করেছেন। কিন্তু সে-সব যাত্রা ও যুদ্ধের কোনো বিশদ বিবরণ নেই। কাজেই তাঁদের কে বা কারা প্রথম রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছেন বলা সম্ভব নয়।

অতএব ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য যেমন আমরা বিদেশী ঐতিহাসিকদের ওপর নির্ভর করে থাকি, তেমনি এসো রোতাং-এর ইতিহাসের জন্যও তাঁদের শরণাগত হই। কারণ তা ছাড়া যে হিমালয়কে জানার আর কোন উপায় নেই। হিমালয় আমাদের, কিন্তু য়ুরোপের মানুষরা এসে তার সঙ্গে আমাদের সত্যিকারের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন দেশীয় জেসুইট মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে যান। ফাদার এ্যান্টনি মনসেরাট (Anthony Monserrate) নামে তাঁদেরই একজন ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হিমালয়ের মানচিত্র অঙ্কন করেন। অবশ্য তাঁর এই অভিনব সৃষ্টির পেছনে সম্রাট আকবরের সক্রিয় সাহায্য ছিল। ফাদার মনসেরাট ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের দরবার উপস্থিত হয়েছিলেন।

এবারে তোমার মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক্—কে বা কারা প্রথম রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছেন ? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তোমাকে জেসুইট মিশনারীদের কিছু কাহিনী শুনতে হবে।

ফাদার আনতনিয়ো দ্য আঁদ্রেদ (Antonio de Andrade) এবং ব্রাদার ম্যানুয়েল মার্কুইস (Manuel Marques) নামে দুজন জেসুইট মিশনারী ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ আগ্রা থেকে রওনা হয়ে মানা গিরিবর্ত্ম (১৮,৪০০´) অতিক্রম করে তিব্বতে পৌঁছন। তাদের প্রচেষ্টায় ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তিব্বতে প্রথম গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। চার বছরে চারশ' তিব্বতী খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন। স্থানীয় রাজা নিজেও খ্রীষ্টান হন। ফলে রাজ্যে বিপ্লব শুরু হয়। দেশবাসীরা চারশ' খ্রীষ্টানকে ক্রীতদাসে পরিণত করে, রাজা ও দুজন মিশনারীকে লাদাখে তাড়িয়ে দেন।

এই সংবাদে বিচলিত হয়ে ফাদার ফ্রান্সিসকো দ্যা এ্যাজেভদো (Francisco de Azevedo) নামে জনৈক ৫২ বছরের প্রবীণ যাজক ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মানা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে উচ্চ-শতদ্রু উপত্যকায় অবস্থিত তিব্বতের গুগে রাজ্যের রাজধানী সাপারাং পৌঁছন। সেখানে জন দ্যা অলিভিয়েরা (John de Oliviera) নাম একজন স্বদেশবাসীর সঙ্গে মিলিত হন। তিনি পাঁচ বছর ধরে সেখানে বাস করছিলেন। ফলে ভাল তিব্বতী বলতে পারতেন। এ্যাজেভদো তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শতদ্রু নদীর উত্তরাংশে অবস্থিত মালভূমি অতিক্রম করে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর লাদাখের রাজধানী লে শহরে উপস্থিত হন।

দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সফল হন। তাঁরা নির্বাসিত মিশনারীদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ভ্রাতৃত্ববোধের এমন দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে তুমি খুব বেশি খুঁজে পাবে না মানসী ! যাই হোক, কিছুদিন বাদে তাঁরা আবার ভারতের রওনা হন।

ফেরার পথে এ্যাজেভদো সুদীর্ঘ ও শীতল তিব্বতীয় মালভূমির পথকে এড়াবার জন্য কুলুর দিকে রওনা হন। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে তাঁরা লে থেকে রওনা হয়ে তাগালাং (১৭,৫০০´), লাচালুং (১৬,৬০০´), বড়ালাচা (১৬,২০০´) এবং রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে কুলু উপত্যকায় আসেন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে যখন হিমালয় ছিল অনাবিষ্কৃত, আর ছিল না কোনো পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম, তখন নভেম্বরের প্রবল শীতকে উপেক্ষা করে তাঁরা এই দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছেন। তাঁদের সেই পদযাত্রা এভারেস্ট (২৯,০২৮´) অভিযানের মতই কৃতিত্বপূর্ণ নয় কি ?

কিন্তু সেকথা বলার জন্য আমি আজ লেখনী নিয়ে বসি নি। আমি শুধু তোমাকে বলতে চাইছি, যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয়, আধুনিক যুগে তাঁরাই প্রথম রোতাং অতিক্রম করেছেন। আর সব চেয়ে বিস্ময়কর কি জানো—সাপারাং থেকে লে গিয়ে কুলু উপত্যকায় ফিরে আসতে তাঁদের মাত্র একুশ দিন সময় লেগেছিল। তাঁদের সেই দুঃসাহসিক পদযাত্রার বিবরণ লাহুল-হিমালয়ের প্রথম ভ্রমণকাহিনী।*

আকাশ পরিস্কার থাকলে রোতাং গিরিবর্ত্মের ওপরে দাঁড়িয়ে কুলু ও লাহুল উপত্যকার বিপরীতধর্মী প্রাকৃতিক দৃশ্য তুমি দেখতে পাবে মানসী ! দেখে বিস্মিত হবে। সত্যই বিস্ময়কর। তাই হিমালয়-অভিযানের অন্যতম পথিকৃৎ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চার্লস গ্রাণভিল ব্রুস তাঁর 'Kulu and Lahoul' বইতে লিখেছেন—

"I know of no greater contrast in any other part of the Himalaya than I have seen in that of which the north and south sides of Rahtang presents."

তাঁর মতে এই পার্থক্য অনেকটা সুইটজারল্যান্ডের সঙ্গে তিব্বতের পার্থক্যের মতো। যদিও পরে তিনি দেখেছিলেন, লাহুল ঠিক তিব্বতের মতো বৃক্ষহীন নয়। তবে লাহুল ও তার বনানীর কথা পরে হবে। আগে রোতাং গিরিবর্ত্মের কথা বলে নিই তোমাকে।

শীতের ছ'মাস লাহুল-স্পিতির সঙ্গে সমতল ভারতের যোগাযোগ থাকে না। কারণ তুষারাবৃত রোতাং তখন অগম্য হয়ে ওঠে। যাওয়া-আসার পালা শেষ হয়ে যায় হেমন্তের শুরুতে। মুলতবী থাকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত।

তাই তোমাকে আমি নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে লাহুল আসতে বলছি না। পথের চেয়েও বড় কথা তখন প্রচণ্ড শীত এখানে। অত শীত সইতে পারবে না তুমি। জানো তো, গ্রীষ্মকালে লাহুলের মানুষকে কুলুতে যেতে বলা, আর কলকাতার মানুষকে সাহারায় যেতে বলা, একই কথা।

শীতকালে এখানে আসার তোমার দরকারই বা কি ? ১৫ই মে থেকে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে যে কোনো সময় আসতে পারো তুমি। হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বর্ষাকালে লাহুল পরিক্রমায় আসতে বাধা নেই কোন। কারণ লাহুল হচ্ছে মধ্য-হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উত্তরে। কিন্তু তোমার বা আমার মতো মৌসুমী বায়ু তো আর রোতাং পেরিয়ে আসতে পারে না লাহুলে। তাই বর্ষকালে একেবারেই বৃষ্টি হয় না এখানে। বরং শীতকালে কিছু

---

* 'Early Jesuits Travellers in Central Asia', 1603-1721 by C.J. Wessels.

ঝড়-বৃষ্টি হয়। তার উৎস কোথায় জানো ? শুনলে তুমি অবাক হবে। সেই ঝড়-বৃষ্টি আসে পারস্য উপসাগর থেকে। তবে সে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বড়ই কম। গড়ে মাসিক বৃষ্টিপাত মাত্র চার ইঞ্চির মতো। তাই লাহুল এমন বৃক্ষলতাহীন রুক্ষ ও বন্ধুর উপত্যকা।

কিন্তু অসুন্দর নয়, বরং সুন্দর—পরম সুন্দর। সে সৌন্দর্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হিমালয়ের প্রত্যেক অংশেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাহলেও তাদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর মিল। কিন্তু লাহুল-স্পিতির সঙ্গে ভারতীয় হিমালয়ের অন্য কোনো অংশের কিছুমাত্র মিল নেই। সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর এই স্বাতন্ত্র্যই তাকে এমন লীলাময় করে তুলেছে। সেই লীলাভূমি দর্শন করবার জন্যই যুগে যুগে মানুষ লাহুল পরিক্রমায় এসেছে।

যাক গে, যে কথা বলছিলাম। আশা করি রোতাং গিরিবর্ত্মের মোটামুটি চেহারাটা তমি বুঝতে পেরেছ। এবারে তার সাজগোজের কথা একটু বলে নিই তোমাকে।

অনেক কাল আগের থেকেই এই গিরিবর্ত্মের ওপরে গড়ে উঠেছিল কয়েকটি চা ও খাবারের দোকান। এমন দোকান অবশ্য গ্রীষ্মকালে লাহুল-স্পিতির পথে তুমি বহু পাবে। পরিশ্রান্ত পদযাত্রীরা এই সব দোকানে বসে বিশ্রাম করে, কিছু খেয়ে নিয়ে আবার চলা শুরু করেন। আমাদের কাছেও রোতাং-এর এই দোকানগুলি এখন অপরিহার্য।

জানি এ কথাটি অজানা নয় তোমার। সেবারে তোমাকে আমি বলেছি এই দোকানগুলির কথা। এরই একটি দোকানে মিস মালিনী ও তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হল আমাদের—সুজয়া, তার স্বামী, অসিত এবং আমার।

কিন্তু তাদের কথা পরে হবে, আগে রোতাং-এর কথা বলে নিই। বিশ্রাম শেষে, দোকানীকে পকোরা ভাজতে বলে, যাত্রীরা গিরিবর্ত্মের ওপরে পায়চারি শুরু করেন। তাঁরা চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখেন আর জেনারেল ব্রুসের উক্তির সত্যতা যাচাই করেন।

না, খুব বেশীক্ষণ সত্যানুসন্ধানের সুযোগ পান না তাঁরা। রোতাং-এর শীত আর শীতল বাতাসের দাপটে তাঁরা তাড়াতাড়ি গিয়ে কোনো একটি দোকানে ঢুকে চায়ের ফরমাস দেন। সেখানে দাউ দাউ করে স্টোভ জ্বলছে, কাজেই বেশ গরম। গরম চায়ের গ্লাস ঠোঁটে ঠেকিয়ে তাঁরা রোতাং-এর সাজগোজ দেখেন। চারিদিকে অসংখ্য তিব্বতীয় পতাকা উড়ছে—লম্বা লম্বা দড়ির সঙ্গে নানা রঙের কাপড়ের টুকরো বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক স্থানীয় পদযাত্রীকে এখানে এসে ওর একটি দড়ির সঙ্গে একটুকরো কাপড় বেঁধে দিয়ে প্রার্থনা করতে হয়—আমি যেন নির্বিঘ্নে এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে পারি।

শরতের শেষে রোতাং-এর ওপর দাঁড়িয়ে তুমি দেখতে পাবে দলে দলে পাহাড়ী মানুষ চলেছে কুলু কিংবা লাহুলে। ভেড়া ও ঘোড়ার পিঠে কুলু থেকে যাচ্ছে চাল ডাল আটা চা চিনি গুঁড়োদুধ নুন ও তামাক। আর লাহুল-স্পিতি থেকে উল কম্বল বার্লি ও সোহাগা।

রোতাং গিরিবর্ত্মের ওপরে তুমি লাহুল-স্পিতির সরল-সুন্দর মানুষকে দেখতে পাবে মানসী। দেখতে পাবে মেয়ে পুরুষ ও শিশুকে। মেয়েদের গয়নার বহর দেখে তুমি কিন্তু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। নানা রংয়ের পাথর বসিয়ে রুপো আর পেতলের ভারী ভারী অলঙ্কার। চরণযুগল যদিও পাদুকাবিহীন। তুমি আঁতকে উঠবে। ভাববে, এই শীতে ঐ পাথর আর তুষারাবৃত পথে ওরা খালি পায়ে কেমন করে চলা-ফেরা করছে!

তাই বলে তুমি আবার ওদের কাউকে জুতো পরাতে যেও না যেন। জুতো পরালে নির্ঘাত সে খোঁড়া হবে—আছাড় খেয়ে ঠ্যাং ভাঙবে।

রোতাং-এর কাহিনী শুনতে তোমার বোধহয় খারাপ ল্যাগছে না মানসী, তবে তোমার মনে নিশ্চয়ই একটা 'কিন্তু' রয়ে গেছে। ভাবছ মূরক্রফ্‌ট এবং ট্রেবেক কারা ? ভেবেছিলাম পরে একদিন তোমাকে তাঁদের কথা বলব। কিন্তু তোমার যখন এখুনি শোনার ইচ্ছে, তখন বলছি শোনো।

উইলিয়াম মূরক্রফ্‌ট ছিলেন একজন পশু চিকিৎসক। তিনি ১৮০৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে এদেশে আসেন। মাল পরিবহণের জন্য তখন কোম্পানীর বহু খচ্চর ছিল। সেগুলি দেখাশোনা করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। মূরক্রফ্‌ট বুঝতে পারলেন ভাল জাতের খচ্চর ছাড়া পাহাড়ী পথে পরিবহণের কাজ চালানো সম্ভব নয়। অথচ ভাল জাতের ঘোড়া না হলে তেমন শক্তিশালী খচ্চর পাওয়া যাবে না এবং ভারতে ভাল ঘোড়া জন্মায় না। তাই তিনি ঘোড়ার খোঁজে তুর্কিস্থানের বোখারায় যেতে চাইছেন। আর তার জন্য হিমালয় অতিক্রম করার প্রস্তাব পেশ করলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। কারণ সে পথে বোখারা নিকটতর।

কোম্পানী প্রথমে এই অসম্ভব প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। কিন্তু পরে তাঁর আগ্রহ দেখে, তাঁকে কিছু পাথেয় এবং অনুমতি দিলেন। এদিকে মূরক্রফ্‌ট-এর অভিযানের কথা শুনে জর্জ ট্রেবেক নামে কলকাতার একজন সলিসিটারের যুবক পুত্র তাঁর সঙ্গী হতে চাইলেন। তিনি ছিলেন সার্ভেয়ার। কাজেই মূরক্রফ্‌ট সানন্দে তাঁকে সঙ্গে নিলেন।

তাঁরা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে রওনা দিয়ে সুলতানপুর তথা কুলু হয়ে পার্বতী উপত্যকার পার্শ্ববর্তী দুর্গম পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে লাহুলের শিগরী হিমবাহে উপস্থিত হন।

এ পথে তুমিও তো কিছুদূর গিয়েছ। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মণিকরণের কথা। পার্বতী উপত্যকার সেই রমণীয় প্রস্রবণের পাশ দিয়েই গিয়েছিলেন তাঁরা। মূরক্রফ্‌ট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেনও মণিকরণের কথা।*

যাক্‌ গে, যে কথা বলছিলাম। মূরক্রফ্‌ট এবং ট্রেবেক শিগরী হিমবাহ পেরিয়ে চন্দ্রানদীর তীরভূমি দিয়ে বড়ালাচা গিরিবর্ত্মের পাদদেশে পৌঁছন। তারপরে বড়ালাচা অতিক্রম করে ১৮২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লে শহরে উপস্থিত হন। তাঁরা কিন্তু মোটেই অন্ধের মতো পথ চলেন নি। অজানা দুর্গম পথ, দুঃসহ শীত এবং খাদ্যাভাবে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁরা এই সব অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা ও জরিপ করেছেন। তাঁরাই বিপাশা, চন্দ্রা ও ভাগা নদীর উৎস আবিস্কার করেন। জরিপ করার পদ্ধতি প্রসঙ্গে জর্জ ট্রেবেক বলেছেন—

'Measurement is made in paces, bearings of compass noted with great precisions, latitudes determined by observation and hight by barometer and thermometer at principal elevations.'

কি বিস্ময়কর সাধনা !

অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণে লে শহরে প্রায় দু'বছর বসে থাকতে হল তাঁদের। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তাঁরা আবার যাত্রা শুরু করতে পারলেন। পৌঁছলেন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে। অতিক্রম করলেন পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী। অবশেষে পেশোয়ার, কাবুল ও কুন্দুজ হয়ে পাঁচ বছর পরে তাঁরা গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলেন—পৌঁছলেন বোখারা শহরে। সেদিনকার বর্ণনা প্রসঙ্গে মূরক্রফ্‌ট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

---

* লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' অথবা 'মানালীর মালঞ্চে' দ্রষ্টব্য।

'On the morning of 25th of February,
1825, we found ourselves at the end of our
protracted pilgrimage, at the gates of that
city which had for five years been the object
of our wanderings, privations and perils...'

পুরো পাঁচ মাস সেখানে কাটিয়ে তাঁরা ফিরে চললেন ভারতে। কিন্তু তখনও মূরক্রফট-এর ভ্রমণের নেশা কাটে নি। তাই ফেরার পথে তিনি ট্রেবেককে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মৈমানা চললেন। পথে আঁধকো নামক স্থানে জ্বরের কবলে পড়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মূরক্রফট-এর ডায়েরী এবং তাঁর নিজের অঙ্কিত মানচিত্র নিয়ে ট্রেবেক ফিরে এলেন ভারতে। সেই অমূল্য ডায়েরী ও তাঁর চিঠিপত্রকে সঙ্কলিত করেছেন সুলেখক হোরেস হেম্যান উইলসন। দুই খণ্ডে বিভক্ত এই বইখানির তিনি নাম দিয়েছেন, 'Travels in the Himalayan provinces of Hindustan and the Punjab; in Ladakh and Kashmir, in Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara–Mr, William Moorcroft and Mr. George Trebeck from 1819 to 1825.'

বইখানি বিলেত থেকে ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি হিমালয়ান-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় মূরক্রফট্ সম্পর্কে উইলসন বলেছেন—

"His life fell a sacrifice to his zeal.'

নিজের জীবনের বিনিময়ে মূরক্রফ্ট অনাবিস্কৃত পশ্চিম-হিমালয়কে আবিষ্কার করে গেছেন। এসো, আমরা তাঁর এবং তাঁর সুযোগ্য সহযাত্রী জর্জ ট্রেবেক-এর অমর আত্মার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

॥ দুই ॥

মানসী,

আবার তোমাকে লাহুলের কথা লিখতে বসেছি! আর রোতাং থেকেই এ লেখা শুরু করছি। কারণ রোতাং থেকেই যে শুরু হয়েছে লাহুল—লীলাভূমি-লাহুল।

রোতাং-এর একটি চায়ের দোকানে বসেই পরিচয় হল মিস মালিনী ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে। মিস্ মালিনী প্যাটেল আমেদাবাদের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী। এখন একজন অকৃতদার বন্ধুর সঙ্গে মানালীতে স্থায়ী হয়েছেন। তিনি মানালীর পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছেন। মিস মালিনী একজন 'মাউন্টেনিয়ার'।

মাউন্টেনিয়ারের পোশাক পরেই তিনি দেশলাই চাইলেন আমার কাছে। সঙ্গে দেশলাই না থাকায় তাঁকে দোকানীর জ্বলন্ত স্টোভ থেকে চুরুট ধরাবার পরামর্শ দিলাম।

"বাই জোভ্!" যেন ইউরেকার বদলে ব্যবহার করলেন শব্দ দুটি। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটাই আমাদের এতক্ষণ খেয়াল হয় নি।" সঙ্গী যুবকটির হাতে চুরুটটি দিয়ে মিস আদেশ করেন,"যাও, ধরিয়ে নিয়ে এসো।"

তারপরে তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন, "দেশাই, আমার বয়-ফ্রেন্ড, আমেদাবাদের ব্যবসায়ী। স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে নিয়ে মানালী বেড়াতে এসেছে।

আমি এদের নিয়ে চলেছি কেলং। আমি মাউন্টেনিয়ার, হিমালয়ান একস্‌পিডিসনই আমার জীবন। তাই মানালীতে মন ভরে না আমার, সুযোগ পেলেই লাহুলে চলে যাই।"

মিঃ দেশাই-এর স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করে দিলেন। ছেলেটি হায়ার-সেকেন্ডারি পাস করে কলেজে পড়ছে। আর মেয়েটি বি. এস. সি. পাস করে শিক্ষকতা করছে।

ছেলেটি চুরুট টানতে টানতে মিস্ মালিনীর সামনে এসে দাঁড়ায়। একটু অবাক হই। বাপ-মায়ের সামনে এই বয়সে চুরুট টানছে!

জ্বলন্ত চুরুটটা তার হাত থেকে নিয়ে মিঃ দেশাইকে দেখিয়ে মিস্ বললেন, "আমার এই বয়-ফ্রেন্ডটি একেবারে বৈচিত্র্যহীন। কোনো নেশা-টেশা নেই। তাই আমি ওর ছেলেকে চুরুট ধরিয়ে দিয়েছি।...ছেলে-মেয়ে কয়েকদিন থাকবে আমার কাছে।....সেই ফাঁকে মেয়েকে চুরুট আর ছেলেকে ড্রিঙ্কস ধরিয়ে দেবো।" বলেই হা হা করে হাসতে থাকেন মিস্ মালিনী।

অসহায় পিতা-মাতার দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে আমার। তাই তাঁদের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাই মিস্ মালিনীর দিকে। তাঁর বয়স বোধ করি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু কসমেটিকস-এর আড়ালে বয়স লুকোবার বৃথা চেষ্টা করেছেন। তিনি যৌবনকে বাঁধতে পারেন নি অথচ যৌবনের যাতনাটুকু রয়ে গেছে। চুরুট আর ড্রিঙ্কস-এর প্রতি এই আকর্ষণ সেই যাতনারই বহিঃপ্রকাশ। হয়তো বা পর্বতপ্রীতিও।

কথায় কথায় তিনি আমাদের জানিয়ে দিলেন, "লাহুল-স্পিতির ডেপুটি কমিশনার আমার বন্ধু। খোকসার ডাকবাংলোর দুটি সেটই আমার জন্য রিজার্ভ করতে বলে আমি তাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। তার একটা সেট আমি আজ রাতে আপনাদের ছেড়ে দেবো। আপনারা আস্তে আস্তে আসুন। আমরা রওনা হচ্ছি।"

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে দাঁড়াই। ওঁরা বেরিয়ে যান চা-এর দোকান থেকে। বাইরে তিনটি ঘোড়া অপেক্ষা করছে। স্বামী স্ত্রী ও মেয়ে অশ্বারূঢ়া হলেন। ছেলেটিকে নিয়ে মিস হেঁটে রওনা হলেন। তার সঙ্গে রয়েছে 'ট্রেনড গাইড'—তিনি 'মাউন্টেনিয়ার'।

ওঁরা বেরিয়ে যাবার পরে আমরা এগিয়ে আসি স্টোভের ধারে। এখানে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায় না, তাই স্টোভেই রান্না হয়। দুটি বড় বড় স্টোভ জ্বলছে দোকানে। মা ও মেয়ে চা বানাচ্ছে, পকোরা ভাজছে। সহসা মা আমাদের সরে বসতে বলল। বিস্মিত হই, আমরা তো তার কোনো অসুবিধে করছি না! তাহলে এমন ব্যবহার কেন?'

সুজয়া বুঝতে পারে ব্যাপারটা। সে বলে, "মা তার যুবতী মেয়ের এত কাছে আপনাদের দাঁড়াতে দিতে চাইছে না।"

বাধ্য হয়ে দূরে সরে আসতে হয় আমাদের। কিছুক্ষণ বাদে চা ও পকোরা খেয়ে আমরা বেরিয়ে আসি বাইরে।

বাইরে যে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে, প্রবল বেগে বাতাস বইছে, ভেতরে বসে বুঝতে পারি নি। আর সময় নষ্ট করা চলবে না। যত দেরি করব, রোতাং তত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। এখনও সাড়ে আট মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। রোতাং পার হয়ে ছ'মাইল উৎরাই ভেঙে খোকসার। আজ সেখানে আমাদের পৌঁছতেই হবে। পথে কোথাও আশ্রয় নেই।*

---

* আজকাল দর্শনার্থীদের আর পায়ে হেঁটে রোতাং পেরোতে হয় না। রোতাং-এর ওপর দিয়ে প্রায় সারাবছর বাস চলাচল করছে।

হিমালয়ের যে কোনো গিরি-সঙ্কট পার হবার শ্রেষ্ঠ সময় সকালের দিকে—দপুরের আগে। উচ্চ হিমালয়ে সাধারণত দুপুরের পরেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। মেঘে ঢেকে যায় আকাশ—তুষারপাত আরম্ভ হয়। তার ওপরে রোতাং আবার তুষারঝড়ের জন্য কুখ্যাত। তাই রাহালাতে সবাই আমাদের সকাল সকাল রওনা হয়ে, দুপুরের আগেই রোতাং পার হয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের মালবাহক তার ঘোড়া নিয়ে তাঁবুতে পৌঁচেছিল বেলা দশটার সময়। সুতরাং এই বিপদ।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম—সেই তুষারপাতের মধ্য দিয়েই আমরা হেঁটে চললাম। চললাম প্রশস্ত ও প্রায় সমতল এক-টি ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে। ডান দিক থেকে বাঁ দিকটা একটু নিচু। দু-দিকেই পাহাড়। বাঁ দিকের পাহাড়টা গিরিবর্ত্ম ঘেঁষে আর ডানদিকেরটা একটু দূরে। তুষারপাতের জন্য তাদের স্পষ্ট দেখতে পারছি না।

তুষার পড়ছে সাগুদানার মতো। তাদের গলিত জলধারায় পথ সিক্ত হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে পথ চলতে হচ্ছে। চলতে অবশ্য তেমন কষ্ট হচ্ছে না। তুষারপাত হচ্ছে বটে কিন্তু মোটেই মুষলধারায় নয়। আর বাতাসটাও সেই কুখ্যাত 'রোট্যাং উইন্ড' নয়। তা হলে আর পথ চলতে হত না।

আমরা চলেছি রোতাং গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে। চলেছি কুলু থেকে লাহুলে। সবার আগে চলেছে সুজয়া। পাহাড়ী পথে চমৎকার হাঁটতে পারে সে। লাহুলকে তার বড় ভাল লেগেছে। তাই আগামী পর্বতাভিযান সংগঠনের জন্য লাহুল-হিমালয়কেই নিয়েছে বেছে।

কিন্তু না, সুজয়ার কথা আজ নয়। আজ শুধু রোতাং-এর কথা বলব তোমাকে। আমাদের সঙ্গে কিন্তু আরও অনেকে চলেছে লাহুলে। লাহুল-স্পিতির নারী পুরুষ ফিরে যাচ্ছে ঘরে। কাঁধে ক্যামেরা দেখে ওদেরই একজন আকৃষ্ট হয় অসিতের দিকে। চলতে চলতে আলাপ জমায়। লোকটির নাম—নুরপু তিনবু। পুরনো খোকসার গ্রামে তাঁর বাস। কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। নতুন বউকে নিয়ে কুলুতে বেড়াতে গিয়েছিল। এখন ঘরে ফিরছে। কুলু ও মানালী থেকে বউকে অনেক কিছু কিনে দিয়েছে সে। কেবল তাকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তুলতে পারে নি। স্টুডিওর সামনে ঘোরাঘুরি করেছে তবু ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় নি। অতএব সাহেব যদি তাদের দুজনের একখানি ছবি তুলে দেন।

অসিত কিছু বলতে পারার আগেই সুজয়া ওকালতি করে, "দিন না একখানা ছবি তুলে, ওদের সখ হয়েছে।"

"কিন্তু এই তুষারপাতের ভেতরে ছবি তুলব কেমন করে?"

"এখুনি তুলবেন কেন? ওরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুক, তুষারপাত কমলে তুলে দেবেন।" সুজয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

"যদি না কমে?"

"কাল খোকসারে বসে তুলে দেবেন।"

"অর্থাৎ ছবি ওদের চাই।"

"নিশ্চয়ই। 'নিউলি ম্যারেড কাপ্‌ল', 'হনি-মুন' সেরে বাড়ি ফিরছে, একখানা ছবি না হলে চলবে কেন?"আমি যোগ করি।

সুজয়া সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে নুরপু তিনবুকে সব বুঝিয়ে দেয় হিন্দীতে। সে সস্ত্রীক সাথী হয় আমাদের।

বেশ জোরে জোরে পথ চলেছি। আমাদের সামনে মাল নিয়ে চলেছে একসারি ঘোড়া।

চলার তালে তালে তাদের গলার ঘন্টা বাজছে—ঢং ঢং ঢং। বড় ভাল লাগছে শুনতে।

শুনতে শুনতে পথ চলেছি আর চলতে চলতে ভাবছি। ভাবছি হিমালয়ের কথা। না, আমি সারা হিমালয়ের কথা ভাবছি না। ভাবছি শুধু আমার চারিদিকে এই পর্বতমালার কথা, যেটি স্বাধীনোত্তর যুগে পাঞ্জাব হিমালয় নামে পরিচিত ছিল। এবং এখন যার ভারতীয় অংশ হিমাচল-হিমালয় ও কাশ্মীর-হিমালয় নামে পরিচিত। এই মধ্য-হিমালয় পর্বতমালার প্রধান দুটি গিরিশ্রেণী হল পীর-পাঞ্জাল ও ধৌলাধর। পর্বতমালার যে অংশ চন্দ্রভাগা এবং বিপাশার মধ্যে জলবিভাজিকা সৃষ্টি করেছে, আমরা এখন তারই ওপর দিয়ে পথ চলেছি। এই পথ পেরিয়ে যুগে যুগে মানুষ যাওয়া-আসা করেছেন। নানা কারণে তাঁরা এসেছেন, কেউ এসেছেন ধর্মপ্রচার করতে, কেউ এসেছেন বাণিজ্য করতে, আবার কেউ বা এসেছেন রাজ্য বিস্তার করতে।

আমি পথ চলতে চলতে তাঁদের কথাই ভাবছি। ভাবছি, ব্রিটিশ অধিকার কায়েম হবার পরে এই পথে মানুষের যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পেরেছিলেন সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে রাজ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহুল এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পিতি ব্রিটিশ অধিকারে আসে। ১৮৫১ সালে লাহুল-স্পিতির প্রথম সরকারী জরিপ হয়। জরিপ কর্মীদের বিরাট বাহিনী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রায় ৯ হাজার মাইল পথ-পরিক্রমা পূর্ণ করেছেন। একদল কুনজুম গিরিবর্ত্মের ১৪,৯৩১´) দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, একদল আমাদের এই পথে খোকসার থেকে কেলং গিয়ে ওপর দিকে এগিয়েছিলেন। আর একদল রওনা হয়েছিলেন লে থেকে। তিন দলই গ্রীষ্মের শেষে বড়ালাচা গিরিবর্ত্মের ওপর মিলিত হয়েছিলেন। এই জরিপের বিশদ বিবরণ (Great Synopsis) সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া ১৮৭৯ সালে প্রকাশ করেন। সেই বিবরণ পাঠ করলে আজও বিস্মিত হতে হয়, কি অমানুষিক কষ্ট করে তাঁরা সেদিন দুর্গম ও দুস্তর হিমালয়কে আবিষ্কার করেছিলেন। স্বাধীন দেশের সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের এক-দশমাংশ কষ্ট করলে আজ এই দেশের চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যেত।

যাক্ গে যে কথা বলছিলাম—ভারতীয় সেনাবাহিনীর এফ. মারখ্যাম সেই বছরই (১৮৫১ খ্রীঃ) শিকাব করতে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি বড়াশিগরী হিমবাহ অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মতে বড়া শিগরী চার মাইল চওড়া।

তাঁরপরে এ অঞ্চলে আসেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মেজর জেনারেল স্যার আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম। তিনি এসেছিলেন ১৮৬২ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে। কানিংহ্যাম রোতাং পেরিয়ে খোকসার হয়ে বড়ালাচা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তিনি পাঁচ মাইল ঘন জঙ্গল ভেদ করে কুলু থেকে মানালী এসেছিলেন। রোতাং গিরিবর্ত্মের ওপরে বিপাশার উৎস দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'Ancient Geography of India' গ্রন্থে লাহুল সম্পর্কে লিখেছেন—

'To the north-east of Kulu Hwen Thsang places the district of Lo-hu-lo, which is clearly the Lho-yal of Tibetans, and the Lahul of the people of kulu and other neighbouring states.'

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দেই কাংড়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ফিলিপ হেন্‌রী এগার্টন বাণিজ্য প্রসারের প্রয়োজনে লাহুলের সমীক্ষা করেন। তিনি ফটো তোলা ও বিকাশ করার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে লাহুলে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য সে-সব সাজ-সরঞ্জাম ছিল যেমন ভারী তেমনি

বড় বড়। সবচেয়ে বিস্ময়কর তিনি ফটো তুলে অকুস্থলে পরিস্ফুটন করে চমৎকার ছবি পেয়েছিলেন। তাঁর আগে আর কেউ হিমালয়ে এসে ছবি তুলেছেন বলে আমার জানা নেই।

এগার্টনের পরে এ. এফ. পি. হারকোর্ট। তিনি আসেন ১৮৬৯ সালে। তখন তিনি কুলু জেলার ডেপুটি কমিশনার। এবং কিছুকাল আগেও লাহুল-স্পিতি কুলু জেলার অন্তর্গত ছিল। হারকোর্ট লাহুল-স্পিতির বিস্তৃত সমীক্ষা করেন। তাঁর সেই সমীক্ষার বিবরণ 'Himalayan Districts of Kooloo, Lahoul and Spiti' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য সাম্রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য শাসনের প্রয়োজনেই হারকোর্ট সেই সমীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই গ্রন্থখানি আজও লাহুল-হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত। তবু সেই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করব না মানসী! আজ অন্য কথা হোক্।

হারকোর্ট-এর পরে এ অঞ্চলে আসেন এন্ড্রু উইলসন। তিনি ১৮৭৩ সালে লোসার থেকে বড়া-শিগরী হিমবাহে আসেন। উইলসন ঘোড়ায় চড়ে এই হিমবাহ অতিক্রম করেছিলেন। তিনি এই হিমবাহ অঞ্চলকে লাহুল ও স্পিতি থেকে একটি স্বতন্ত্র উপত্যকা বলে বর্ণনা করেছেন। নাম দিয়েছেন—'The Valley of Glaciers,' তিনি ছিলেন কবি। তাই হিমবাহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

'Bare is it, Without house or track, and destitute
of obvious shelter as a shipless sea

* * *

The glaciers creep
Like snakes that watch their pray; from
their far fountains
Slowly rolling on; there many a precipice,
Frost, and the sun, in scorn of mortal power,
Have piled–dome, pyramid, and pinnacle
A city of death, distinct with many a tower,
And wall impregnable of beaming ice.
Yet not a city but a flood of ruin
Is there, that form the boundaries of the sky
Rolls its parpetual stream.'

স্পিতি উপত্যকা ও শিগরী হিমবাহ দর্শন করে তিনি লাহুলে প্রবেশ করেন। লাহুলের অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

'Lies on the southern slope of the main range
of the western Himalaya.'

এই উপত্যকার বর্ণনা প্রসঙ্গে উইলসন বলেছেন যে দশ-এগারো হাজার ফুট উঁচু সমতল জমিতে অনেক গ্রাম ছিল। উপত্যকাটি মোটামুটি ষাট মাইল লম্বা ও পঞ্চাশ মাইল চওড়া। আর তখন লাহুলের জনসংখ্যা ছিল ছয় হাজারের মতো।*

---

* 'The abode of Snow' by Andrew Wilson–1875

এবারে তোমাকে লাহুল-হিমালয়ের পর্বতাভিযান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি। তুমি তো জানো মানসী, হিমালয়ের পর্বতাভিযানের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৮৩ সালে ডাবলু. ডাবলু. গ্র্যাহাম নামে একজন ইংরেজ পর্বতারোহী দুইজন সুইস পথ-প্রদর্শক নিয়ে দার্জিলিং আসেন। তিনি সিকিম-হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গ জয় করেন। সেই থেকেই হিমালয় অভিযান আরম্ভ হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধের শতাধিক বছর পরে লাহুল ব্রিটিশ অধিকারে এসেছে। কিন্তু হিমালয় অভিযান আরম্ভ হবার পরের বছরই ব্রিটিশ পর্বতাভিযাত্রীরা লাহুলে এসেছেন। হিমালয় অভিযানের অন্যতম পথিকৃত স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড লাহুলে এসেছেন ১৮৮৪ সালে। তবে তিনি কোনো পর্বতশিখরে আরোহণ করেন নি। কেবল রোতাং অতিক্রম করে খোকসার পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'Wonders of the Himalaya' বইতে সেই পদযাত্রার কথা লিখে গেছেন।

লাহুল-হিমালয়ে প্রথম পর্বতাভিযান পরিচালনা করেন জেনারেল সি. জি. ব্রুস। গতবারে তোমাকে আমি তাঁর কথা বলেছি মানসী! আশা করি তা তোমার মনে আছে।

জেনারেল ব্রুস তাঁর 'Twenty years in the Himalaya' এবং 'Kulu And Lahoul' বই দু'খানিতে সেই অভিযানের কথা লিখে গেছেন। তিনি ১৮১২ সালে সাতমাসের ছুটি নিয়ে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। অল্প কিছুদিন মানালীতে কাটিয়ে তাঁরা রোতাং পেরিয়ে লাহুলে যান। তাঁরা সোলেন ওয়েসহর্ণ (Solane Weisshorn), গেফান শ্রেক্‌হর্ণ (Gaphan Schreck-horn) এবং কন্‌ডিনি (Kondini) সহ অনেকগুলি ছোট বড় পর্বতশিখরে আরোহণ করেছিলেন। তারপরে তিনি দেও টিব্বা (২০,৪১০´) পর্বতশৃঙ্গের প্রাথমিক সমীক্ষা করেন। সেই সমীক্ষার প্রায় চল্লিশ বছর বাদে ১৯৫২ সালে মিস্টার ও মিসেস গ্রাফ্ এবং কে. বেরিল নামে তিনজন পর্বতারোহী দেও টিব্বা শীর্ষে আরোহণ করেন। তারপর থেকে বহুবার এই শৃঙ্গ বিজিত হয়েছে। ইদানীং তো প্রায় প্রতিবছর মানালী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা দেও টিব্বা শিখরে আরোহণ করছেন। তাহলেও জেনারেল ব্রুসের সেই প্রাথমিক সমীক্ষা আজও মূল্যবান বলে বিবেচিত। কিন্তু দেও টিব্বার কথা এখন থাক। কারণ দেও টিব্বা এ অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিখর হলেও, সে কুলু উপত্যকায় অবস্থিত। সে লাহুল-হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গ নয়।

ঐ অঞ্চলে সমীক্ষা করবার জন্য জেনারেল ব্রুসের পরে যাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে, তিনি মেজর জে. ও. এম. রবার্টস। ১৯৩৯ সালে তিনি এ অঞ্চলে দু'মাস ছুটি কাটিয়েছিলেন।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ.ই. গানথার (A.E.Gunther) নামে একজন ব্রিটিশ পর্বতারোহী তিনজন স্বদেশীয় সঙ্গী ও চারজন শেরপা সহ মানালী আসেন। রোতাং অতিক্রম করে চন্দ্রানদীর তীর ধরে তাঁরা শিগরী হিমবাহের পূর্বাঞ্চলে পৌঁছন। ১৯,৬০০ ফুট উঁচু একটি নামহীন পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করার পরে তাঁরা মূল-হিমবাহের মধ্যাঞ্চলে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁরা বিশ হাজার ফুট উঁচু আর একটি নামহীন শৃঙ্গে আরোহণ করেন। সেই শঙ্গটি আজও গানথার শৃঙ্গ নামে পরিচিত হয়ে আছে। তারপরেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ে এবং পর্বতারোহীদের ছুটি ফুরিয়ে আসে। তাই তাঁরা আর কোনো শৃঙ্গারাহণের চেষ্টা না করে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

গানথার অঙ্কিত মানচিত্রকে অবলম্বন করে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে রয়েল এয়ারফোর্স-এর একদল পর্বতারোহী এবং পিটার হোম্‌স-এর নেতৃত্বে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

আর একদল পর্বতাভিযাত্রী কুলু এবং লাহুল-স্পিতির জলবিভাজিকা সমীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁরা কেউ শিগরী হিমবাহে যান নি। এই হিমবাহের প্রথম বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিস্তারিত সমীক্ষা করেন চারজন মহিলা। শুনে নিশ্চয়ই তুমি খুব গর্ববোধ করছ। কিন্তু তাঁদের সেই অভিযানের কথা আমি একটু বাদেই বলছি মানসী। তার আগে আরও তিনটি অভিযানের কথা বলে নিই।

১৯৫৫ সালেও রয়েল এয়ারফোর্স-এর পর্বতারোহণ সংস্থা এই অঞ্চলে একটি পর্বতাভিযান পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা মে মাসে ইংলন্ড থেকে ভারতে আসেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, স্পিতি নদীর উপনদী গিউর্ডি এবং র‍্যাতং-এর উৎস অন্বেষণ। তাঁদের ইচ্ছে ছিল শিগরী হিমবাহের ওপর দিয়ে অগ্রসর হবেন। কিন্তু মে মাসের শেষেও সেখানে এত বেশী তুষার ছিল যে তাঁরা কিছুতেই হিমবাহের ওপর দিয়ে এগোতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে পথ পরিবর্তন করতে হল। তাঁরা চন্দ্রানদী পেরিয়ে কুল্টি উপত্যকা সমীক্ষা করেন এবং সেখানকার কয়েকটি নামহীন শৃঙ্গে আরোহণ করেন। সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম দেন 'টিলা-কা লাড়'। অভিযাত্রীরা তারপরে তনাগিরি (২১,০০০´) শৃঙ্গে অরোহণ করেন। তাঁদের আগে আর কোন অভিযাত্রীদল লাহুল হিমালয়ে এত উঁচু শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারেন নি।

ঐ বছরই হেমিশ এবং মিলিসেন্ট অর্থার নামে দুজন পর্বতারোহী তাঁদের বন্ধু ফ্রাঙ্ক সোলেরি ও তাঁর স্ত্রী ব্যাব্স-কে নিয়ে লাহুল-হিমালয় অভিযানে আসেন। অভিযাত্রীরা চন্দ্রানদীর তীর দিয়ে অগ্রসর হয়ে বড়া শিগরী হিমবাহ ছাড়িয়ে কাঞ্জাম লা পর্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁরা আঠারো হাজার ফুটউঁচু কাঞ্জাম শিখরে আরোহণ করেন এবং চন্দ্রানদীর তীরভূমি জরিপ করেন। তারপরে ২০,৪৩০ ফুট উঁচু এ অঞ্চলের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ইতিমধ্যে তুষার গলে যাওয়ায়, ফেরবার সময় তাঁরা আর চন্দ্রানদী পার হতে পারলেন না। তাই তাঁদের বড়ালাচা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে ভাগানদীর উপত্যকা ধরে অর্থাৎ সমগ্র লাহুল উপত্যকা পরিক্রমা করে মানালী ফিরতে হল।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযাত্রী দলকে নিয়ে পিটার হোমস আবার সে বছর লাহুলে এসেছিলেন। তাঁর সেই অভিযানের নাম—'Ratong Parbati Himalaya Expedition.' এই অভিযানকালে তাঁরা দশটি অপরাজিত পর্বতশিখর জয় করেন। তার মধ্যে ছয়টি শৃঙ্গই একুশ হাজার ফুটের চেয়ে বেশি উঁচু। হোমস্ একজন মানচিত্র বিশারদ। এই দুই পর্বতাভিযানের সময় তিনি চারশ' বর্গমাইল জায়গায় মনচিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁরা দশটি অনাবিস্কৃত গিরিবর্ত্ম এবং পনেরোটি হিমবাহ আবিষ্কার করেছেন।

মানসী, তুমি মনে মনে আমার ওপর চটে আছ তো ? যে চারজন ইংরেজ মহিলা বড়া-শিগরী হিমবাহের প্রথম বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমীক্ষা করেছেন, তাঁদের কথা এখনও বলি নি বলে। এতে অবশ্য তোমার রেগে যাবার যথেষ্ট কারণ আছে। শুধু তোমরা মেয়েরা নও, তাঁদের সেই সুন্দর সমীক্ষার জন্য প্রত্যেক হিমালয়-প্রমিক গর্বিত। তাই এবারে আমি তোমাকে সেই মহিলা অভিযানের কথা বলছি।

তাঁদের অভিযানের নাম—'Abinger Himalayan Expedition–1956.' মিসেস জয়েস ডানশীথ এই অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন। দলের অন্য তিনজন সদস্য হলেন হিল্‌ডা রীড, এইলিন গ্রেগরী এবং ফ্রান্সেস ডিলেনী। ডানশীথ একাই ছিলেন বিবাহিতা। তিনি ছিলেন সাধারণ গৃহস্থবধূ। তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন যথাক্রমে নার্স্‌, রিসার্চ ওয়ার্কার এবং জিওলজিস্ট। অর্থাভাবের জন্য তাঁদের দুজন মালপত্র নিয়ে মোটরে করে বিলেত থেকে মানালী আসেন।

অপর দুজন জাহাজে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। এই মহিলা অভিযাত্রীরা বড়া-শিগরী হিমবাহের সমীক্ষা করার সময়ে আঠারো হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেছেন। ফেরার পথে তাঁরা দেও টিব্বা শিখরে ওঠেন। সেখানেই শেষ নয়। দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরা যৌথভাবে 'Mountiains and Memsahibs' নামে চমৎকার একখানি বই লিখেছেন। বইখানি পড়লে তুমি লীলাভূমি লাহুলের অনেক রহস্যের সন্ধান পাবে মানসী!

তারপরে বছর পাঁচেক আর এ অঞ্চলে কোনো উল্লেখযোগ্য পর্বতাভিযান পরিচালিত হয় নি। পাঁচ বছর বাদে আসেন তোমার প্রিয় পর্বতারোহিণী জোসেফাইন স্কার। তিনিও মিসেস্ ডানশীথ-এর মতো তাঁর সঙ্গিনী বারবারা স্পার্ককে নিয়ে লণ্ডন থেকে মোটরে করে মানালী আসেন। তাঁরা স্পিতির লায়ন (২০,১৩০´) এবং সেন্ট্রাল পিক-য়ে (২০,৬০০´) আরোহণ করেন। জোসেফাইন তাঁর 'Four Miles High' বইতে সে অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তুমি এই বইখানি খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়েছ মানসী! কাজেই আমি আর সে কথা লিখে সময় নষ্ট করতে চাই না।

তাছাড়া আমি আর তাঁদের কথা ভাবারও সময় পাই নি। নেতার হুশিয়ারীতে আমার ভাবনা থেমে যায়। অসিত সহসা চীৎকার করে ওঠে, "দেখে পথ চলো, খাড়া উৎরাই। তুষারপাতের জন্য পিচ্ছিল হয়ে আছে।"

অতএব আমি লাহুলের ভাবনা ভুলে লাহুলের পথের দিকে নজর দিতে বাধ্য হই। সমতল শেষ হয়ে গেছে। পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেছে নিচে। আমরা আকাশ থেকে মেঘের জগতে নেমে এলাম। আমরা অবতরণ করছি—স্বর্গ থেকে মর্ত্যে।

অসিত দেখে পথ চলতে বলছিল। চলা উচিত, পথ সত্যি পিচ্ছিল। কিন্তু সাধ্য কি সামনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনি পায়ের দিকে। আমি অবাক বিস্ময়ে সামনে তাকিয়ে রয়েছি। হিমালয়কে দেখেছি বিভিন্ন জায়গায়। দেখেছি কাশ্মীরে, গাড়োয়ালে আর কুমায়ুনে, চাম্বা কুলু আর সিকিমে। কিন্তু তার এমন বিচিত্রসুন্দর রূপ আর কোথাও দেখি নি। এ যেন আলাদা এক জগৎ। এখানে সে ধ্যান-মগ্ন মৌন, রিক্ত ও সর্বস্বান্ত। কোথাও সবুজ নেই। বাদামী ও ধূসর রং-এর সারি সারি পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় মাথায় রুপোর মুকুট।

রুপো শুধু আকাশে নয়, রুপো রয়েছে মাটিতে। সেই বাদামী ও ধূসর উপত্যকার বুক জুড়ে আঁকাবাঁকা একটি রুপোলী রেখা—লীলাভূমি-লাহুলের প্রাণধারা চন্দ্রা।

না, শুধু চন্দ্রা নয়, লাহুলের প্রাণধরা চন্দ্রভাগা—চন্দ্রা ও ভাগানদীর মিলিত ধারা।

চন্দ্রা ও ভাগা দুদিক থেকে বেষ্টন করেছে লাহুলকে। উপত্যকা বাদ দিয়ে দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্বতময়। এই ত্রিভুজাকৃতি মধ্যাঞ্চলই লাহুল হিমালয়ের কেন্দ্রীয় অংশ। বড়ালাচা গিরিপথ লাহুল হিমালয়ের উত্তর পূর্বদিকের পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে এই অংশকে যুক্ত করেছে। মধ্যাঞ্চলের গিরিশ্রেণী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। এর একটি শাখা চলে গেছে পশ্চিমে। এই দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী অধিত্যকাগুলি হিমবাহে পরিপূর্ণ। এখানে একুশ হাজার ফুট উঁচু পর্যন্ত পর্বতশৃঙ্গ আছে। বিখ্যাত গেফান শৃঙ্গটি এ অঞ্চলেই অবস্থিত। বহু চেষ্টা করেও জেনারেল ব্রুস গেফান শৃঙ্গে আরাহণ করতে পারেন নি। তবে তাঁরা এই অঞ্চলের অন্যান্য পর্বতশিখর জয় করেছেন। জেনারল ব্রুস এ অঞ্চলের শিখরসমূহ সম্পর্কে বলেছেন—

> 'This mass of central Lahoul, all beautiful,
> and apparently unnamed, is a perfect centre
> of unambitious mountaineering....'

কিন্তু আমাদের দেশের পর্বতাভিযাত্রীরা উচ্চতাভিলাষহীন পর্বতারোহণ পছন্দ করেন না বলেই হয়তো লাহুলকে তেমন সুনজরে দেখেন না।

সামনের দিকে নজর পড়তেই পর্বতারোহণের চিন্তায় ছেদ পড়ে আমার। দেখতে পাই ওঁদের—মিস মালিনী ও তাঁর সহযাত্রীদের। অবাক কাণ্ড! ওঁরা যে আমাদের অনেক আগে রওনা হয়েছিলেন রোতাং থেকে। ওঁদের তো এতক্ষণে প্রায় খোকসার পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। বিশেষ করে মিস মালিনী একজন 'ট্রেন্‌ড মাউন্টেনিয়ার!'

আমার প্রস্তাবটা পছন্দ হয় সুজয়ার। এ জাতীয় প্রস্তাবে সে কোনোদিন আপত্তি করে না। ছেলেমানুষী করতে বড় ভালবাসে সুজয়া। সে সম্মত হয়। কিন্তু আপত্তি করে নেতা। বলে, "খাড়া উৎরাই। ভিজে পথ—তাড়াতাড়ি চলা ঠিক নয়।"

সুজয়া কিন্তু মেনে নেয় না তার অভিমত, সে বলে, "একটু দেখেশুনে চলবেন। কতক্ষণ আর লাগবে ওঁদের ছাড়িয়ে যেতে।"

অতএব নেতাকে সম্মত হতে হয়। পথ ছেড়ে পাকদণ্ডী বেয়ে জোর কদমে নামতে শুরু করি। উদ্দেশ্য ট্রেনড মাউন্টেনিয়ারের আগে গ্রামফু পৌঁছব। নিচে গ্রামফু দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্দেশ্য সফল হয়। আমরা ওদের ছাড়িয়ে আসি। সুজয়া হেসে বলে, "মিস বোধ হয় অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।"

কিন্তু আমাদের এখন সে দৃষ্টি দর্শনের সুযোগ নেই। খাড়া উৎরাই, অন্যমনস্ক হওয়া সম্ভব নয়। সাবধানে পথ চলে নেমে আসি সমতলে—গ্রামফু গ্রামে। একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে বসি। অসিত দম নিয়ে চায়ের ফরমাস দেয়।

চারিদিকে তাকাই—চট আর ক্যানভাসে ছাঁওয়া কয়েকখানি পাথরের ঘর নিয়ে গ্রামফু। কোনোটিতে চা-এর দোকান, কোনোটিতে সরকারী গুদাম আবার কোনোটি বা কেবলই বাসগৃহ। পাহাড়ের ঢালে আর সংকীর্ণ উপত্যকার বুক জুড়ে পথের দুপাশে গড়ে উঠেছে একটি জনপদ।

জনসংখ্যার দিক থেকে কিন্তু গ্রামফুর স্থান কেলংয়ের ওপরে। ১৯৬১ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী এখনকার জনসংখ্যা ৩০৪৬ জন। তবে এটি কেবল গ্রীষ্মকালীন জনপদ। মানালী কাজা ও কেলং পথের সঙ্গম গ্রামফু।

রোতাং গিরিবর্ত্মের উত্তর পাদদেশে লাহুল ও স্পিতি উপত্যকার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে এই অস্থায়ী জনপদ। রোতাং পার হবার পথে কিংবা পেরিয়ে আসার পরে এখানে বিশ্রাম না করে উপায় নেই পদযাত্রীদের। তাঁদের কিছুক্ষণ অতিবাহিত করতে হয় এখানে। সেই অবসরে তাঁরা তাড়াতাড়ি এক গেলাস গরম চা খেয়ে নেন।

দোকানী চা-এর গেলাস এগিয়ে দেয় আমাদের দিকে। আমরা চা-এ চুমুক দিতে শুরু করি। আর তখুনি নেতা বলে ওঠে, "আরে মালিনী চলে যাচ্ছেন যে!"

তাকাই পথের দিকে। ঠিকই দেখেছে। মিস মালিনী তাঁর বন্ধুপুত্র এবং 'হাই অলটিচুড গাইড'-কে নিয়ে শ্রান্ত পায়ে চলেছেন এগিয়ে। এটা তো পাহাড়ী পথের রীতি নয়। তিনি মাউন্টেনিয়ার হয়ে এমন রীতিবিরুদ্ধ কাজ করবেন! গ্রামফুতে বিশ্রাম না করেই খোকসার চলে যাবেন!

সুজয়া হাসতে হাসতে অভিযোগ করে, "আপনাদের জন্যই তো উনি একটু বসতে পারলেন না এখানে।"

"কেন আমরা আবার কি করলাম?"

"আপনারা তাঁকে অপমান করেছেন।"

"মানে ?"

"ওঁদের পরে রওনা হয়ে, আগে গ্রামফু পৌঁচেছেন।" সুজয়া গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়। তার বক্তব্য ও বাচনভঙ্গিতে হাসি পায় আমাদের। আমরা তো হো হো করে হেসে দিই।

হাসি থামলে সুজয়া অবার বলে, "তাই আমরা এখানে বসেছি, দেখে উনি আর সময় নষ্ট করলেন না। এখন সমতল পথ। যদি আমাদের আগে খোকসার পৌঁছে যেতে পারেন, তাহলে অন্তত খানিকটা প্রেস্টিজ বাঁচে।"

হেসে বলি, "বেশ, মিস মালিনী যাতে আমাদের আগে খোকসার পৌঁছতে পারেন, তার সব ব্যবস্থাই আমরা করব।"

"মানে ?"

"আমরা এখানে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব, তারপরে ধীরে ধীরে হাঁটব। পাহাড়ে এসেছি, পর্বতারোহীর সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।"

তাই করা হল। বেশ কিছুক্ষণ গ্রামফুতে জিরিয়ে নিয়ে আমরা খোকসার রওনা হলাম। ধীরে ধীরেই পথ চলতে হচ্ছে। সুজয়া বলে দিয়েছেন, "মিস মালিনী পেছনে তাকিয়ে কিছুতেই যেন দেখতে না পান আমাদের।"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তাতে তাঁর ক্ষতি কি ?"

"ভদ্রমহিলা হোঁচট খাবেন।"

অতএব সামান্য উৎরাই এবং সমতল ও প্রশস্ত পথ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি আমরা। দেখতে দেখতে পথ চলেছি। আমাদের ডানদিকে নিচে পথের পাশে বয়ে চলেছে চন্দ্রা—লাহুলের প্রাণধারা চন্দ্রা। চিরচঞ্চলা চিত্তহারী চন্দ্রা। আমাদের মতো সে সুজয়ারও চিত্ত হরণ করেছে। তাকে দেখে কিন্তু সুজয়া ভাবতে পারে না যে এই করুণা ধারায় কেউ কোনোদিন যেতে পারে হারিয়ে।

কিন্তু সেকথা এখন নয়, এখন তোমাকে চন্দ্রভাগার কথা বলে নিই মানসী ! চন্দ্রা ও ভাগা দুটি নদীই উৎপন্ন হয়েছে বড়ালাচা গিরিবর্ত্ম থেকে। পাঁচ মাইল দীর্ঘ এই গিরিবর্ত্মটি লাহুল হিমালয়ের গ্রীবাদেশে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। বড়ালাচা নামটি এসেছে তিব্বতী শব্দ 'P'ara la' rtse" থেকে। শব্দটির অর্থ শিখরসমূহের গিরিপথ। সার্থকনামা বড়ালাচা—তিব্বত (জাসকার), লাদাখ, লাহুল ও স্পিতির পথ এসে মিশেছে সেখানে। ইতিহাসের ঊষাকাল থেকে এই গিরিপথ দিয়ে ভারত ও তিব্বতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়ে আসছিল। ইদানীং সেই যোসূত্রটি ছিন্ন হয়ে গেছে। তাহলেও বড়ালাচার মূল্য যায় নি কমে। এখনও লাহুল স্পিতি ও লাদাখের যোগসূত্র সে। আর লাহুল-স্পিতির প্রাণধারা চন্দ্রভাগা ও য়ুনান নদীর জন্মস্থান বড়ালাচা।

বড়ালাচার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের প্রশস্ত তুষারক্ষেত্র থেকে সৃষ্ট হয়েছে চন্দ্রা। উৎস থেকে প্রায় মাইলখানেক পর্যন্ত সে সাধারণ একটি বড় ঝরনা। তারপরেই সে দুর্বারগতি ভয়ঙ্করী। উৎস থেকে মাইল বিশেক প্রবাহিত হয়ে চন্দ্রা একটি প্রশস্ত তৃণভূমিতে এসেছে। কুনজুম গিরিশ্রেণীর দুটি নিচু গিরিশিরার মধ্যে পালমো গিরিবর্ত্মের কাছে অবস্থিত এই তৃণভূমি। উচ্চতা ১৪,০০০ ফুট। চন্দ্রার ধারায় সেখানে সৃষ্ট হয়েছে একটি অনিন্দ্যসুন্দর সবুজ রং-এর স্বচ্ছ হ্রদ—চন্দ্রতাল। ছোট হ্রদ। মাত্র ছ' ফার্লং দীর্ঘ এবং প্রায় তিন ফার্লং প্রশস্ত। জনৈক পর্যটক এই হ্রদের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

'a shining turquoise placed on a cloth of green baize.'

চন্দ্রা আবার বেরিয়ে এসেছে চন্দ্রতাল থেকে। এসেছে কুনজুম গিরিবর্ত্মের পাদদেশে। প্রথম দিকে সে দক্ষিণবাহিনী। তারপরে দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহিণী, কুনজুমের পরে সে আবার দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে বাতালের কাছে চন্দ্রা শিগরী হিমবাহ থেকে সৃষ্ট করচা নালার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

করচা নালার কথা লিখতে আমার হাত কাঁপছে মানসী ! কত শত পাহাড়ী নদী আছে লাহুল-হিমালয়ে। কিন্তু তার মতন এমন নিষ্ঠুরা স্রোতস্বিনী তুমি সারা হিমালয়ে আর খুঁজে পাবে না ! তাই বলছি, করচা নালার কথা এখন আর নয় মানসী ! আমি তোমাকে চন্দ্রানদীর কথা বলছি।

শিগরী হিমবাহের কাছে ফুটি-রুণি নামে একটা জায়গায় এসে চন্দ্রা ডানদিকে বাঁক নিয়ে পশ্চিম প্রবাহিণী হয়েছে। উৎস থেকে এই জায়গার দূরত্ব মোটামুটি তিরিশ মাইল।

হামতা গিরিবর্ত্মের পাদদেশ ছাড়িয়ে চন্দ্রা আরও খানিকটা ডাইনে বাঁক নিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রবাহিণী হয়েছে গ্রামফুতে।

এখান থেকে সে চলে গেছে খোকসার। সেখান থেকে শিশু ও গোন্ধলা হয়ে তান্ডিতে। ভাগার সঙ্গে মিলিত হয়ে চন্দ্রভাগায় পরিণত হয়েছে চন্দ্রা। পূর্ণ করেছে তার সত্তর মাইল দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা।

খোকসারের পর থেকেই তার তীরে তীরে গড়ে উঠেছে গ্রাম। তাই চন্দ্রার তীর দিযেই আমাদের পথ—লীলাভূমি-লাহুল পরিক্রমার পথ।

আমরা বিপাশা উপত্যকা থেকে রওনা হয়ে রোতাং পেরিয়ে চন্দ্রার কাছে নেমে এসেছি। চন্দ্রার তীর দিয়ে পথ। কিন্তু সে পথের কথা পরে হবে। তার আগে তোমাকে ভাগা নদীর কথা বলে নিই। কারণ চন্দ্রা ও ভাগা দুটি নদীকে নিয়েই লীলাভূমি-লাহুল। এর যে কোনো একটিকে বাদ দিয়ে লাহুল পরিক্রমা অসম্পূর্ণ।

বড়ালাচা গিরিবর্ত্মের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে সৃষ্ট হয়েছে ভাগা। উৎস থেকে সে প্রবাহিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ চন্দ্রার বিপরীত দিকে। জিংজিংবার পর্যন্ত গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবাহিণী হয়েছে। ভাগা চল্লিশ মাইল দীর্ঘ। গড়ে প্রতি মাইলে সে ১২৫ ফুট করে নেমে এসেছে। প্রথম দিকে ঊষর উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিতা। তারপরে ভাগার উপত্যকা অপেক্ষাকৃত উর্বর। পাতসেও থেকেই তার তীরে তীরে বনভূমি আর জনপদ। জিসপার পর থেকে ভাগা উপত্যকা সমতল ও সুজলা। আর কেলং থেকে সুফলা ও শস্যশ্যামলা। তাই ভাগা উপত্যকাই চিরকাল লাহুলের প্রাণকেন্দ্র। আগে লাহুলের রাজধানী ছিল কেলং-এর বিপরীত দিকে কারদাং গ্রামে। কিন্তু তখনও কেলং উপত্যকার বৃহত্তম জনপদ। তাই বোধ করি জার্মানীর মোরেভিয়ান মিশনারীরা তিব্বত থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানেই তাঁদের প্রধান প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। আর ব্রিটিশ রাজত্বকালে কেলং জেলা সদরে রূপান্তরিত হয়।

দুই নদীর মিলিতধারা চন্দ্রভাগাও উত্তর-পশ্চিম প্রবাহিণী। চন্দ্রা ও ভাগার চেয়ে চন্দ্রভাগার উপত্যকা প্রশস্ততর। তাই নদীও অনেক শান্ত। গড়ে প্রতি মাইলে সে মাত্র ৩০ ফুট অবতরণ করেছে। তান্ডি থেকে ষোলো মাইল প্রবাহিত হবার পরে থিরোটের কাছে চন্দ্রভাগা চাম্বায় প্রবেশ করেছে। সেখানে অবশ্য নদীখাত সংকীর্ণ। চন্দ্রভাগা উপত্যকা লাহুলের সবচেয়ে উর্বর এবং ঘনবসতিপূর্ণ অংশ।

চন্দ্রার তীর ছুঁয়ে আমাদের পথ। সেই পথে খোকসার চলেছি আমরা। চন্দ্রার দু' তীরেই উপত্যকা। এ-পারের সমতলভূমি শুরু হয়েছে চন্দ্রার তীর থেকে। ডান থেকে বাঁয়ে ধীরে

ধীরে উঁচু হয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে মিশেছে। ও-পারেও তাই। তবে এ-পারের উপত্যকা প্রশস্ততর। দু-পারেরই পাহাড়ের মাথায় তুষারের প্রলেপ।

খোকসারের পর থেকে কিন্তু উপত্যকার প্রকৃতি পালটে যাবে। তখন ডানদিকের অর্থাৎ চন্দ্রার ওপারের পাহাড় গুলি সরে যাবে দূরে। আর বাঁদিকে পর্বতশ্রেণী এগিয়ে আসবে চন্দ্রার কাছে। আমাদের তাই চন্দ্রা পেরিয়ে ওপারে চলে যেতে হবে। আর এপারে চন্দ্রার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকবে খাড়া পাহাড়। এমন খাড়া পাহাড় তুমি খুব বেশি দেখো নি মানসী! বিশেষ করে গোন্ধালায়। সেখানে দাঁড়ালে প্রায় বিশহাজার ফুট উঁচু পর্বতশীর্ষ দেখতে পাবে তুমি। দেখবে সেই খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে হিমবাহ নেমে আসছে নিচে। আর পর্বতগাত্র এসে মিশেছে চন্দ্রার তৃণময় বেলাভূমিতে। এক জায়গায় পাহাড় প্রায় পাঁচহাজার ফুট সোজা নেমে এসেছে। ভৌগোলিকদের মতে সেটি—

'One of the grandest precipices in the world.'

মাইল দুয়েক হাঁটার পরে জনপদ চোখে পড়ল—এ-পারে নয়, ও-পারে। প্রাচীন খোকসার। সেকালে এখানে চন্দ্রার ওপরে একটি ঝুলা ছিল। লাহুল যাত্রীদের সেই ঝুলা পেরিয়ে ওপারে যেতে হত। ঝুলাটিকে অভিযাত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন মূরক্রফ্ট বলেছেন—

'Swing bridge led to the hamlet of Kuksars'...

স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহ্যাম যখন লাহুলে এসেছিলেন, তখনও তাকে সে ঝুলাটি পেরোতে হয়েছিল। তিনি বলেছেন—

'Ghula (a wooden cage drawn accross on a rope cable)'.

দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই বিস্ময়কর বস্তুটি দর্শনের সৌভাগ্য হল না। মহাকালের গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে সেই ঝুলা। এখন আর এখানে কোনো ঝুলা নেই। আধুনিক পুল তৈরি হয়েছে খোকসারে—আরও মাইল খানেক এগিয়ে। সেই পুলই এখন দক্ষিণ ও মধ্য লাহুলের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করছে। পুলের ওপর দিয়ে মোটর চলে। আমরা তার কাছেই চলেছি।

কিছুদূর এগিয়েই পথটা ডাইনে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে বাঁ দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে একটি পাহাড়ী নদী এসে চন্দ্রায় মিশেছে। মূরক্রফ্ট বলেছেন, এই নদীটি এসেছে সরকুণ্ড অর্থাৎ রোতাং গিরিবর্ত্ম থেকে।

পুল পেরিয়ে পাহাড়ী নদীর অপর পারে এলাম আমরা। উপত্যকাটি সহসা অনেকখানি প্রশস্ত হয়ে গেল। সামনে সুদীর্ঘ সমতল প্রান্তর। তারই ভেতর দিয়ে পথ। পথের দুদিকে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট ও মোটর-স্ট্যান্ড। আমরা পৌঁছে গেছি খোকসার।

॥ তিন ॥

আমার মানসী,

আগের চিঠিতে তোমাকে খোকসার পৌঁছবার কথা লিখেছি, কিন্তু খোকসারের কথা হয় নি লেখা। তাই আবার কলম নিয়ে বসেছি।

খোকসার লাহুল-স্পিতি ও মানালী পথের জংশন স্টেশন। রোতাং গিরিবর্ত্মের দক্ষিণে চন্দ্রা উপত্যকায় অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। ১০,৪০০ ফুট উঁচু এই গ্রামটি চন্দ্রা উপত্যকার প্রথম ও উচ্চতম স্থায়ী জনপদ। লাহুল-স্পিতির যাত্রীদের এখানে এসেই গাড়ি ধরতে হয়—

জিসপা, কাজা ও থিরোটের গাড়ি। অদূর ভবিষ্যতে অবশ্য যাত্রীদের আর পায়ে হেঁটে রোতাং পেরিয়ে এখানে এসে গাড়ি ধরতে হবে না। মানালী থেকে রোতাং-খোকসার, তান্ডি-উদয়পুর ও কেলং-জিসপা বাসপথ প্রস্তুত হচ্ছে। তুমি সকাল সাতটায় মানালীতে বাসে চাপলে খোকসার পৌঁছবে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ। বাস-পথে মানালী থেকে রোতাং শীর্ষের দূরত্ব হবে ৩২ মাইল। আর সেখান থেকে খোকসার ১২ মাইল।

খোকসার থেকে বাসপথে তান্ডির দূরত্ব হবে ২৩ মাইল, কেলং ২৮ ও জিসপা ৪২ মাইল। ত্রিলোকনাথের যাত্রীরা তান্ডি থেকে উদয়পুরের গাড়ি ধরে চলে যাবেন। তান্ডি থেকে উদয়পুর ২৮ মাইল। অর্থাৎ মানালী থেকে উদয়পুর ১০২ মাইল।

খোকসার থেকে বাসে করে কেলং যেতে দু'ঘন্টার মতো সময় লাগবে। কাজেই কেলং-যাত্রীদের আর খোকসারে রাত্রিবাসের প্রয়োজন পড়বে না। তাঁরা মানালীতে সকাল সাতটায় বাসে চাপলে কেলং পৌঁছে যাবেন বিকেল তিনটার মধ্যে।

কিন্তু স্পিতি উপত্যকার সদর কাজার যাত্রীদের অবশ্য তখনও একটা রাত কাটাতে হবে খোকসারে। কারণ এখানকার মতো তখনও সকাল আটটায় এখান থেকে কাজার জীপ ছাড়বে। ১৪,৯৩১ ফুট উঁচু কুনজুম গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে ৯৩ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সেই জীপ কাজা পৌঁছয় বিকেল ছ'টায়। আঁকা বাঁকা ও সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তা। কাজেই সারাদিন জীপে বসে থাকা রীতিমতো কষ্টকর। তার ওপর আবার বাতালের কাছে চন্দ্রার পুল পেরোবার সময় যাত্রীদের জীপ থেকে নেমে হেঁটে পুল পেরোতে হয়। কারণ ছোট পুল, যাত্রীসহ ওজন বইতে পারে না। কিন্তু পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য যাত্রীদের সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

পথে গ্রামফু, বাতাল, কুনজুম-শীর্ষ ও লোসারে জীপ থামে। খোকসার থেকে বাতাল ৩৩ মাইল, কুনজুম-শীর্ষ ৪১ এবং লোসার ৫৪ মাইল। খোকসার থেকে কাজার ভাড়া প্রায় পনেরো টাকা। মালের জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হয়। বাতাল, লোসার ও কাজায় বিশ্রাম-ভবন আছে। কাজার নির্মাণ বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি লিখে এই বিশ্রাম-ভবন রিজার্ভ করা যায়।*

এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে একটু স্পিতি উপত্যকার কথা বলে নিচ্ছি মানসী। বিশাল কুনজুম গিরিশ্রেণী লাহুল ও স্পিতির মাঝে বিভেদের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কুনজুম গিরিবর্ত্ম হল স্পিতির প্রবেশ-তোরণ। এই গিরিবর্ত্ম থেকেই উপত্যকার প্রধান জলধারা স্পিতি নদীর সৃষ্টি হয়েছে। কুনজুম রোতাংয়ের চেয়ে উঁচু কিন্তু অমন দুর্গম এবং বিপজ্জনক নয়। তাই অনেক দিন থেকেই কুনজুমের ওপর দিয়ে জীপ চলাচল করছে। এই গিরিবর্ত্মের ওপর থেকে বড়া শিগরী হিমবাহ অঞ্চলের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। অসংখ্য তুষারাবৃত শৃঙ্গের সে এক অপূর্ব সমাবেশ। সুজয়া এরই একটি শৃঙ্গের নাম রেখেছে 'ললনা' হয়তো সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন কয়েকটি বাঙালী মেয়ে সেই শৃঙ্গে আরোহণ করে ললনা নাম সার্থক করবে। সেদিনটি তোমাদের কাছে তো বটেই, আমাদের কাছেও একটি পরম গৌরবের দিন। কিন্তু সেকথা এখন থাক মানসী, এখন স্পিতি উপত্যকার কথা হোক।

স্পিতি উপত্যকার মহকুমা-সদর কাজা। স্থায়ী জনসংখ্যা ৩১০ জন। স্পিতি নদীর বাঁতীরে অবস্থিত বারো হাজার ফুট উঁচু এই জনপদটি বহুকাল থেকেই স্পিতি রাজ্যের রাজধানী। কাছেই একটি এ্যাজবেস্টসের খনি রয়েছে। কিন্তু পরিবহণের অসুবিধার জন্য

---

* এখন মানালী থেকে বাসে করে প্রায় সারাবছর সর্বত্র যাতায়াত করা যায়।

উত্তোলন করা হয় না। কাজাতে বিশ্রাম-ভবন ছাড়াও স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং কয়েকটি সরকারী অফিস আছে।

আয়তনের দিক থেকে স্পিতি উপত্যকা লাহুলের চেয়ে বড়। কিন্তু উচ্চতর এবং অনুর্বর বলে লোকসংখ্যা কম—লাহুলের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। ১৯৬১ সালের আদম-সুমারি অনুযায়ী স্পিতি উপত্যকার জনসংখ্যা ৫২৭৬ জন। তাদের মধ্যে ২৮২৭ জন পুরুষ ও ২৪৪৯ জন নারী। বিবাহিতের সংখ্যা যথাক্রমে ১২৮৭ ও ৯১৭ জন।

অধিবাসীদের মধ্যে ৪৮২৭ জন বৌদ্ধ, ৩২৪ জন হিন্দু ও ১২৫ জন শিখ। তার মানে স্পিতি একটি বৌদ্ধপ্রধান উপত্যকা। তিব্বত সীমান্তের শেষ ভারতীয় উপত্যকা স্পিতি। স্বভাবতই তার গুরুত্ব প্রায় কাশ্মীরের মতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা স্পিতির উন্নয়নে আমরা নিতান্তই উদাসীন।

স্পিতি উপত্যকার সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় মন্দিরটির নাম 'কী' গুম্ফা। বারো শ' বছর আগেও নাকি সেখানে দেবালয় ছিল, তবে, বর্তমান গুম্ফাটি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের।

স্পিতি উপত্যকার প্রকৃতি অতিশয় পার্বত্য হলেও এই গুম্ফাটি গ্রামের বাইরে প্রায় সমতল প্রান্তরে। গুম্ফার দেওয়ালে আঁকা ফ্রেস্‌কো চিত্রগুলি তোমার ভাল লাগবে মানসী।

এই গুম্ফার প্রধান দর্শন সুবিশাল অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। তাঁর এগারোটির মাথা আর এক হাজার হাত।

কিন্তু 'কী' গুম্ফার খ্যাতি অন্য কারণে। থাঙ্কা চিত্রসম্পদ গুম্ফাটিকে বিশ্ববিখ্যাত করে রেখেছে। মসলিনের ওপরে আঁকা এই 'চাইনিজ স্ক্রোল পেন্টিং' সত্যই দেখবার মতো। বুদ্ধদেব, মা-তারা, মা-দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি আঁকা হয়েছে। চিত্রগুলি একটি মাখন মাখানো কাঠের বাক্সে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। শত শত বছরের প্রাচীন চিত্রসম্ভার, দেখলে মনে হয় যেন সদ্য অঙ্কিত।

যাক্‌গে, এবারে আবার খোকসারের কথায় ফিরে আসা যাক্। বিকেল পাঁচটায় আমরা খোকসার পৌঁচেছি। এরই মধ্যে রোদ পড়ে গেছে এখানে। তাই ভীষণ শীত লাগছে আমাদের। তোমাকে আগেই বলেছি মানসী, খোকসার উপত্যকাটি বেশ চওড়া এবং তার চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ। প্রায় সর্বদা প্রবল বাতাস বয় এখানে। আর সে বাতাস তুষার-শীতল।

কিন্তু এ শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায়ও দেখছি না। আমরা যে এখনও নিরাশ্রয়। দুটি স্যুইট নিয়ে নির্মাণ বিভাগের একটি বিশ্রাম ভবন আছে খোকসারে। কিন্তু সেখানে আশ্রয় পেতে হলে লাহুলের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে অগ্রিম অনুমতি নিতে হয়। সময়াভাবে আমরা সেটি নিতে পারি নি। কাজেই আমরা আশ্রয়হীন।

আমাদের দেখতে পেয়েই ছুটে আসছেন ওঁরা। না তুমি ভুল ভেবেছো মানসী! মিস মালিনী কিংবা তার সহচর-সহচরীদের কেউ নয়। তাঁরা হয়তো এতক্ষণে বিশ্রাম-ভবনের কার্পেট-মোড়া ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমাদের ঘর দেবার প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গেছেন।

আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন মাস্টারজী ও সেপাইজী। ওঁদের দুজনের সঙ্গে গতকাল রাহালায় পরিচয় হয়েছিল আমাদের। একই তাঁবুতে রাত্রিবাস করেছি। দুজনেই বদলী হয়ে কেলং চলেছেন। আজ সকালে আমাদের ঘোড়াওয়ালা দেরি করায়, ওঁরা আগে রওনা হয়ে এসেছেন। কথা ছিল খোকসারে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে রাখবেন।

"যে ভাবে ছুটে আসছেন, মনে হচ্ছে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।" সুজয়া আশা প্রকাশ করে।

কিন্তু কাছে এসেই মাস্টারজী জানান, "রেস্ট হাউস পাওয়া গেল না।"

"কেন ?" আমরা রীতিমতো মর্মাহত।

"জায়গা নেই।" সেপাইজী উত্তর দেন।

"কিছুক্ষণ আগে যে যাত্রীদল এসেছেন, তাঁরা দখন করেছেন তো। তাঁরা বলেছেন, আমাদের একটা ঘর ছেড়ে দেবেন।"

সেপাইজী হাসেন। বলেন, "তাঁদের নিজেদের ব্যবস্থাই যে এখনও হয় নি তাঁরা আমাদের জায়গা দেবেন কেমন করে ?"

"কেন, মিস মালিনী যে বললেন, তিনি লাহুলের ডেপুটি কমিশনারকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।"

"তাতে কোনো কাজ হয় নি।" মাস্টারজী জবাব দেন, "রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা থেকে কানাডার জনৈক কৃষি-বিশারদ গতকাল এখানে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। ডাকবাংলোর দুটি ঘরই এখন তাঁদের দখলে। সকালে তাঁরা ভূমি-সমীক্ষা করতে বেরিয়েছেন, এখনও ফিরে আসেন নি। ফিরে এসে যদি দয়া করে মিস মালিনীকে একখানি ঘর দেন, তাহলে তিনি সেখানে থাকতে পারবেন, নইলে তাঁরও আমাদের দশা হবে।"

"তাঁরা কোথায় ?" সুজয়া অবার জিজ্ঞেস করে।

"ডাকবাংলোর বারান্দায়।"

"আহা, বেচারী মিস মালিনী। কত কষ্টই না-জানি হচ্ছে। অথচ লাহুলের ডেপুটি কমিশনার তাঁর 'পার্সোন্যাল ফ্রেন্ড'—হয়তো বা বয়-ফ্রেন্ড।"

সুজয়ার বক্তব্যও ভঙ্গিমায় হাসি পায় আমাদের। হাসি থামলে মাস্টারজীকে প্রশ্ন করি, "কিন্তু আমরা কোথায় থাকব ?"

"হোটেলে।" সেপাইজী উত্তর দেন। "নিচের ঐ হোটেলের দোতলায় একটা ঘর নিয়েছি। মালপত্র সেখানে তুলে দিয়েছি।"

"আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।" সুজয়া বলে। "আপনারা না থাকলে আজ আমাদের না-জানি কি দুর্দশাই হত।"

"ঘরটা দেখে নিন। তখন হয়তো ধন্যবাদ না দিয়ে অভিশাপ দেবেন।" মাস্টারজী বলেন।

"ছি ছি এ-সব কি বলছেন !" সুজয়া প্রতিবাদ করে, "যেখানে আশ্রয় পাওয়াটাই পরম প্রাপ্তি, সেখানে ভাল-মন্দের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।"

সেপাইজীর প্রদর্শিত পথে আমরা ডানদিকের রাস্তায় নেমে আসি—চন্দ্রার প্রায়-সমতল তীরের কাছে। বড় বড় কয়েকখানি টিনের ঘর রয়েছে এদিকে। দুখানি ঘর দোতলা। কাঠের মেঝে, মাটির দেওয়াল আর টিনের চাল। কাঠের মই বেয়ে দোতলায় উঠতে হয়।

একটি ঘরের সামনে একটা ডাক-বাক্স লাগানো রয়েছে। সেই আদি ও অকৃত্রিম চেহারার ডাক-বাক্স। তেমনি টিনের তৈরি, লাল রং। খোকসারে এখনও কোনো পোস্ট-অফিস হয় নি। তাই এ ডাক-বাক্সটি এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তুসমূহের অন্যতম। আমরাও একটু দাঁড়িয়ে ডাক-বাক্সটিকে ভাল করে দেখে নিই।

সুজয়া বলে, "রাতে একখানা চিঠি লিখে কাল সকালে এই ডাক-বাক্সে ফেলে দিতে হবে।"

"কোথায় লিখবে ?"

"কলকাতায়।"

"পরশু দেখি মানালী থেকে চিঠি পাঠালে, এরই মধ্যে আবার চিঠি !"

"হ্যাঁ, নতুন জায়গায় গেলেই আমি সেখান থেকে বাড়িতে চিঠি লিখি। ফিরে গিয়ে বিভিন্ন পোস্ট-অফিসের ছাপ মারা সেই চিঠিগুলো সযত্নে রেখে দিই।" সুজয়া জবাব দেয়।

"কিন্তু এই বাক্সে চিঠি ফেললে তাতেও যে মানালীরই ছাপ থাকবে।"

"কেন ?"

"এখানে পোস্ট-অফিস নেই। তাই চিঠিতে ছাপ মারার লোকও নেই। সপ্তাহে দু'বার করে একজন রাণার এই বাক্সের চিঠি পৌঁছে দেয় রাহালা। সেখান থেকে বাসে করে চিঠি যায় মানালী।"

"তাহলে আর এখানে থেকে চিঠি লিখে কি হবে ?"

সুজয়া মত পরিবর্তন করে।

সেপাইজীর সঙ্গে আমরা মই বেয়ে ওপরে উঠে আসি। ভেবেছিলাম কাজটি সহজ। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি বেশ কঠিন। একে তো মইটা একেবারে খাড়া, তার ওপরে পাশে ধরবার কোনো জিনিস নেই। মই ধরে মই বেয়ে উঠে আসতে হল ওপরে। সুজয়ার কিন্তু কোনো অসুবিধে হল না। কেনই বা হবে ! সে দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে তুমি অনায়াসে জিজ্ঞেস করতে পারো মানসী, তাহলে রোতাং গিরিবর্ত্মের চা-এর দোকানে বসে মিস মালিনী যখন নিজেকে 'বেসিক ট্রেন্‌ড' বলে পরিচয় দিলেন, তখন তাঁকে সুজয়ার ট্রেনিং-এর কথা বললাম না কেন ? ইচ্ছে করেই বলি নি। কারণ তাহলে তিনি অমন সোচ্চার স্বরে নিজেকে মাউন্টেনিয়ার' বলে ঘোষণা করতে পারতেন না।

যাক্‌ গে, যে-কথা বলছিলাম। আমরা কাঠের মই বেয়ে একটা অন্ধকার ঘরে উঠে এলাম। কয়েকজন কনস্টেবল সে ঘরে গদাগাদি করে বসে অথবা শুয়ে ছিলেন। নিজেদের আলোচনা বন্ধ করে তাঁরা আমাদের নমস্কার জানালেন। আমরাও প্রতিনমস্কার করলাম। সেপাইজী ওঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, "এরা কাল এসেছে। আমারই মতো বদলী হয়ে কেলং চলেছে। জীপের টিকিট না পেয়ে আজ এদের এখানে থেকে যেতে হচ্ছে। কাল যাবে।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। বলি, "আমাদের টিকিটের কি হবে ?"

"আমাদেরও কাল এখানে থাকতে হবে।" মাস্টারজী বলেন।

"কেন ? কালকের জীপে জায়গা নেই ?"

"না। পরশুদিনের গাড়িতে জায়গা রেখে দিয়েছি। কাল দুপুরে টিকিট পাওয়া যাবে।"

সংবাদটা শুভ নয়। অযথা একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু অন্য কোনো উপায় নেই যে। কাজেই বৃথা মন খারাপ না করে সেপাইজীর সঙ্গে পাশের ঘরে আসি।

আগের ঘরটায় তবু যা হোক একটু আলোর রেশ ছিল, কিন্তু এ ঘরটা একেবারেই অন্ধকার। নেতা পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে টর্চ বের করে।

ছোটঘর। একটি মাত্র দরজা। কোনো জানালা নেই। শীতের দেশ। এদেশের বাড়ি-ঘরে কেউ বড় একটা জানালা করে না।

সেপাইজী বলেন, "ঘরটা অন্ধকার হলেও বেশ গরম। বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।"

"কি দরকার ?" সুজয়া প্রতিবাদ করে। "চলুন না, দোকানে গিয়েই চা খেয়ে আসা যাক্।"

"না, না। নিচেই হোটেল। বললেই চা দিয়ে যাবে। আপনারা ততক্ষণ বিশ্রাম করুন।" আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সেপাইজী বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

ভদ্রলোক অতিশয় অতিথি-বৎসল। তাঁকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। আজ আবার অনুভব করছি, পুলিশরাও মানুষ—আমার আর তোমার মতো স্নেহপরায়ণ সাধারণ মানুষ।

একটু বাদেই সেপাইজীর কথার সত্যতা বুঝতে পারি—ঘরটা সত্যই বেশ গরম।

ঘরে দু'খানি খাটিয়া—দড়ির খাটিয়া। তারই ওপর বসে গল্প করছি আমরা। নেতা মোমবাতি জ্বালিয়েছে। মোমের মৃদু আলো মুহূর্তে মোহময় পরিবেশ রচনা করেছে ছোট্ট এই ঘরটিতে।

সেপাইজী ফিরে আসেন। বলেন, "চা আর পকোরা আসছে।"

"পকোরা !" সুজয়া দস্তুরমত উল্লসিতা।

"জী, বহিনজী।" সবিনয়ে সেপাইজী উত্তর দেন।

"থ্রি চিয়ার্স ফর সেপাইজী..."

"হিপ্ হিপ্ হুররে..." আমরা সোচ্চার স্বরে সুজয়ার সঙ্গে গলা মেলাই।

সেপাইজী লজ্জা পান। এবং তারপরেই সেই পরমপ্রিয় গরম পকোরা আসে। আমরা সানন্দে সদ্ব্যবহার শুরু করি।

খেতে খেতে সেপাইজী জানান, এটি একটি হোটেল। এই রকম গুটি তিনেক হোটেল আছে খোকসারে। রাতের খাবার খেলেই এখানে রাত্রিবাসের অধিকার পাওয়া যায়, পৃথক পয়সা দিতে হয় না। খাটিয়া নিলে পঞ্চাশ পয়সা এবং বিছানা নিলে আড়াই টাকা।

ম্যানেজোর-কাম-লীডারের টনক নড়ে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই ছেঁড়া লেপ-তোশক আর তেল-কুচকুচে বালিশটার জন্য দু'টাকা বেশী দিতে হবে !"

"জী, সাব।" মাস্টারজী জবাব দেন।

অসিত সুজয়াকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি এই বিছানাটা রাখবেন নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ? আপনার তো স্লীপিংব্যাগ আর এয়ার-ম্যাট্রেস রয়েছে।"

"তা থাক্ গে।" সুজয়া অকম্পিত স্বরে বলে।

"কিন্তু এগুলো যে ভীষণ নোংরা।"

"হোক গে।" সুজয়া চুপ করে।

অসিত বিরক্ত। আমরাও বিস্মিত। কারণ নেতা কেবল পয়সা বাঁচাবার জন্যই সুজয়াকে বিছানা নিতে নিষেধ করছে না, সত্যি বিছানাটা বড়ই নোংরা। আর অসিত আমাদের লীডার হলেও পয়সা বাঁচাবার গরজ তার একার নয়। এই যাত্রার ব্যয়ভার সবাইকেই সমান ভাগে বহন করতে হবে।

একটু বাদে সুজয়া নীরবতা ভঙ্গ করে। ভারী স্বরে বলে, "অসিতবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। সত্যই বিছানাটা নোংরা এবং আমার এর কোনো প্রয়োজনই নেই। তবু আমি এটা রাখব, না শুলেও রাখব। কেন জানেন ?"

"না।"

"রাখলে হোটেলওয়ালা দুটো টাকা পাবে। আপনি তো জানেন অসিতবাবু, এরা বড় গরীব। বিশ্রাম ভবনে ঘর নিলেও তো আমাদের টাকা দিতে হত।"

এর পরে যে আর আপত্তি করা যায় না, তা তুমিও মেনে নেবে মানসী! আর করলেও কোনো লাভ হত না। সুজয়া শুনতো না সে কথা। হিমালয়কে সে ভালোবাসে নিজের প্রাণের থেকের বেশি। কিন্তু সে হিমালয় কেবল গাছ পাথর আর বরফ নিয়েই নয়, নগাধিরাজ, তাঁর ফুল-ফল, পশু-পক্ষী আর মানুষ সব কিছুকে নিয়েই সুজয়ার হিমালয়।

কিছুক্ষণ বাদেই খাবার ডাক এলো। আমরা নেমে এলাম নিচে। সিঁড়ির পাশেই বড় ঘরে রেস্তোরাঁ। কি একটা নামও যেন লেখা আছে। একপাশে মালিকের বসবার জায়গা অর্থাৎ 'ক্যাশ কাউন্টার'। দোকানে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। দু'সারি খাবার জায়গা। তক্তা ও খুঁটি দিয়ে তৈরি বেঞ্চি এবং টেবিল। এক সারিতে জন আটেক লোক বসতে পারে। পাশের ছোট্ট কুঠুরিতে রান্না হচ্ছে।

প্রতিবেশী পুলিশরা খেতে বসেছেন। স্বভাবতই মালিক কর্মব্যস্ত। কিন্তু তারই মধ্যে সে আমাদের আমন্ত্রণ জানায়। বলে, "আপনাদের টেবিল রিজার্ভ করে রেখেছি, বসে পড়ুন।"

সত্যই তাই। পুরো একখানি বেঞ্চি খালি পড়ে আছে। আমরা সেখানে বসে পড়ি। একটু বাদে গরম জল এলো। তারপরেই গরম ডাল রুটি ও তরকারী। বলা বাহুল্য আলুর তরকারী। কেবল লাহুল নয়, সারা হিমালয়ে আলুই একমাত্র সর্বজনভোক্ষ সবজি।

সারাদিনে চা ও পকোরা ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয় নি। চড়াই-উৎরাই করে প্রভূত পরিশ্রম হয়েছে। খুব খিদে পেয়েছে। তাছাড়া গরম গরম ডাল-তরকারী দিয়ে মোটা রুটিগুলি খেতে বেশ ভালই লাগছে। যদিও এমন খাদ্য কলকাতায় হলে গলা দিয়ে ঢুকত না।

খাওয়া-শেষে দোকান থেকে বেরিয়ে আসি। সিঁড়ির গোড়ায় এসে সুজয়া প্রশ্ন করে, "এখুনি ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ব নাকি?"

"আর কি করার আছে! তাছাড়া রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। কলকাতায় এখন সবে সন্ধ্যে হলেও হিমালয়ে যে গভীর রাত।"

"তা হোক গে", সুজয়া বলে, "আমি একবার বাইরে গিয়ে রাতের লাহুলকে না দেখে কিছুতেই ওপরে উঠছি না। এখানে আসার পর থেকেই স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড-এর সেই বর্ণনাটুকু আমার বার বার মনে পড়ছে।"

প্রতিবাদ নিরর্থক। কারণ সুজয়া একবার যখন মনস্থ করেছে, তখন তাকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। আর তার প্রয়োজনই বা কি? প্রস্তাবটা তো ভালই। তাই নীরবে আমরা তাকে অনুসরণ করি।

উঠে আসি রাস্তায়। বিস্ময়ে ও আনন্দে হতবাক হয়ে যাই। চারিদিকে এক অদৃশ্যপূর্ব মায়াময় জগৎ। লীলাভূমি-লাহুলের সুনীল আকাশে চাঁদ উঠেছে। সামনের পাহাড়টির পেছনে দাঁড়িয়ে সে তার স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়েছে লাহুল হিমালয়ের সংখ্যাতীত রূপালী শিখরে। লক্ষ-কোটি মাণিকের জ্যোতি নিয়ে তারা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। কিন্তু সামনের পাহাড়ের শরীরটা কালো আঁধারে ঢাকা। সাদা আর কালোর বিস্ময়কর সহাবস্থান।

চাঁদের হাসি কাছের পাহাড়টির মুখ থেকে গাম্ভীর্যের কালো পরদাটা সরাতে পারে নি, কিন্তু দূরের এই খোকসার আর চন্দ্রার মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এখানকার বাড়ি-ঘর বাগান ও বেলাভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার আলোয়। চাঁদের আলোয় চন্দ্রা আজ চন্দ্রাবতীতে রূপান্তরিতা।

তার রূপালী ধারার নূপুর-নিক্কণে নিস্তব্ধ নিখিল মুখর হয়ে উঠেছে। আর সেই মুখরতায় একটা আশ্চর্য মৌনতা মূর্ত হয়ে উঠেছে চারিদিকে। এবং মৌনতা মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলেছে আমাদের। আমরাও লীলাভূমি-লাহুলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছি। হাড়-কাঁপানো হিমেল হাওয়া আমাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করে তুলতে পারছে না। আমরা অচল ও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছি লীলাভূমি-লাহুলের দিকে।

কতক্ষণে কেটে গেছে জানি না। সহসা সেপাইজীর ডাকে বাস্তবে ফিরে আসি। তিনি বলেন, "এবারে ঘরে চলুন। এখানে বেশিক্ষণ এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

কথাটা মেনে নেয় সুজয়া। কিন্তু মনে মনে বোধ করি সে আহত হয়েছে। তাই সে ধীরে ধীরে ফিরে চলে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে ওপরে। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

বিছানা পাততে গিয়ে দেখা গেল দু'খানি খাটিয়ায় দুজন শুলে, ঘরের বাকি জায়গাটুকুতে কুলোচ্ছে না। অন্তত একখানি খাটিয়ায় দুজন শোয়া দরকার। কিন্তু খাটিয়ায় দুজন শোয়া বড়ই অসুবিধের। সেপাইজীও সেই কথাই বললেন, "বহিনজী এই খাটিয়ায় শুয়ে পড়ুন, আর আপনারা মেঝেতে বিছানা করে নিন।"

"আপনি ও মাস্টারজী ?" প্রশ্ন করি।

"ঐ খাটিয়ায়।" হেসে মাস্টারজী বলেন।

"কিন্তু তাতে আপনাদের অসুবিধে হবে যে ?"

"কোনো অসুবিধে হবে না।" সেপাইজী জবাব দেন। "আমাদের অভ্যেস আছে।"

এর পরে কি আর বলব ? তাই নীরবে এয়ার-ম্যাট্রেস বের করি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুয়ে পড়ি সকলে। মাস্টারজী জিজ্ঞেস করেন সুজয়াকে, "আচ্ছা, তখন আপনি কোন বর্ণনাটার কথা বলছিলেন বহিনজী ?"

"আপনি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড-এর 'Wonders of the Himalaya" পড়েছেন কি ?

"না বহিনজী !" মাস্টারজী উত্তর দেন। "বলুন না সে বইতে তিনি লাহুলের কথা কি লিখেছেন ?"

সুজয়া শুরু করে, "স্যার ফ্রান্সিস ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম হিমালয় পরিক্রমার সময় খোকসারে এসেছিলেন। তিনি কুলু থেকে রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে লাহুলে আসেন। প্রথম দর্শনে লাহুলকে তাঁর মনে হয়েছিল—

'Huge depressing mountains shut me in on every side, and the whole valley looked......inexpressibly dreary and desolate.'

"কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে রাতের খাওয়া সেরে তিনি যখন বিশ্রাম ভবনের বারান্দায় পায়চারি করছিলেন, তখন পূবদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন—

'It was getting lighter and lighter, just as if the sun was rising behind the mountains, only the light was white and silvery instead of ruddy. Lighter and lighter it grew. Peak after peak was lit in the silvery radiance. At last the moon at its full appeared above the mountains and the valley was almost as light as day.'

* * *

"ভাইসাব, চায়ে।"

ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে তাকাই। সেপাইজী দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে হোটেলের সেই ছেলেটি। তার হাতে একখানি থালায় কয়েক গ্লাস চা।

সেপাইজী গ্লাস বাড়িয়ে ধরেন আমার দিকে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। গ্লাসটা হাতে নিই।

চা-এ চুমুক দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাই। সাতটা বাজে।

একে একে সবাইকে সেপাইজী ডেকে তোলেন। সবার সামনে তিনি একই ভাবে চা-এর গ্লাস ধরেন এগিয়ে।

আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই তাঁকে। কিন্তু মৌখিক ধন্যবাদে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করা যায় না। প্রচণ্ড শীত এখানে। গরম চা না হলে শয্যাত্যাগ সম্ভব নয়। সেপাইজী আমাদের হাতে সেই মহামূল্য বস্তুটি তুলে দিয়েছেন। কিন্তু এজন্য তাঁকে চা ছাড়াই শয্যাত্যাগ করতে হয়েছে। নিজে কষ্ট করে আমাদের কষ্ট লাঘব করার ব্যবস্থা করেছেন।

চা শেষ হতেই তিনি সুজয়াকে বলেন, "বহিনজী, আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথায় ?" সুজয়া জিজ্ঞেস করে।

"ডাকবাংলোয়।"

"কেন ?"

"সেখানে বাথরুম আছে, ভাল করে মুখ-হাত ধুয়ে নেবেন।"

"কিন্তু বিশ্রাম ভবনের বাসিন্দারা কি আমাকে তাঁদের বাথরুম ব্যবহার করতে দেবেন ?"

"কেন দেবেন না, নিশ্চয়ই দেবেন।" সেপাইজী আশ্বাস দেন সুজয়াকে, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

আর আপত্তি না করে সুজয়া সেপাইজীর সঙ্গে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

একটু বাদে আমরাও প্রভাতী কাজকর্ম সেরে বেরিয়ে আসি হোটেল থেকে। রাস্তায় উঠে আসি। রাস্তা পেরিয়েই মোটর-স্ট্যান্ড। রাস্তা থেকে খানিকটা উঁচুতে একফালি সমতল জায়গা। একপাশে বিশ্রাম ভবন, চলতি কথায় ডাকবাংলো। পেছনে নির্মাণ-বিভাগের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ও কোয়ার্টার্স।

মোটর-স্ট্যান্ডের আর এক পাশে 'মান্ডি কুলু রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন'-এর অফিস। এই পরিবহন সংস্থা হিমাচল প্রদেশের দুর্গম অঞ্চলে বাস ও জীপ চালিয়ে থাকেন। এঁদের সহায়তা ছাড়া হিমাচল-ভ্রমণ সম্ভব নয়।

ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অফিসের পরেই পাহাড়। না, পাহাড় নয়, পর্বত—পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী। কুলু ও লাহুল উপত্যকাকে পৃথক করে রেখেছে। এটি মধ্য-হিমালয় পর্বতশ্রেণী (Mid Himalayan Range)। এর ওপারে কুলু ও বড়া-বাঙ্ঘাল, এপারে লাহুল ও স্পিতি। এই পর্বতশ্রেণী স্পিতি নদীর উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে জাস্‌কার তথা হিমালয়ের মূল পর্বতমালার (Main Himalayan Range) সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উভয়ের সংযোগস্থলে কুনজুম গিরিবর্ত্ম। তোমাকে আগেই বলেছি মানসী, স্পিতি উপত্যকায় যেতে হলে সেই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে হয় এবং কুনজুম শৃঙ্গমালা লাহুল ও স্পিতি উপত্যকাকে বিভক্ত করেছে।

মূল হিমালয় পর্বতমালা তিব্বত থেকে উত্তরপূর্ব দিক দিয়ে এই জেলায় প্রবেশ করেছে।

বড়লাচা গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত এসে স্পিতির দিকে প্রসারিত হয়েছে।

লাহুলের উত্তর-পশ্চিম সীমায় পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী। কাশ্মীর ও লাদাখ থেকে লাহুলকে পৃথক করে রেখেছে। আর এই অংশ চাম্বা ও লাহুলের মাঝে প্রাচীর তৈরি করেছে।

সুউচ্চ পর্বতমালা আর সংকীর্ণ উপত্যকা নিয়েই লাহুল-স্পিতি জেলা। সতেরো থেকে তেইশ হাজার ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ আছে এ জেলায়। এগারো হাজার ফুট পর্যন্ত গাছপালা জন্মায়। তার ওপরে রুক্ষ প্রান্তর। লাহুলের সাধারণ উচ্চতা দশ হাজার ফুটের ওপরে আর স্পিতির বারো হাজার ফুটের চেয়ে বেশি। ১৩°-৪৪´-৪৫´´ ও ৩৩°-০০´-১০´´ সেঃ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৬°-৪৪´-৪৫´´ ও ৭৮°-৪০´-১৫´´ সেঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই জেলা।

লাহুল-হিমালয় সুগঠিত পর্বতমালা। সারা জেলার চতুর্দিকেই প্রসারিত হয়েছে তার শৃঙ্গবাহু। চন্দ্রা ও ভাগা উপত্যকার মধ্যবর্তী ভূভাগের কথা তোমাকে আমি বলেছি মানসী! বলেছি, এই পর্বতময় ভুভাগ তুষারাবৃত শৃঙ্গ ও হিমবাহে পরিপূর্ণ। ২১,৪১৫ ফুট উঁচু শিখর এবং বারো মাইল দীর্ঘ হিমবাহ আছে এই লাহুল-হিমালয়ে। তবে লাহুলের বৃহত্তম হিমবাহ বড়া শিগরী। কিন্তু না, বড়া শিগরীর কথা এখন নয়।

এখন লাহুলের কথাই বলছি তোমাকে। লাহুল মহকুমা পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত—চন্দ্রা, ভাগা ও চন্দ্রভাগা উপত্যকা, লিঙ্গটির সমতল এবং মধ্য লাহুল-হিমালয়।

"আরে, আরে মিস মালিনীর কাণ্ড দেখেছো?"

অসিতের কথায় আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। আমি তার দিকে তাকাই। সে আবার বলে, "ঐ দেখো, মিস খালি পায়ে পায়চারি করছেন।"

খালি পায়ে, এই প্রস্তরময় হিমশীতল পথে!

হ্যাঁ, সত্যই তাই। বন্ধু তনয়ের পাণিপীড়ন করে তিনি দোকানে যাচ্ছেন। তাঁর পরনে ক্লাইম্বিং ট্রাউজার ও ফেদার জ্যাকেট। মাথায় বালাক্লাভা টুপি, হাতে দস্তানা কিন্তু পা দুখানি পাদুকাহীন! মোটামোজা পরে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, তবে একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তাঁর মুখে জ্বলন্ত চুরুট। কাজেই তাঁর পায়ে জুতো না থাকলেও পকেটে দেশলাই আছে। দেশলাইকে কেন্দ্র করেই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

একটু বাদে সুজয়া বিশ্রাম ভবন থেকে বেরিয়ে আসে। এসেই মিস মালিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, "চমৎকার মহিলা, খুবই পরোপকারী। আমাকে কেবল বাথরুম ব্যবহারের অনুমতি দেন নি, বিশ্রাম ভবনের ঘরখানি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন।"

"মানে?"

"ওনারা আজই কেলং চলে যাচ্ছেন। আমরা ঐ ঘরখানি পেয়ে যাব। তিনি চৌকিদারকে বলে যাবেন। সেপাইজী দুজন লোক নিয়ে হোটেলে গেছেন আমাদের মালপত্র আনতে।" সুজয়া উত্তর দেয়।

না, এর পরে আর ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়। হোটেলের ঘরটা গরম হলেও সেখানে সারাদিন থাকা কষ্টকর। বিশ্রাম ভবনের ঘরখানি পেলে ভাল হয়। কিন্তু মিস মালিনীর আজ কেলং যাচ্ছেন কেমন করে? ওঁরা কি টিকিট পেয়ে গেছেন?

"হ্যাঁ।" সুজয়া জবাব দেয়। "তিনি মানালী থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সিট রিজার্ভ করেছিলেন।"

ভালই করেছেন। নইলে আমরা ঘরখানি পেতাম না। অবশ্য মানালীর ট্যুরিস্ট রিসেপশনিস্ট যদি দয়া করে আমাদের এই নিয়মটির কথা বলতেন, তাহলে আমরাও

টেলিগ্রাম করতে পারতাম। আমরাও আজ কেলং যেতে পারতাম।

মিস মালিনী ফিরে আসেন দোকান থেকে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে 'গুড মর্ণিং' জানান। তারপরে সুজয়াকে জিজ্ঞেস করেন, "ইউ হ্যাড এ নাইস ওয়াশ ?"

"হ্যাঁ।" সুজয়া সকৃতজ্ঞ স্বরে উত্তর দেয়।

মালিনী বলেন, "আমি চৌকিদারকে বলে দিচ্ছি। আপনারা ঘরখানা দখল করে নিন। আমি কেলং গিয়ে ডি. সি—কে বলে দেবো।"

"ডি. সি ?" ঠিক বুঝতে পারি না।

"হ্যাঁ, ডেপুটি কমিশনার অব্ লাহউল এ্যান্ড স্পিটি, আমার বন্ধু। আমরা কেলং-এ তাঁরই গেস্ট্ হয়ে থাকব।"

প্রথম বাক্যটি তিনি রোতাং-এ বসেই বলেছিলেন। দ্বিতীয়টি যোগ করলেন এখানে। কথাটা হয়তো সত্যি। আর তা হলেই ভাল হয়। আমরাও সেখানে গিয়ে এক-আধটু সুযোগ-সুবিধা পেতে পারব।

অসিত কিন্তু আর ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলে, "ম্যাডাম, আপনি জুতো পরেন নি কেন ?"

"আর বলেন কেন", মিস উত্তর দেন, "অনেকদিন 'ক্লাইম্বিং শু' পরি না, কাল দুটো পায়েই ফোস্কা পড়েছে। সঙ্গে আর কোনো জুতো নেই, তাই খালি পায়ে ঘুরতে হচ্ছে। কেলং গিয়ে একজোড়া ক্যাম্প শু কিনতে হবে।"

আমি পর্বতারোহী নই কিন্তু জীবনে একাধিকবার পর্বতারোহণে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। তখন দেখেছি পর্বতারোহীরা মূল-শিবির পর্যন্ত 'ক্লাইম্বিং বুট' পরে না। 'ট্রেকিং শু' থাকলে ভাল, নইলে 'হান্টার' কিংবা 'হকি শু' দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। সাধারণত হিমালয় অভিযানে পনেরো-ষোলো হাজার ফুটে অর্থাৎ রোতাং-এর চেয়ে দু-তিন হাজার ফুট উঁচুতে মূল-শিবির স্থাপন করা হয়। কাজেই রাহালা থেকে খোকসার আসার জন্য ক্লাইম্বিং বুট পরিধানের কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু আমার মনে না-হওয়ার মিস মালিনীর কি এসে যায় ? তিনি মাউন্টেনিয়ার। আর এখন এ অভিমত প্রকাশ করলে হয়তো বিশ্রাম ভবনের ঘরখানি বে-হাত হয়ে যাবে। অতএব মুখে একটা সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে চুপ করে থাকি।

সেপাইজী মালপত্র নিয়ে আসেন। মিস তাঁকে নির্দেশ দেন, "তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে দিন, এখুনি আমাদের মাল বের করা হবে। এই সুযোগে ঘরটা দখল করে নিন।"

সেপাইজী কুলিদের নির্দেশ দেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বিশ্রাম ভবনে আসি। মিস মালিনীর 'বয় ফ্রেন্ড' এবং তাঁর স্ত্রী ও কন্যা আমন্ত্রণ জানান আমাদের। তাঁরা মিস মালিনীর হাই অলটিচুড গাইডের সাহায্যে নিজেদের মালপত্র বাইরে বের করছেন। ঘর খালি হলে সেপাইজী আমাদের মালপত্র গুছিয়ে রাখেন। কুলিরা পয়সা নিয়ে চলে যায়।

একটু বাদে সেপাইজী হঠাৎ বলেন, "ভাইসাব, আমি এবারে চলি।"

"কোথায় !"

"কেলং। আমাকে আজই ডিউটিতে রিপোর্ট করতে হবে। অনেক বলে কয়ে ড্রাইভারকে রাজী করিয়েছি। সে আমাকে নিয়ে যাবে।"

কি বলব ? চাকরির চেয়ে বৃহত্তর বস্তু নেই এ সংসারে। তবে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যায়। মাত্র দু'দিন আগে দেখা। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতকালের বন্ধুত্ব। পরিচয়টা

হিমালয়ে হয়েছে বলেই বোধ হয় মনটা এমন করছে। হিমালয় যে মানুষকে বড় কাছাকাছি এনে দেয়। আর তা দেয় বলেই তো তোমার কাছে আমার এই চিঠি মানসী! আমাদের দুজনের দেখাও যে হিমালয়ের পথে।

সেপাইজীর কথা শুনে আমরা চুপ করে থাকি, কিন্তু নীরব থাকতে পারে না সুজয়া। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে, "ঘর যখন পেয়েছি, আজ রান্না করব। ভেবেছিলাম আপনাকে রান্না করে খাওয়াবো, কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার আর হল না সেপাইজী!"

"অমন করে বলবেন না বহিনজী। কাল আপনারা বড় কষ্ট পেয়েছেন। আজ ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করুন। কেলং ছোট জায়গা, সেখানে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। এখন আমাকে বিদায় দিন, গাড়ি ছাড়ার সময় হল।"

সেপাইজী তাঁর মালপত্র তুলতে যান, আমি এগিয়ে এসে সুটকেসটা হাতে নিয়ে বলি, "চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।"

সেপাইজী আপত্তি করেন না। তিনি হাতজোড় করে সুজয়াদের ও মাস্টারজীকে নমস্কার করেন। আমরা বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। ওরা দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

সেপাইজী গাড়িতে ওঠেন। মিস মালিনীরা আগেই উঠে বসে আছেন। গাড়িতে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে। একটু বাদে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেন। গাড়ি নড়ে ওঠে, ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে রাস্তার দিকে।

"এই রোখ্‌কে, জ্যারা রুখিয়ে...."

সুজয়া ছুটে আসছে, পেছনে অসিত। কি ব্যাপার? ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। সুজয়া এসে থামে গাড়ির কাছে। মিস মালিনী জিজ্ঞেস করেন, "হোয়াট্‌'স দ্য ম্যাটার?"

"মাফলার....মাই মাফলার...." সুজয়া হাঁফাতে হাঁফাতে বলে। সে মালিনীর গলার মাফলারটা দেখিয়ে দিচ্ছে। ঠিকই তো, সুজয়ার মাফলারটি মালিনীর গলায় কেন?

মিস মালিনী মাফলারটার দিকে তাকান। তারপরেই বলে ওঠেন, "আই অ্যাম্‌ স্যরি। দিস ইজ ইয়োর্‌স?"

"ইয়েস।" সুজয়া দম নিয়ে উত্তর দেয়।

"বাট হোয়ার্‌'স মাইন!...এনি ওয়ে, 'শ্যাল সি টু ইট। টেক্‌ ব্যাক ইয়োর্‌স।" মিস গলা থেকে মাফলারটা খুলে সুজয়ার দিকে ছুঁড়ে দেন।

সুজয়া সেটি লুফে নিয়ে বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

মিস বলেন, "স্যরি ফর দ্য মিস্টেক।"

"ও! ন্যথিং।" আমরা বলে উঠি।

মিস হুকুম দেন, "ঠিক হ্যায়, ড্রাইভার গাড়ি ছোড়। লেট্‌'স স্টার্ট।"

সেপাইজী একটু হাসেন। গাড়ি চলতে শুরু করে। সেপাইজী হাত নাড়েন, আমরা হাত নাড়ি। গাড়ি বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে সুজয়া। সে মুখ ধোবার সময় মাফলারটা গলা থেকে খুলে বাথরুমের ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রেখেছিল। বেরুবার সময় নিয়ে আসতে ভুলে গেছে। আর মিস মালিনী ভুল করে সেটিকে নিজের মাফলার ভেবে গলায় জড়িয়ে নিয়েছিলেন। সুজয়া আরও বলে, "এখানে মাফলার ছাড়া একটা মুহূর্ত কাটানো সম্ভব নয়, অথচ কিনতেও পাওয়া যায় না। নইলে আমি কিছুতেই এমন কাণ্ড করতাম না।"

"কি কাণ্ড করেছেন?" নেতা প্রশ্ন করে, "নিজের জিনিস চেয়ে রাখবেন না!"

সুজয়া চুপ করে থাকে।

ঘরে এসেই সুজয়া বলে, "স্টোভ, তেল, বাসনপত্র ও খাবার-দাবার সব বের করে দিন, আজ রান্না করব।"

"এ বেলা দোকানে খেয়ে নিলেই হত না!"

"না।" সুজয়া দৃঢ় স্বরে জবাব দেয়, "কলকাতা থেকে এত সব জিনিসপত্র বয়ে আনা হয়েছে কি ফেরত নিয়ে যাবার জন্য?"

কথাটা সত্যি। যাত্রাপথ প্রায় ফুরিয়ে এলো, অথচ এখনও অনেক জিনিস রয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা সুজয়া বেশ ভাল রাঁধে।

এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার আমি ওর মধ্যে দেখেছি মানসী! লেখাপড়া থেকে পর্বতারোহণ পর্যন্ত যে-কোনো কাজে সুজয়া হাত দেয়, সে-কাজই সে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। ১৯৫৮ সালে ইতিহাস নিয়ে এম. এ পাস করেছে সে। কলেজ-জীবনে এন. সি. সি-র নামকরা ক্যাডেট ছিল। কিছুকাল অধ্যাপনাও করেছে। বেশ ভাল সেতার বাজাতে ও ছবি আঁকতে পারে সুজয়া। পারে ফটো তুলতে, গান গাইতে আর গাড়ি চালাতে। পর্বতারোহিণী হিসেবে তার খ্যাতির কথা তো তোমার জানাই আছে। হিমালয়ের প্রতি যে তার সহজাত আকর্ষণ এবং মমতাবোধ রয়েছে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা পড়ে তুমি নিশ্চয়ই সে পরিচয় পেয়েছো মানসী!

আজ তোমাকে আমি সুজয়ার আর একটি গুণের পরিচয় দিচ্ছি—চমৎকার রান্না করতে পারে সে। আমাদের এই হিমাচল পরিক্রমার সময় সুযোগ পেলেই সে রান্না করেছে। সারাদিন দুর্গম পথে পদচারণা করার পরে স্টোভের সামনে বসে কখনও আমি তাকে ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখি নি। সমস্ত অসুবিধে উপেক্ষা করে নানা রকমের সুস্বাদু খাদ্য সে রান্না করেছে। হিমালয়ের পথে এমন ভাল খাওয়া আমার আর কোনো যাত্রায় জোটে নি।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম। মাস্টারজী দোকান থেকে চা ও পকোরা নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়বার চা খেয়ে সুজয়া রান্নার আয়োজন শুরু করে দেয়। অসিত ও মাস্টারজী সাহায্য করছেন তাকে। এই সুযোগে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

বিশ্রাম ভবনের সঙ্গেই এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টার্স—বেশ বড় দুখানি ঘর, সামনে বারান্দা। বারান্দা ও বিশ্রাম ভবনের মাঝে বাগান ও একফালি সবুজ সমতল। অনেক মরশুমী ফুল ফুটে আছে। গোলাপ গাছও রয়েছে কয়েকটি। হ্যাঁ, লাহুলে গোলাপ ফুল ফোটে বইকি। কিন্তু লাহুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুল হল—ইয়ারমারুস স্পেক্‌টাবিলিস (Eremurus Spectabilis)। এই ফুলের বৃন্তটি প্রায় পাঁচ ফুট এবং শীর্ষগুলি দু' থেকে তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। জুনিপার, রডোডেনড্রন, জেনসিয়ান্স, একোমিয়াম, জুরিনিয়া ও পলিগোনাম প্রভৃতি হিমালয়ের বনজ ফুল তুমি প্রচুর দেখতে পাবে লাহুলে। সাধারণত ষোলো হাজার ফুট পর্যন্ত এইসব গাছ জন্মায়। যাক্ গে, লাহুলের গাছপালার কথা তোমাকে আর এক দিন বলব মানসী! আজ খোকসারের কথা বলে নিই।

বাগানের মধ্যস্থলে পতাকা দণ্ড—একটা মজবুত কাঠের খুঁটি। গোড়ায় পাথর আর সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বেদী।

বাগানের শেষ প্রান্তে, বেড়ার গায়ে একটা প্রকাণ্ড তাঁবু—ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের অফিস। সেখান থেকে টাইপরাইটারের খটখট্ আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। অনেকদিন এই পরিচিত ও প্রিয় শব্দটি শুনি না। তাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তারপরে একসময় নিজের অলক্ষ্যেই

চলতে শুরু করি।

নেমে আসি মোটর-স্ট্যান্ডে। উদয়পুরের পথে থিরোটের জীপ ছাড়বে কিছুক্ষণ বাদে। তারই আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। একটু আগে তোমাকে বলেছি মানসী, থিরোট এখান থেকে আটচল্লিশ মাইল। দুপুর দেড়টায় জীপ ছাড়লে, সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ থিরোট পৌঁছয়। এ জেলার সবচেয়ে নীচু ও শেষ গাম থিরোট, চাম্বা জেলার সীমান্তে-অবস্থিত। থিরোট ছাড়িয়েই চন্দ্রভাগা চাম্বায় প্রবেশ করেছে।

থিরোট থেকে সোয়া ছয়মাইল পাকা রাস্তায় এগিয়ে দু'মাইল পাহাড়ী পথ ভেঙে বিখ্যাত ত্রিলোকনাথ মন্দির একদিনে দর্শন করে ফিরে আসা যায়। ভবিষ্যতে অবশ্য যাত্রীরা বাস-যোগেই ত্রিলোকনাথ যাতায়াত করবেন।

সেদিন মানালীতে হিড়িম্বা মন্দির দর্শনের সময় তোমাকে আমি ত্রিলোকনাথ মন্দিরের কথা বলেছি মানসী! তুমি জানো যে কাঠের তৈরি এই মন্দিরটি উন্নত দারুশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তবে মন্দিরের ছাদটি কিন্তু স্লেটপাথরের তৈরি।

ত্রিলোকনাথ ত্রিলোকের অধীশ্বর অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব। হিন্দুরা মনে করেন তাঁরই প্রস্তরমূর্তি রয়েছে মন্দিরে। আবার বৌদ্ধরা বলেন মূর্তিটি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের। তাই তাঁরা তিব্বতী ভাষায় বুদ্ধের বাণী লেখা পতাকা টাঙিয়ে দিয়ে একখানি পাথরে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' কথাটি লিখে মন্দিরর পাশে রেখে দেন। আবার হিন্দুরা ফুল-বেলপাতা নিয়ে গিয়ে শিবপুজো করেন। মন্দিরের পূজারী কিন্তু বৌদ্ধলামা। তুমি বুঝতে পারছ মানসী, ত্রিলোকনাথ হিন্দু-বৌদ্ধ যৌথ-মন্দির, ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সুমহান ঐক্যের এক অবিনশ্বর প্রতীক।

চাম্বা থেকেও ত্রিলোকনাথ যাওয়া যায়। কিন্তু সে পথের কথা আজ নয়।

শুনলে তোমার হাসি পাবে মানসী! তা হলেও না বলে পারছি না, ১৯৬১ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী খোকসারের জনসংখ্যা মোটে ৪৬১ জন। আজকাল অবশ্য কিছু বাইরের লোক স্থায়ীভাবে এখানে বাস করছেন। তাহলেও পাঁচশ' লোকের বেশি নেই খোকসারে। কিন্তু মোটর-স্ট্যান্ডে কম করেও শ'খানেক লোকের ভিড় জমে গেছে। তারা এসেছে নানা কাজে। এটি যে খোকসারের প্রাণকেন্দ্র।

শ'খানেক লোকের সমাবেশকে মোটেই ভিড় বলা যায় না। তবু এখানে আমার এত লোক ভাল লাগে না। আমি নেমে আসি পথে। এগিয়ে চলি পশ্চিমে—কেলং-এর দিকে। একটু এগিয়েই পথটা ডাইনে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে পুল। পুলের মুখে পুলিশ। পুলটি সমতল ভারত ও মধ্য-লাহুলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে। তাই পুল রক্ষা করার এই ব্যবস্থা। পুলের গোড়ায় কড়া পুলিশ পাহারা।

এখানে এসেও পুলিশ! পুলিশ দেখে সময় নষ্ট না করে, সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় প্রোজ্জ্বল লাহুল-হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা দেখা যাক্। দেখা যাক্ লাহুলের প্রাণধারা চন্দ্রা নদীকে।

পাহারারত পুলিশের অনুমতি নিয়ে পুলের মাঝখানে এসে দাঁড়াই। দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে চন্দ্রা—চলেছে তাণ্ডিতে। ভাগার সঙ্গে মিলিত হয়ে চন্দ্রভাগায় রূপান্তরিত হতে।

তোমাকে আগেই বলেছি মানসী, চন্দ্রভাগা পাঞ্জাবের পঞ্চ-নদীর অন্যতমা। অপর চারটি হল, বিতস্তা বা ঝিলম, বিপাশা বা বিয়াস, শতদ্রু বা সাটলেজ্ এবং ইরাবতী তথা রাবী।

বৈদিক যুগের নদী চন্দ্রভাগা। ঋগ্বেদে এই নদীকে বলা হয়েছে অসিক্নী তথা কৃষ্ণবর্ণা নদী। সম্ভবতঃ চন্দ্রভাগা বা চেনাবের জল একটু কালচে বলে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। মহাভারতের সভাপর্বে বলা হয়েছে—'কেউ যদি উপবাসী থেকে সাতদিন চন্দ্রভাগার পুণ্যধারায় অবগাহন করে, তাহলে আর মন পাপমুক্ত হয়ে যায়। সে মহামুনিতে পরিণত হয়।' পুরাণ এবং ভাগবতেও চন্দ্রভাগার উল্লেখ আছে।

চন্দ্রভাগা লাহুল অতিক্রম করে চাম্বা ও জম্মুর (কিশতোয়ার) ভেতর দিয়ে পাকিস্তানে চলে গেছে। ত্রিম্মু নামে একটা জায়গায় বিতস্তা এসে মিলেছে তার সঙ্গে। মিলিত ধারা চন্দ্রভাগা নামেই প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। সিন্ধু নামক স্থানে ইরাবতী এসে মিলেছে সেই ধারায়। আরও কিছুদূর প্রবাহিত হবার পরে মাদ ওয়ালাতে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মিলিত ধারার সঙ্গে বিপাশা ও শতদ্রুর মিলিত ধারার মিলন হয়েছে। সেই সম্মিলিত সুবিশাল নদীর নাম হয়েছে পঞ্চনদ। তার পরে আরও খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে মিঠানকোটে পঞ্চনদ সিন্ধুনদে বিলীন হয়েছে।

॥ চার ॥

মানসী,

এর আগের চিঠি পড়ে হয়তো ভেবেছো, খোকসারের কথা বলা শেষ হয়েছে, এবারে তোমাকে আমি নতুন কিছু বলব। তোমার সে ভাবনা কিন্তু মিথ্যে হবে মানসী! এ চিঠিতেও তোমাকে খোকসারের কথাই বলতে হবে আমার। সেই কথাই বলছি।

কতক্ষণ পরে জানি না, সহসা কেউ এসে আমার কাঁধে হাত রাখে। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। তাকিয়ে দেখি মাস্টারজী। হয়তো তিনি দূর থেকে ডেকে সাড়া পান নি, তাই কাছে এসে গায়ে হাত দিয়েছেন। আমি তাঁর ডাক শুনতে পাই নি। পাবো কেমন করে, আমি যে খোকসার পুলের ওপর দাঁড়িয়ে চন্দ্রাকে দেখছিলাম, চন্দ্রভাগার কথা ভাবছিলাম।

মাস্টারজীর স্পর্শে সেই ভাবনা হারিয়ে যায়। প্রশ্ন করি, "আমার খোঁজে বেরিয়েছেন নাকি?"

"হ্যাঁ।" মাস্টারজী উত্তর দেন।

"কেন?"

মাস্টারজী বলেন, "চলুন, রান্না হয়ে এসেছে।"

"এরই মধ্যে!" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোকা বনে যাই।" একটা বাজে। তাহলে যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

মাস্টারজী হাসেন। আমরা বিশ্রাম ভবনের দিকে পা বাড়াই।

ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য বাইরে রান্না করা সম্ভব নয়। কার্পেট মোড়া ছোট ঘর। দুদিকে দুখানি খাট। সামান্য জায়গা। কিন্তু তারই ভেতর সুজয়া সুন্দর গুছিয়ে বসেছে। আমরাও বসে পড়ি।

খিচুড়ি, আলু ও পাঁপর ভাজা আর আচার, চমৎকার লাগছে।

খেতে খেতে মাস্টারজী বলেন, "বিকেলের রান্না আমি করব বহিনজী!"

"সে কি! আমি থাকতে আপনি রান্না করবেন কেন?" সুজয়া প্রতিবাদ করে।

"প্রথমতঃ আপনি একটু বিশ্রাম করতে..."

"আমার বিশ্রামের দরকার নেই।" সুজয়া শেষ করতে দেয় না মাস্টারজীকে।

সে থামলে মাস্টারজী শেষ করেন, "দ্বিতীয়তঃ আমার একটু অভ্যেস হবে।"

"তা আপনার রান্না অভ্যেস করার কারণ ? আপনি কি ছাত্রদের রান্না শেখাবেন নাকি ?" সুজয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

"না।" মাস্টারজী হাসেন। "অভ্যেস করতে হবে নিজের গরজে। আমাকে যে এই পাঁচ মাস রান্না করে খেতে হবে।"

"কেন, আপনার ফ্যামিলি আনবেন না ?"

"এখন নয়। আনব আগামী গ্রীষ্মকালে। নতুন জায়গা, হালচাল না বুঝে সবাইকে নিয়ে আসি কেমন করে। তাছাড়া জানেন তো, সামান্য মাইনে। হিসেব করে চলতে হয়।"

কেউ কড়া নাড়ছে। কে এলো আবার ! এখানে তো পরিচিত কেউ নেই আমাদের। তাহলে কি চৌকিদার ? কি বার্তা নিয়ে এলো ? আবার ঘর ছেড়ে দিতে বলবে না তো ?

অসিত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। না, চৌকিদার নয়—নুরপু তিনবু, একা নয়—সস্ত্রীক। আমরা ভুলে বসে আছি, কিন্তু সে ভোলে নি। কাল আর তাদের ছবি নেওয়া হয়ে ওঠে নি, তাই আজ ছবি তুলতে এসেছে।

অসিত কিছু বলতে যাবার আগেই সুজয়া বলে, "বেচারীরা ছবির আশায় ছুটতে ছুটতে এসেছে, ওদের নিরাশ করবেন না অসিতবাবু ! ক্যামেরাটা নিয়ে বাইরে যান, ওদের কয়েকটা ছবি তুলে দিন।"

"কয়েকটা !" অসিতবাবু বিস্মিত।

"হ্যাঁ, এত কষ্ট করে এসেছে ওরা, অন্তত তিন-চারটা 'পোজ'য়ের ছবি না তুলে দিলে যে ওদের পরিশ্রম পোষাবে না।"

অসিত আর কথা না বাড়িয়ে ক্যামেরা নিয়ে বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে ওদের নিয়ে ফিরে আসেন। তাঁর পেছনে পেছনে মিস্টার ও মিসেস তিনবু ঘরে ঢোকে। সুজয়া এগিয়ে যায় মিসেস-এর কাছে। তাকে ধরে এনে নিজের পাশে বসায়।

আমরা নুরপুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই। কথায় কথায় নুরপু জানায়, সে 'লভ্ ম্যারেজ' করেছে। স্বভাবতই লাহুলের বিবাহ প্রথার প্রসঙ্গ ওঠে। নুরপুর কাছ থেকে জানতে পারি—সেকালে লাহুলে কেবলমাত্র বড় ছেলেরাই বিয়ে করত।ছোট ভাইরা বৌদির অনুমতি নিয়ে বাড়িতে থেকে তার সঙ্গে সহবাস পর্যন্ত করতে পারত। কিন্তু সন্তান-সন্ততিরা সর্বদা বড় ভাইয়ের পরিচয়ে পরিচয় দিত। বৌদি সম্মতি না দিলে দেওরদের গুম্ফায় গিয়ে বাস করতে হত। কোনো কারণে বড়ভাইয়ের অকালমৃত্যু হলে তার পরের ভাই গুম্ফা থেকে বাড়ি এসে সংসারের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করত। বলা বাহুল্য চাষের জমির স্বল্পতার জন্য জনসংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজনে লাহুলী সমাজ এই ব্যবস্থা করেছিল।

দুর্গম গিরিপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত লাহুল। সমতল ভারতের সঙ্গে সেকালে তার সামান্যই সম্পর্ক ছিল। তাই লাহুলে গড়ে উঠেছিল একটি নিজস্ব সমাজ। হিমালয় তার বাহু বিস্তার করে সযত্নে সেই সমাজকে রক্ষা করেছে। প্রাকৃতিক পার্থক্য লাহুলের ধর্ম ও সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে মানবপ্রকৃতিকে। লাহুলের মানুষ সমতল ভারতকে অস্বীকার করে নি, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু সযত্নে রক্ষা করে আসছিল।

দুর্গম হিমালয়ের আড়ম্বর, চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গমালার দীপ্তি, আঁকাবাঁকা নদী ও ঝরণার ঝঙ্কার আর দশ-এগারো হাজার ফুট উঁচু উপত্যকা নিয়ে লাহুল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লাহুলীরা ফসল ফলাতো। ফসলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল বার্লি। এই বার্লির জন্য যুগে যুগে প্রতিবেশীরা হানা দিয়েছে লাহুলে। যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু লাহুলীদের প্রকৃতি পালটায় নি। আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ বাঁচিয়ে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে লাহুল এতকাল একা ছিল।

ভারত স্বাধীন হবার পরে স্বাভাবিক ভাবেই লাহুলের একাকীত্ব ঘুচে গেছে। আধুনিকতার রাহু লাহুলী সমাজকেও ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। তবু এখনও এখানে বিবাহ প্রথাটা মোটামুটি আগের মতনই রয়ে গেছে।

সেই প্রথার কথাই নুরপু বলছে। বলছে, কিছুকাল থেকে লাহুলে বহুপতি প্রথা এবং অবিবাহিত থাকার নিয়ম বন্ধ হয়েছে। এখন লাহুলে প্রায় প্রত্যেক পুরুষই বিয়ে করে।

লাহুলী সমাজে সাধারণত মা-বাবা কিংবা পরিবারের লোকেরাই বিয়ে ঠিক করে। তবে ওরাও প্রেমে পড়ে এবং প্রেমিক-প্রেমিকারা অনেক সময়ে বাপ মায়ের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করে। অনুমতি না পেলে তারাও পালিয়ে যায়। তবে কয়েক দিন বাদে ঘরে ফিরে আসে। তখন কিন্তু অধিকাংশ পিতা-মাতাই ছেলে-মেয়েকে সানন্দে ঘরে ঠাঁই দেয়—তাদের আশীর্বাদ করে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণত বাপ-মায়ের পছন্দ অনুসারেই বিয়ে করে থাকে। কারণ পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাকে সমাজ ভাল চোখে দেখে না। লাহুলে পণপ্রথা নেই বললেই চলে।

সামাজিক বিয়ের প্রথম পর্বে ছেলের বাবা এক ঘড়া 'ছাং' তথা দেশী মদ নিয়ে মেয়ের বাড়িতে আসে। মদের ঘড়া মেয়ের বাবাকে উপহার দিয়ে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। মেয়ের মা তখন ছুটে যায় মেয়ের কাছে। মেয়েকে জানায় এই প্রস্তাব। মেয়ে রাজী না থাকলে সে আর বাড়ির বাইরে ফিরে আসে না। মেয়ের বাবা তখন ছাং-এর ঘড়া ফিরিয়ে দেয় ছেলের বাবাকে। সমস্ত ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

মেয়ে অমত না করলে, প্রতিবেশীদের ডেকে এনে মহা সমারোহে ছেলের বাবার দেওয়া ছাং-এর সদ্ব্যবহার করা হয়। তারপরে কিছুদিন বাদে বাদে আরও দুবার ছাং আদন-প্রদান হয়। তৃতীয়বারে ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে একটি টাকা দেয়। এই টাকাটি গ্রহণ করার পরেই সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়। বিয়ের দিন ঠিক হয়।

বিয়ে হয় বরের বাড়িতে। বিয়ের দিন বর বাড়িতে বসে থাকে। কিন্তু তার ঢাল-তরোয়াল যায় কনের বাড়িতে। বরের আত্মীয়-স্বজন শোভাযাত্রা সহকারে কনের জামাকাপড়, গয়নাগাঁটি, মিঠাই ও ছাংয়ের সঙ্গে তার ঢাল তরোয়াল নিয়ে যায়। মেয়ের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে পাত্রীর আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা করতে থাকে। দুপক্ষ মিলিত হয়। কিছুক্ষণ ধরে মদ্যপান চলে। বে-সামাল হবার পরে শুরু হয় তর্কযুদ্ধ। তবে তার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে।

যেখানে কনেপক্ষ বরপক্ষীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সেখান থেকে মেয়ের বাড়ি পর্যন্ত পথের ধারে একুশটি পাথরের স্তূপ তৈরি করা হয়েছে। মদ্যপানের পরে দুপক্ষই তার প্রথম স্তূপটির সামনে এসে দাঁড়ায়। কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে একটি প্রশ্ন করে। তারা যদি সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে স্তূপটি ভেঙে ফেলে দুপক্ষ দ্বিতীয় স্তূপের কাছে আসে। আর যদি না পারে, তাহলে প্রথম স্তূপটি অক্ষত থাকে। এবং বরপক্ষকে তীব্র পরিহাস সহ্য

করতে হয়। এইভাবে প্রশ্নোত্তর ও স্তূপ ভাঙ্গার পালা চলে। একুশটি প্রশ্ন এবং উত্তরের পরে তারা কনেরবাড়ির দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়। এই সব প্রশ্ন ও উত্তর একখানি স্থানীয় ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে। দু'পক্ষই বিয়ের আগে সেই বইখানি খুব ভাল করে পড়ে নেয়।

মেয়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিমত্তা ও বীর্যবত্তার শেষ পরীক্ষা হয়। পাত্রীপক্ষ আগেই একটি ভেড়া মেরে তার হৃৎপিণ্ডটি কোথাও পুঁতে রেখে দিয়েছে। তারা ছড়াগানের মধ্য দিয়ে জায়গাটি বলে দেয়। বরপক্ষের জনৈক বীরকে তখন বরের তরোয়াল দিয়ে একটি মাত্র খোঁচায় ভেড়ার সেই হৃৎপিণ্ডটিকে তুলে আনতে হয়। সাধারণত ছড়াগান শুনে জায়গাটার হদিস পাওয়া যায় না। তাই বরপক্ষকে কনেবাড়ির কাউকে পটিয়ে জায়গাটি জেনে নিতে হয়।

এই পরীক্ষায় পাস করার পরে বরপক্ষ কনের বাড়িতে প্রবেশ করে। দুপক্ষ গোল হয়ে বসে। বরপক্ষ তখন উপহার দেখায়। পান ও ভোজন পর্ব শুরু হয়। তারপরে মেয়ের বাবা কিছু টাকা ও জিনিসপত্র দেয়। বলা বাহুল্য তার আর্থিক অবস্থার ওপরে দানের পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণত কিছু জামা-কাপড়, বিছানা-পত্র, একটি গরু কিম্বা চমরী এবং টাকা অর্থাৎ নতুন সংসার পাততে যা কিছু লাগে, সবই দেওয়া হয়। তবে কনের বাবা যাই দিতে পারুক, বরপক্ষ তাতেই খুশি হয়।

অবশেষে কনেকে নিয়ে আসা হয় বরের বাড়িতে। প্রতীক্ষারত পাত্রের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে কিন্তু তার প্রতীক্ষার অবসান হয় না। জীবনসঙ্গিনীর শ্রীমুখ দর্শনের জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কারণ কনে বরের বাড়িতে ঢুকতে পারে না। বলা তো যায় না, আসার পথে যদি কোনো অশরীরী আত্মা তার ওপর ভর করে থাকে। কাজেই বিয়ের মিছিল বরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমেই বরের পূর্বপুরুষদের কারও আত্মাকে আহ্ববান করে কনের কাঁধের ভূতকে তাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করা হয়। বর তারপরে কিছুক্ষণ ধরে ভগবানের কাছে সেই একই অনুরোধ করে। প্রার্থনার শেষে সে একটি মেষশাবক নিয়ে ঘরের চালে ওঠে। সেখান থেকেই নিরীহ মেষশাবকটিকে শোভাযাত্রীদে' সামনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অর্ধমৃত মেষশাবকটিকে ধরে তারা হত্যা করে। তার হৃৎপিণ্ড এবং যকৃৎ টুকরো টকরো ভাগ করে কাঁচা খেয়ে ফেলে। একদিকে যখন এই নৃশংস ব্যাপার চলেছে, আর একদিকে তখন চলেছে ধর্মচর্চা। জনৈক লামা একখানি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে মন্ত্রপাঠ করতে থাকেন। তাঁর এক হাতে ধর্মগ্রন্থ আরেক হাতে ছোট্ট মাটির পাত্রে একটি ময়দার ভূতমূর্তি। পাঠশেষে তিনি সেই মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলেন। ব্যস, ভূত তাড়ানো হয়ে গেল। তখন সকলে নিশ্চিন্ত মনে কনেকে নিয়ে বরের বাড়িতে প্রবশ করে। বরও নিশ্চিন্ত হয়।

লাহুলে বিয়ের একটা নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা আছে। তবে সাধারণত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েদের তার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। অনেক সময় ছেলে-ময়ে জন্মাবার পরেই তাদের বাপ-মায়েরা বিয়ে ঠিক করে রাখে। বড় হবার পরে ছেলে কিংবা মেয়ের আপত্তি হলে অবশ্য সে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এ ধরনের ঘটনা যদিও খুব বেশি ঘটে না। সাধারণত লাহুলের ছেলে-মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মায়ের মতকে মেনে নেয়। না মানলে সমাজ তাকে ভাল বলে না।

স্ত্রী সন্তানহীনা হলে স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে কিন্তু সংসারে দ্বিতীয়ার স্থান হয় প্রথমার পরে। তাই দ্বিতীয়াকেই যাবতীয় কাজকর্ম করতে হয়। প্রথমা থাকে গৃহকর্ত্রী হয়ে।

লাহুলের সমাজেও মাঝে মাঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। স্বামীর উদ্যোগে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী তার বাপের দেওয়া টাকা ও জিনিসপত্র নিয়ে যায়। আর স্ত্রীর চেষ্টায় বিচ্ছেদ হলে স্বামীকে তার কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুষ্ঠানটি বড় হৃদয়বিদারক। একগাছি সরু উলের সুতা দুজনে কড়েআঙ্গুলে জড়িয়ে পাশাপাশি দাঁড়ায়। আত্মীয়-স্বজনরা থাকে চারিদিকে। সবার সামনে ওরা অঙ্গীকার করে যে তারা আর একসঙ্গে থাকবে না। বলতে বলতে কাঁদে আর সবাইকে কাঁদায়। অবশেষে দুজনে দুদিকে হাত সরিয়ে নেয়। সুতো ছিঁড়ে যায়। শেষবারের মত দৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপরে চোখ নামিয়ে নিয়ে দুজনে দুদিকে চলে যায়। কেবল পড়ে থাকে বিগত জীবনের হাসি-কান্নায়-ভরা দিনগুলির মধুর স্মৃতি। জানি না সে স্মৃতি কতদিন অক্ষয় হয়ে থাকে ওদের মনে।

নুরপুরা চলে যাবার পরে একটু বিশ্রাম করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পথে—খোকসারের পথে। একটা দিন যখন থেকেই যেতে হল, ভাল করে খোকসারকে দেখে নেওয়া যাক্।

কিছুকাল আগেও চন্দ্রা উপত্যকায় খোকসারের ওপরে আর কোনো গ্রাম ছিল না। তাই খোকসার ছিল চন্দ্রা উপত্যকার শীতলতম জনপদ। সুদূর অতীত থেকেই খোকসার, লাহুল-স্পিতি, লাদাক ও তিব্বতের সঙ্গে সমতল ভারতের প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। এখন এর ওপরে গ্রামফু ও বাতাল প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্মকালীন জনপদ গড়ে উঠেছে, কিন্তু খোকসারের মূল্য কিছুমাত্র যায় নি কমে।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম মূরক্রফট যখন আসেন, তখনও এখানে জনপদ ও শস্যক্ষেত্র ছিল। প্রচুর বার্লি ও পাহাড়ী গম উৎপন্ন হত। তাঁদেরও পুরো একটি দিন থাকতে হয়েছিল এখানে। জীপের জন্য নয়, ঝুলার ওপর দিয়ে মালবাহী ঘোড়াগুলিকে চন্দ্রা পার করার জন্য। সেই ঝুলার বর্ণনা প্রসঙ্গে মূরক্রফট্ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

'.....It was ninety-six feet long,....The bridge was made of ropes formed of birch twigs, and the flooring was of wickerwork of the same material.'

এখানে তাঁদের সঙ্গে ত্রিলোকনাথ যাত্রী দুজন উপবাসী হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের একজন এসেছিলেন বিহারের ছাপরা জেলা থেকে।

তারপরে এ.এফ. পি হারকোর্ট, এন্ড্রু উইলসন, ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড ও জেনারেল ব্রুস প্রভৃতি প্রত্যেকে আমাদেরই মতো দুচোখ ভরে খোকসারকে দেখেছেন। তখনও ঠিক এমনি হিমেল হাওয়া অস্থির করে তুলেছে তাঁদের। তাই ব্রুস লিখেছেন—

'.....regular Koksar wind was blowing and even in June it can be cold.'

তাঁর পরেও বহু পর্বতারোহী এবং পদযাত্রী লাহুল-স্পিতিতে এসেছেন। এদের প্রায় প্রত্যেকেই আসা যাওয়ার পথে দু-একটা দিন খোকসারে কাটিয়ে গেছেন। ভবিষ্যতে যারা আসবে, তাদেরও অনেককেই রাত্রিবাস করতে হবে এখানে। আসতে হবে ১৯৬৯ সালের ২১, ৭৬০ ফুট উঁচু অনামী শৃঙ্গাভিযানের এবং ১৯৭০ সালের 'ললনা' অভিযানের সদস্যাদের। শেষের অভিযানটির নেতৃত্ব করবে সুজয়া—আমার ভগ্নীসমা সুজয়া। কিন্তু তার সে অভিযানের কথা এখন নয়, এখন খোকসারের কথা বলে নিই তোমাকে।

হাঁটতে হাঁটতে আবার নদীর ধারে আসি। এপারে খাড়া তটভূমির গা বেয়ে দুর্বার বেগে বয়ে যাচ্ছে চন্দ্রা। ওপারে নদীর তীরে বালি কাঁকর আর পাথরের চরা পড়েছে। পাহাড়টা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি-ঘর দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু যে জিনিসটি দেখে আমরা বেশি আকৃষ্ট হলাম, সেটি এপারে—নদীর ধারে। আমরা তার কাছে এগিয়ে আসি। চার-পাঁচ ফুট উঁচু এবং ফুট ছয়েক লম্বা একটি পাথরের দেয়াল। ওপরে একখানি পাথরে খোদাই করা—'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।' এমনি প্রস্তর ফলক তুমি দেখতে পাবে লাহুল-স্পিতির পথে পথে—পর্বতগাত্রে ও গিরিবর্ত্মে।

অপলক নয়নে আমরা তাকিয়ে থাকি ঐ প্রস্তরফলকের দিকে। কে বলতে পারে এই অবহেলিত ফলকটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে খোদিত হয় নি?

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পশ্চিম হিমালয় সম্রাট অশোকের অধীন ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এ অঞ্চলে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রভাব। এমন কি অশোকের মৃত্যুর পরে, তাঁর সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যাবার পরেও সে প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপরে কুষাণ আমলে (খ্রীঃ পূর্ব ৫০ থেকে ২১০ খ্রীঃ পর্যন্ত) পশ্চিম হিমালয়ের ওপরে বৌদ্ধপ্রভাব আরও শক্তিশালী হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে অনিবার্য কারণে বৌদ্ধধর্ম তার মাধুর্য হারিয়ে ফেলে। আস্তে আস্তে মানুষের মন থেকে তার প্রভাব কমে আসতে থাকে। সেই যুগসন্ধিক্ষণে একদিন স্বোয়াত উপত্যকার উদ্দিয়ানা থেকে একজন সন্ন্যাসী এলেন রিওয়ালসারে। সেখানে এক ধর্মসভায় তিনি বিবদমান তান্ত্রিক ধর্ম ও পৌত্তলিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক আশ্চর্য ভাষণ প্রদান করলেন। তান্ত্রিক দর্শনের রহস্য ও মূর্তিপূজার সেই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলল। কিছুকালের মধ্যে তিনি যুগাবতার বলে পরিচিত হলেন সারা হিমালয়ে।

যুগাবতার পদ্মসম্ভব (৭৫০—৮০০ খ্রীঃ) লাহুলে আসেন। তিনি নতুন করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এখানে। তাণ্ডি থেকে আড়াই মাইল দূরে তুপচিলিং গ্রামের গুরু ঘাতাঁল গুম্ফাটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এটি লাহুলের প্রাচীনতম বৌদ্ধমন্দির। এই মন্দিরে তাঁর নাম খোদিত আছে।

'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' কথাটি তাঁরই নির্দেশে লাহুল-স্পিতি, চাম্বা, লাদাখ, তিব্বত, সিকিম, ভুটান ও নেপালের পথে-প্রান্তরে ও মঠে মন্দিরে লিখিত হয়েছিল। সেই থেকেই এটি লাহুল-স্পিতির সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্ত্র।

পদ্মসম্ভব কেবল মহাপণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন একজন ক্লান্তিহীন পর্যটক। তিনি তিব্বত থেকে রিওয়ালসার হয়ে কয়েকবার কাশ্মীর গিয়েছিলেন। কাশ্মীর থেকে কয়েকখানি বৌদ্ধগ্রন্থ এবং কয়েকজন সুদক্ষ শিল্পী তিনি তিব্বতের সাম্যে মঠে নিয়ে যান। তাঁরা তিব্বতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। আর পরবর্তীকালে সেই তিব্বতীয় সংস্কৃতি পশ্চিম-হিমালয়ের ভারতীয় বৌদ্ধ রাজ্যগুলিকে প্রভাবিত করেছিল।

মানসী, এই প্রসঙ্গে তোমাকে সংক্ষেপে তৎকালীন তিব্বতের একটু ইতিহাস বলে নেওয়া দরকার। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে কেবল ব্রহ্মপুত্র (তিব্বতী নাম সাংপো) নদের দক্ষিণে খানিকটা জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে স্থানীয় রাজা স্রংট্‌সেন-গামপোর পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃততর অংশে ছড়িয়ে পড়ে। গামপোর মন্ত্রী থনমি সামভোটা তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। সামভোটা নালন্দা মহাবিহারে বিদ্যার্জন করেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিত্তিতে তিব্বতী ভাষার পুনর্বিন্যাস করেছিলেন।

রাজা গামপো ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী পৃষ্ঠপোষক হলেন রাজা থিরহিসং দেতসেন। তিনি ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁরই রাজত্বকালে পদ্মসম্ভব তিব্বত যান এবং তাঁর বজ্রায়ণা ধর্মমত প্রচার করেন। বলা বাহুল্য রাজা দেতসেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

পদসম্ভবের বজ্রায়ণা ধর্মমতই তিব্বতে লামাতন্ত্র নামে পরিচিত। তিব্বতে ধর্মপ্রচারে পদ্মসম্ভবের প্রধান সহায় ছিলেন নালন্দার পণ্ডিত—শান্তরক্ষিত ও তাঁর শিষ্য কমলশীলা। পদ্মসম্ভবই তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধবিহার সাম্যে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

পদ্মসম্ভব দেহরক্ষা করার পরে তাঁকে কেন্দ্র করে তিব্বতের সাহিত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। বলা বাহুল্য তাঁর বিস্ময়কর জীবনীকে কেন্দ্র করেই সেই সাহিত্য, এবং তাঁর মূর্তি ও ছবিকে নিয়েই সে ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। ভারতীয় লেখক ও শিল্পীরাই তিব্বতের সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিলেন। তিব্বতী লেখক ও শিল্পীরা সানন্দে সেদিন ভারতীয় লেখক ও শিল্পীদের নির্দেশে কাজ করেছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই চীনা পাণ্ডিতগণ তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর ভারতীয়দের এই প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা তিব্বতে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকলেন। কিন্তু ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লাসাতে আয়োজিত তর্কযুদ্ধে চীনা পণ্ডিতগণ ভারতীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসী শ্রীঘোষ এবং কমলশীলার কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। ফলে তিব্বতী সাহিত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলায় ভারতবর্ষের অপ্রতিহত প্রভাব অক্ষুণ্ণ রইল।

৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দেতসেন দেহরক্ষা করেন। তারপরে যিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ বজ্রপাণি, অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী বিগ্রহের রক্ষক বলে পরিচিত হলেন, তিনি রাজা রালপা চেন। এই তিনটি মূর্তি বৌদ্ধদের প্রধান বিগ্রহ। পশ্চিম হিমালয়ের শত শত মঠে ও মন্দিরে তুমি এই বিগ্রহ দেখতে পাবে মানসী! কিন্তু আজ তোমাকে আমি ঐ বিগ্রহত্রয়ের কথা বলব না। আজ কেবল রাজা রালপা চেন-এর কথা বলছি।

রাজা চেন একজন ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যে এমন কোনো গল্প লেখা, মূর্তি তৈরি এবং ছবি আঁকা হবে না, যা ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেই তিব্বতী সংস্কৃতিই পরবর্তীকালে পশ্চিম-হিমালয়ের ভারতীয় রাজ্যসমূহ এবং নেপালকে প্রভাবিত করেছে। কাজেই এই সংস্কৃতি মূলতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি নবরূপ, ভারতের কাছে কোনো বৈদেশিক বস্তু নয়। সুতরাং যাঁরা তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে সীমান্তের ভারতীয় রাজ্যগুলিকে প্রাচীন তিব্বতের অংশ বলে প্রমাণ করতে চাইছেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

যাকগে যে কথা বলছিলাম। পদ্মসম্ভব ধর্মপ্রচার করার পর থেকেই লাহুল-স্পিতির প্রায় প্রত্যেক গ্রামের উচ্চতম স্থানে গুম্ফা বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। খোকসার গুম্ফার পতাকাটিও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

কিন্তু আজ আর দেখা গেল না খোকসারকে। হঠাৎ রোদটুকু মিলিয়ে গেল আর বাতাসের বেগটা গেল বেড়ে। বড়ই বেয়াড়া বাতাস। জেনারল ব্রুস পর্যন্ত এই বাতাসকে অবহেলা করেন নি। আমরাও বিশ্রাম ভবনের দিকে এগিয়ে চলি।

বারান্দায় উঠতেই ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়। একটু আগেই নাকি ফিরে এসেছেন—সেই ক্যানাডিয়ান কৃষি-বিশারদ এবং কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের অফিসার। ক্যানাডিয়ান ভদ্রলোক আমাদের আমন্ত্রণ জানান। আমরা তাঁদের ঘরে এসে বসি।

কথায় কথায় তাঁরা জানান—জমি তৈরি করে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারলে, লাহুলে ভাল ফসল পাওয়া যেতে পারে। উৎপাদনের উপযোগী খনিজপদার্থ রয়েছে এখানকার মাটিতে।

কথাটা শুনে একটু আনন্দিত হয়ে পড়ি। কিন্তু তারপরেই মনে হয়, মাটি ভাল হলেই তো ভাল ফসল পাওয়া যায় না। কে ক্ষেত তৈরি করবে, জলসেচের ব্যবস্থা করবে? বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া এই পাথুরে দেশে জমি তৈরি করা কিংবা জলসেচের বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। আর সরকারী উদ্যোগ ছাড়া সে সাহায্য অসম্ভব। দুঃখের কথা জাতীয় সরকার এখনও লাহুল-স্পিতির উন্নয়নে মনোযোগী হন নি। নইলে ৭৭০০ বর্গমাইল বিস্তৃত জেলার জন্য কেমন করে তাঁরা প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে মাত্র সতেরো ও আশি হাজার টাকা বরাদ্দ করতে পারলেন। পরবর্তী পরিকল্পনায় অবশ্য কিছু বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নেহাতই নগণ্য। ফলে লাহুল ও স্পিতিতে আবাদী জমির পরিমাণ মোটে আট হাজার একর।

জমি তৈরি ও জলসেচ তো দূরের কথা। লাহুল-স্পিতিতে যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়ে গেছে, তাদের দিকেও তো আমরা মনোযোগ দিই নি। নইলে আর্তেমিসিয়া (Artemisia) এফেদ্রা (Ephedra) একোনিটাম (Aconitum), পোডোফাইলাম (Podophyllum), জেনসিয়ান্স (Gentians) এবং হাইওসিয়ামাসনিগোর (Hyoscyamusnigor) প্রভৃতির মতো মূল্যবান ওষুধের গাছ জন্মানো সত্ত্বেও এখানে একটি ওষুধের কারখানা হচ্ছে না কেন? এমন কি ঐসব দুর্মূল্য গাছ এবং স্পিতির এ্যাজবেস্টস রপ্তানীর কোনো ব্যবস্থাও এখন পর্যন্ত হয়ে উঠল না।

তবে এসব কথা এঁদের বলে কোনো লাভ নেই। কারণ এঁরা সমীক্ষক মাত্র। তাই অন্য আলোচনায় ব্যস্ত হই। কথায় কথায় মিস মালিনীর কথা উঠল। অফিসার ভদ্রলোক হেসে বললেন, "কাল ফিরে এসে শুনলাম, ঘর বন্ধ করে রেখে যাবার জন্য তিনি চৌকিদারের কাছে আমাদের খুব গালাগালি করেছেন। তাই বললাম, ঘর ছাড়ব না। ভদ্রমহিলা আরও ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু তাতে কোন ফলই হল না, আমি অনমনীয় রইলাম। অবশেষে তিনি তাঁর অশালীন মন্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। তখন আমি ঘর ছেড়ে দিলাম।"

সুজয়াকে আর চা বানাতে হল না। ওঁরাই চা-বিস্কুট খাওয়ালেন আমাদের। আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পরে আমরা বিদায় নিলাম তাঁদের কাছ থেকে।

ঘরে এসে বসতেই, কোথা থেকে চৌকিদার এসে হাজির হল। সকালে তাকে খুঁজে পাই নি বলে ঘরে বাস করার অনুমতি নেওয়া হয় নি। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কথা বললামও তাকে। কিন্তু লোকটা ক্ষমাহীন। সে নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে, "আছেন, থাকুন। তবে সন্ধ্যের জীপে যদি কেউ কেলং থেকে পারমিট নিয়ে আসে, তাহলে ঘর ছেড়ে দিতে হবে।"

অনেক অনুরোধেও তার মন গলানো গেল না। এমন কি নেতার দেওয়া টাকা দুটি নিঃশব্দে পকেটে পুরেও সে একই কথা বলছে।

বাধ্য হয়ে নেতা বলে, "ঠিক আছে, যদি কেউ না আসে, তাহলে আমরা থাকতে পারব তো?"

"জী হাঁ।" লোকটা সেলাম ঠুকে চলে গেল। সেলামটা তার ব্যবহারের সঙ্গে বড় বে-মানান বলে মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে 'আরাম হারাম হ্যায়' কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। সামান্য একটু

আরামের লোভে, হোটেল ছেড়ে এখানে না এলেই হত। সেখান থেকে তো কেউ আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারত না।

কিন্তু এখন আফসোস করা বৃথা। সেপাইজীও নেই। তিনি থাকলে হয়তো দুঃসময়ে একটা ব্যবস্থা করতে পারতেন।

মাস্টারজী ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে ফিরে এলেন। সুসংবাদ দিলেন, "কাল সকালের গাড়িতে টিকেট পাওয়া গেছে।"

বাঁচা গেল। কাল তাহলে আমরা কেলং যেতে পারছি। সেখানে শুনেছি আশ্রয়ের অসুবিধে হবে না। আর ফেরার পথে যে একটা রাত এখানে কাটাতে হবে, তার জন্য পারমিট নিয়ে আসা যাবে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে। এই বিশ্রাম ভবনে বাস করবার অনুমতি পত্র দেওয়া উচিত মানালী থেকে। কারণ সেখান থেকেই আসতে হয় এখানে। কিন্তু কে তার ব্যবস্থা করবে?

প্রশ্নটা কিন্তু সবার মনেই জেগে রয়েছে এখনও। তবু আমরা চুপ করে থাকি। শুধু সুজয়া বলে, "আচ্ছা সন্ধ্যের জীপে যদি সত্যি সত্যি কেউ পারমিট নিয়ে আসে?"

প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা নেই। তাই চুপ করে থাকি। কিন্তু নীরব থাকতে পারে না নেতা। সদস্যদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাঁকে। তাই ক্ষীণস্বরে বলে "আসে আসুক না, তারপরে দেখা যাবে।"

"কি দেখবেন?"

না, সুজয়া নেতার অবস্থা সঙ্গীন না করে ছাড়বে না দেখছি। তবে অত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় আমাদের নেতা। সে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলে, "তার আগে রান্নার হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেলুন দেখি।"

"মাস্টারজী নাকি আলুর পরোটা বানাবেন।" সুজয়া বলে।

"বেশ তো, তাঁকে বলুন তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ফেলতে।"

"কিন্তু এখনও দিনের আলো রয়েছে, এত তাড়াহুড়ো করে রান্না শেষ করার কি দরকার? সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!"

"খাবার আগে গরম করে নিলেই চলবে। মোট কথা সন্ধ্যের মধ্যে অর্থাৎ জীপ আসার আগে রান্না শেষ করে ফেলতেই হবে।"

"কেন?" আমরা কেউ তাঁর মতলব বুঝতে পারছি না।

অসিত উত্তর দেয়, "জীপ আসা মাত্র দরজা জানালা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। শত ডাকাডাকি করলেও সাড়া দেবো না। চৌকিদার বিরক্ত হয়ে চলে যাবে।"

"পারমিট-হোল্ডার বিরক্ত নাও হতে পারে।"

"দেখাই যাক না।" নেতা তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল।

অগত্যা মাস্টারজী গিয়ে স্টোভের ধারে বসেন। সুজয়া এগিয়ে যায় তাঁকে সাহায্য করতে। আমরা শুয়ে শুয়ে ওদের রান্না দেখতে থাকি। দুর্ভাবনাটা অবশ্য মাঝে মাঝেই মনে আসছে, কিন্তু সে কথা কাউকে বলি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্না শেষ হয়ে যায়। কিই বা রান্না, আলুর পরোটা। অর্থাৎ সিদ্ধ আলুর পুর ভেতরে দিয়ে পরোটা ভাজা। জিনিসটা মন্দ নয়, আলাদা তরকারির দরকার হবে না। হিমালয়ের পথে আমরা এমনি সব সহজ ও সংক্ষিপ্ত রান্না করি মানসী! তুমি নিজেও তো দেখেছ এর আগে। সেই যেদিন মানালী স্কুলে চণ্ডীগড় কলেজের ছেলেরা 'সুইট

রাইস' অর্থাৎ গুড় দিয়ে ফেনাভাত রান্না করেছিল। খেতে কিন্তু খারাপ লাগে নি।

যাক্‌গে যে কথা বলছিলাম—সন্ধ্যের মধ্যে রান্না শেষ হয়ে গেল। সব গুছিয়ে রেখে ওরাও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। জীপ আসার সময় সমাগত।

একটু বাদেই দূর হিমালয়ের বুক থেকে একটা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসে। খোকসার চমকে ওঠে। না, খোকসার নয়। খোকসার প্রতীক্ষা করছে তারই জন্য। ঐ জীপ আসার পরে আজকের মতো খোকসারের কর্মজীবন শেষ হয়ে যাবে। কাজেই খোকসার তার পথ চেয়েই বসে রয়েছে। চমকে উঠি আমরা, খোকসার বিশ্রাম ভবন থেকে আশ্রয়চ্যুত হবার ভয়ে ভীত গুটিকয়েক মানুষ।

শব্দটা এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে জীপের শব্দ। কোন্ জীপ, লাইনের জীপ কি ? নিশ্চয়ই তাই। নইলে এ সময় অন্য জীপ আসবে কেন ? আচ্ছা অন্য কোনো সরকারী জীপও তো হতে পারে। তবে আমি কি চাইছি না যে জীপটা আসুক ?

আশ্চর্য, যে জীপের জন্য কাল রাহালা থেকে ছুটে এসেছি এখানে, যে জীপে জায়গা না পাওয়ায় আজ সারাদিন থাকতে হল খোকসারে, যে জীপের টিকিট পাবার সংবাদকে কিছুক্ষণ আগেও সুসংবাদ বলে মনে হয়েছিল, সেই জীপের শব্দ শুনে সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। অথচ সে না এলে যে কাল আমাদের কেলং যাওয়া হবে না, সে কথাটাও ভুলে যাই নি।

প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে সে এলো। উঠে এলো পথ থেকে—মোটর-স্ট্যান্ডে। তার হেড লাইটের আলোয় সারা জায়গাটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। সে আলোর ছিটেফোঁটা কাচের জানলার ভেতর দিয়ে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে আমাদের আঁধার ঘরে। বাইরে থেকে কেউ দেখতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি কম্বলটা মাথার ওপরে টেনে দিই।

কিন্তু পারি না। সুজয়া আবার উঠে বসল কেন ! কোথায় যাচ্ছে সে। বাইরে থেকে ওকে দেখতে পাবে যে !

অসিত ফিসফিস শব্দে ধমক লাগায়, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

ফিসফিস করেই জবাব দেয় সুজয়া, "লাইনের জীপ এলো কিনা দেখে আসি।"

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় নেতার। সে একই স্বরে আদেশ দেয়, "দেখেই চলে আসবেন। আমাদের সাড়া না পেলে চৌকিদার টর্চ মারতে পারে।"

সুজয়া ফিরে আসে। নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে।

আমরা উৎকণ্ঠিত। নেতা জিজ্ঞেস করে, "কি ?"

"হ্যাঁ।" সুজয়া কোনমতে জবাব দেয়।

"কম্বলমুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকুন।" নেতা আবার আদেশ করে।

আমরাও সে আদেশ পালন করি। সময় বয়ে চলে।

আশা করি তুমি আমাদের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারবে মানসী ! অবিকল গল্পের সেই বন্ধুর মতো। পার্থক্য শুধু এই যে, সে ভালুকের হাতে মারা পড়বার ভয়ে মরে যাবার ভান করেছিল, আর আমরা চৌকিদারের হাতে গলাধাক্কা খাবার ভয়ে ঘুমের ভান করছি।

জীপ শব্দহীন হয়েছে। তার বদলে জেগে উঠেছে মানুষের শব্দ—কথাবার্তা, ও চলাফেরার শব্দ। আগেই বলেছি—জীপকে নিয়েই খোকসারের জীবন। জীপের জন্য এতক্ষণ জেগে ছিল খোকসার। এবারে সে পড়বে ঘুমিয়ে। কাল সকালে জীপ ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে সে উঠবে জেগে।

কারা জানি বারান্দা দিয়ে উঠে আসছে। খট্ খট্ জুতোর শব্দ হচ্ছে। বিশ্রাম ভবনে দরকার না থাকলে, এ বারান্দায় উঠে আসবে কেন ? অদৃষ্ট নেহাতই মন্দ দেখছি, নিশ্চয়ই কেউ পারমিট নিয়ে এসেছে। এইবার তল্পি-তল্পা নিয়ে বাইরে বেরুতে হবে। তারপরে ?

তারপরে কোথায় যাব ? হোটেলের সে ঘর বোধ হয় আর খালি নেই। এখানে রাত্রিবাসের মতো আর কোনো ঘর আছে বলেও জানি না। সেপাইজী থাকলে হয়তো একটা উপায় হয়ে যেত। কিন্তু তিনিও যে নেই।

ওরা আসছে। জুতোর শব্দটা নিকটতর হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের দরজার সামনে এসে শব্দটা থেমে গেল। এবারে কড়া নাড়ার শব্দ হবে। কতক্ষণ আর চুপ করে থাকতে পারব। একসময় সাড়া দিতে হবে। দরজা খুলতেই হবে। ঘর দিতে হবে ছেড়ে। তারপরে ? বাইরে প্রচণ্ড শীত। কোথায় যাব আমরা ? কি উপায় হবে আমাদের ?

কিন্তু কড়া নাড়ার শব্দ হয় না। কেউ কড়া নাড়ে না। তবে ওরা আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে।

কিসের কথাবার্তা ? ওরা কি বুঝতে পেরেছে আমাদের চালাকি ? তাই কি কেমন করে দরজা খোলা যায় তারই ফন্দি আঁটছে। লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেলবার মতলব ভাঁজছে ?

কিন্তু না, লাথি মারা তো দূরের কথা, কেউ কড়া পর্যন্ত নাড়ে না। ডাকাডাকিও করে না। বরং কথাবার্তার শব্দটাও থেমে যায়। তার বদলে আবার খট্ খট্ শব্দটা জেগে ওঠে।

ওরা কি চলে যাচ্ছে ! তাই তো মনে হচ্ছে। পদশব্দ আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে—ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কোয়ার্টার্সের দিকে। তাহলে কি কোনো পারমিট-হোল্ডার নয়, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ফিরে এলেন ? কিন্তু তিনি তো মানালী গিয়েছেন, আর তাঁর তো আজ আসার কথা নয়।

শব্দটা মিলিয়ে গেল। আমরা তবু শব্দহীন।

কেটে যায় আরও কিছুক্ষণ। আর কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। তাহলে কি ওরা সত্যি সত্যি চলে গেল ? কোথায় গেল ?

তা জেনে আমাদের কি লাভ ? আমরা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকব।

কিন্তু সুজয়া আর নীরব থাকতে পারে না। সে সহসা বলে ওঠে, "অল ক্লিয়ার।"

॥ পাঁচ ॥

সুজয়ার সে ঘোষণা মিথ্যে হয় নি মানসী ! সত্যই কাল রাতে কেউ আসে নি আমাদের ঘরে। নির্বিঘ্নেই রাত কেটেছে। এমন কি খাওয়ার পরে সাহস করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিলাম পর্যন্ত। চাঁদের আলোয় আর একবার দেখেছিলাম লীলাভূমি-লাহুলকে, যে লাহুল তখন মাটির পৃথিবী নয়, রূপকথার অলকাপুরী।

কাল রাতে কড়া নাড়ে নি, কিন্তু আজ সকালে শয্যা ছাড়তে হল কড়া নাড়ার শব্দে। আজ আর নেতা নির্বাক থাকেন না। গম্ভীর স্বরে হাঁক দেয়, "কৌন হ্যায় ?"

"ম্যায় চৌকিদার, সাব্।"

সে কি ! সকাল না হতেই চৌকিদার ! কাল রাতে চুপ করেছিলাম বলে লোকটা কি

আজ সকালেই কৈফিয়ৎ তলব করতে এসেছে ? কিন্তু সে তো কড়া নাড়ে নি। না ডাকলে আমরা সাড়া দেবো কেন ?

ভীত নেতা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে দরজা খোলে। বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করে, "নমস্তে চৌকিদারজী। কি খবর ?"

"আপনারা এখনো শুয়ে আছেন !" তার কণ্ঠস্বরে তিরস্কার।

নেতা নির্বাক। চৌকিদার আবার বলে, "সাতটায় গাড়ি, সাড়ে ছ'টা বাজে যে।"

তাই নাকি ! তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে সে। তাহলে উপায় ? আধঘন্টার মধ্যে প্রাতঃরাশ সেরে সব গুছিয়ে নেওয়া কি সম্ভব হবে ?

চৌকিদার নির্দেশ দেয়, "তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে অন্তত তিনজন গাড়িতে চলে আসুন। আপনাদের দেরি হবে বুঝে আমি জায়গা রেখে দিয়েছি। কিন্তু এখনও আপনারা গাড়িতে গিয়ে না বসলে, জায়গা বে-দখল হয়ে যাবে !"

"কিন্তু আমাদের যে চা খাওয়া হয় নি ?" সুজয়া বলে।

চৌকিদার উত্তর দেয়, "আপনারা গাড়িতে আসুন, আমি দোকান থেকে চা এনে দেবো।"

এর পরে আর আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। তাছাড়া আপত্তি করবই বা কেন ? লোকটি নিজের থেকে আমাদের জায়গা রেখেছে, সেই জায়গায় বসবার জন্য ডাকতে এসেছে। মনে মনে ধন্যবাদ দিই চৌকিদারকে।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে আমরা তিনজন মোটর স্ট্যাণ্ডে রওনা হই। অসিত ও মাস্টারজী সব গুছিয়ে নিচ্ছেন। আমরা কুলি পাঠিয়ে দিলে ওঁরা মালপত্র নিয়ে আসবেন।

জীপের কাছে এসে চক্ষুস্থির। লোকে লোকারণ্য। পেছনে আড়াই সারি সিট। এক সারিতে পাঁচজন লোক বসতে পারে, সেখানে সাতজন করে বসতে হবে। কিন্তু গাদাগাদি করে বসাটা সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে জায়গা পর্যন্ত পৌঁছনো এবং আমাদের পা ও মালপত্র রাখা। মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় মালপত্রের ওপর কম করেও জনদশেক লোক বসে আছে।

চৌকিদার তাগিদ দেয়, "উঠে পড়ুন !"

"কোন্‌খান দিয়ে ?" অসহায় স্বরে প্রশ্ন করি।

"কেন এখান দিয়ে,....এই ভাই একটু উঠে দাঁড়াও তো, সাব্‌দের যেতে দাও।"

চৌকিদারের কথায় কাজ হয়। ওরা একটু জায়গা করে দেয়। আমরা একে একে উঠে আসি গাড়িতে, চৌকিদার সাহায্য করে।

কম্বল বিছিয়ে জায়গা রেখেছিল চৌকিদার। জায়গায় বসে কম্বল ফিরিয়ে দিই। মনে মনে আবার ধন্যবাদ দিই তাকে। সে জায়গা না রাখলে আমাদের যাওয়াই হত না।

চৌকিদার বলে, "আর কাউকে বসতে দেবেন না। কেউ বসতে চাইলে বলবেন, আপনাদের আরও দুজন সাব আছেন। আমি কুলি পাঠিয়ে দিয়ে চা নিয়ে আসছি। আমাকে দুটো টাকা দিন।"

সুজয়া তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে একখানি দু'টাকার নোট তার হাতে দেয়। চৌকিদার চলে যায়। ভাবতে থাকি লোকটার কথা। কাল যাকে নির্দয় বলে ভেবে নিয়েছিলাম, আজ তাকে বড়ই দয়ালু বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না— কাল সন্ধ্যার গাড়িতে যাত্রী এলো, তারা আমাদের ঘরের সামনে গিয়ে কথাবার্তা বলল, অথচ আমাদের ঘর ছাড়তে বলল না !

একটু বাদে হোটেলের সেই ছেলেটি চা-বিস্কুট নিয়ে আসে। চৌকিদার এলো কিছুক্ষণ পরে—নেতার সঙ্গে। তেমনি করেই যাত্রীদের সরিয়ে সে মালপত্র গাড়িতে তুলে দেয়। তুলে দেয় নেতা ও মাস্টারজীকে।

চৌকিদারকে এক গ্লাস চা নিতে বলি। সে খুশি হয়। চা খেতে খেতে সহসা প্রশ্ন করে, "কাল সন্ধ্যায় আপনাদের ঘর অন্ধকার করে ঘুমোচ্ছিলেন নাকি ?"

"হ্যাঁ, না...মানে..." আচমকা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। বিব্রত বোধ করতে থাকি।

চৌকিদার আবার বলে, "ভালই করেছিলেন।"

"কেন ?"

সে একটু হাসে। তারপরে বলে, "কাল কেলং থেকে একটি পরিবার পারমিট নিয়ে এসেছেন। তাঁরা আপনাদের সাড়া না পেয়ে ও ঘর অন্ধকার দেখে হাজির হলেন আমার ঘরে। আমি বললাম—কলকাত্তার এক বড়াসাব দিল্লীর চিঠি নিয়ে এসেছেন, আমি তাঁকে ঘর ছেড়ে দিতে বলতে পারব না। তাঁরাও সাহস পেলনে না দরজায় ধাক্কা দিতে। আমি তখন তাঁদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বারান্দায় ব্যবস্থা করে দিলাম।"

না, লোকটি অযাচিতভাবে আমাদের অশেষ উপকার করেছে। তবে কাল রাতে আমরা অন্ধকার ঘরে চুপ করে শুয়ে না থাকলে তার পক্ষে বোধ হয় কিছু করা সম্ভব হত না। ভাগিস্য নেতার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল। মনে মনে নেতাকেও ধন্যবাদ দিই।

চৌকিদার গাড়ির পেছনদিকের লোহার ঝাঁপটা তুলে খিল লাগিয়ে দেয়। অপেক্ষমান পাঁচ-ছজন যাত্রী লাফিয়ে গাড়িতে ওঠে। বসে পড়ে সেই ঝাঁপের ওপরে। সুজয়া হেসে বলে, "এবারে বোধ হয় বাস 'ফুল' হল।"

কে জানে, তার এ অনুমান কতদূর সত্য। বারো জনের জায়গায় যখন বত্রিশ জন বসতে পেরেছি, তখন আরও বারো জন উঠলে কি আর একটা কষ্ট হবে ?

চৌকিদার বিশ্রাম ভবনের খাতা এনে নেতাকে দেয়। লেখা-লেখি শেষ করে নেতা তাকে খাতা ফিরিয়ে দিল। তারপরে পাঁচটাকার একখানি নোট তার হাতে দিয়ে বলে, "এই নিন ঘরভাড়া।"

নোটটি হাতে নিয়ে চৌকিদার বলে, "কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই সাব, আপনাকে যে দু'টাকা ফেরৎ দিতে হবে।"

"না, হবে না। আপনি ঐ দু'টাকার মিষ্টি কিনে দেবেন আপনার ছেলে-মেয়েকে।"

চৌকিদার সেলাম দেয়। সুজয়া তাকে বলে, "আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন, কিছুই তেমন দেওয়া হল না আপনাকে। কয়েকদিন পরেই আমরা আবার ফিরে আসব। কেলং থেকে পারমিট নিয়ে আসব, তখন আবার দেখা হবে।"

"নিশ্চয়ই হবে মেমসাব।" সে আবার সেলাম জানায়। আমরাও হাতজোড় করি।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেয়, প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়িটা দুলে ওঠে। কাল রাতে যে শব্দ শুনে শঙ্কিত হয়েছিলাম, আজ সকালে সেই শব্দকে শুভ-সঙ্গীত বলে মনে হচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করে। উঁচু স্ট্যান্ড থেকে নেমে আসে পথে। পুলের গোড়ায় এসে থেমে যায়। পাহারারত পুলিশ ড্রাইভারকে কিছু বলে। ড্রাইভার তার হাত থেকে একটা কাগজের মোড়ক নেয়। তারপরে পুলিশকে সেলাম করে গাড়ি ছেড়ে দেয়।

ঝুলন্ত পুলের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে গাড়ি। পুলটা ভীষণ ভাবে দুলছে। তাই বলে ভয় পাই নি আমরা। হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে যারা পরিক্রমা করেছে, তারা

বহুবার এই দোলায় দুলেছে। তুমিও তো আমার সঙ্গে দুলেছো মানসী, সেবারে সেই নাগর থেকে কুলু ফিরে আসার সময়।

যাকগে, যেকথা বলছিলাম। আমরা খোকসার পুল পেরিয়ে এলাম। এলাম লাহুলের মধ্যাঞ্চলে। পাহাড়ের গা বেয়ে গাড়ি ওপরে উঠছে। পুলের পূর্বদিকে খানিকটা দূরে কিছু বাড়ি-ঘর—প্রাচীন খোকসারের অংশ। মোটর স্ট্যান্ড থেকেও এই বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছিল। তবে এখন নদীর এপারে আসায় আরও ভাল করে দেখতে পাচ্ছি। ওরই একখানি বাড়িতে নুরপু সুখের সংসার পেতেছে। ওরা সুখী হোক্।

সঙ্কীর্ণ চড়াই পথ বেয়ে উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে আমাদের জীপ। মাঝে মাঝেই প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠছে আর যাত্রীরা একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু তাতে কেউ কিছু মনে করছে না। বরং মাথায়-মাথায় ঠোক্কর লাগার পরেও মাথার মালিকরা হাসা-হাসি করছে। বলা বাহুল্য, হাসতে হাসতে মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

শুনেছি মে মাসেও প্রচুর বরফ থাকে এ পথে। পদযাত্রীদের তখন বরফের কাদা ভেঙ্গে পথ চলতে হয়। আর এখন সে-পথ ধূলিধূসরিত। গাড়ি থামলেই ধোঁয়ার মতো ধুলো ঢুকছে ভেতরে। ভেড়ার পাল ও খচ্চরবাহিনীর জন্য মাঝে মাঝেই গাড়ি থামাতে হচ্ছে। তাছাড়া পথের বাঁকে তো গাড়ির গতি কমাতে হবেই। পাহাড়ী পথ যে শ'খানেক ফুটও বড় একটা সোজা থাকে না, তা তো তোমার অজানা নয় মানসী!

এপারের পাহাড়টা এবারে দূরে সরতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে ওপারের পাহাড়টা এগিয়ে আসছে চন্দ্রার কাছে। তাই ওপার থেকে এপারে আসতে হলে আমাদের। ওপারে পাহাড়, এপারে উপত্যকা। ওপারে পাথর, এপারে পথ। ওপারে তুষার, এপারে মাটি।

ওপারের পর্বতশ্রেণী এখন একেবারে চন্দ্রার তীরে এসে গেছে। চন্দ্রার গা ঘেঁষে খাড়া পাহাড়। জেনারেল ব্রুস ঐ পর্বতশ্রেণীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—

'The views of the range south of Chandra were truly magnificent. The steepness and prodigiousness of the faces is wonderful...the road west of Sussu...is really worth a journey in itself to see....'

তাই দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি আমরা। আর ভাবছি, পঞ্চাশ বছরের বেশি হল, ব্রুস এসেছিলেন এখানে। কিন্তু তখন তিনি লীলাভূমি-লাহুলের যে রূপ দর্শন করেছেন, তা আজও সত্য। আবার আজ আমরা যেরূপ দেখে যাচ্ছি, তাও হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে সত্যি হয়ে থাকবে। সত্য-সুন্দর শাশ্বত লাহুল।

যাত্রীদের অনুরোধে গাড়ি থামালেন ড্রাইভার। যাত্রীরা ধরাধরি করে গাড়ির পেছনের পর্দাটা ফেলে দিলেন। এখন সামনের দরজা দুটি ছাড়া ধুলো ঢোকার আর কোন পথ রইল না। কিন্তু তাতেও রেহাই পাওয়া যাবে কি? বোধ হয় না। মাঝখান থেকে লাহুল-দর্শন বন্ধ হয়ে গেল।

এখন দর্শনার্থীদের একমাত্র সম্বল গাড়ির উইন্ড স্ক্রীণ। ভাগ্যিস ওখানে পর্দা টাঙিয়ে গাড়ি চালানো যায় না।

সামনের দিকে তাকাই। পথের বাঁ দিকে অনেক নিচে বয়ে চলেছে চন্দ্রা। চন্দ্রার বেলাভূমি থেকে ডানদিকের পাহাড় পর্যন্ত উপত্যকা। নামেই উপত্যকা, আসলে পাথুরে প্রান্তর। খেতখামার গাছপালা তো দূরের কথা, শেওলা বা মস পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। দূরের পাহাড়ের মাথায় রূপালী মুকুট, আর কাছের পাহাড়ের গায়ে নিরেট পাথর। যতদূর

দৃষ্টি যাচ্ছে, কেবল পাথর পাথর আর পাথর। পাথর ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। কিন্তু সে পাথর প্রাণহীন নয়, সৌন্দর্যহীন নয়। পাথরের যে একটা নিজস্ব রূপ আছে আর সে রূপ মনোমুগ্ধকর, তা লাহুলে না এলে অজানাই রয়ে যেত।

লাহুল-হিমালয় স্থির ও অচঞ্চল। আর তাই বোধহয় চন্দ্রা একটু বেশি চঞ্চলা। চিরচঞ্চলা চন্দ্রা এখানে শূন্যতার মাঝে পূর্ণতার এবং মৃত্যুর মাঝে জীবনের স্পন্দন। তার নীলধারায় স্বপ্নের আবেশ। স্বপ্নসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে। আশ্বাস দিচ্ছে—এই রিক্ত রূপই লাহুলের সর্বস্ব নয়। তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমার মন ভরিয়ে দেবো।

এখন আমরা শিশু গ্রামে চলেছি। শুনেছি তিনটি অংশ নিয়ে শিশু। শেষের অংশটি সবচেয়ে সমৃদ্ধ। সেখানেই থামবে আমাদের গাড়ি। শিশু খোকসার থেকে নয় মাইলের মতো। শিশুর উচ্চতা ১০,১০০ ফুট। নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম ভবন আছে সেখানে।

মোটর চলাচল আরম্ভ হবার আগে, যাত্রীরা প্রথম দিনে খোকসার থেকে শিশু পর্যন্ত হেঁটে আসতেন। শিশুতে রাত্রিবাস করে, পরদিন সকালে তাঁরা কেলং রওনা হতেন। কেলং শিশু থেকে ১৯ মাইল।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সহসা সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠি। কোন ফাঁকে যেন লাহুল তার রূপ পরিবর্তন করে নিয়েছে। পাথুরে লাহুল সবুজ হয়েছে। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-ঝাড়। মাঝে মাঝে বার্লি ও খাটুর ক্ষেত। খাটু অনেকটা ভুট্টার মতো। লাহুলীরা খাটু থেকে আটা তৈরি করে।

একটু দূরে বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। খোকসার ছাড়বার পরে এই প্রথম লোকালয় চোখে পড়ল। ছেলে-মেয়ে পিঠে বেঁধে তিব্বতী মেয়ে-পুরুষ পথের পাশে পাথর ভাঙ্গছে। নোংরা পোশাক কিন্তু গায়ের রং ও স্বাস্থ্যের জন্য দেখতে খারাপ লাগছে না। পথের পাশে ছোট ছোট তাঁবু ও ত্রিপলের ছাউনীতে সংসার পেতেছে ওরা—নতুন সংসার। দেশের ভিটে থেকে বিতাড়িত হয়ে বিদেশের পথে বাসা বেঁধেছে। যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে, সেই প্রাণের জন্যই এখন প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কতৃপক্ষ তাঁবু অথবা ত্রিপল দিয়েছেন। তারই তলায় সংসার পেতেছে ওরা—বাস্তুহারার সংসার।

তিব্বতী-উপনিবেশ ছাড়িয়ে এলাম। পথের পাশে মাঝে মাঝে উইলো গাছ। শুনেছি কয়েক বছর আগে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য এইসব গাছের চারা লাগানো হয়েছিল। লাহুলের মাটি ও জলবায়ু সে পরীক্ষায় পাস করেছে। উইলো চারাগুলি বেশ বড়বড় গাছ হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে।

কয়েকজন লোক পথের পাশে দাঁড়িয়ে উইলো গাছের ছাল ছাড়াচ্ছে। আমরা কলকাতার মানুষ—ইলেকট্রিক তার কাটা, ওয়াগন ভাঙ্গা, টেলিফোন অথবা রেল লাইন তোলা প্রভৃতি ব্যাপার বুঝতে পারি। সেই অভিজ্ঞতায়, ওরা যদি গাছ কাটতো, তাহলে অবাক হতাম না। কিন্তু তা না করে, ওরা শুধু গাছের ছাল ছাড়াচ্ছে। স্বভাবতই বিস্মিত স্বরে সহযাত্রী লাহুলীকে প্রশ্ন করি, "ওরা কি করছে?"

তিনি উত্তর দেন, "আমরা বড় গরীব বাবুজী। গ্রীষ্মকালে তবু যা হোক্ একবেলা খাবার জোটে, কিন্তু শীতকালে প্রায়ই উপোস করতে হয়। তাই উইলো গাছের ছাল শুকিয়ে ঘরে রেখে দিই। শীতকালে সেই শুকনো ছাল সেদ্ধ করে খাই।"

"ওরা ছাল খাবে, কি সেদ্ধ জল খাবে?" সুজয়া প্রশ্ন করে।

সহযাত্রী বলেন, "জলটাই খাবার নিয়ম। কিন্তু খিদের জ্বালায় কিছুই ফেলতে পারি না।"

চুপ করে থাকি। কি বলব ? লাহুল এখন স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ আজও লাহুলীদের গাছের ছাল খেয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। পরাধীনতা যদি অভিশাপ হয়, তাহলে এ স্বাধীনতাকে কি বলব ?

আর একটা ক্ষুদ্র লোকালয় ছাড়িয়ে এলাম। পেরিয়ে এলাম পাহাড়ী একটি নদী। ডানদিকের পাহাড় থেকে নেমে এসে বাঁদিকের চন্দ্রায় পড়েছে। নদীটির নাম শিশু নদী। শিশু গ্রামের উপকণ্ঠে ছোট্ট নদীটির নাম তো শিশু নদীই হওয়া উচিত।

নদী পেরিয়েই উপত্যকা প্রশস্ততর। এবারে আর কেবল খাটু ও বার্লির ক্ষেত নয়। সেই সঙ্গে আলু কপি কুমড়ো সয়াবিন ও অন্যান্য শাক-সবজির ক্ষেত। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে চন্দ্রার উপত্যকায় ক্ষেত-খামার ও বাড়ি-ঘর।

একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করবার মতো। এখানে উইলো গাছ খুবই কম। কারণটা বুঝতে পারছি। প্রয়োজন নেই বলেই উইলো গাছ লাগানো হয় নি। প্রয়োজন নেই, কারণ এখানে রয়েছে অসংখ্য শিশু গাছ। শিশুগাছ জন্মায় বলেই এ গ্রামের নাম শিশু।

বাজারে এসে থামল আমাদের জীপ। ছোট বাজার। পথের দু'ধারে কয়েকটি ছোট ছোট দোকান—মুদি মনোহারী দর্জি চা ও খাবারের দোকান। খাটু পেষাই করবার জন্য একটি পানি-চাক্কি রয়েছে নিচে—চন্দ্রার তীরে।

জীপ থামতেই যাত্রীরা ঠেলাঠেলি করে নামতে শুরু করলেন। তাই বলে তুমি ভেবো না মানসী, তাঁরা সবাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছেন। শিশুর দুএকজন যাত্রী হয়ত আছেন ওঁদের মধ্যে। কিন্তু মালপত্র নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছেন বেশ কয়েকজন। কাজেই গাড়ির ভিড় কমা তো দূরের কথা, বরং বাড়বে এখান থেকে।

ভাবছ—তাহলে ওঁরা অমন করে গাড়ি থেকে নামলেন কেন ? নামলেন হাত-পায়ের জড়তা আর গায়ের ব্যথা কমাতে। একভাবে বসে থেকে, একটানা ঝাঁকুনি সহ্য করা কি সহজ কথা ? কম তো নয়, এই নয় মাইল পথ আসতে চল্লিশ মিনিট সময় লেগেছে। এখন আটটা বেজে দশ, সকাল সাড়ে সাতটায় আমাদের জীপ ছেড়েছে খোকসার থেকে।

ভিড় কমে যাবার পরে আমরাও নেমে আসি গাড়ি থেকে। চৌকিদারের কৃপায় আমরা সিটে জায়গা পেয়েছি বটে, কিন্তু বসতে পেরেছি বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। দুদিকের অসহ্য চাপ, তার ওপর সারাপথে পা দু'খানিকে নাড়াতে পারি নি। পায়ের সামনে মাল। মালের ওপরে মানুষ।

পায়চারি করতে বড় ভাল লাগছে। বসার চাইতে দাঁড়ানো আর দাঁড়ানোর চাইতে হাঁটা যে বেশি আরামদায়ক হতে পারে শিশুর পথে- পায়চারি করতে পেরে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম।

রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থিত সুন্দর গ্রাম শিশু। ছোট ও মাঝারি সুন্দর সুন্দর পাকা বাড়ি। এখানে এই একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। গাড়েয়াল ও কুমায়ুনের মতো পর্ণকুটির তুমি খুবই কম দেখতে পাবে লাহুলে। এখানকার অধিকাংশই পাকা বাড়ি।

প্রায় চারশ' ফুট নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে চন্দ্রা। নদীখাত এখানে অনেকটা চওড়া। ফলে চন্দ্রা অপেক্ষাকৃত শান্ত। চন্দ্রার ওপারে একটি দর্শনীয় তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ।

শিশু গ্রামের উচ্চতম স্থান অর্থাৎ এই বাজর থেকে প্রায় পাঁচশ' ফুট ওপরে একটি বৌদ্ধ গুম্ফা আছে। ১৯১২ সালে জেনারেল ব্রুস যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তিনি ঐ গুম্ফায় গিয়ে উপাসনা ও গানবাজনা শুনেছিলেন। সেদিনকার সেই নাচ-গানে খোকসারের

লামা সহ প্রায় চার-পাঁচশ' মানুষ যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক গদ্দি মেষপালক, কুলুর ব্যবসায়ী ও স্পিতির মানুষ ছিলেন। শিশুর লামা সেদিন সবার ভরপেট অন্ন-প্রসাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই নাচ-গান ও উৎসব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ব্রুস। তিনি এই সম্পর্কে বলেছেন—

> 'The dancing was preceded by a procession of Lamas in their best robes, headed by a small but typical Buddhist band, and followed by a small but quite entertaining devil dance.'

লাহুলের নাচ বড় ভাল লেগেছিল তাঁর। তাই তিনি বলেছেন—

> 'The dancing of the Lahoulis is much more cheerful, and shows a much greater sense of humour than the Kulu dancing.;

জেনারেল ব্রুস এখান থেকে পার্শ্ববর্তী শিখরগুলিতে পর্বতাভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের তো সে অবকাশ নেই। আমাদের জীপ মাত্র কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেবে এখানে। এই অবসরে হাত-পায়ের জড়তা কাটিয়ে এক গ্লাস চা খেয়ে তাজা হয়ে নিতে হবে.। কাজেই ব্রুস-এর ভাবনা বন্ধ করে পকেট থেকে রুমাল বার করি। মাথা মুখ ও হাত-পা ঝেড়ে যথাসম্ভব ধূলিমুক্ত হই। তারপরে এসে দাঁড়াই জলধারার কাছে। পাইপ দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছে। জল খুবই ঠান্ডা। তবু চোখেমুখে জল দিয়ে আরাম বোধ করি।

একটা চায়ের দোকানে এসে বসি। দোকানীর হাত থেকে গরম গ্লাসটা নিয়ে চা-এ চুমুক দিই। এখান থেকে চন্দ্রাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। স্নিগ্ধ সুনীল স্রোতস্বিনী। ওখানে তীরভূমিতে কোথাও খানিকটা জলাভূমি আছে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর ও এপ্রিল মাসে সেখানে অসংখ্য বলাকা দেখতে পাওয়া যায়। শীতের শুরুতে হিমালয় থেকে সমতল ভারতে যাবার পথে এবং শীতের শেষে ফিরে আসার পথে, তারা কয়েকটা দিন কাটিয়ে যায় সেখানে। তুমি তো জানো মানসী, হিমালয়ের অনেক পাখির শীতকালীন আবাস আলিপুরের চিড়িয়াখানা। লাহুলের মানুষ বড় একটা কলকাতায় যায় না, কিন্তু লাহুলের পাখিরা প্রতি বছর কলকাতা দেখে আসে।

কেবল রাজহংসী নয় মানসী, ঐ জলাভূমিতে তুমি প্রচুর ট্রাউট মাছ দেখতে পাবে। ট্রাউটের কথা বলতেই বোধ হয় তোমার মাণ্ডির সেই হোটেলের কথা মনে পড়ে গেল। আমরা সেখানে ট্রাউট মাছ খেয়েছিলাম। সবটা না খেতে পেরে খানিকটা এঁটো মাছ তুমি তুলে দিয়েছিলে আমার পাতে। বলেছিলে—তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, তোমার পাতের মাছ খেলে আমার জাত যাবে না।

কিন্তু সেকথা এখন থাক, এখন শিশুকে ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। বাজার থেকে একটি সংকীর্ণ চড়াই পথ উঠে গেছে বিশ্রাম ভবনে। এখান থেকে শ'খানেক ফুট উঁচুতে অবস্থিত ঐ রমণীয় নিবাসে দাঁড়িয়ে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি মনোরম। শিশুকেও ভারী সুন্দর দেখায় ওখান থেকে। লাল পাথরের টালিতে ছাওয়া ছোট ছোট বাড়ি আর সবুজ ফসলে ভরা ছোট ছোট ক্ষেত। আশেপাশে বনফুলের ছড়াছড়ি।

অবশ্য বিশ্রাম ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পর্যটকরা যে দৃশ্যটি দেখে সবচেয়ে মুগ্ধ হন, সেটি এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারের ঐ খাড়া পাহাড় আর অনিন্দ্যসুন্দর ঝরণা। জলপ্রপাত বলাই বোধ করি উচিত হবে। অনেকটা ওপর থেকে রুপোলী জলধারা

প্রবল উচ্ছ্বাসভরে লাফিয়ে পড়েছে নিচে—কঠিন পাথরের ওপরে। ফেনিল জলরাশি মুক্তোর মতো উজ্জ্বল হয়ে চন্দ্রার নীল জলে ডুবে যাচ্ছে।

কিন্তু আমরা আধুনিক যুগের ভারতীয় পর্যটক। জেনারেল ব্রুস-এর মতো সাত মাসের ছুটি নিয়ে হিমালয়ে আসি নি আমরা। সাত দিনে লাহুল-স্পিতি দর্শন শেষ করতে হবে। অতএব অনির্দিষ্টকাল এই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অবসর নেই আমাদের। ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। এবারে বিদায় নিতে হবে শিশুর কাছ থেকে।

গাড়িতে এসে বসি। একটু বাদেই জীপ চলতে শুরু করে। চাপটা আগের চেয়ে বেশি হয়েছে কারণ ভিড় আরও বেড়েছে। তবু চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে। আমরা বিংশ শতাব্দীর পর্যটক। গাড়িতে চেপে লীলাভূমি-লাহুল দর্শন করছি।

তেমনি দুলতে দুলতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। সেই ধূলি-ধূসরিত পথ—চন্দ্রার তীরে তীরে পথ। ওপারের পর্বতশ্রেণী ক্রমেই উঁচু হচ্ছে, এপারের পাহাড় একই রকম। শিশু ছাড়িয়ে আসার পরে অবশ্য উপত্যকাটি আবার সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এর পরে আমাদের যাত্রা-বিরতি গোন্ধলায়। শিশু থেকে নয় মাইল। সেখান থেকে কেলং আরও দশ মাইল।

গাড়ির দোলার সঙ্গে সমতা রেখে আমরাও দুলছি। দুলতে দুলতে সহযাত্রীর গায়ে গড়িয়ে পড়ছি। কিন্তু আমাদের দোলার দিকে নজর নেই কারও। দর্শনার্থীরা প্রায় প্রত্যেকেই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে—ঐ পাঞ্জাবী নবদম্পতীর দিকে। মাস্টারজীর বিছানার ওপর জড়াজড়ি করে বসে আছে ওরা। গাড়ির দোলায় দুজনেই একসঙ্গে দুলছে।

পথের দুদিকে আবার উইলো গাছের সারি শুরু হয়েছে, শুনলাম এবারে এরা সঙ্গে থাকবে কেলং পর্যন্ত। শিশু গাছ কিন্তু আর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না। প্রকৃতির কি বিস্ময়কর ব্যবস্থা!

নিজের অলক্ষ্যেই চেঁচিয়ে উঠি, "রোখ্‌কে, ড্রাইভারসাব জ্যারা রোখকে..."

ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ির গতি কমায়। একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থেমে যায়। যাত্রীরা বে-সামাল হয়ে পড়েন। সামলে নিয়ে সকলে বিরক্তভাবে আমার দিকে তাকায়। কিন্তু তাদের সেই তির্যক দৃষ্টিকে অবলীলাক্রমে অবহেলা করে আমি ঠেলাঠেলি করে নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। সুজয়া অসিত এবং মাস্টারজীও নেমে আসেন।আরও কয়েকজন যাত্রী আমাদের অনুসরণ করেন।

আমরা চন্দ্রার তীরে এসে দাঁড়াই। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যের দিকে—চন্দ্রার ওপারে একটি অপরূপ জলপ্রপাত। উঁচু খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে নদীর গা ঘেঁষে। তার শিখর থেকে হিমবাহ নেমে এসেছে নিচে। উজ্জ্বল নীলাভ সেই তুষারপ্রবাহ কালো পাহাড়ের গায়ে একটি ত্রিভুজাকৃতি স্তূপে পরিণত। তার থেকে একটি ক্ষীণ তুষারধারা নেমে এসেছে প্রায় শ'খানেক ফুট নিচে। সেখানে সৃষ্টি হয়েছে আর একটা স্তূপ। স্তূপ তো নয়, যেন ঢাকনাবিহীন বিশাল এক জলপাত্র। কারণ সেই স্তূপ থেকে সৃষ্ট হয়েছে শ্বেত-শুভ্র একটি জলধারা। সোজা লাফিয়ে পড়েছে কয়েক'শ ফুট নিচে—পাহাড়ের গায়ে একখানি উন্নত শৈলস্তবকের ওপরে। পাথরে প্রতিহত হয়ে জলধারা ফোয়ারায় পরিণত। সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা নিচের নুড়ি-ছাওয়া জায়গাটুকু সিক্ত করে কয়েকটি ছোট ছোট ফেনিল জলধারায় রূপান্তরিত। ভিন্ন ভিন্ন পথে তারা নেমে এসেছে চন্দ্রায়। নামার পথে পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি করেছে কয়েকটি ব-দ্বীপ। পার্থিব বস্তু বলেই মনে হচ্ছে না, যেন একখানি অপার্থিব রঙীন ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি বলতে পারব না। গাড়ির হর্ন কানে আসতে আমাদের চমক ভাঙ্গে। ড্রাইভার তাড়া দিচ্ছে। সে কাজের মানুষ। আমাদের কেলং পৌঁছে দিয়ে, তাকে আজ আবার খোকসার ফিরে আসতে হবে।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসি গাড়িতে। যে যার জায়গায় বসে পড়ি। গাড়ি এগিয়ে চলে।

কিছুক্ষণ পরে পথের পাশে আবার বাড়ি-ঘর পাওয়া গেল। তাহলে তো গোন্ধলা এসে গেছে। একটু বাদে গোন্ধলা বাজারে এসে থামল আমাদের জীপ।

বেশ প্রশস্ত উপত্যকা—সমৃদ্ধ জনপদ। চারিদিকে বাড়ি-ঘর, নির্মাণ বিভাগের অফিস, কোয়ার্টার্স ও স্টোর্স। এখানেও একটি বিশ্রাম ভবন আছে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এখানকার স্থায়ী জনসংখ্যা ২২৯ জন। এখন অনেক বেড়েছে। এখানকার উচ্চতা ১০,৩০০ ফুট।

সহযাত্রীদের সঙ্গে আমরাও জীপ থেকে নেমে পড়ি। চন্দ্রার তীরে এসে দাঁড়াই। ওপারে সেই আকাশ-ছোঁয়া খাড়া পাহাড। একেবার চন্দ্রার তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট সোজা নেমে এসেছে—'Stupendous precipice, one of the finest in the world.'

এর কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি মানসী! সত্যই সুন্দর, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছে না।

তবু তাকাতে হয় অন্য দিকে। সময় কম, এরই মধ্যে সব দেখে নিতে হবে। তাই ওপার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে এপারের দিকে নজর দিই। পাহাড়ের গায়ে ক্ষেত আর বাড়ি-ঘর। অনেক উঁচুতে সেই প্রাচীন গুম্ফা। গোন্ধলা গুম্ফা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত। প্রতিবছর জুলাই মাসে ঐ মন্দিরপ্রাঙ্গণে মেলা বসে। পুণ্যার্থীদের সঙ্গে লামারাও নাচে-গানে অংশ নেন। কথিত আছে, একদা লামারা নাকি জনৈক তিব্বতী রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধজয়ের সেই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যই এই মেলা। কাজেই মেলাটি বিজয়োৎসব।

এখানকার মনুষ্য-নির্মিত দ্রষ্টব্য বস্তুসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ ঠাকুরবাডি। না এটি কোনো দেবালয় নয় মানসী, এটি এখানকার জমিদারবাড়ি। ঠাকুর মানে দেবতা নয়, মানুষ। তাই বলে ভেবে বসো না, কবিগুরু কিংবা শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে তাঁদের।

লাহুলীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় হল—ঠাকুর, ব্রাহ্মণ, কানেৎ, সিপি বা ডোগি, লোহার, বারারা এবং হেনসি। ঠাকুরদের কথা তোমাকে পরে বলছি মানসী। আগে অন্যদের কথা বলে নিই।

লাহুলের ব্রাহ্মণরা সমতল ভারত থেকে এসেছেন। তাঁরা পাটান অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে বসবাস করেন। এঁরা তিব্বতী জানেন না। এই অঞ্চলের লাহুলী ভাষায় বহু হিন্দী শব্দ মিশে গিয়েছে।

কানেৎ ও ডোগিরা মঙ্গোলীয় জাতি। তবে প্রচুর সংমিশ্রণ ঘটেছে। তুলনায় কানেৎরা উচ্চবংশীয়। তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ঠাকুরদের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রচলিত। ডোগিদের সে স্বীকৃতি নেই। তাঁরা লোহার বারারা ও হেনসিদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে মনে করেন। এঁরা মন্দির ও গুম্ফায় নাচ-গান করে জীবিকা অর্জন করে থাকেন।

লোহার মানে লৌহকার। কিন্তু লাহুলের লোহারদের কম লোকই এখন কামারের কাজ করেন। বারারা এবং হেনসিদেরও জীবিকা নাচ-গান। এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে

বৈবাহিক সম্পর্ক সুপ্রচলিত। কারণ এঁরা সবাই লাহুলের আদিবাসী।

এবারে ঠাকুরদের প্রসঙ্গে আসছি। তাঁরা জাতিতে রাজপুত। তবে স্বাভাবিক ভাবেই এঁদের সমাজে কিছু মঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। তাঁরা দীর্ঘকাল লাহুল উপত্যকাকে শাসন করেছেন। এঁরা তিনটি পরিবারে বিভক্ত—কেলং গুমরং ও গোন্ধলার ঠাকুরপরিবার। এঁরা লাহুলের জায়গীরদার ছিলেন।

ব্রিটিশ অধিকারের পরেও লাহুলের ঠাকুরদের প্রতিপত্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের তহশীলদার অর্থাৎ মহকুমাশাসকের মর্যাদা দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে অবশ্য তাঁদের প্রতিপত্তি অনেকখানি কমে গেছে। তবু ঠাকুররা এখনও লাহুলের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পরিবার। কেলং এবং গুমরংয়ের ঠাকুরদের কথা আজ থাক্ মানসী, আজ তোমাকে কেবল গোন্ধলার ঠাকুরবাড়ির কথা বলছি। হাঁটতে হাঁটতে বাজার ছাড়িয়ে আমরা এসে দাঁড়াই বাড়িটির সামনে—সাততলা বাড়ি। ঠাকুর ফতেচাঁদ নির্মাণ করেছেন লাহুলের এই সুউচ্চ প্রাসাদ।

গ্রামের মধ্যস্থলে চন্দ্রার তীরে অবস্থিত এই প্রাসাদের ছবি তুমি দেখেছো মানসী! তলাগুলি খুবই নিচু। ছ' থেকে সাতফুট মাত্র উঁচু। তাই সমস্ত বাড়িটা পঞ্চাশ ফুটের বেশি উঁচু নয়। তাহলেও এটি লাহুল-স্পিতির সবচেয়ে সাবেকী উঁচু বাড়ি। প্রত্যেক পর্যটক এ বাড়ির ছবি নেন। আমরাও নিলাম।

শুনেছি বাড়ির সর্বোচ্চ তলাটি ঠাকর সাহেবের সম্মানিত অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত। অনুমান করতে পারি, সেখানে দাঁড়িয়ে বরেণ্য অতিথিরা গোন্ধলা এবং লাহুল-হিমালয়ের অপরূপ রূপ দেখে চমৎকৃত হন। কেবল ওঠা-নামার সময় মাথা সম্পর্কে সাবধান হতে হয়। কারণ ঘোরানো সিঁড়িটা নিচু এবং অন্ধকার।

আমাদের অবশ্য সে ভাবনা বৃথা। কেউ এই বাড়ির ওপরে উঠে গোন্ধলাকে দর্শন করবার নেমন্তন্ন করেন নি আমাদের। আর করলেও ওপরে উঠবার সময় নেই এখন। ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি জীপের কাছে ফিরে আসি। গাড়িতে উঠে বসি। জীপ চলতে শুরু করে। এবারে গন্তব্যস্থল তাণ্ডি। গোন্ধলা থেকে ছয় মাইল।

গোন্ধলা পড়ে রয়েছে পেছনে, আমরা চলেছি এগিয়ে। চলেছি চন্দ্রা ও ভাগানদীর মিলনভূমি তাণ্ডির দিকে।

কিন্তু না, তাণ্ডি না। আমি ভাবছি গোন্ধলার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকা গেফান শৃঙ্গের কথা। জেনারেল ব্রুস গেফান শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা সফল হয় নি। কিন্তু তাঁদের সেই দুঃসাহসিক অভিযান পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। রাত সাড়ে বারাটার সময় তাঁরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা শিখর-শিরায় উপস্থিত হতে সক্ষম হলেন। শিখর তখন তাঁদের প্রায় মুঠোর মধ্যে। অভিযাত্রীরা বুঝতে পারলেন, আর মিনিট বিশেক আরোহণ করতে পারলেই তাঁরা গেফান শীর্ষে পৌঁছতে পারবেন।

সহসা কোথা থেকে একটা মৃত্যুশীতল দমকা হাওয়া এলো ছুটে। অভিযাত্রীদের সারা শরীর মুহূর্তে অসাড় হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে ফিরে এলেন তাঁরা। তারপরে আটান্ন বছর কেটে গেছে। কিন্তু গেফান আজও অপরাজিত। লাহুলীরা অবশ্য বলেন গেফান শীর্ষে আরোহণ করা মানুষের অসাধ্য। কারণ—'গেফান-দেওতা বড়া খারাব।' তবু তোমাকে আমি

সেই অভিযান প্রসঙ্গে জেনারেল ব্রুসয়ের কয়েকটি কথা বলছি মানসী! ব্রুস বলেছেন—

'The last part of the Gaphan has a most sensational appearance.

'The face and ridge....are at the steepest angle, and the western face goes sheer down on to the Sissu glacier, an immense rock face....ice and snow, with occasional bits of outcropping rock, their only trouble being that, owing to the heavy cornicing of the ridge, they occasionally had to take to the face. However,when they had passed all difficulties,and when not more than twenty minutes from the top, they were suddenly caught in a regular *ourmente*, which nearly took them off the mountain, and without stopping a moment they fled.'

এই শিখরারোহণ সম্পর্কে ব্রুসয়ের অভিমত হল—

'Gaphan, in the best of weather, is a mountain to be treated with very deep respect.'

জানি না কারা তা করতে পারবেন, তবে ভাবীকালের সেই সফলকাম অভিযাত্রীদের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

চন্দ্রার তীর দিয়ে চড়াই পথ। পথের পাশে মাঝে মাঝে লোকালয়—সব ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে আমাদের জীপ।

চন্দ্রা ক্রমেই চওড়া হচ্ছে। তাই তো হবে। তার একক যাত্রা যে শেষ হয়ে এলো। একটু বাদেই তার ৭০ মাইল পরিক্রমা পূর্ণ হবে। ভাগার সঙ্গে মিলিত হবে সে। মিলনের আনন্দে মশগুল হয়ে উঠেছে চন্দ্রা।

আগেই বলেছি গোন্ধলা থেকে তাণ্ডি ছ' মাইল। তার অর্ধেকেরও বেশি পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা। এবার শুরু হল উৎরাই। চন্দ্রার তীর ঘেঁষে পথ। পথের পাশে কয়েকশ' ফুট নিচে উচ্ছ্বসিতা চন্দ্রা। ড্রাইভার মুহূর্তের তরে অসতর্ক হলে, জন-তিরিশেক যাত্রীর ভবলীলা সাঙ্গ হবে লীলাময় লাহুলের জলে।

কথাটা বলতেই যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে সুজয়া। বলে, "ইস্ কি মজাই না হয় তাহলে!"

"মজা!"

"মজা বৈকি। মরতে তো একদিন হবেই। কিন্তু হিমালয়ের বুকে মৃত্যু ক'জনের অদৃষ্টে জোটে। অনেক পুণ্য করলে অনিমাদি, গৌরাঙ্গ অথবা অমরের মতো মৃত্যু বরণ করা যায়।"* একবার থামে সে। কি যেন একটু ভাবে। তারপরে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে থাকে, "আমার যদি সত্যি সে সৌভাগ্য হয়, আমি যদি লাহুলের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি, তাহলে তোমরা আমার এই নশ্বর দেহ চন্দ্রা কিংবা ভাগার তীরে পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিও।"

অন্তর্যামী কী শুনতে পেলেন সুজয়ার কথা? শুনে তিনি কি ভাবছেন জানি না, কিন্তু কথাটা মোটেই ভাল লাগে না আমার। সুজয়া বয়সে আমাদের সবার চেয়ে ছোট কিন্তু গুণে সবার বড়। সামনে তার সম্ভাবনাময় সুদীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। জীবনের কাজ শেষ না

---

* লেখকের 'গিরি-কান্তার' [হিমালয়—১] দ্রষ্টব্য।

হতেই তার বিদায় নেবার বাসনা কেন ?

তাই তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই। কিন্তু লাহুলের দিকে তাকিয়ে তার কথাটাই মনে পড়ে আবার। সুজয়া সত্যি কথাই বলেছে—লাহুল বড় সুন্দর। এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মাঝে শেষনিঃশ্বাস নিতে পারা পরম সৌভাগ্যের।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সে সৌভাগ্য হল না আমাদের। ড্রাইভার নির্বিঘ্নে গাড়ি নিয়ে এলো তাণ্ডি। আমরা সকলেই সুস্থ শরীরে নেমে এলাম গাড়ি থেকে।

সামনে সঙ্গম—সুনীল চন্দ্রা এসে শুভ্র ভাগার সঙ্গে মিলিত হল। জন্ম নিল চন্দ্রভাগা। চন্দ্রা ও ভাগা হল শেষ, শুরু হল চন্দ্রভাগা। তাই নিয়ম। একের শেষ, অপরের শুরু—শেষ থেকে শুরু।

॥ ছয় ॥

আমার মানসী,

চন্দ্রা ও ভাগা সঙ্গমে শেষ করেছিলাম আগের চিঠি। চন্দ্রভাগার সেই জন্মভূমি থেকেই শুরু করছি এ চিঠি।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে এলাম পথে—তাণ্ডির পথে। সামনেই সঙ্গম। সঙ্গমের কাছে বালুকাবেলায় চোরতেনটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তুমি তো জান মানসী, চোরতেন হল বৌদ্ধদের পবিত্র স্থল। দেখতে অনেকটা আমাদের দোলমঞ্চের মতো। আজ কিন্তু তাণ্ডির এই সুপ্রাচীন চোরতেনটিকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ কিছুকাল আগেও তার এমন দুরবস্থা ছিল না। তখন যে এখানে ছিল না এমন মজবুত পুল। চন্দ্রভাগা উপত্যকার যাত্রীদের প্রাণ হাতে করে নদী পেরোতে হত। তাই তাঁরা প্রত্যেকেই ঐ চোরতেনের সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতেন—প্রভু, আমি যেন নির্বিঘ্নে নদী পার হতে পারি। সেদিনকার সেই সমাদৃত চোরতেন আজ নিতান্তই অবহেলিত। মানুষ বড়ই স্বার্থপর।

তাণ্ডি কিন্তু কেবল দুটি নদীর সঙ্গম নয়, তিনটি উপত্যকার মিলন-ভূমিও বটে। উত্তর-পূর্ব থেকে ভাগা, দক্ষিণ-পূর্ব থেকে চন্দ্রা এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে চন্দ্রভাগা বা পাট্টান উপত্যকা এসে মিলিত হয়েছে এখানে।

স্বভাবতই জায়গাটা উর্বর।আর তাই সুদূর অতীতেই এখানে গড়ে উঠেছিল জনপদ। মনুষের জন্যই ধর্ম। তাই ধর্মপ্রচারক ও পরিব্রাজক মহান পদ্মসম্ভব অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে একদিন এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এখানে। আমাদের মতো তিনিও অবাক বিস্ময়ে দর্শন করেছিলেন এই সঙ্গম। বিমুগ্ধ সন্ন্যাসী শিষ্যদের বলেছিলেন—"আমি এই রমণীয় সঙ্গমের কাছে একটা গুম্ফা প্রতিষ্ঠা করতে চাই।"

শিষ্যগণ গুরুদেবের সে ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। এখান থেকে আড়াই মাইল দূরে তুপচিলিং গ্রামে গুম্ফার স্থান নির্বাচিত হল। পদ্মসম্ভব গেলেন সেখানে। প্রতিষ্ঠা করলেন লাহুলের প্রথম বৌদ্ধ গুম্ফা ও হিন্দু মন্দির। স্থাপিত হল অবলোকিতেশ্বর মূর্তি।

মহানায়ক পদ্মসম্ভব আজ নেই। কিন্তু তাঁর বাণী ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের পথে পথে। আছে সেই গুরুঘাঁতাল গুম্ফা ও অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। সেই তপস্যারত বোধিসত্ত্ব-

অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটির গঠননৈপুণ্য অপূর্ব। শ্রীমদনজিৎ সিং ঐ মূর্তিটি সম্পর্কে লিখেছেন—

'The plastic austerity and stylistic sophistication of this exquisite piece, with hypnotising eyes under gently arched eyebrows,have all the qualities of Gupta classicism. This figure is by far the finest of all the stray Gupta sculptures of the 7th-8th Centuries traced at Kullu, Kangra, Chamba and Asarur.'*

কেবল অবলোকিতেশ্বরের মুখাবয়ব নয় মানসী, কাষ্ঠনির্মিত পিরামিডাকৃতি গুরুঘাঁতাল গুম্ফার ছাদ এবং দেওয়ালের খোদাই করা কাজও তোমাকে মুগ্ধ করবে। তুমি মুগ্ধ হবে ব্রজেশ্বরী দেবীর মূর্তি এবং একটি কাঠের মুখোস দেখে। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত সেই মুখোসটি সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে এই মন্দিরে। প্রতি বছর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় মন্দিরে 'ঘাঁতাল উৎসব' হয়। দূর দূর থেকেও তীর্থযাত্রীরা সমবেত হন। নাচ-গানের আসরে বসে। অবস্থা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করেন সে উৎসবে। প্রত্যেককেই মুখোস পরে নাচতে হয়। ভয় দেখিয়ে শয়তান তথা অমঙ্গলকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই এই মুখোস। গুরুঘাঁতাল মঠের অধ্যক্ষ নিজে ষোড়শ শতাব্দীর সেই মুখোসটি পরে নেন। ঐ মুখোসের প্রসঙ্গে শ্রীসিং বলেছেন—

'A fantastic piece of workmanship, simply yet effective. It is a reflection of the spirits and devils of Bon-po beliefs about magic, sorcery and superstition.The Bon-po cult has long been superseded by the Buddhist religion, but these basic art forms of an ageless variety and are firmly enshrined in the mental make-up and religious and artistic responses of the hardy, truthful and kindhearted people of lahoul and Spiti.'

শ্রীসিংকে ধন্যবাদ, তিনি লাহুল-স্পিতির সরল অধিবাসীদের চরিত্র যথাযথ বর্ণনা করেছেন। সত্যই মানসী। এমন কষ্টসহিষ্ণু বিশ্বস্ত ও সহৃদয় মানুষ তুমি খুবই কম দেখতে পাবে।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। গুরুঘাঁতাল মঠে সমবেত লামা ও তীর্থযাত্রীরা সেদিন নিকটবর্তী পবিত্র শিখর দিরিলবুড়ি পরিক্রমা করেন—অনেকটা গিরি-গোবর্ধন পরিক্রমার মতো। হয়তো আশ্চর্য হচ্ছ! কোথায় ব্রজমণ্ডল আর কোথায় লাহুল, কোথায় বৈষ্ণব ধর্ম আর কোথায় বৌদ্ধধর্ম!

কিন্তু মানসী! আশ্চর্য হবার তো কিছুই নেই। বিভেদের মাঝে মিলনই যে ভারতীয়তা। এই ভারতীয়তা নিঃশব্দে সকল ধর্মকে প্রভাবিত করে আসমুদ্র হিমাচলকে অধিকার করে আছে। তাই তুমি বাংলার পালবংশীয় (ধর্মপাল ও দেবপাল—৭৭০ খ্রীঃ, ৮৫৪ খ্রীঃ) স্থাপত্যকলার বহু নিদর্শন পাবে লাহুল-স্পিতির মঠে ও মন্দিরে।

তবে লাহুল স্পিতির শিল্পকলার কথা এখন নয়, এখন তোমাকে সেই দিরিলবুড়ি পর্বত পরিক্রমার কথা বলে নিই। কয়েক হাজার ফুট চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে আঠারো মাইল

---

* 'Himalayan Art (UNESCO art Books) by Madanjeet Singh'–1968.

দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয় পুণ্যার্থীদের। পরিক্রমা-শেষে গুম্ফার প্রাঙ্গণে ভোজের আসর বসে। ঠাকুর পরিবারের লোকজন ও লামারা প্রত্যেকেই সাধারণের সঙ্গে বসে সেই পঙক্তি ভোজনে অংশগ্রহণ করেন। সেদিনটি তাণ্ডি অঞ্চলের সবচেয়ে আনন্দের দিন।

কিন্তু মানসী, তোমাকে আমি আগেই বলেছি, তুপচিলিং এখান থেকে আড়াই মাইল। এ যাত্রায় আমাদের আর যাওয়া হবে না সেখানে। পরিক্রমা করা হবে না দিরিলবুড়ি পর্বত। কারণ আমরা একালের পর্যটক। আমাদের সময় অল্প, সুযোগ স্বল্পতর। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মস্তিষ্ক সুস্থ। আমরা কেউ পদ্মসম্ভব, মূরক্রফট কিংবা রাহুল সাংকৃত্যায়ণের মতো পাগল নই। পাগল না হতে পারলে হিমালয়কে দর্শন করা যায় না। তুমি তো জান মানসী, হিমালয়ান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ শেষজীবনে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা পাগল নই, তাই গন্তব্যস্থলে ঠিক করে নিয়ে পদযাত্রা শুরু করি। নির্দিষ্ট পথে লক্ষ্যে পৌঁছই। আমাদের যাত্রা শেষ হয়। কিন্তু হিমালয়-দর্শন হয় না। কেমন করে হবে? হিমালয় তো চিড়িয়াখানা নয়। হিমালয় দর্শনের অভিধানে শেষ বলে কোনো কথা নেই।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক্, এখন তাণ্ডিকে একটু ভাল করে দেখে নেওয়া যাক্। চন্দ্রভাগার দু'তীরে দুটি গ্রাম গউশাল ও তাণ্ডি। গউশাল ছোট, তাণ্ডি বড়। গউশাল নতুন, তাণ্ডি পুরনো। সুপ্রাচীন গ্রাম তাণ্ডি। কথিত আছে রাণা চাঁদরাম নামে জনৈক রাজা এই গ্রামের পত্তন করেন। তিনি নাকি নাম রেখেছিলেন 'চান্দি'। পরবর্তীকালে চান্দি তাণ্ডি হয়েছে।

এই গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে আর একটি জনপ্রিয় কাহিনী হল—দ্রৌপদী এখানে এসে দেহত্যাগ করেছিলেন বলে, এই গ্রামের নাম হয়েছিল 'তন দেহি'। তন দেহি পরবর্তীকালে তাণ্ডিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

তাণ্ডি কেবল একটি প্রাচীন গ্রাম নয়, এ জেলার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ গ্রামগুলির অন্যতম। তাই ১৯৬১ সালের আদমসুমারির সময়ে এ গ্রামের বিস্তৃত সমীক্ষা করা হয়েছে। তখন তাণ্ডির স্থায়ী জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১৬৫ জন।* এখানে পোস্ট-অফিস ও হাইস্কুল আছে। তাণ্ডির উচ্চতা ১০,০০০ ফুট।

আগেই বলেছি, তিনটি উপত্যকার মিলনক্ষেত্র তাণ্ডি। তিন উপত্যকা থেকে তিনটি পথ এসে মিশেছে। তাণ্ডিতে। চন্দ্রা উপত্যকার পথটি দিয়ে আমরা খোকসার থেকে এসেছি এখানে। এখান থেকে ভাগা উপত্যকার পথ ধরে পৌঁছব কেলং। কিন্তু সে পথকে পরে দেখা যাবে। আগে থিরোট তথা চন্দ্রভাগা উপত্যকার পথটি দেখে নিই।

চন্দ্রভাগা উপত্যকার পথটি চলে গেছে উদয়পুর। এখান থেকে নেমে গেছে সঙ্গমের কাছে। পেরিয়েছে পুল—তাণ্ডি পুল। তারপরে চন্দ্রভাগার তীর দিয়ে চলে গেছে উত্তর-পশ্চিমে। তোমাকে আগেই বলেছি মানসী, চন্দ্রভাগা উপত্যকা খুবই উর্বর। তাই তুমি উদয়পুর যাবার সময় পথের পাশে দেখতে পাবে সমৃদ্ধ গ্রাম—থোলং, তোজিং, লোটে ও থিরোট গ্রাম। আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে পথটি পৌঁছেছে কিরতিং—একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। নির্মাণ বিভাগের চমৎকার বিশ্রামভবন আছে সেখানে। কিরতিং তাণ্ডি থেকে ৮ মাইল। উচ্চতা ৯৮০০ ফুটের মতো। চন্দ্রভাগার ওপারে বড় গ্রাম শানশা। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে সেখানে। ঐ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে লাহুলের সর্বত্র।

---

* Census of India, Village Monographs–Vol. XIII, Part VI–I.

কিরতিং থেকে থিরোট ১০ মাইল। পথে পড়ে ফুরা, জালমা ও জনড়া গ্রাম। জালমাতে একটি হাইস্কুল আছে। সেটি চন্দ্রভাগা উপত্যকার বৃহত্তম বিদ্যালয়। জালমাতে বনবিশ্রাম গৃহ আছে। থিরোট থেকে উদয়পূর ১০মাইল। উদয়পুরের পথে তুমি আর একটি পরিচিত বস্তু দেখতে পাবে মানসী—পাইন গাছ। লাহুলের আর কোথাও তুমি পাইন বন পাবে না। এই রাস্তাটিও প্রশস্ত করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বাস চলবে (এখন চলছে। এখন মানালী থেকে বাসে চড়েই উদয়পুর যাওয়া যায়)।

থিরোট একটি নয়, দুটি গ্রাম। একটি লাহুলে আর একটি চাম্বায়। উভয়ের দূরত্ব সিকি মাইলের মতো। লাহুলের থিরোট একটি গণ্ডগ্রাম। কয়েক ঘর মানুষ, গুটিতিনেক দোকান আর একটি বনবিশ্রাম গৃহ নিয়ে সেই গ্রাম। আর চাম্বার থিরোট সমৃদ্ধ জনপদ। সেখানে বাজার, ধর্মশালা, বনবিশ্রাম গৃহ ও নির্মাণ বিভাগের বিশ্রামভবন আছে। থিরোট থেকে ত্রিকলোকনাথ ৬ মাইল।

চন্দ্রভাগা ও মিয়ার নালার সঙ্গমে উদয়পুর একটি রমণীয় গ্রাম। উপত্যকাটি ওখানে বেশ প্রশস্ত। তার চারিদিকে তুষারাবৃত শৈলশিখর। সেখানেও একটি চমৎকার বিশ্রামভবন আছে।*

ত্রিলোকনাথ লাহুল-হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই পুণ্যতীর্থের কথা সেবারে আমি তোমাকে বলেছি। তবু সংক্ষেপে আবার তোমাকে ত্রিলোকনাথের কথা কিছু বলে নিতে চাই। নইলে আমার এ চিঠি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ত্রিলোকনাথ হলেন ত্রিলোকের তথা তিন ভুবনের অধীশ্বর। চন্দ্রভাগা উপত্যকা এবং মধ্য হিমালয়ের দক্ষিণে বিপাশার উচ্চ উপত্যকায় ত্রিলোকনাথ বলতে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে বুঝায়। কিন্তু বিপাশার নিম্ন উপত্যকায় ত্রিলোকনাথ হলন শিব। সেখানকার মানুষরা শিবলিঙ্গ কিংবা একটি পঞ্চমুখী মূর্তিকে ত্রিলোকনাথ বলে পূজা করে থাকেন। এই মূর্তির সঙ্গে অবলোকিতেশ্বর মূর্তির সাদৃশ্য রয়েছে। মাণ্ডি, কালাত, রেলয়ালসার ও ত্রিলোকপুরে ত্রিলোকনাথের মন্দির আছে।

কিন্তু আমি তোমাকে যে ত্রিলোকনাথের কথা বলতে চাইছি, সেই গিরিতীর্থ ত্রিলোকনাথ মন্দির চাম্বা-লাহুলের তাণ্ডে গ্রামে (৯,৫৬৬´) অবস্থিত। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে সেখানকার বিগ্রহ শিবমূর্তি। কিন্তু লামারা সেই মূর্তিকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বলে গ্রহণ করেছেন। আর তাই মন্দিরের পুরোহিত বৌদ্ধ।

এই তীর্থের তিব্বতী নাম রেপাগ্‌স (Repags)। তিব্বতীরা ত্রিলোকনাথকে বলেন পাগ্‌সপা (Pagspa) অথবা স্প্যান-রাস-জিগ্‌স (Chan-re-zig) অর্থাৎ পরম-মহীয়ান বা সর্বদ্রষ্টা। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের স্রষ্টা, ত্রাণকর্তা এবং শাসক। তিনি করুণাময়।দালাই লামারা নিজেদের সেই সর্বশক্তিমান ত্রিলোকনাথের অবতার বলে দাবী করে থাকেন! কাজেই বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের পর থেকে ত্রিলোকনাথ হচ্ছেন বুদ্ধদেবের প্রতিভূস্বরূপ। সংক্ষেপে ত্রিলোকনাথ বিধাতার প্রতিনিধি।

---

* মিয়ার নালার তীরে তীরে সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ দিয়ে দুর্গম মেন্‌থোসা শৃঙ্গের (২১,১৪০´) পাদদেশে পৌঁছতে হয়। পথে পড়বে চিরমাট, কারপাট, চিংলেট ও উরগাস গ্রাম। ১৯৭৬ সালে কলকাতার এক পর্বতারোহী সংস্থা এই শৃঙ্গারোহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। দলের ডাক্তার আশিস আচার্য আমাকে লাহুল সম্পর্কে বহু নতুন খবর দিয়েছে। তাকে ধন্যবাদ।

যাক্ গে, এবারে তোমাকে গিরিতীর্থ ত্রিলোকনাথ মন্দিরের কথা বলছি। প্রায় সাড়ে ছ'শ বছর আগে নির্মিত হয়েছে ত্রিলোকনাথ মন্দির। তাণ্ডে গ্রামের প্রান্তে তুষারাবৃত গিরিশ্রেণীর পাদদেশে কাঠের মন্দির। দারুশিল্পের এক অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন।

তুমি তো জানো মানসী যে মানালীর হিড়িম্বা মন্দির ও ত্রিলোকনাথ মন্দির একই শিল্পী নির্মাণ করেছেন। মানালীর রাজার আদেশে শিল্পী তৈরি করলেন হিড়িম্বা মন্দির। রাজা মুগ্ধ হলেন কিন্তু চাইলেন না যে অন্য কোনো রাজা আর তেমন সুন্দর মন্দির নির্মাণ করতে পারেন। তাই তিনি শিল্পীর ডান হাত কেটে দিলেন। শিল্পী পালিয়ে গেলেন মানালী থেকে। অকৃতজ্ঞ রাজাকে জব্দ করবার জন্য তিনি বাঁ হাতেই খোদাই কাজ অভ্যেস করা শুরু করলেন। আপন অধ্যবয়সায়ে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বাঁ হাতে তেমনি কাজ করতে সক্ষম হলেন। নির্মাণ করলেন ত্রিলোকনাথ মন্দির। আজও তা দর্শনার্থীদের পরম বিস্ময়। রাজশক্তি পরাজিত হল, শিল্পীর সাধনাই হল জয়যুক্ত।

ত্রিলোকনাথ মন্দিরের চারিদিকে দড়ির সঙ্গে অসংখ্য প্রার্থনা পতাকা ঝুলছে। তিব্বতী ভাষায় বুদ্ধের বাণী লেখা রয়েছে বহু পতাকায়। ধর্মনির্বিশেষে প্রতি তীর্থযাত্রীকে একটি করে পতাকা ঝুলিয়ে দিতে হয়।

মন্দিরের পাশে রয়েছে একটি প্রস্তরস্তূপ। তীর্থযাত্রীরা প্রত্যেকে একখানি পাথরে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' কথাটি লিখে ঐ স্তূপের ওপর রেখে দেন। এ পথের পাশেও তুমি মাঝে মাঝে এমনি স্তূপ দেখতে পাবে মানসী!

কাঠের মন্দির কিন্তু স্লেট পাথরের টালির চাল। মন্দিরশীর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের যুক্ত প্রতীক। নাটমন্দিরের ভেতর দিয়ে গর্ভমন্দির ঢুকতে-হয়। বেশ বড় মন্দির তবে নীচু এবং অন্ধকার। তাই সর্বদা মাখনের প্রদীপ জ্বলে। দেয়ালে অপরূপ দারুশিল্প এবং রেশমী কাপড়ের ওপর রঙ্গীন চিত্রকলা।

গর্ভমন্দিরে রয়েছেন ত্রিলোকনাথ—শ্বেত পাথরের ত্রি-নয়ন মূর্তি। প্রথম দর্শনে বুদ্ধমূর্তি বলে মনে হয়। পরে জটার দিকে নজর পড়লে শিবমূর্তি বলে বোঝা যায়।

মন্দিরের পুরোহিত বৌদ্ধ। তিনি দর্শনার্থীদের হাতে রেশমী সুতো বেঁধে দেন। শুনেছি এই মন্দিরে ভেড়া বলির রেওয়াজ আছে। এবং বৌদ্ধ পুরোহিত তার তদারকি করে থাকেন।

তাণ্ডে একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামবাসীরা বড়ই দরিদ্র। তোমাকে আগেই বলেছি এই গ্রামের উচ্চতা ৯৫৬৬ ফুট। কিন্তু দরিদ্র গ্রামবাসরা শীতকালেও এখানেই থাকেন। ঠাকুর দুনিচাঁদ এই গ্রামের জমিদার। বলা বাহুল্য তিনি গোন্ধলার ঠাকুরদের জ্ঞাতি। শুনে অবাক হবে মানসী, তাঁর ছেলে ইন্দো-ব্রিটিশ পর্বতাভিযানের সময় কুলির কাজ করেছে।

দোকানপাট লোকালয় আর মন্দির নিয়ে গ্রাম। সংস্কারের অভাবে ধর্মশালাটি ভেঙ্গে গেছে। তবে ইচ্ছে করলে তুমি ত্রিলোকনাথে রাত্রিবাস করতে পারবে মানসী! একটি রাতের জন্য আশ্রয়ের অভাব হবে না সেখানে।

প্রতি শ্রাবণী-পূর্ণিমায় মেলা বসে মন্দিরচত্বরে। দু'দিন ধরে এই মেলা হয়। ধর্মকেন্দ্রিক হলেও বেশ ভাল কেনা-কাটা হয় সে মেলায়। লাহুল-স্পিতি চাম্বা কুলু ও লাদাখ থেকে পুণ্যার্থীরা মেলায় যোগদান করেন। আগে বহু তিব্বতী তীর্থযাত্রীও আসতেন। এখন সে আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আর তাই দরিদ্র গ্রামবাসীরা দরিদ্রতর হয়ে পড়েছেন। দারিদ্র্য শুধু আর্থিক নয়। এই আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবার ফলে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও আমরা, দু' দেশের মানুষরা, দিন দিন দরিদ্র হয়ে পড়ছি। জানি না এ দারিদ্র্য কবে ঘুচবে?

ত্রিলোকনাথ থেকে উদয়পুর হয়ে যাওয়া যায় কিলার। সেখান থেকে চাম্বা ও জম্মুর বাস পাবে তুমি। কাজেই একই যাত্রায় লাহুল ও চাম্বা কিংবা লাহুল ও কাশ্মীর উপত্যকা দর্শন করা কষ্টকর নয়।

এক যাত্রায় ত্রিলোকনাথ এবং মণিমহেশ (১৩,৫০০´) দর্শন করাও মোটেই অসম্ভব নয় মানসী! চোবিয়া (১৬,৪৪০´) অথবা কুগতি (১৬,৩০০´) গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে এই পথ। তোমার নিশ্চয়ই প্রাণেশকে মনে আছে। মানাশৃঙ্গ (২৩,৮৬০´) বিজয়ী প্রখ্যাত পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তী। সে বিগত ইন্দোব্রিটিশ পর্বতাভিযানের অংশ নিয়েছিল। তাঁরা এই তান্ডি হয়েই গিয়েছিলেন থিরোট। সেখান থেকে উদয়পুর। আরোহণ করেছিলেন চাম্বা-লাহুলের দুটি বিখ্যাত শৃঙ্গ ডুফাও জোত (২০,০১১´) ও বাইহিলি জোত (২০,৬০২´)। ফেরার পথে ওঁরা উদয়পুর থেকে ত্রিলোকনাথ চলে যান। সেখান থেকে চোবিয়া গিরিপথ অতিক্রম করে ভারমৌর পৌঁছান। তুমি তো জান মানসী, ভারমৌর থেকে মণিমহেশ হাঁটাপথে মাত্র ২১ মাইল।

ইন্দো-ব্রিটিশ অভিযাত্রীরা কিন্তু মণিমহেশ যান নি। তাঁরা ভারমৌর থেকে চাম্বা হয়ে দিল্লী ফিরে গিয়েছেন। তাহলেও তাঁরা ত্রিলোকনাথ থেকে চোবিয়া পেরিয়ে পৌঁছেছিলেন ভারমৌর। সেই কথাই বলছি তোমাকে।

ত্রিলোকনাথ থেকে ভারমৌর পৌঁছতে ওঁদের মাত্র তিন দিন লেগেছে। প্রথম দিন দুপুরে ত্রিলোকনাথ থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যের আগে তাঁরা গিরিবর্ত্মের ঠিক নিচে পৌঁছেছেন। সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটিয়েছেন। পরদিন ভোর ছ'টায় রওনা হয়ে তুষারাবৃত দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছেন। সারাদিন শ্রান্তিহীন পদচারণার পরে সন্ধ্যার সময় পৌঁছেছেন গিরিপথের পরপারে—চোবিয়া গ্রামে। গ্রামের স্কুলে রাত্রিবাস করেছেন। তৃতীয় দিনে আট মাইল উৎরাই ভেঙ্গে দুপুরের পরে পৌঁছেছেন ভারমৌর। চাম্বা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মন্দিরময় ভারমৌর। কিন্তু তার কথা এখন নয়। তার চেয়ে বরং তোমাকে ইন্দো-ব্রিটিশ পর্বতাভিযান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি।

ইন্দো-ব্রিটিশ অভিযানের আয়োজন করেছিলেন ভারতের মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান এবং বিলেতের আউটওয়ার্ড বাউন্ড স্কুল। এই যৌথ অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন মেজর এইচ. ভি. বহুগুণা। দলের অন্যান্য অভিযাত্রীরা হলেন—সর্বশ্রী ডেভিড এইচ. চ্যালিস (সহ-নেতা), র‍্যানডাল উইলিয়াম্স, মার্টিন সিঙ্কার, এ্যালান জে. স্মিথ, নিক্ এ্যালেন, আর. এস.প্রভু, ডি. কে খুলার, এ. এল. শর্মা এবং প্রাণেশ চক্রবর্তী।

এবারে তোমাকে কুগতি গিরিবর্ত্মের কথা বলছি। তুমি তো জান মানসী, মণিমহেশ দর্শন করে ঐ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে আমরা লাহুলে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুষারপাত এবং মালবাহকের অভাবে আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নি। আমরা মণিমহেশ থেকে ফিরে গিয়েছি চাম্বা। সেখান থেকে পাঠানকোট ও মানলী ঘুরে এসেছি লাহুলে।

আমরা পারি নি, কিন্তু পেরেছেন, চারজন বাঙ্গালী অভিযাত্রী—সর্বশ্রী প্রদীপ্ত চক্রবর্তী, পরেশ সাহা, মহাদেব ঘরুই এবং সুধাংশু ঘোষ। এই প্রসঙ্গে আমার কাছে লেখা সুধাংশুবাবুর একখানি চিঠির কপি আমি পাঠিয়ে দিলাম তোমাকে। আশাকরি চিঠিখানি ভালই লাগবে তোমার।

ত্রিলোকনাথ

প্রিয় শঙ্কুবাবু, ২১শে জুন

আপনার উৎসাহ ও প্রেরণাকে পাথেয় করে অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত গিরিতীর্থ ত্রিলোকনাথ দর্শন হল আজ।

আমরা এসেছি ভারমৌর ও লাহুল উপত্যকার মধ্যবর্তী কুগতি গিরিপথ পেরিয়ে। মণিমহেশ দর্শন করে আমরা ফিরে আসি হাড়সার। সেখান থেকে ৮ মাইল হেঁটে কুগতি গ্রাম। তারপরে কুগতি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পৌঁছলাম লাহুল উপত্যকায়। মনে হল অন্য এক জগতে এলাম। সবুজ উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে চন্দ্রভাগা—আঁকাবাঁকা একটি রুপোলী রেখা। বেলাভূমি থেকে ধাপে ধাপে ক্ষেত উঠে এসে মিশেছে পাহাড়ের পাদদেশে। উপত্যকার শেষে দু'দিকেই তুষারমৌলি পর্বতশ্রেণী—লাহুল-হিমালয়।

চন্দ্রভাগা উপত্যকায় নানা ফসলের সমারোহ। আর তারই মাঝে মাঝে গোলাপী বনফুলের ফোয়ারা। ক্ষেতের শেষে জনপদ—রাপ্পা গ্রাম। দূর থেকে মনে হল, রঙ্গীন চলচ্চিত্রে দেখা সুইজারল্যান্ডের কোন গ্রাম্য জনপদ। কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, লাহুলের মানুষদেরও বড় ভাল লাগছে। তাদের আচার-ব্যবহার, বেশ ভূষা ও ভাষা মুগ্ধ করেছে আমাদের।

রাপ্পা থেকে ত্রিলোকনাথ ২০ মাইলের মত। চন্দ্রভাগার বাঁ-তীর দিয়ে পথ। পথটি এসেছে খোকসার থেকে, গিয়েছে পাঙ্গী জেলার সদর কিলার পর্যন্ত। এই পথে থিরোট পর্যন্ত জীপ চলে। থিরোটে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা রওনা হলাম ত্রিলোকনাথের পথে। বড়রাস্তা ধরে ৩ মাইল এগিয়ে নেমে এলাম চন্দ্রভাগার তীরে। নদী পার হয়ে ধরলাম পাকদণ্ডীর পথ। তিনমাইল চড়াই ভেঙ্গে বিকেলে এসে পৌঁছেছি ত্রিলোকনাথ।

পাহাড়ে ঘেরা ছোট একটি উপত্যকা। অনেকখানি প্রায় সমতল প্রান্তর। প্রান্তরের এক প্রান্তে পাহাড়ের পাদদেশে মন্দির। মনোরম পরিবেশ। মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম—সুপ্রাচীন গ্রাম, প্রায় শ'খানেক ঘর। আছে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও কয়েকটি খাবারের দোকান। প্রায় প্রত্যেক দোকানেই মদ পাওয়া যায়। এবং সবাই মদ খায়। এমন স্বর্গীয় পরিবেশে বাস করেও, মানুষ কেন এত পানাসক্ত হল, বুঝতে পারছি না। তা সত্ত্বেও বলব, এখানকার মানুষরা আচার-ব্যবহারে ও আতিথেয়তায় আমাদের থেকে অনেক উন্নত।

কাল সকালে আমরা বিদায় নেব ত্রিলোকনাথজীর কাছ থেকে। সেই সঙ্গে শুরু হবে ফেরার পালা। আশা করি কুশলেই আছেন। আমরা সবাই ভাল। শুভেচ্ছান্তে

বিনীত
সুধাংশু ঘোষ

হর্নের শব্দে চমকে উঠি। অতীতের চিন্তা মিলিয়ে যায়, ফিরে আসি বর্তমানে। আমরা খোকসার থেকে কেলং যাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে জীপ এসে থেমেছে তাণ্ডি। চন্দ্রা ও ভাগা নদীর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে অমি ভাবছিলাম গুরুঘাঁতাল, ত্রিলোকনাথ ও মণিমহেশের কথা। ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে জানিয়ে দিল—এবারে আমাদের যাত্রা হবে শুরু।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসি গাড়িতে। একটু বাদে জীপ চলতে শুরু করে। তাণ্ডি পড়ে থাকে পেছনে, আমরা এগিয়ে চলি সামনে। ভাগার তীর দিয়ে কেলংয়ের পথে। তাণ্ডি

থেকে কেলং ৪ মাইল।

ভাগার বাঁ-তীর দিয়ে পথ। চলেছি উত্তর-পূর্ব দিকে। উপত্যকাটি অপেক্ষাকৃত উর্বর। তুলনায় গাছপালা বেশি। এই পরিবর্তনটুকু ভালই লাগছে।

বাঁ-তীর দিয়ে কিন্তু বেশীদূর এগোতে হল না। একটি পুল পেরিয়ে আমরা ভাগার অপর পারে এলাম। তবে এগিয়ে চললাম একই দিকে। তাণ্ডি থেকে মাইল খানেক এসে একটি লোকালয়—বিলিং গ্রাম। এখানকার গুম্ফাটি বিখ্যাত। শুনেছি সেখানে সোনার পাতে মোড়া একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আছে। ছোট মূর্তি, মাত্র ইঞ্চি তিনেক লম্বা। কিন্তু তাঁর মুখে এমন জ্ঞানময় ও আশাবাদী হাসির ব্যঞ্জনা যে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

পথ তেমনি ধুলিময়। তার ওপর উঁচুনিচু। দুলতে দুলতে জীপ চলেছে। আর চলতে চলতে ধূলার ঝড় তুলছে। তুলবেই তো। ও যে আর চাইছে না চলতে। তবু স্বার্থপর মানুষ তাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে চালিয়ে। ধুলো ছড়িয়ে সে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

অমসৃণ হলেও সুপ্রাচীন এ পথ। ইতিহাসের ঊষাকাল থেকে এই পথেই লাহুলের মানুষ যাওয়া-আসা করেছে আর তিব্বত ও লাদাখের মানুষ এসেছে লাহুলে। তাহলেও এ পথ ভাবীকালের পথ নয়। ওপর দিয়ে নতুন পথ তৈরি হচ্ছে জিস্পা পর্যন্ত। অদূর ভবিষ্যতে সেই পথে বাস চলবে মানালী থেকে। তুমি যখন লাহুলে আসবে মানসী, তখন সেই নতুন পথে চলে যাবে কেলং। তোমার মনেও পড়বে না এই পুরনো পথের কথা। কেবল তুমি কেন, লাহুলের মানুষও ভুলে যাবে এই পথ। তাই যে নিয়ম, নূতন এসে পুরাতনকে ভুলিয়ে দেয়।

পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের জীপ নেমে এলো অনেকটা নিচে—একেবারে একটি পাহাড়ী নদীর তীরে। বাঁ-দিকের পাহাড় থেকে নদীটি নেমে এসে ডান দিকের ভাগা নদীতে মিশেছে। পাহাড়ী নদী পেরিয়ে যেতে হবে আমাদের।

পুলটি তেমন মজবুত নয় বলে ড্রাইভারের নির্দেশে গাড়ি থেকে নামতে হল সবাইকে। আমরা পায়ে হেঁটে পুল পেরিয়ে এলাম। ড্রাইভার খালি গাড়ি পার করে নিয়ে এলো। আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চলল এগিয়ে।

বাঁকটা ঘুরতেই আমাদের দৃষ্টি মুক্ত হল। সামনে সুন্দর সুবিস্তৃত এক মনোরম উপত্যকা—কেলং। ডানদিকে পথের পাশে বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, স্কুল ও অফিস। বাড়িগুলির অধিকাংশই তিনতলা। নিচের তলায় থাকে গৃহপালিত জন্তু—গরু, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়া প্রভৃতি। দু'তলায় থাকে ফসল, জ্বালানী এবং গৃহপালিত জন্তুর খাদ্য। শীতকালে লাহুলে সর্বত্র প্রবল তুষারপাত হয়। তখন কিছুই পাওয়া যায় না এখানে। তাই শরৎকালে লাহুলের মানুষ সাধ্যমত রসদ সংগ্রহ করে রাখে। বাড়ির তিনতলা হচ্ছে বাসগৃহ। আর ছাদ হল উঠোন। ফসল মাড়াই, ঘাস শুকানো প্রভৃতি যাবতীয় কাজের জন্য ছাদ। প্রত্যেক ছাদে একটি করে গর্ত থাকে। সেই গর্ত দিয়ে ফসল ও ঘাস নিচের তলায় চালান করে দেওয়া হয়।

সোজা ছাদযুক্ত এইরকম বাড়ি তুমি হিমালয়ে বড় একটা পাবে না মানসী! পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে বাড়ি তৈরি করে এরা। দেওয়াল তৈরি করতে সিমেন্ট বা অন্য কোন মসলা ব্যবহার করে না। কেবল মাটি দিয়ে দেওয়ালের দু'দিক লেপে দেয় অর্থাৎ আস্তর করে। পাথরের টালি বসিয়ে ছাদ তৈরি করে—সোজা ছাদ। অবশ্য শীতকালে প্রতিদিন ছাদের বরফ পরিস্কার করে ফেলতে হয়। নইলে বরফের ভারে ছাদ ধসে পড়বে। লাহুলীদের

এ ধরনের বাড়ি তৈরি করতে শিখিয়েছেন মোরেভিয়ান মিশনারীরা। তাঁরা এদের অনেক কিছুই শিখিয়েছেন, যেমন—লেখাপড়া, চাষাবাদ, উল বোনা ও তাঁতের কাজ। তবু লাহুলের মানুষ নিজেদের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন নি। এতে কিন্তু মোরেভিয়ান মিশনারীরা মোটেই ক্ষুণ্ণ হন নি। বরং তাঁরা স্বার্থহীন সেবার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে যীশু প্রকৃতই প্রেমাবতার।

কিন্তু মোরেভিয়ান মিশনারীদের কথা তোমাকে আমি পরে বলব মানসী! এখন কেলংয়ের কথা বলে নিই। আমরা কেলং শহরে প্রবেশ করেছি। শহরের প্রধান পথ দিয়ে চলেছে আমাদের জীপ। এই পথটির নাম বিপ্লবী রাসবিহারী বসু মার্গ। বিপ্লবী রাসবিহারী ১৯১২-১৩ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমাবর্ষণের পরে এখানে এসে কয়েক মাস লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর মহান স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখবার জন্য তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালে তাঁর নামে এই রাস্তার নাম রেখেছেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় এখানে রাসবিহারী বসুর আবক্ষ মূর্তি এবং রবীন্দ্রনাথের নামে 'টেগোর মেমোরিয়াল লাইব্রেরী' ও ইনফর্মেশন সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই গ্রন্থাগারে লাহুল-স্পিতি, তিব্বত ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রনাথ, সরস্বতী ও বৌদ্ধদের জ্ঞানদেবী মঞ্জুশ্রীর তিনখানি অপরূপ চিত্র আছে। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পথের বাঁ-দিকে পাহাড়—তেমন খাড়া নয়। পাহাড়ের গায়েও বাড়ি-ঘর রয়েছে। ভাগা এখানে অনেক নিচু দিয়ে মোটামুটি সমতলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। তার তীরে ক্ষেত-খামার। সামনে উপত্যকার প্রান্তে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী।

ভাগার ওপারেও একটি সমৃদ্ধ জনপদ দেখতে পাচ্ছি। জনৈক সহযাত্রী জানান—কারদাং।

উৎসাহিত হয়ে আমরা সেদিকে তাকাই। লাহুলের প্রাচীন রাজধানী কারদাং। ব্রিটিশ অধিকারের আগে অর্থাৎ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কারদাং লাহুলের রাজধানী ছিল। লাহুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আজ আর তার কোন প্রভাব অবশিষ্ট নেই। তবু তাকে মানুষ একেবারে যায় নি ভুলে। আজও পর্যটকরা কয়েক ঘন্টা কারদাংয়ে কাটিয়ে আসেন। কারণ কারদাং গুম্ফা লাহুলের অবশ্য-দর্শনীয় বস্তুসমূহের অন্যতম।

গুহা সদৃশ এই গুম্ফার অভ্যন্তর অনেকটা দুন্দুভির মতো। ভেতরের দেওয়ালে সাদা রং। তবু অন্ধকার। কারণ একটিমাত্র দরজা। অপরিচিত দর্শনার্থীর পক্ষে চলা-ফেরা করা কষ্টকর। তাই লামারা তাঁদের পথ দেখিয়ে দেন।

বৌদ্ধ শিল্পীদের হাতে আঁকা প্রাচীন ছবি, নানা ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র রক্ষিত আছে সেখানে। আছে বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যদের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। আর আছে একটি গ্রন্থাগার। ভোটিয়াভাষায় রচিত বহু মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি আছে সেই গ্রন্থাগারে।

গুম্ফায় লামা ঐসব পুঁথি থেকে ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলী ছেপে, সেই পুস্তক গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলি করেন। কাঠের হরফের সাহায্যে তিনি নিজ হাতে এই ছাপার কাজটি করে থাকেন।

রাজানুগ্রহে কারদাং একদিন লাহুলের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছিল। আবার রাজ অবজ্ঞায় আজ সে একটি অবহেলিত গণ্ডগ্রামে রূপান্তরিত। এই রূপান্তর সভ্যতার বিধান আর ইতিহাসের উপাদান।

॥ সাত ॥

বেলা সাড়ে দশটার সময় আমরা কেলং পৌঁছলাম মানসী ! আগের চিঠিতে কারদায়ের কথা লিখতে গিয়ে আর কেলং পৌঁছবার কথা লেখা হয়ে ওঠে নি। লেখবার তেমন কিছু নেইও অবশ্যি। তাহলেও লিখছি। নইলে তুমি হয়তো আবার অভিমান করে বসে রইবে।

অপেক্ষাকৃত ঘন জনপদের ভেতর দিয়ে জীপ চলল এগিয়ে। ডেপুটি কমিশনারের অফিস আর নির্মাণ বিভাগের দপ্তর ছাড়িয়ে এলাম আমরা।

নির্মাণ বিভাগের অফিসটি লাহুলের সবচেয়ে কর্মবহুল দপ্তর। লাহুল-স্পিতির উন্নয়ন-যজ্ঞের যজ্ঞশালা এটি।

সেই অফিসের পাশেই নবনির্মিত ট্যুরিস্ট বাংলো। এখানেই রাত্রিবাস করতে হবে আমাদের। কিন্তু বাংলোর সামনে জীপ থামলো না। থামলেও নামা সম্ভব ছিল না। আমাদের মালপত্রের ওপর যাত্রীরা বসে রয়েছেন।

অবশেষে লোকলয় ছাড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে একফালি সমতল প্রান্তরে এসে থামল আমাদের জীপ। নেমে এলাম গাড়ি থেকে। ২৮মাইল পথ আসতে তিন ঘন্টা লেগেছে।

কুলি যোগাড় করে ট্যুরিস্ট বাংলোয় আসা গেল। এখানে নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম-ভবনও আছে। শুনেছি তারই সামনে বিপ্লবী রাসবিহারীর আবক্ষমূর্তি। দর্শন করতে যেতে হবে। বাসস্থান হিসেবে নাকি এটি তার চেয়ে ভাল। কেবল ভাল নয়, একেবারে নতুন। এ বছরই খোলা হয়েছে। দ্বিতল বাড়ি—বেশ বড় বড় ঘর। সামনে বারান্দা—দাঁড়ালে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা দেখা যায়। একেবারে সামনে—খুবই কাছে। মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। ভুলে যাই যে ওরাও তোমারই মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আর তাই বোধ হয় ওদের প্রতি আমার এমন দুর্নিবার আকর্ষণ।

চৌকিদার কিন্তু নিরাশ করে। ঘর খুলে দেয় না আমাদের। বলে, "কম্‌শনার সাবের কাছ থেকে পারমিট নিয়ে আসুন। বেগর-পারমিট ঘর দিতে পারব না।"

কম্‌শনার মানে লাহুল-স্পিতির ডেপুটি কমিশনার। আসার সময় গাড়ি থেকে তাঁর অফিস দেখে এসেছি। কাছেই অফিস।

চৌকিদারকে বলি, "আপনি যদি দয়া করে আমাদের মালপত্রের দিকে একটু নজর রাখেন, আমরা গিয়ে পারমিট নিয়ে আসতে পারি।"

চৌকিদার একটু হাসে। বলে, "মালপত্রের জন্য চিন্তা করবেন না। এখানে রাস্তার ওপর মাল ফেলে রাখলেও কেউ তাতে হাত দেবে না সাব্‌।"

সমতলের মানুষ আমরা। আমরা ভাবতে পারি না, দুর্গম হিমালয়ের মানুষ এখনও কতখানি সৎ রয়েছে। অবশ্য এরাও যে আর বেশিদিন সৎ থাকতে পারবে মনে হয় না। উন্নয়নের প্রয়োজনে হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে পথ তৈরি করা হচ্ছে। সেই পথে সমতলের মানুষ আসছে হিমালয়ে। হিমালয় দর্শন করতে নয়, আসছে রোজগার করতে। তাদের সংস্পর্শে এসে হিমালয়ের মানুষরাও ক্রমে ক্রমে অসৎ হয়ে পড়ছে। এজন্য দুঃখিত হবার কিছু নেই। এটি সভ্যতার অবদান।

সৌভাগ্যের কথা, লাহুলের সঙ্গে সমতলের সম্পর্কটা এখনও সুদৃঢ় হয়েওঠে নি। তাই চৌকিদার অমন করে বলতে পারল কথাটা। অদূর ভবিষ্যতে সমতল ভারতের সঙ্গে লাহুলের দূরত্ব যাবে ঘুচে। সেই সঙ্গে সম্ভবতঃ এমন সৎ মানুষও বিলুপ্ত হবে লাহুল থেকে।

কিন্তু ভবিষ্যতের সে ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই কিছু। তার চেয়ে বরং বর্তমানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্। আমরা বাংলো থেকে নেমে আসি পথে। পথের দু'দিকেই বাড়ি-ঘর, দোকানপাট। একটা চায়ের দোকানে এসে ঢুকি। ঢুকেই নজরে পড়ে ওদের দিকে। প্রায় চীৎকার করে উঠি, "নমস্কার। ভাল আছেন ?"

তাঁরাও নমস্কার করেন আমাদের—মিস মালিনী এবং তাঁর সহযাত্রীরা। কেলং ছোট শহর, কাজেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে জানতাম। কিন্তু প্রথম পথে নেমেই দেখা হবে, একথা জানা ছিল না। বড় ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে যেন বহুকালের পরিচয় আর বহুদিন বাদে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ওঁদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তাই ওঁরাই উঠে এলেন আমাদের কাছে। কুশল বিনিময়ের পরে মিস মালিনী সুজয়াকে জিজ্ঞেস করেন, "কাল রাতে খোকসারে আপনাদের কোনো কষ্ট হয় নি তো ?"

"না।" সুজয়া উত্তর দেয়।

"চৌকিদার নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল করে নি ?"

"না। লোকটি খুবই ভাল।"

"ভাল !" মিস যেন বিস্মিতা। একটু হেসে বলেন, "ভাল না মোটেই, অত্যন্ত বাজে লোক।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো খুবই ভাল ব্যবহার করেছে।"

"করেছে প্রাণের দায়ে, চাকরির মায়ায়।" মিস বলেন, "আমি যে বলে এসেছিলাম, আপনাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করলে আমি ডি. সি.-কে বলে ওর চাকরি খতম করে দেব।"

"তাই বলুন !" অসিত গম্ভীর স্বরে বলে, "তাই লোকটা আমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় নি আর শেষরাতে উঠে গাড়িতে জায়গা রেখেছে।"

"রাখতেই হবে। নইলে যে বিপদে পড়ত, চাকরি চলে যেত।" মিস আপন কৃতিত্বে গর্ববোধ করছেন—আনন্দলাভ করছেন। আমরাও আনন্দ লাভ করছি,

তাই চুপ করে আছি।

একটু বাদে তিনি আবার বলেন, "কোথায় উঠেছেন ?"

"টুরিস্ট্-বাংলোয়। মালপত্র রেখে এসেছি কিন্তু এখনও ঘর পাই নি।" সুজয়া জানায়।

"পেয়ে যাবেন। চৌকিদার গোলমাল করলে আমার কথা বলবেন। বলবেন, ঘর না দিলে আমি ডি. সি.-কে রিপোর্ট করে দেব।"

চুপ করে থাকি। কারণ কথা বলতে গেলে হয়তো বা হেসে ফেলব।

আমাদের নির্বাক দেখে মিস আবার বলেন, "আচ্ছা, আমরা এখন চলি। আবার দেখা হবে।"

"আপনারা কোথায় উঠেছেন, ডি. সি.-র কোয়ার্টার্সে ?" সুজয়া সহসা প্রশ্ন করে।

মিস্ থমকে দাঁড়ান। একটা ঢোক গিলে জবাব দেন, "না। আমরা রয়েছি নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলোতে। বেড়াতে এসে কারও বাড়িতে থাকাটা বড়ই অসুবিধের।"

"তা তো বটেই।" আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি।

কিন্তু সুজয়া ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সে আবার জিজ্ঞেস করে, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ? ডি সি.-র সঙ্গেই খাচ্ছেন বোধ হয় ?"

"না।" মিস বলেন। "সে অবশ্যি বলেছিল, কিন্তু আমরা রাজী হই নি। আমরা এই হোটেলেই খাচ্ছি।" সুজয়াকে আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দেন না মিস মালিনী। তিনি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "আচ্ছা, এবারে যাচ্ছি। আবার দেখা যবে।" মিস সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যান দোকান থেকে। একটু বাদে আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠি। কিন্তু তারপরেই খেয়াল হয়, দোকানের খদ্দের ও কর্মচারীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তাড়াতাড়ি গম্ভীর হয়ে চা ও খাবারের ফরমাশ দিই।

এখানে জিনিসপত্রের দাম দেখছি বেশ চড়া। পাওয়াও যায় না তেমন কিছু। পকোরা ও বিস্কুট ছাড়া আর কোনো জলখাবার নেই। তাই খেয়েই খিদে মেটাতে হল। অনেকগুলি পয়সা খরচ হয়ে গেল—নেতা সবিশেষ বিচলিত। কেনই বা হবে না, তিন পয়সার বিস্কুট দশ পয়সা করে কিনতে হল যে।

দোকানী জানায়, এটি কেবল রেস্তোরাঁ নয়, হোটেলও বটে—ভাল হোটেল। এমন ভাল রান্না নাকি লাহুলের আর কোথাও পাবো না। দু'টাকায় পেট-ভরা ডাল-ভাত ও এক প্লেট মাংস পাওয়া যবে।

সব শুনে নেতা দুপুরের খাবার অর্ডার দিয়ে দেয়। বলা তো যায় না, নইলে হযতো খিদের সময় এসে খাবার পাওয়া যাবে না, ভাল হোটেল কিনা।

আমরা পথে বেরিয়ে আসি—কেলংয়ের পথে। পথের পাশে বাড়ি-ঘর, মাঝে মাঝে দোকান। মুদি-মনোহারী ও চায়ের দোকান। বাড়ি-ঘরের ফাঁকে ফাঁকে শাক-শব্জির ছোট ছোট বাগান। এখানকার মাটি ভাল বলেই কি নাগরিকদের এই কৃষিপ্রীতি, না এটি সরকারের 'অধিক ফলাও' আন্দোলনের পরিণতি, বলতে পারি না। তবে বাগানগুলি দেখতে বড় ভাল লাগছে। অনেকদিন এমন বাগান দেখি না যে।

নির্মাণ বিভাগের অফিসের সামনে এলাম। চমৎকার রোদ উঠেছে। শীতের দেশ। তাই কর্মচারীরা টেবিল-চেয়ার নিয়ে ঘর থেকে অফিসের উঠোনে উঠে এসেছেন—মাঠে অফিস বসিয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গাছতলায় পড়াশুনার ব্যবস্থা করে আশ্রমিক-শিক্ষার পুনঃপ্রচলন করেছিলেন। এঁরাও দেখছি আশ্রমিক-অফিসের প্রচলন করেছেন। কিন্তু এই অভিনব ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না। কারণ কর্মীরা কাজ না করে আমাদের দেখেছেন।

পথের বাঁদিকে ভাগার তীরে ডেপুটি কমিশনারের অফিস। পথ থেকে আমরা অফিস-প্রাঙ্গণে নেমে এলাম। বেশ বড় একটি দোতলা বাড়ি—টিনের চাল ও পাথরের দেওয়াল। ওপরে জাতীয় পতাকা উড়ছে। এই উড্ডীয়মান পতাকা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে সেই বহুদূরের শ্যামল-কোমল বঙ্গভূমি আর এই ধূসর কঠিন লাহুল উপত্যকা একই দেশ—আমাদের দেশ। ঐ চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আমার এই বিশাল দেশকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে—আমি তাকে প্রণাম করি।

আমরা দোতলায় উঠে এলাম। বেয়ারা সিঁড়ির গোড়া থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো দর্শনপ্রার্থীদের বসবার জায়গায়। আর এখানে আবার দেখা হয়ে গেল তাঁদের সঙ্গে। মিস মালিনীও দেখতে পেলেন আমাদের। চীৎকার করে উঠলেন, "আরে আপনারা এখানে! তখন তো বললেন না, এখানে আসবেন!"

বুঝতে পারি, তাঁরাও চায়ের দোকান থেকে সোজা এখানে এসেছেন। কিন্তু কেন? তিনিও কি ডেপুটি কমিশনারের দর্শনপ্রার্থিনী? হলেও বা তিনি এখানে সাধারণজনের মতো

বসে রয়েছেন কেন ? ডেপুটি কমিশনার যে মিস মালিনীর 'বয়ফ্রেন্ড'।

প্রশ্নটা মনের দুয়ারে এসে ভিড় করলেও জিজ্ঞেস করা যাবে না। তাছাড়া মিস মালিনীর প্রশ্নটার আগে উত্তর দেওয়া দরকার। তাই মৃদু হেসে বলি, "কথায় কথায় বলা হয়ে ওঠে নি আর কি।"

আমি থামতেই অসিত বলে, "আমার মনে ছিল, কিন্তু ইচ্ছে করেই বলি নি।"

"কেন ?" মিস বিস্মিতা। সেই সঙ্গে আমরাও। কি বলতে চাইছে নেতা ?

নেতা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, "বলি নি, কারণ আপনি আবার আমাদের হয়ে ডি. সি.-র কাছে সুপারিশ করতে চাইতেন। আমরা আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই নি।"

মিস বিগলিত স্বরে বলেন, "না, না, কষ্টের কি আছে। এটা তো আমার ডিউটি। যাক্ গে, এবারে একটা স্লিপ লিখে দিন, বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে।"

মিস মালিনীর পরামর্শমতো স্লিপ পাঠিয়ে দিই।

এতক্ষণে সুজয়া কথা বলে। মালিনীকে জিজ্ঞেস করে, "তা আপনারা এখানে এভাবে বসে রয়েছেন, আপনাকেও কি স্লিপ দিয়ে ডি. সি.-র সঙ্গে দেখা করতে হয় ?"

"না।" মিস উত্তর দেন, "আমি অনায়াসে ওর চেম্বারে ঢুকে যেতে পারতাম। তবে কি জানেন, নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করা কোনো সময়েই সমীচীন নয়।"

"তা তো বটেই।" অসিত ধুয়া ধরে, "এই নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা না করার জন্যই তো সোনার দেশটা রসাতলে যেতে বসেছে।"

তিনি থামতেই সুজয়া জিজ্ঞেস করে, "আপনারা কতক্ষণ স্লিপ দিয়েছেন ?

"তা...প্রায় আধঘন্টা।" মিস ঘড়ি দেখে উত্তর দেন, "শুনলাম একটু দেরি হবে, ডি. সি. ব্যস্ত আছে।"

"তা তো থাকবেনই, কত বড় দায়িত্ব তাঁর মাথায়।" সুজয়া বলে।

"কেলং আপনাদের কেমন লাগছে ?" মিস প্রশ্ন করেন।

"ভাল।"

"লাগবেই তো। ভারী সুন্দর জায়গা। শহর হলেও শহরের কোলাহল নেই, পঙ্কিলতা নেই। শান্ত-সুন্দর পরিবেশ আর সরল-সুন্দর মানুষ নিয়ে কেলং। তাই কেউ মানালী এলেই তাকে আমি কেলং বেড়িয়ে যেতে বলি।"

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি সেদিন থেকেই। মিস যখন কথা বলেন, তাঁর বন্ধু এবং অন্যান্যরা চুপ করে থাকেন। তবে তাঁরা সকলেই কথাবার্তা শোনেন এবং মাঝে মাঝে নীরবে হেসে আলোচনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। আজ কেন যেন তাঁদের নীরবতা ভাল লাগে না আমার। তাই মালিনীর বয়-ফ্রেন্ড মিঃ দেশাইকে জিজ্ঞেস করি, "কেলং আপনাদের কেমন লাগছে ?"

"ভাল। তবে বড্ড শীত।" ভদ্রলোক উত্তর দেন।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন মিস মালিনী। ডি.সি.-র বেয়ারা ছুটে আসে সামনে। মিস হাসি থামান। বোধ হয় তাঁর মনে পড়ে যায়, এটা তাঁর ড্রয়িংরুম নয়। হাসি থামিয়ে মিস বলেন, "শুনলেন আমার বয়-ফ্রেন্ডের কথাটা, এখানে নাকি বড় শীত।"

ভদ্রলোক লজ্জা পেয়ে চুপ করে আছেন।

সুজয়া তাকে রক্ষা করতে চায়। মালিনীকে বলে, "উনি আমেদাবাদের সাধারণ মানুষ, আপনার মতো মাউন্টেনিয়ার নন। ওনার তো শীত লাগবেই।"

মিস কোনো প্রতিবাদ করেন না। বোধ হয় হাসিটাকে এখনও বাগে আনতে পারেন নি। তাই তিনি মুখ খুলতে সাহসী হচ্ছেন না।

কথাবার্তা চালিয়ে যাবার জন্য সুজয়া মালিনীর বন্ধুপুত্রকে বলে, "তোমরাও কি শীত করছে নাকি ?"

"জী, হাঁ।"

"সে কি !" সুজয়া হেসে বলে, "তোমার তো শীত করা চলবে না, তোমাকে যে আন্টির মতো মাউন্টেনিয়ার হতে হবে।"

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু মেয়েটি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, "মাউন্টেনিয়ারের বুঝি শীত করতে নেই ?"

"না, না।" সুজয়া কিছু বলতে পারার আগেই মিস বলে ওঠেন, "মাউন্টেনিয়ারের আবার শীত কিসের ? শীতবোধ থাকলে মাউন্টেনিয়ার হবে কেমন করে ?" একবার থামেন তিনি। তারপরে বলেন, "এখানকার উচ্চতা কত জান, মাত্র সাড়ে দশ হাজার ফুট। বেসিক ট্রেনিংয়ের সময় আমাদের বেস-ক্যাম্পই হয়েছিল তেরো হাজার ফুটে। বেস-ক্যাম্প জানো তো, যেখানে থেকে পর্বতাভিযান আরম্ভ...."

শেষ করতে পারেন না মিস মালিনী। একখানি স্লিপ হাতে বেয়ারা এই দিকে আসছে। মিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান। বেয়ারা সামনে আসতেই বলে ওঠেন, "বাব্বা, এতক্ষণে তোমার সাহেবের মনে পড়ল।" তিনি স্লিপটা নেবার জন্য বেয়ারার দিকে হাত বাড়ান।

"না, আপনার নয়।" বেয়ারা গম্ভীর স্বরে বলে।

"আমার নয় ?" মিস ক্ষীণকণ্ঠে বলে ওঠেন। তিনি আবার বসে পড়েন।

বেয়ারা আমাদের দিকে স্লিপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "সাব্, আপনাদের সেলাম দিয়েছেন।"

আমরা উঠে দাঁড়াই।

মিস মুহূর্তের মধ্যে সামলে নেন। বলেন, "আপনারা পাবলিক, তার ওপর কলকাতার লোক। তাই ডি. সি. আগে আপনাদের ইন্টারভিউ দিল। যান, ঘুরে আসুন।"

"যাচ্ছি।" সুজয়া বলে, "কিন্তু যেতে ভাল লাগছে না, আপনারা আমাদের আগে এসেছেন।"

"তা হোক গে।" মিস সুজয়াকে সান্ত্বনা দেন, "আপনারা ঘুরে আসুন। আমরা পরে যাব।"

বেয়ারার পেছনে আমরা ডেপুটি কমিশনারের চেম্বারে প্রবেশ করি। কার্পেট-মোড়া বেশ বড় একখানি ঘর। একপাশে বড় টেবিলের সামনে বসে আছেন মিঃ বেন্‌স, লাহুল-স্পিতির বর্তমান ডেপুটি কমিশনার। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ যুবা, মাথায় শিরস্ত্রাণ, মুখে দাড়ি। ভদ্রলোক জাতিতে শিখ।

একটা ফাইল পড়ছিলেন তিনি। আমাদের দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ান। বললেন, "আসুন, আসুন। ভারী খুশী হলাম আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে।"

করমর্দনের পরে বসলেন তিনি। আমরাও আসন গ্রহণ করলাম। মিঃ বেন্‌স জিজ্ঞেস করেন, "বলুন কি করতে পারি আপনাদের জন্য ?"

নেতা আমাদের প্রয়োজন জানায়।

মিঃ বেন্‌স বলেন, "এখুনি পারমিট দিয়ে দিচ্ছি।" তিনি বেল টেপেন। বেয়ারা ঘরে

ঢোকে। আমাদের স্লিপটার পেছনে কি একটু লিখে তিনি সেটা বেয়ারার হাতে দিয়ে বলেন, "বড়বাবুকে এখুনি এই পারমিট দুটো বানিয়ে পাঠিয়ে দিতে বলো, আমি সই করে দিচ্ছি।"

বেয়ারা স্লিপটা হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করছে।

মিঃ বেন্‌স জিজ্ঞেস করেন, "কিছু বলবে ?"

"সাব, মানালীর সেই মেম্‌সাব বাইরে বসে আছেন।"

"আবার কি চাইছেন তিনি ?" মিস বেন্‌স যেন বিরক্ত।

"খোকসার বাংলোর পারমিট।" বেয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর দেয়।

"তা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন, বড়বাবুর কাছে যেতে বলো। রেস্ট-হাউস খালি থাকলে পারমিট পেয়ে যাবেন।" বলতে বলতে তিনি মিস মালিনীর স্লিপটা বেয়ারার হাতে দিয়ে দেন। বেয়ারা দরজার দিকে এগোয়।

মিঃ বেন্‌স আবার বলেন, "চট করে চা ও বিস্কুট নিয়ে আসতে বলো।"

সবিনয়ে বলি, "আমরা একটু আগেই চা খেয়েছি।"

"তাতে কি হয়েছে ?" মিঃ বেন্‌স একবার থামেন। তারপর মৃদু হেসে আবার বলেন, "এ্যানি টাইম ইজ টি টাইম, ইফ ইট ইজ কেলং।"

বেয়ারা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সুজয়া জিজ্ঞেস করে, "মিস মালিনী ও তাঁর সঙ্গীরা কাল চলে যাবেন বুঝি ?"

"কে ? কার কথা বলছেন ?"

মিঃ বেন্‌স বোধ হয় বুঝতে পারেন না। কিন্তু কেন, তিনি কি তাঁর গার্ল-ফ্রেন্ড-কাম-গেস্ট মিস মালিনী প্যাটেলের নাম জানেন না !

সুজয়া বুঝিয়ে দেয় তাঁকে। বলে, "মিস মালিনী প্যাটেল, যাঁর স্লিপটা বেয়ারাকে দিলেন।"

"ও ! মানালীর ঐ যন্ত্রণাদায়িকা।" তিনি যেন আঁতকে ওঠেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে হাসি পায় আমাদের। আমরা হেসে দিই। মিঃ বেন্‌সও যোগ দেন আমাদের সঙ্গে।

একটু বাদে হাসি থামিয়ে তিনি আবার বলেন, "সত্যই তাই।বছর দুয়েক আগে মানালীতে আলাপ হয়েছিল একদিন। সেই সূত্র ধরে তিনি ক্রমাগত জ্বালাতন করে চলেছেন। এখানে এলেই দৈনিক একবার করে দেখা করবেন।"

বেয়ারা চা নিয়ে আসে। চা খেতে খেতে নানা গল্প চলে—লাহুল আর কলকাতার গল্প। বলা বাহুল্য লাহুলের গল্প হিমালয় সম্পর্কে আর কলকাতার গল্প রাজনৈতিক বিষয়ে। বাঙ্গালীর এখন সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে রাজনৈতিক-সচেতন। অথচ দুঃখের কথা, ভারতের অনেক রাজ্যের অধিবাসীরা এই চেতনাকে প্রগতি বলে মেনে নিতে পারছে না। তাই তারা ক্রমেই বাঙ্গালী-বিমুখ হয়ে উঠছে।

মিঃ বেন্‌স কিন্তু বাংলার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও আমাদের যথেষ্ট খাতির করলেন। একটু বাদে বেয়ারা পারমিট এনে তাঁর হাতে দেয়। তিনি সই করে কাগজ দু'খানি নেতাকে দেন। আমরা উঠে দাঁড়াই।

মিঃ বেন্‌সও উঠে দাঁড়ান। তিনি আবার করমর্দন করেন। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন আমাদের। বিদায়বেলায় বলেন, "কোনো অসুবিধে হলেই সোজা চলে আসবেন। পেছনেই আমার কোয়ার্টার্স।"

ফিরে আসি ট্যুরিস্ট্ বাংলোয়।

"সে কি ! আমাদের মাল-পত্র কোথায় গেল ?" সুজয়া বলে ওঠে।

সত্যই তো। এখানেই যে রেখে গিয়েছিলাম। তাহলে কি চুরি-টুরি হয়ে গেল নাকি ? কিন্তু চৌকিদার যে বলল, এখানে রাস্তার ওপরে মাল ফেলে রাখলেও, কেউ তাতে হাত দেয় না। আর সে লোকটাই বা কোথায় গেল ?

"এদিকে আসুন সাব, এই যে এদিকে।"

এবারে দেখতে পাই তাকে—চৌকিদারকে। একটু দূরে একটি খোলা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে কাছে ডাকছে আমাদের।

আমরা তার কাছে আসি। সুজয়া জিজ্ঞেস করে, "আমাদের মাল-পত্র কোথায় ?"

"এই ঘরে রেখে দিয়েছি মেম্‌সাব ! বড়বাবু ফোন করে বলে দিয়েছেন, তাই আমি আগের থেকেই আপনাদের মাল-পত্র গুছিয়ে রেখেছি।"

এ যেন সে চৌকিদার নয়, অন্য কেনো মানুষ। মিঃ বেন্‌স নিশ্চয়ই বড়বাবুকে ফোন করে দিতে বলেছেন, কিন্তু তিনি তো আমাদের কিছুই বলেন নি।

আমরা ঘরে আসি। বেশ বড় ঘর। একখানা নয়, দেড়খানি ঘর—বড় ঘরের সঙ্গে একটি ছোট ঘর। ছোট হলেও সেঘরে অনায়াসে জন দু'য়েক লোক থাকা যায়। ঠিক হল সুজয়ারা সেখানে থাকবে, আমি নেতা ও মাস্টারজী থাকব সামনের বড় ঘরে।

দেওয়াল-আলমারী, জামা-কাপড় রাখার ব্র্যাকেট, ড্রেসিং টেবিল ও দু'খানি খাটিয়া আছে ঘরে। খাটিয়া ওদের দেওয়া হবে। আমরা মাটিতে বিছানা করব। অসুবিধের কিছু নেই। মেঝেতে দড়ির কার্পেট পাতা আছে।

ভাবী পর্বতারোহীর শীত লাগছে বলায় মিস মালিনী হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমাদেরও বেশ শীত-শীত করছে। হয়তো আমরা মাউন্টেনিয়ার নই বলেই। তবে সুজয়ারও নাকি শীত করছে। অবাক কাণ্ড। মিস মালিনীর থিয়োরী অনুযায়ী তার তো শীত করা উচিত নয়। কারণ সে সত্যই ট্রেনড্ মাউন্টেনিয়ার।

তাহলেও তার শীত লাগছে। আর তাই সে স্নান না করে আমাদের মতো মুখ হাত ধুয়েই পথে নেমে এলো। আমরা হোটেলে চলেছি।

তুমি তো জানো মানসী, আমি গরীব মানুষ। কলকাতায় বাস করেও বড় হোটেলে লাঞ্চ খাবার সৌভাগ্য বড় একটা হয়ে ওঠে না আমার। কিন্তু লাহুলের সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে খানা খাবার সুযোগ হল আজ। আমি ভোজন-বিলাসী নই, জীবনধারণের জন্যেই খেয়ে থাকি। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এমন ভাল রান্না দিন সাতেক খেলে, খাবার জন্যই জীবন যাবে। তাই ঠিক হল বিকেল থেকে আমরা নিজেরাই রান্না করব।

পথে নেমেই প্রশ্ন করে সুজয়া, "এখন কি আমরা বাংলোতে ফিরে যাচ্ছি ?"

"তাই তো যাওয়া উচিত। একটু বিশ্রাম করা দরকার।"

"আপনাদের দরকার থাকলে আপনারা গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি সারা কেলং শহর টহল মেরে একেবারে সন্ধ্যেবেলা বাংলোতে ফিরব।"

"অতক্ষণ কোথায় থাকবে ?"

"পথে।" সুজয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। বলে, "এখানে বিশ্রাম করতে আসি নি, বেড়াতে এসেছি।"

একবার যখন বলেছে, তখন সে কিছুতেই সন্ধ্যের আগে বাংলোয় ফিরবে না। আমরা তাই নিঃশব্দে সুজয়ার সঙ্গে চলতে শুরু করি।

যেপথে আমরা খোকসার থেকে কেলং এসেছি, সেই বিপ্লবী রাসবিহারী বসু মার্গ দিয়েই বিলিং-য়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

খানিকক্ষণ বাদে মাস্টারজী বলেন, "চলুন কেলং হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল থেকে ঘুরে আসা যাক। আপনাদেরও বেড়ানো হবে, আমিও হেড-মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখাটা সেরে নিতে পারব।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়—'রথ দেখা ও কলা বেচা', দুইই হবে। তাছাড়া হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে। চমৎকার আবহাওয়া। এইরকম প্রাকৃতিক পরিবেশেই বোধহয় মুগ্ধ হয়েছিলেন জেনারেল ব্রুস। বলেছিলেন—

'...for an unambitious holiday, a journey to Kyelang, and three or four weeks passed in its neighbourhood, would be time very well spent, especially for a bracing after a hot weather in India. I know of no finer climate in the whole Himalaya.'

ব্রুস বিশটি গ্রীষ্মকাল হিমালয় কাটিয়েছেন। কাজেই তাঁর এ উক্তি অতিশয় মূল্যবান।

দেখতে দেখতে পথ চলেছি। চলতে চলতে গল্প করছি। কথায় কথায় নেতা জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ কি লাহুলে আসেন নি?"

আমরা কিছু বলতে পারার আগেই সুজয়া বলে ওঠে, "এসেছেন বৈকি, একবার নয় দু'বার। প্রথমবার আসেন ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তিনি কাশ্মীর থেকে জোজিলা গিরিবর্ত্ম হয়ে লাদাখ গিয়েছিলেন। সেবারে তিনি হেমিস গুম্ফা দর্শন করেন এবং লে শহরে তিন মাস কাটান। ঐ সময়ে রাহুল 'তিব্বত মে বৌদ্ধধর্ম' এবং কয়েকখানি তিব্বতী ভাষাশিক্ষার পুস্তক প্রণয়ন করেন। ফেরার সময় তিনি এই পথে কুলুতে গিয়েছিলেন।

"১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি লে থেকে রওনা হন। তাগালাং, লাচালুং এবং বড়ালাচা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর কেলং পৌঁছন। তারপরে গুম্‌রং ও কারদাং হয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর গোন্ধলা চলে যান। পরদিন শিশু হয়ে খোকসার পৌঁছন।

"১৯৩৭ সালের জুন মাসে রাহুল আবার এ অঞ্চলে এসেছিলেন। সেবারে তিনি দিন দশেক লাহুলে ছিলেন।" সুজয়া চুপ করে।

"রাহুল লাহুল সম্পর্কে কি বলেছেন?" নেতা আবার প্রশ্ন করে।

"আপনি জানেন অসিতবাবু কেলং, গুম্‌রং এবং গোন্ধলার ঠাকুররা ছিলেন লাহুলের জায়গীরদার। এই ঠাকুরদের সম্পর্কে রাহুল লিখেছেন—একদা তিব্বত সম্রাট স্রোঙ-চনয়ের বংশীয়া জনৈক মহিলা কেলংয়ের গদীতে আসীনা ছিলেন। নীলা রানা নামে একজন রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁদের বংশধররাই লাহুলের ঠাকুর পরিবার। ঠাকুররা মহারাজা রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। ফলে লাহুল তখন শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার ব্রিটিশ বাহিনী কুলু উপত্যকা অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুররা তাঁদের ভেট পাঠিয়ে দেন। ইংরেজরা ঠাকুরদের তহসিলদার পদে নিযুক্ত করেন এবং লাহুলে অস্ত্র আইন কার্যকরী করেন নি। ব্রিটিশ আমলে বন্দুক রাখার জন্য কোনো লাইসেন্স করতে হত না।

"রাহুল গুমরাং সম্পর্কে লিখেছেন—লাদাখের রাণী সেখানকার মেয়ে। গুম্‌রাং গুম্ফায় সহস্রবাহু অবলোকিতেশ্বরের বিগ্রহ এবং ধাতুনির্মিত কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি আছে।

"উৎরাই পথে ভাগার তীরে পৌঁছে পুল পেরিয়ে রাহুল গুম্‌রং থেকে জো-লিঙ যান। সেখানকার মন্দিরে কাঠের বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে কারদাং আসেন। কারদাং থেকে গুরুঘাঁতাল

গুম্ফা দেখে তিনি গোন্ধলায় চলে যান। গোন্ধলার ঠাকুর প্রাসাদকে তাঁর একটি আলমারী বলে মনে হয়েছে। রাহুল এই প্রাসাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—প্রাসাদের তৃতীয়তলায় মন্দির। অনেক মূর্তির মধ্যে সেখানে প্রথম সংস্থাপক ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে। সে মূর্তির মাথায় মোগল আমলের পাগড়ি ও পরনে মোগল চৌবন্দী। তিব্বতীয় ভাষায় রচিত 'কর্মশতক' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আছে সেখানে। আর আছে 'লচকদার', একখানি খাঁড়া। কথিত আছে সেটি ভাঙা অবস্থায় তিব্বত থেকে আনা হয়। পরে দেবকৃপায় জোড়া লেগে যায়। তাই খাঁড়া আজও দেবজ্ঞানে পূজিত হচ্ছে।

"আগেই বলেছি, রাহুল পরদিন শিশু চলে যান। শিশু সম্পর্কে তিনি বলেছেন—কোনো সময় শিশুর পাহাড় দেবদারু বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। মানুষ নির্দয়ভাবে শত শত বছর ধরে সেই বন কেটেছে, ফলে জঙ্গল গেছে কমে। তখন লাহুলে খুব কুট গাছ হত। লাহুলীরা সেই ওষধি বাইরে চালান দিয়ে ভাল রোজগার করত।

"শিশু ছাড়িয়ে দুটি গ্রাম পেরোবার পরে রাহুলের সঙ্গে একজন বৈদ্যের সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছে কয়েকটি পেতলের প্রাচীন মূর্তি ছিল। একটি ছিল ললিতবসনা মূর্তি—ভারী সুন্দর। সেটি নাকি বারাণসী থেকে উড়ে এসেছিল লাহুলে। আর একটি মুকুটধারী ছোট মূর্তি। ধর্মচক্র প্রবর্তন মূদ্রাসন বুদ্ধের মূর্তি। এই মূর্তিটির পিঠে সংস্কৃতে কিছু লেখা ছিল। অক্ষর দেখে রাহুল বুঝতে পেরেছিলেন মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্মিত।

"এবারে ১৯৩৭ সালের রাহুল সাংকৃত্যায়ণের লাহুল ভ্রমণের কথা বলছি।" সুজয়া বলে চলে, "সেবার তিনি জিস্‌পাতে কাটিয়েছেন কয়েকদিন। জিস্‌পার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—ডাকবাংলোর দেবদারু বনে এক জাগ্রত দেবতা আছেন। তাঁর ভয়ে কেউ সেখানকার শুকনো গাছ কাটতে সাহস পায় না। যে দেবদারু গাছটির গোড়ায় দেবতার স্থান, সেটির বয়স নাকি হাজার বছর।

"তারপরে রাহুল আর একটা জায়গায় গিয়েছিলেন, যেখানে চারশ'বছর আগে একটি বড় গ্রাম ছিল। ১০৮ ঘর বাসিন্দা ছিল সেই গ্রামে। একদিন উৎসব উপলক্ষে গ্রামবাসীরা গ্রামের ধারে পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হন। যখন সবাই খেতে বসেছেন তখন তিব্বতের দিক থেকে একজন বৃদ্ধ এসে তাঁদের সঙ্গে খেতে বসতে চান। কিন্তু কেউ তাঁকে পাশে বসতে দিতে চায় না। অবশেষে একটি ছেলে তার নিজের জায়গাটা ছেড়ে দেয় তাঁকে।

"খাওয়া দাওয়ার পরে নাচ গান শুরু হয়। আর তখনই হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি নামে। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পড়তে শুরু করে। ইতিমধ্যে সেই বৃদ্ধ কিন্তু নিখোঁজ হয়েছেন। আর সেই ছেলেটি, যে তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল, তারও কিছুই হয় না। দমকা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় নদীর ধারে। এখনও তার বংশধররা লুম্‌পাচন গ্রামে বাস করছে। বলা বাহুল্য অন্যান্য সমস্ত গ্রামবাসীরা সেই প্রস্তর-বৃষ্টিতে মারা যায়। গ্রামটি শ্মশানে পরিণত হয়। সেখানে নাকি এক জবরদস্ত ভূত থাকত। লাদাখের হেমিস গুম্ফার লামা তাকে মন্ত্র দিয়ে বেঁধে রেখেছেন বলে সে আর এখন কারও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। রাহুল সেখানে পাথরের নিচে একটি ভূর্জপত্র পেয়েছিলেন। তাতে তিব্বতী অক্ষরে মন্ত্র লিখিত ছিল। রাহুল বলেছেন—অনুসন্ধান করলে সেখানে পুরাতত্ত্বের মূল্যবান বস্তু পাওয়া যেতে পারে।

"তার পরে পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু রাহুলের সে ইচ্ছা আজও পূর্ণ হয়নি। ব্রিটিশ সরকার স্বাভাবিক কারণেই সে ইচ্ছা পূর্ণ

করেন নি। আর জাতীয়সরকার পুরস্কার ও উপাধি প্রদান করেই রাহুল সংকৃত্যায়ণের প্রতি তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন।

"জিপ্‌সা থেকে রাহুল সেবারে খংসর গিয়েছিলেন। সেখানেও ঠাকুরদের একটি বাড়ি আছে। এ বাড়ির মন্দিরে কয়েকটি পেতলের ভারতীয় মূর্তি এবং হস্তলিখিত পুঁথি আছে।

"এই হচ্ছে লাহুলের ওপরে মোটামুটি রাহুলের অবদান। তবে হিমালয়ের অন্যান্য অংশের ওপরে তাঁর অবদান অনেক বেশি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।" সুজয়া শেষ করে।

সুজয়া এতক্ষণ বাংলোয় কথা বলেছে। কাজেই মাস্টারজী কি বুঝেছেন জানি না। কিন্তু সুজয়া থামতেই তিনি বলে ওঠেন, "রাহুলের কথা আপনারা এত জানেন বহিনজী ?"

"কেন জানব না বলুন ?" সুজয়া উত্তর দেয়, "রাহুল তো কোনো বিশেষ দেশ, ধর্ম বা ভাষার পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের। আপনি তো জানেন মাস্টারজী, তাঁর গবেষণা-ক্ষেত্র ছিল সিংহল থেকে সোবিয়েত রাশিয়া পর্যন্ত। ছত্রিশটা ভাষা শিখেছিলেন তিনি। কিন্তু নিয়মিত চর্চা না করায় তার অধিকাংশই গিয়েছিলেন ভুলে। তবে শেষ বয়সেও ষোলটি ভাষা ভালভাবে বলতে পড়তে ও লিখতে পারতেন তিনি। বেদ থেকে শুরু করে পৃথিবীর পায় প্রত্যেক ধর্মের মূল গ্রন্থগুলি মুখস্থ ছিল তাঁর। অথচ ভেবে আশ্চর্য হই, এই মহাপণ্ডিত স্কুল-কলেজে সামান্যই পড়াশুনা করেছেন। ষোলো বছর বয়সে ১৯০৯ সালে যখন তিনি আজমগড় জেলার পন্দাহ গ্রাম থেকে গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনি কপর্দকহীন ও অসহায়। আর ১৯৬৩ সালের ১৪ই এপ্রিল সত্তর বছর বয়সে যখন দার্জিলিংয়ে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি একজন বিশ্ববন্দিত মহাপুরুষ। তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা দেড়শ, তাঁর আবিষ্কৃত তিব্বতীয় পুঁথির সংখ্যা ৩৮৪ খানি। তিনি পায়ে হেঁটে যে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পরিক্রমা করেছেন, জগতের যে কোনো শ্রেষ্ঠ পর্যটকের পক্ষে তা ঈর্ষার বস্তু। কাজেই তাঁর কথা কেন জানব না বলুন।" সুজয়া থামে।

অসিত আবার বলে, "সংক্ষেপে রাহুলের জীবনটা একটু বলুন না।"

সুজয়া হেসে বলে, "সে জীবন এমনই কর্মবহুল যে খুব সংক্ষেপে বলতে গেলেও রাত ভোর হয়ে যাবে। তার চেয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি আপনাকে একখানি বই দেব।"

"কি বই ?" নেতা জিজ্ঞেস করেন।

"রাহুল সাংকৃত্যায়ণের 'তুম্‌হারী ক্ষয়' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ—'নতুন মানব সমাজ'।"

"কে অনুবাদ করেছেন ?"

"আমাদের শম্ভুবাবু, মানে 'ট্রেক এ্যান্ড ট্যুর' ক্লাবের সম্পাদক শম্ভুনাথ দাস।" সুজয়া একবার থামে, তারপরে আবার বলে, "বইখানির শেষে শম্ভুবাবু সংক্ষেপে রাহুলের জীবনী আলোচনা করে তাঁর গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করেছেন।" সুজয়া চুপ করে।

অসিত আর কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। আমরা স্কুলের সামনে পৌঁছে গেছি। স্কুল-বাড়িটি বেশ বড়। এটি লাহুল-স্পিতি জেলার একমাত্র হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল। এ জেলায় এখনও কোনো কলেজ হয় নি। চারটি হাই স্কুল, তেরোটি মিড্‌ল ও সতেরটি প্রাইমারী স্কুল আছে। শতকরা ৩৭ জন লিখতে পড়তে পারে। বলা বাহুল্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা চলেছে। নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে লাহুলের মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের পাশে, নিজেদের আসন করে নিতে পারবেন। সেই

শুভ দিনকে স্বাগত জানাই।

মাস্টারজীর সঙ্গে আমরা উঠে আসি স্কুলে। উপস্থিত হই হেডমাস্টার মশায়ের সামনে। পরিচয়ের পরে বেরিয়ে আসি বাইরে। কাজকর্ম সারতে মাস্টারজীর একটু দেরি হবে। এই অবসরে স্কুলের মাঠে ভাগানদীর তীরে বসে লাহুলকে দেখা যাক, তার কথা ভাব যাক্।

আমরা এসে ভাগার তীরে বসি। আমার মতো কত মানুষ এমনি এসে বসেছে তার তীরে। এমনি করেই দু'চোখ ভরে দেখেছে লীলাভূমি-লাহুলকে। এ দেখার পালা শুরু হয়েছে ইতিহাসের ঊষাকাল থেকে—যে ইতিহাস আজও স্পষ্ট নয়। কারণ হিমালয়ের অধিকাংশ অঞ্চলের মতোই লাহুলের মানুষও তাদের ইতিহাসকে রক্ষা করেন নি।

তবু আমরা জানতে পেরেছি, লাহুলীরা মিশ্রজাতি। খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগে লাহুলে মুণ্ডা জাতীয় অধিবাসীরা বাস করতেন। বাংলাদেশের মুণ্ডাভাষার মতোই ছিল তাঁদের ভাষা। পরবর্তীকালে প্রতিবেশী তিব্বতীদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় এক মিশ্রজাতির সৃষ্টি হয়। তাঁদের ভাষায় বহু তিব্বতী শব্দ মিশ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে লাহুলীরা যেমন তিব্বতীয় নয়, তেমনি লাহুলী ভাষাও তিব্বতী ভাষা নয়।

চাম্বা কুলু ক্রির লাদাখ এবং তিব্বত দিয়ে ঘেরা লাহুল ও স্পিতি। লাহুলীরা শান্ত ও সরল বলে ঐসব প্রতিবেশী রাজ্য মাঝে মাঝেই লাহুল-স্পিতিতে তাদের রাজ্যসীমা প্রসারিত করেছে। স্বভাবতই তাদের ইতিহাসের সঙ্গে লাহুল-স্পিতির ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। লাহুলের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের তাই চাম্বা কুলু ও লাদাখের ইতিহাস জানতে হবে।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে (খ্রীঃ পূঃ ১৮৫) যখন পশ্চিম-হিমালয় সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, তখন লাহুল তার মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে (খ্রীঃ পূঃ ৫০ থেকে ২১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) লাহুল কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। তাহলেও আমরা সেকালের ইতিহাস জানতে পারি না।

তোমাকে আমি আগেই বলেছি মানসী, চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙয়ের ভ্রমণ-বিবরণ থেকেই আমরা প্রথম লাহুলের কথা জানতে পারি। তিনি ৬২৯ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময় কুলু উপত্যকায় এসেছিলেন। সম্ভবত লাহুল তখন কুলুরাজ্যের অধীনে ছিল। তার আগে অবশ্য কিছুকাল চাম্বার রাজারা লাহুল শাসন করেছেন। সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে লাহুলের সঙ্গে লাদাখের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল আরও আগে। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে চাম্বা ও কুলুর সঙ্গে লাহুলের যোগাযোগ চিরকালই বেশি ছিল।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই লাহুলকে কেন্দ্র করে তার প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গেছে। যেমন ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে চাম্বার সৈন্যদল কুগতি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে কুলুর কাছ থেকে লাহুল কেড়ে নেয়। তবে কুলুর পরবর্তী রাজাই নাকি লাহুল পুনরুদ্ধার করেন। রোতাং গিরিপথের পাদদেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় দু'দলে। সে যুদ্ধে কুলু জয়লাভ করে।

৭৮০ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে মধ্য-এশিয়ার ইয়ারখন্দ থেকে শক এবং খস জাতীয়রা লাহুলে এসে রাজত্ব স্থাপন করেন। তাঁরা দশ-বারো বছর লাহুল শাসন করেছেন। কুলুর সৈন্যরা তাঁদের লাহুল থেকে তাড়িয়ে দেন।

তারপর থেকে চন্দ্রা উপত্যকা চিরকালই কুলুর অধীনে ছিল। তবে চন্দ্রভাগা ও ভাগা উপত্যকা কখনও কুলু, কখনও চাম্বা, কখনও বা লাদাখের পদানত হয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর কোনো সময়ে লাদাখরাজ লা-চেন-উৎপলা লাহুল জয় করে কুলুরাজ্য আক্রমণ করেন। কুলুর রাজা লাদাখকে লোহা এবং চমরী (তিব্বতীগরু) ভেট দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধি করেন। লাহুল কিন্তু কুলুরাজ্যের ভেতরই থেকে যায়।

১৫৩০ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে লাদাখরাজ সেওয়াঙ নামগিয়াল লাহুলের মধ্য দিয়ে এসে কুলু উপত্যকার খানিকটা অংশ অধিকার করে নেন। সে সময় লাহুলও নিশ্চয়ই লাদাখ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই লাহুলের ওপর লাদাখী প্রভাব কমতে শুরু করে। ১৬৩১ সালে ফাদার এ্যাজেভদো যখন লাহুল অতিক্রম করে লাদাখে যান, লাহুল তখন আবার কুলু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছে। পরবর্তীকালে কুল ও লাদাখের রাজার মধ্যে এক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী কুলু থেকে প্রতি বছর একশ' কুলি লোহা নিয়ে লিঙটি যেত এবং সেখান থেকে লাদাখের রাজার পাঠিয়ে দেওয়া সমপরিমাণ গন্ধক নিয়ে কুলতে ফিরে আসত। শিখরা কুলু ও লাদাখ অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর ছিল।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কুলুর রাজা মান সিং বড়ালাচা গিরিবর্ত্মের উত্তর দিকে লিঙটি পর্যন্ত রাজ্যসীমা প্রসারিত করেন। এখনও লিংটি লাহুলের সীমা। তিনি গোন্ধলাতে দুর্গ নির্মাণ করেন। মান সিং গোন্ধলার একটি মেয়েকে বিয়ে করে লাহুলের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কুলুর নৃপতি ছিলেন রাজা প্রীতম সিং। মান্ডিরাজ্যের রাজার সঙ্গে তাঁর একবার যুদ্ধ লেগে যায়। বজৌরার প্রান্তরে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় লাহুলীরা গেফানশৃঙ্গ অঙ্কিত পতাকা নিয়ে রাজা প্রীতম সিংয়ের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। মোরেভিয়ান মিশনারীরা লাহুলী ভাষায় এই যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু সেই মিশনারীদের কথা আমি তোমাকে পরে বলব মানসী! এখন লাহুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু শেষ করে নিই।

লাদাখের রাজকাহিনী থেকেও আমরা জানতে পারি যে কুলু এবং লাহুলের সম্মিলিত সেনাদল একবার লাদাখ আক্রমণ করে সীমান্তের কয়েকটি গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছিল। ১৮২০ সালে উইলিয়াম মূরক্রফট্ যখন লাহুলের ভেতর দিয়ে লাদাখে গিয়েছিলেন, তখনও লাহুল কুলুরাজ্যের অন্তর্গত। সে সময় তান্ডি ছিল লাহুলের রাজস্ব আদায়ের প্রধান কেন্দ্র। কুলুরাজের দুজন প্রতিনিধি তান্ডিতে বসে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। তাঁরা লাহুলীদের কাছ থেকে রাজস্বের বিনিময়ে শস্য নিতেন।

তোমাকে আগেই বলেছি মানসী, ১৮৪০ সালে কাশ্মীরের ডোগরা (শিখ) সেনাপতি জরোয়ার সিং লাহুলসহ লাদাখ অধিকার করেন। লাহুল কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত হয়। তারপরে কাশ্মীরের মহারাজা ইংরজদের লাহুল উপহার দেন। ফলে ১৮৪৬ সালে লাহুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই সে কথা বলে আর সময় নষ্ট করব না। আজ এখানেই থাক্।

মাস্টারজী এসে গেছেন, এখন বাংলোয় ফিরতে হবে। কাজেই লাহুলের কাহিনী থেকে এবারে নিজেদের কথায় ফিরে আসছি মানসী! রাসবিহারী বসু মার্গ ধরে আমরা কেলং স্কুল থেকে ট্যারিস্ট-বাংলোয় ফিরে চলেছি। লীলাভূমি-লাহুলের মাটিতে আমাদের আর একটি দিন শেষ হয়ে গেল। গোধূলি নেমে এসেছে পাহাড়ী পথে। কিন্তু এখনও পথের আলো জ্বলে নি। হয়তো বা একেবারে অন্ধকার হয় নি বলেই। কিন্তু পথের পাশের দোকানে

আর দূরের বাড়িঘরে সন্ধ্যার আলো উঠেছে জ্বলে।

ভারী ভাল লাগছে দেখতে। যেন কালোর মাঝে থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে উঠেছে। পথের পাশে ছোট-বড় গাছগুলি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। ভাগার তীরে ক্ষেতগুলি কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে। ওপারের পাহাড়গুলিও হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট।

আঁকাবাঁকা রুপোলি ভাগা এখনও স্পষ্ট। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার অবিশ্রান্ত গর্জন। না, মোটেই গর্জন বলে মনে হচ্ছে না। সেই গান গাইছে, লীলাময় লাহুলের গান, জয়গান। মনে হচ্ছে জয়গান গেয়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে ভাগা। অভিনন্দিত করছে, কারণ আমরা বহুদূর থেকে এসেছি এখানে। এসেছি তার জন্মভূমিতে—এই লীলাভূমি-লাহুলে।

॥ আট ॥

মানসী,

লাহুলের মাটিতে আমার জীবনের আর একটি রাত অতিবাহিত হল। কাচের জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে। কেলং বিশ্রাম-ভবনের ঘরে আমাদের ঘুম গেছে ভেঙে। কিন্তু আমরা বিছানা ছাড়তে পারি নি। প্রচণ্ড শীত।

তাড়াতাড়ি ওঠার কোনো তাড়া নেই। তাই আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছি—লাহুলের গল্প। মোরেভিয়ান মিশনারীদের গল্প। সেই গল্পের কথাই লিখছি তোমাকে।

আমি তোমাকে বলেছি মানসী, ১৯৬১ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী লাহুলের লোকসংখ্যা ১৫,১৭৭জন। কিন্তু বলি নি যে তাদের মধ্যে ৯,২৫১ জন হিন্দু, ৪৬৭৬ জন বৌদ্ধ, ১২১০ জন মুসলমান, ৩৭ জন শিখ, ২ জন খ্রীষ্টান ও ১ জন জৈন। কাজেই বুঝতে পারছ লাহুল হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রধান জায়গা এবং সেখানে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসার লাভ করে নি। কিন্তু মানসী, তুমি শুনে বিস্মিত হবে, খ্রীষ্টান মিশনারীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই লাহুলে ধর্মপ্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। আর এই প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করেন মোরেভিয়ান মিশনারীরা। বলা বাহুল্য তাঁদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা লাহুলীদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে তুলতে পারেন নি। কিন্তু জনসেবার ক্ষেত্রে এক মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাই কেলংয়ের মোরেভিয়ান মিশনারীদের সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করছি, তার কিছু কথা তোমাকে না লিখলে আমার এ পত্রাবলী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জন ওয়াইক্লিফ্ (John Wycliffe) ও লোলার্ডস্-য়ের (Lollards) শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে জন হাস (John Huss) নামে জনৈক যাজক বোহেমিয়ায় (জর্মনী) ইউনিটাস ফ্রাট্রাম (Unitas Fratrum) নামে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষিত যুবক তাঁর সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম সংস্কারের জন্য একযোগে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু ১৪১৫ সালে জন হাস দেহরক্ষা করার পরে তাঁর শিষ্যদের মাঝে আদর্শের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উদারপন্থীরা জয়লাভ করেন। আবার কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মোরেভিয়ায় তাঁরা গীর্জা স্থাপন করেন। মোরেভিয়া চেকোশ্লভাকিয়ার একটি জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চল। এর চেক নাম 'Morava' আর জার্মান নাম হল 'Mahren'.

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোহেমিয়া ও মোরেভিয়ার অধিকাংশ প্রটেস্টান্ট তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হন। কিন্তু ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথলিকরা তাঁদের সমস্ত ধর্মপুস্তক ও গীর্জা

বিনষ্ট করে ফেলেন। ভয়ে তাদের অধিকাংশ শিষ্য ক্যাথলিক মত গ্রহণ করেন।

মোরেভিয়ান মিশনারীরা কিন্তু আদর্শচ্যুত হলেন না। তাঁরা গোপনে কাজ করে যেতে থাকলেন। আস্তে আস্তে আবার মিশন সংগঠিত হল। পৃথিবীর নানা দেশে তাঁরা গীর্জা স্থাপন করলেন। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হল। তাঁরা লাব্রাডার, মধ্য-আমেরিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং মধ্য-এশিয়ার শাখা স্থাপন করেন।

কালক্রমে তাঁদের একটি দল তিব্বতে গেলেন। কিন্তু চীনা ও রাশিয়ানদের প্ররোচনায় স্থানীয় রাজা তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন তিব্বত থেকে। বিতাড়িত মিশনীরা এলেন কেলংয়ে। সেটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক। কাজেই কারদাং তখন লাহুলের রাজধানী। কেলং একটি সমৃদ্ধ গ্রামমাত্র। তবু তাঁরা কেলং গ্রামেই তাঁদের গীর্জা স্থাপন করলেন। আর অদূর ভবিষ্যতে সেই গীর্জা মধ্য এশিয়ায় মোরেভিয়ান মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হল।

মিশনারীরা বাংলো, বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা লাহুলের লোকগাথা, ভাষা, সামাজিক আচার, ধর্ম ও ইতিহাস নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। আর তারই ফলে লাহুল সহ লাদাখের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের কিছু অংশ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।* সে ইতিহাস আমি তোমাকে আগের চিঠিতে লিখেছি মানসী!

মোরেভিয়ান মিশন লাহুলে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকে যেমন লাহুলী ও তিব্বতী ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বাল্যশিক্ষা, ইংরেজী, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতি যাবতীয় স্কুলপাঠ্য পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। আর লামাদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও সেগুলি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা তোমাকে বলে নিচ্ছি মানসী, মোরেভিয়ান মিশনারীদের প্রকাশিত বাইবেল লাহুলী ভাষায় রচিত প্রথম ধর্মগ্রন্থ তথা প্রথম সাহিত্য।

তাই বলে মিনারীরা কিন্তু কেবল ধর্ম ও শিক্ষা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। তাঁরা ছিলেন সর্বকর্ম বিশারদ। জেনারেল ব্রুসযের ভাষায় তাঁরা ছিলেন, 'Jacks of all trades–engineers, doctors, taught weaving and were ready to turn their hands to anything that came along.† তাঁরা বড়ালাচা গিরিবর্ত্মের ওপরে রাস্তা তৈরি করেছেন, কেলংয়ে প্রথম আলু, জই ও রাইয়ের চাষ করেন। এমনকি তাঁরা তুষারপাতের হিসেব পর্যন্ত রাখতেন।

জেনারেল ব্রুস তাঁদেরই অতিথি হিসাবে সস্ত্রীক এক মাস কাটিয়ে গেছেন এখানে। ভাগা নদীর তীরে পাহাড়ের ওপর যে ছোট্ট বাড়িটি মিশনারীরা তাঁকে বাস করতে দিয়েছিলেন, সেটি তাঁর বড় পছন্দ হয়েছিল। বাড়িটি সম্পর্কে ব্রুস লিখেছেন—

'It really was a charming little abode....situated in the centre of fields, the farm-lands owned by the Mission.'

মূল রাস্তা থেকে এগারোশ' ফুট ওপরে অবস্থিত সেই বাড়িতে বসে বসে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সারাদিন ধরে তিব্বত, স্পিতি, কুলু, চাম্বা ও পাঞ্জাবের মানুষদের আসা-যাওয়া দেখতেন। কেলং-কে তাঁর বড়ই বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর বলে মনে হত।

মোরেভিয়ান মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কেলং লাহুল-স্পিতির বৃহত্তম জনপদে

---

* History of Western Tibet by Rev. A. H. Francke.

† 'Himalayan Wanderer'–by Brig. Gen. Hon. C. G. Bruce, C. B,–1934

পরিণত হল। ফলে ব্রিটিশ রাজত্বকালে কেলং জেলা-সদরের মর্যাদা লাভ করল। কাজেই তুমি বুঝতে পারছ মানসী, কলকাতা যেমন জব চার্নকের কীর্তি, আজকের কেলংও তেমনি মোরেভিয়ান মিশারীদেরই অবদান!

ভাগা নদীর ডানতীরে অবস্থিত ১০,৩৮৩ ফুট উঁচু এই জনপদটি ব্রিটিশ রাজত্বকালে জেলা-সদরের মর্যাদা লাভ করেছে। সকলেই কেলংকে শহর বলে থাকে। কিন্তু তুমি শুনে বিস্মিত হবে যে ১৯৬১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী এখানকার স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র ৭৭৯ জন। পরিসংখ্যানটি হয়তো নির্ভুল, কিন্তু কাল কেলংয়ের পথে পদচারণা করতে করতে আমার মনে হয়েছে, বর্তমান জনসংখ্যা অনেক বেশি।

আলোচনা থামাতে হল আমাদের। বাইরে কেউ কড়া নাড়ছে। এখানে এত সকালে কে এল আবার? গতকাল সকালে খোকসারে চৌকিদার কড়া নেড়েছিল। ভালই করেছিল, নইলে আমরা জীপ ধরতে পারতাম না। কিন্তু আজ তো গাড়ি ধরার কোন ব্যাপার নেই! আজ আমাদের অফুরন্ত অবসর। তাহলে এই সাত-সকালে আবার চৌকিদার কড়া নাড়ছে কেন? চৌকিদার কি? সেই হবে। সে ছাড়া আর কে আসবে এখানে?

কালকের মতো আজ কিন্তু নেতা আর স্লিপিং ব্যাগের মায়া কাটিয়ে উঠতে রাজী হয় না। আমাকে দরজা খুলতে বলে। উপায় নেই, নেতার আদেশ অমান্য করতে পারি না।

দরজা খুলেই দেখতে পাই ওঁকে। আর দেখেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠি, "আরে সেপাইজী যে, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।"

"কে, সেপাইজী!" সুজয়াও দরজা খুলে আমাদের ঘরে আসে। বিছানার ওপরে উঠে বসেছে নেতা ও মাস্টারজী।

সেপাইজীর অপ্রত্যাশিত আগমনে আমরা সবাই খুশি হয়ে উঠি।

সেপাইজী ঘরে এসে বসেন। বলেন, "আজ আপনারা এখানে থাকছেন তো?"

"হ্যাঁ।" জবাব দিই।

"আপনাদের সঙ্গে বেড়াবো বলে, অনেক বলে-কয়ে আজ ছুটি নিয়েছি আমি।"

"খুব ভাল করেছেন।" সুজয়া বলে, "আজ সারাদিন আমরা কেলংয়ের পথে-পথে কাটাবো।"

"তাহলে মুখ-হাত ধুয়ে নিন, আমি চা আনবার ব্যবস্থা করছি।" সেপাইজী উঠে দাঁড়ান।

নেতা বাধা দেয়। বলে, "এখানে এসেও আপনি ফরমাশ খাটবেন?"

"ফরমাশ বলছেন কেন? আপনারা কতদূর থেকে এসেছেন, এটুকু না করলে যে আমার পাপ হবে। আপনারা তৈরি হয়ে নিন, আমি আসছি।"

আর কোনো আপত্তি করার সুযোগ না দিয়ে সেপাইজী বেরিয়ে যান ঘর থেকে। আমি তাকিয়ে থাকি দরজার দিকে। ভাবি, আমরা তাঁর কে? কেউ নই। তবু আমাদের সঙ্গে বেড়াবেন বলে আজ ছুটি নিয়েছেন তিনি। নিয়েছেন কারণ এটা কলকাতা নয়, হিমালয়। এখানে মানুষের মন টাকা-পয়সার ছকে বাঁধা নয়। এখানকার মানুষ এখানকার প্রকৃতির মতোই উদার। স্বার্থপরতার কাছে তারা আজও আত্মসমর্পণ করে নি।

চা ও জলখাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি পথে। কথায় কথায় লাহুলের ভাষা প্রসঙ্গে এসে গিয়েছে। আজকের বক্তা মাস্টারজী। তিনি বলে চলেছেন, "আপনারা জানেন

লাহুলের জনসংখ্যা ১৫,১৭৭ জন। এদের মধ্যে প্রায় এগারো হাজার অধিবাসীর মাতৃভাষা লাহুলী। কিন্তু তারা সবাই এক ভাষায় কথা বলেন না। অনেকগুলি স্থানীয় ভাষা আছে লাহুলে। পনেরোটি প্রধান গ্রাম নিয়ে লাহুল। পাশাপাশি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এবং এক গ্রামের মানুষ আরেক গ্রামের ভাষা বুঝতে পারে না। কাজেই সব ভাষার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি কেবল প্রধান প্রধান লাহুলী ভাষা কয়টির কথা বলছি।

"লাহুলের প্রধান ভাষা তিনটি—বুনান, মানসাত এবং টিনান। এই উপত্যকার যে সামান্য ইতিহাসটুকু আবিস্কার করা গিয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে এই তিনটি ভাষারই সাহায্যে। কাজেই এই তিনটি ভাষা না জেনে লাহুলের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়।

"লাহুলী ভাষাগুলির সঙ্গে কোল ভিল ও সাঁওতালী ভাষার অদ্ভুত মিল রয়েছে। এর কারণ, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে লাহুলে মুণ্ডা জাতীয় মানুষ বাস করতেন। এবং তারাই লাহুলের আদি অধিবাসী।

"শব্দ বিন্যাসের দিক থেকে লাহুলী ভাষার সঙ্গে তিব্বতীর যথেষ্ট মিল থাকলেও কোনো ব্যাকারণগত সাদৃশ্য নেই। বরং ব্যাকরণের দিক থেকে লাহুলী ভাষা ও মুণ্ডারী ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

"এই সম্পর্ক থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে মুণ্ডা জাতীয় মানুষরাই লাহুলের আদি অধিবাসী। আর আপনাদের বোধ হয় অজানা নয় যে মুণ্ডারা বাংলারও আদি অধিবাসী। এবং এদের কয়েক ঘর বংশধর এখনও কলকাতার উপকণ্ঠে বাস করছে। তাদের ভাষার সঙ্গে লাহুলী ভাষার আশ্চর্য মিল রয়েছে।

"এবারে ভাষার প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। গুমরং, বারবোগ, কারদাং অর্থাৎ এই কেলং অঞ্চলের ভাষা হল বুনান। মানসাত বলা হয় গৌশল সহ সমস্ত চন্দ্রভাগা উপত্যকায়। আর টিনান হল গোন্ধলা ও শিশু অঞ্চলের ভাষা। খোকসার এবং জিস্‌পা অঞ্চলে লাহুলীদের ভাষা তিব্বতী।

"তিনটি লাহুলী ভাষার সঙ্গে প্রচুর তিব্বতী শব্দ মিশে গেছে। তবে টিনান ও মানসত ভাষার চেয়ে বুনান ভাষায় তিব্বতী শব্দের আধিক্য বেশি। বলা বাহুল্য, ইদানীং লাহুলী ভাষায় তিব্বতী ভাষার প্রভাব কমেছে, আর হিন্দী তার স্থান অধিকার করেছে। হিন্দী এখন লাহুলের সকলের বোধগম্য সাধারণ ভাষায় পরিণত হয়েছে।

"লাহুলী ছাড়া আরও সাতশটি ভাষাভাষী মানুষ লাহুলে বাস করেন। আপনারা শুনে খুশি হবেন, বাংলা এই সাতাশটি ভাষার অন্যতম। তবে ১৯৬১ সালের আদম সুমারী থেকে জানা যায়মাত্র তিনজন বাঙ্গালী স্থায়ীভাবে লাহুলে বাস করতেন।"

"তারা কোথায় থাকেন ? এখানে ?" সুজয়া মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

মাস্টারজী মাথা নেড়ে বলেন, "বলতে পারব না বহিনজি !" একটু থেমে নিয়ে তিনি আবার বলতে থাকেন, "১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে অন্যান্য ভাষার মধ্যে প্রথম হল ভোটিয়া ভাষার স্থান। লাহুলে ১৩২৪ জন লোক স্থায়ীভাবে বাস করেন যাঁদের মাতৃভাষা ভোটিয়া। তারপরেই কাশ্মীরী ভাষার স্থান। ১২১২ জন অধিবাসীর মাতৃভাষা কাশ্মীরী। লাহুলী ভাষা তিব্বতী প্রভাবিত হলেও মাত্র ৫৪৩ জন লাহুলীর মাতৃভাষা খাঁটি তিব্বতী। অন্যান্য চব্বিশটি ভাষা যাদের মাতৃভাষা, তাদের মিলিত সংখ্যা মোটে হাজার খানেক।"

বলা শেষ হল মাস্টারজীর। সুজয়া তারিফ করে তাঁর বক্তব্যের। বলে, "খুব ভাল লাগল। অনেক কথা জানতে পারলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

মাস্টারজী বোধ হয় লজ্জা পেলেন সুজয়ার প্রশংসায়। তিনি নিঃশব্দে নত মস্তকে হাঁটতে থাকেন। আমরাও কোনো কথা বলি না। নীরবে এগিয়ে চলি। সেই একই পথে পায়চারি করছি আমরা—বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর স্মৃতিধন্য কেলংয়ের একমাত্র রাজপথ।

হঠাৎ নজরে পড়ে পথের পাশে—'কাংড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড। হেড অফিস—ধরমশালা।' সুজয়া প্রশ্ন করে, "এখানে আর কোনো ব্যাংক আছে?"

"না।" সেপাইজী বলেন, "এখন পর্যন্ত এই একটিই।"

আমরা স্কুল ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। পথটা বাঁয়ে বেঁকে খানিকটা সোজা এগিয়েছে। তারপরে আবার ডাইনে মোড় নিয়েছে। আমরা ট্যুরিস্ট-বাংলো থেকে প্রায় মাইল খানেক এসেছি।

পথের পাশে সাইনবোর্ড—ডাইরেকটর অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ, হিমাচল প্রদেশ। কার্পেট উয়িভিং সেন্টার, কেলং।

সেপাইজীর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে—পথের ডানপাশে। পাশাপাশি দুটি বড় ঘর। একটিতে তাঁত আর একটিতে কার্পেট তৈরির যন্ত্রপাতি। প্রতি ঘরে জন পনেরো করে ছেলেমেয়ে কাজ করছে। এরা সবাই সরকার থেকে চল্লিশ টাকা করে মাসিক বৃত্তি পায়। তাঁত বোনা শিখতে হয় এক বছর আর কার্পেট বোনা দু' বছর।

ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। ভালই লাগল। আরও ভাল লাগত, যদি প্রতিষ্ঠানটি বড় হত। প্রয়োজনের তুলনায় বড্ড ছোট। কুটিরশিল্পের প্রসার ছাড়া লাহুলের উন্নতি সম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় সাহায্য পেলে পরিশ্রমী লাহুলীরা কুটির শিল্পের মাধ্যমে তাঁদের দারিদ্র্য দূর করে ফেলতে পারেন।

উয়িভিং সেন্টার দেখে ফিরে আসি। চৌকিদারকে জিনিসপত্র সব দিয়ে গিয়েছিলাম। সে রান্নার আয়োজন করে রেখেছে। গরম জল ফুটছে। একে একে স্নান সেরে নিই। মানালী ছাড়ার পরে আর স্নান করি নি।

সুজয়া রান্নাঘরে চলে যায়। আমরা রোদে এসে বসি। বেশ আরাম লাগছে। তোমাকে আগেই বলেছি মানসী, কেলংয়ের উচ্চতা ১০,৩৮৩ ফুট। এর তিনদিকেই তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা। তবু কেলং লাহুলের উষ্ণতম স্থান। কারণ এখানে হাওয়া কম। বলা বাহুল্য অবস্থানের জন্যই এমন হয়েছে।

অসিত সহসা মাস্টারজীকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, লাহুলের প্রধান ধর্ম কি?"

মাস্টারজী বলেন, "ধর্মের দিক থেকে লাহুলীদের মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়—হিন্দু, বৌদ্ধ, দুই ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক নতুন ধর্মমতে বিশ্বাসী সমাজ এবং লোহার শিপী বা দাগিস সম্প্রদায়।"

"কেলং মোরেভিয়ান মিশনের রেভারেন্ড হেডে (Rev. Heyde) ১৮৬৮ সালে লিখেছেন—লোহাররা হল কর্মকার। তারা শিপীদের থেকে নিজেদের বড় বলে মনে করেন কিন্তু লাহুলের হিন্দু ও বৌদ্ধরা এই দুই ধর্মমতকে কোনো মত বলে স্বীকার করেন না।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমতের মিশ্রিত মতাবলম্বীরা চন্দ্রভাগা উপত্যকায় বাস করেন। তাঁদের তিনটি ছোট গুম্ফা আছে। পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে এঁরা একজন করে পুরোহিত ও লামা ডেকে নিয়ে আসেন। তাঁরা দুজনেই নিজ নিজ মতে যাগযজ্ঞ ও নাচ-গান করে

রোগীর কাঁধ থেকে অসুখের ভূত তাড়াবার চেষ্টা করে থাকেন। জানি না এ চেষ্টার ফলে রোগীর কতটা লাভ হয়।

"চন্দ্রভাগা উপত্যকার কয়েকটি গ্রামে লাহুলী হিন্দুদের বাস। লাহুলী হিন্দুরা সকলেই নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করেন। কিন্তু চাম্বা এবং কুলু উপত্যকার ব্রাহ্মণরা এঁদের ছোটজাত বলে মনে করে থাকেন। অথচ লাহুলের হিন্দুরা নিজেদের কৌলীন্য সম্পর্কে অতিশয় গর্বিত। তাই তাঁরা বৌদ্ধদের সঙ্গে বসে ভোজন করেন না। অবশ্য পান করতে আপত্তি নেই কোনো।

"লাহুলের বৌদ্ধরা চন্দ্রা এবং ভাগা উপত্যকার অধিবাসী। তাঁদের আটটি গুম্ফা আছে। সন্ন্যাস-বুদ্ধ (Cha'm-dan-da's) এই সব গুম্ফার প্রধান বিগ্রহ। লামারা ধূপ, ফুল ও জল দিয়ে প্রতিদিন বিগ্রহকে পূজা করেন। সারা বছর দিনরাত বিগ্রহের সামনে মাখনের প্রদীপ জ্বলে। সন্ন্যাস-বুদ্ধ ছাড়া অবলোকিতেশ্বর এবং পদ্মপাণির বিগ্রহ লাহুলের বিভিন্ন বৌদ্ধ গুম্ফায় পূজিত হচ্ছে। সব গুম্ফাতেই অন্ততঃ একটি করে বাৎসরিক উৎসব হয়। তখন লামারা শিষ্যদের সঙ্গে বসে প্রাণভরে ছাং পান করেন।

"লাহুলের লামারা দ্রুগ্‌পা সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের অনেকেই বিবাহিত এবং জমি ও বাড়ির মালিক। তাঁরা কেবল গ্রীষ্মকালেই গুম্ফায় বাস করেন। শীতকালে সাধারণতঃ নীচে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। সেখানেও অবশ্য বুদ্ধ-মূর্তি সহ ছোট একটি মঠ থাকে। লাহুলী বৌদ্ধরা নিয়মিত ভাবে রিওয়ালসার ও ত্রিলোকনাথে তীর্থদর্শনে যান।

"আপনারা জানেন, এর আগে ঠাকুরেরা লাহুলের শাসক ছিলেন। ঠাকুররা হিন্দু। স্বভাবতই তাঁরা হিন্দুধর্মের প্রসার সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত শতাব্দীতে লাহুলের বহু বৌদ্ধ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরই ফলে ১৯১০ সালে এই শতাব্দীর প্রথম আদমসুমারীর সময় দেখা গেল, লাহুলে ৭৫০৮ জন হিন্দু আর বৌদ্ধ মাত্র ১৯০ জন। তখনও এখানে ৩০ জন মুসলমান এবং ৩২ জন খ্রীষ্টান বাস করতেন।

"১৯৬১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী লাহুলে ৯২৫১ জন হিন্দু, ৪৬৭৬ জন বৌদ্ধ, ১২১০ জন মুসলমান এবং ২ জন খ্রীষ্টান। এই পরিসংখ্যান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন, গত পঞ্চাশ বছরে এখানে বহু হিন্দু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর প্রধান কারণ, লাহুলের রাজনৈতিক জীবনে ঠাকুরদের প্রভাব কমে গেছে। কিন্তু আরও একটি কারণ বোধ করি আছে। সেটি হল, হিমালয়ের মাটির বৌদ্ধধর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। নইলে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে গেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে খ্রীষ্টান ধর্ম সেই স্থান অধিকার না করে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করল কেন? মোরেভিয়ান মিশনারীদের প্রচেষ্টাই বা কেন ব্যর্থ হল লাহুলে?

"আপনারা সবাই জানেন, লাহুলে বৌদ্ধধর্ম এসেছে সম্রাট অশোকের সময়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে কুলু ও চাম্বার প্রভাবে এখানে হিন্দুধর্মের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তারপরে এসেছেন পদ্মসম্ভব। আবার বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করেছে। অবশেষে ঠাকুরদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় হিন্দুধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনাদের আমি বলি নি তার আগের কথা। অর্থাৎ সম্রাট অশোকের আগে লাহুলে কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিল?

"ইতিহাসের সেই আদিকালে লাহুলের মানুষ হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্যের মানুষের মতই প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। তাঁরা সাধারণতঃ লিঙ্গ এবং সর্পের পূজা করতেন। অনেকের মতে লিঙ্গ এবং সর্প হল সূর্য এবং জলের প্রতীক। কিন্তু আপনারা জানেন, এই লিঙ্গ পূজা বা Phallicism এসেছে মাটির উর্বরতার প্রতি মানুষের ভক্তি থেকে। লিঙ্গ বা Phallus

হল প্রকৃতির সেই উৎপাদন শক্তির প্রতীক। এই একই ধারণা সেকালে এশিয়া মাইনর থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তবে ভারবর্ষে লিঙ্গ বা লিঙ্গম্ হল শিবের প্রতীক এবং লিঙ্গপূজা শিবপূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই লাহুলে বৌদ্ধধর্মের আগে শৈবধর্ম প্রচলিত ছিল এবং শৈবধর্মই লাহুলের আদিধর্ম।

"কিছুকাল আগেও লাহুলে নরবলির প্রচলন ছিল।...আঁৎকে উঠলেন কেন ?"

"না।" সুজয়া থতমত খায়।

মাস্টারজী আবার বলতে শুরু করেন, "আজকের ভারতে বাস করে যে আপনার এমন ভয় পাওয়া উচিত নয়। নরবলি যে এখন পল্লীতে পল্লীতে প্রতিদিন সংঘটিত হচ্ছে। পার্থক্য শুধু সেকালের অশিক্ষিত লাহুলীরা ভগবানের নামে নরবলি দিতেন আর একালের শিক্ষিত আমরা গণতন্ত্রের নামে মানুষ খুন করছি। উদ্দেশ্য কিন্তু অভিন্ন। তাঁরাও মানুষের মঙ্গলের জন্য নরবলি দিতেন, আমরাও মানুষের মঙ্গলের জন্যই নরহত্যা করছি। কিন্তু মানুষ মেরে কি মানুষের মঙ্গল করা যায় ?" মাস্টারজী থামেন।

আমরা কেউ কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

আমাদের নির্বাক দেখে মাস্টারজী আবার বলতে থাকেন, "যাক্, যে কথা বলছিলাম। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লাহুলের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন লাহুলীদের মানসিক বিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় নি। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ত্রিলোকনাথের চিরস্থায়ী জনপ্রিয়তা। ফলে লাহুলীরা কখনই সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয় নি। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলমান এখানে পরম শান্তিতে পাশাপাশি বাস করছেন। এই উদারতাকে উদাহরণ বলে গ্রহণ করতে পারলে আজ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের চেহারা অন্যরকম হতে পারত।

খেয়ে নিয়ে আমরা আবার পথে বের হয়েছি। সেই একই পথ। কালকের হোটেলের সামনে এসে থমকে দাঁড়াই। এমন দৃশ্য দেখতে পাব বলে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই সামলে নিতে সময় লাগে একটু। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসি।

মিস কিন্তু আমাদের দেখেও দেখেন না। বাস্তবিকই তাঁর এখন আমাদের দিকে নজর দেবার সময় কোথায় ? দোকানীর হুঁকো নিয়ে তিনি তামাকু সেবন করছেন। তাঁর পাশে বসে রয়েছে ছেলেটি। লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে হুকোটির দিকে। মা-বাবা ও দিদি আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসেন। হাসি দেখে ওঁদের বড়ই অসহায় মনে হচ্ছে।

আমরা তাঁদের কাছে এসে দাঁড়াই। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে হয় দাওয়ার দিকে যেখানে মিস মালিনী তামাকু সেবন করছেন—স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন।

একটু বাদে মিস হুঁকো থেকে মুখ তোলেন। হুঁকোটি ছেলেটির হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলা বাহুল্য ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে তামাক খেতে শুরু করে।

মিস উঠে আসেন আমাদের কাছে। আমরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে ওঠেন, "এখানকার লোকেরা খুব কড়া তামাক খায়। খেতে বেশ আরাম লাগে।"

"তা তো লাগবেই।" সুজয়া বলে, "কড়া জিনিস সব সময়েই আরামদায়ক।"

"হ্যাঁ।" মিস উত্তর দেন। তারপরে জিজ্ঞেস করেন, "আপনারা কাল চলে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"টিকিট কিনেছেন ? গাড়ির টিকিট ?"

"না তো।"

"সে কি ? তাহলে যে যেতে পারবেন না। গাড়িতে ভীষণ ভিড় হচ্ছে। শীত আসছে। সবাই নিচে নেমে যাচ্ছে।"

কথাটা একদম খেয়াল ছিল না। তিনি তো ঠিকই বলেছেন। আমরা নেতার দিকে তাকাই। নেতাও অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিস মালিনীর দিকে।

সহসা সেপাইজী বলে ওঠেন, "আপনি একবার ডি.সি. সাবকে বললে হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।" তিনি আমাদের হয়ে মিস মালিনীকে অনুরোধ করেন। তাঁর দোষ নেই, তিনি আসল ব্যাপারটা জানেন না। কিন্তু সে কথা যে বলতে পারছি না তাঁকে। তাই চুপ করে থাকি।

সেপাইজীর অনুরোধের উত্তরে মিস বলেন, "আমি ডি. সি-কে বলতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। কাজেই বলে কোনো লাভ হবে না। কিছুই করতে পারবে না। মাঝখান থেকে গতকাল না বলার জন্য সে আমাকে রাগারাগি করবে।"

"তাহলে থাক্।" সেপাইজী তাঁকে মুক্তি দেন। জিজ্ঞেস করেন, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?"

"ডি. সি-র কাছেই যাচ্ছি একবার।" মিস উত্তর দেন। "যাচ্ছি একটা জীপের ব্যবস্থা করতে। কাল আমরা একটু জিস্‌পা বেড়িয়ে আসতে চাই। ওর জীপটা পেলে সুবিধে হয়।"

"তা তো বটেই। তাহলে আর সময় নষ্ট করবেন না। ওদিকে দেরি হয়ে যাবে।" নেতা বিদায় করেন তাঁকে।

"হ্যাঁ। বাই, বাই।" মিস তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পথে নামেন। আমরা তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপরে সমস্বরে হেসে উঠি।

হাসি থামলে সুজয়া সেপাইজীকে বলে, "ডি. সি. সাহেবের সঙ্গে মিস মালিনীর সামান্যই জানাশোনা, তাই তিনি ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন।"

সেপাইজী হেসে বলেন, "জানি।"

"কিন্তু আমাদের জীপের টিকিটের কি হবে ?" অসহায় স্বরে প্রশ্ন করি সেপাইজীকে।

"কোনো ভয় করবেন না। সব ব্যবস্থা করে দেব। আমার জানাশোনা লোক আছে।"

সুজয়া বলে, "তাহলে চলুন, জীপ অফিসটাই ঘুরে আসা যাক্।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সেপাইজীও সমর্থন করেন সুজয়াকে। অতএব আমরা মোটর-স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে চলি।

চলতে চলতে অসিত জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা জিস্‌পা এখান থেকে কতদূর ?"

"ষোলো মাইলের মতো" আমি উত্তর দিই।

জিস্‌পা অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করতে আমরা বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি।

সেই আলোচনার কথাই এখন তোমাকে লিখছি মানসী ! এই পথটা চলে গেছে জিস্‌পা। অদূর ভবিষ্যতে এই পথে বাস চলবে। নির্মীয়মাণ সেই পথে খোকসার থেকে জিস্‌পার দূরত্ব পড়বে ৪৪ মাইলের মতো আর মানালী থেকে ৯০ মাইল।

জিস্‌পা থেকে হাঁটাপথে তুমি পাতসেও এবং জিংজিংবার হয়ে পৌঁছতে পারো বড়ালাচা গিরিবর্ত্মে। সেখান থেকে একটি পথ চলে গেছে উত্তর পূর্বে লাদাখের জেলাসদর লে শহরে। এ পথের কথা আমি তোমাকে বলেছি মানসী ! এই পথেই এ্যাজেভদো ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে লে থেকে লাহুলে এসেছিলেন এবং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মূরক্রফ্‌ট লাহুল থেকে লে গিয়েছিলেন।

বড়লাচা থেকে আর একটি পথ নেমে গেছে দক্ষিণ-পূর্বে—চন্দ্রা নদীর তীর দিয়ে। তপোগোগমা, তপোযোগমা ও চন্দ্রতাল হয়ে সেই পথটি পৌঁছেছে কুনজুম গিরিবর্ত্মের পাদদেশে। সেখান থেকে জীপ ধরে কুনজুম পেরিয়ে তুমি স্পিতি উপত্যকার সদর কাজায় চলে যেতে পার। তুমি তো জানো মানসী, খোকসার থেকে প্রতিদিন সকালে সেই জীপ ছাড়ে। সংক্ষেপে সে পথের কথা আমি বলেছি তোমাকে। পথের বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাইলে, তুমি মাননীয় বিচারপতি শ্রী জি. ডি. খোসলার 'Himalayan Circuit' বইখানি পড়ে নিও। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে বইখানি। শ্রীখোসলা মানালী থেকে হামতা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে লাহুলে আসেন। তারপরে তাঁরা স্পিতি উপত্যকা দর্শন করে বড়ালাচা অতিক্রম করে এই পথে কেলং আসেন। এখান থেকে তিনিও তাণ্ডি ও খোকসার হয়ে রোতাং পেরিয়ে মানালী ফিরে যান। ইদানীংকালে আর কেউ লাহুল হিমালয়ে এত দীর্ঘ পথ পরিক্রমা পূর্ণ করেছেন বলে জানা নেই আমার। তার চেয়েও বড় কথা, এ যুগে লাহুল-স্পিতি পদযাত্রার ওপরে এমন সুন্দর বই আর লেখা হয় নি। সময় করে তুমি কিন্তু শ্রীখোলসার বইখানি পড়ে নিও মানসী!

এবারে সংক্ষেপে তোমাকে জিস্‌পা ও পাতসেও মেলার কথা বলছি। ভাগা উপত্যকার একটি সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ জিস্‌পা। উইলো গাছে ছাওয়া ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। ভাগা নদী সেখানে অনেকটা প্রশস্ত। নদী থেকে কয়েকটি খাড়ি এসেছে গ্রামের ভেতরে। ফলে ক্ষেতগুলি বেশ উর্বর। ক্ষেত মানে, আলু গম ও যবের ক্ষেত। যব থেকেই বার্লি হয়, যে বার্লির জন্য যুগে যুগে প্রতিবেশী উপত্যকার রাজারা লাহুল আক্রমণ করেছেন।

জিস্‌পা থেকে হাঁটাপথে তুমি কোলং বেড়িয়ে আসতে পারো। দেখে আসতে পারো সেখানকার ঠাকুর রাজপ্রাসাদ। তৎকালীন কর্তা ঠাকুর প্রতাপচাঁদের আমন্ত্রণে শ্রীখোসলা জিস্‌পা থেকে কেলং আসার পথে গিয়েছিলেন কোলং। ঠাকুর প্রাসাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীখোসলা বলেছেন, বাড়িটি অনেকটা দুর্গের মতো। একটি চমৎকার উপত্যকার উচ্চতম স্থানে অবস্থিত। এই প্রাসাদের মন্দিরে শ্রীখোসলা একটি বিস্ময়কর বস্তু দেখেছিলেন। দু'ইঞ্চির মতো লম্বা একটি চীনামাটির বুদ্ধমূর্তি। বহু বছর আগে প্রতাপচাঁদের পিতা দালাই লামার কাছ থেকে মূর্তিটি নিয়ে এসেছেন। তখন মূর্তির মাথায় সিকি ইঞ্চির মতো লম্বা চুল ছিল। আর শ্রীখোসলা যখন মূর্তিটি দর্শন করেন, তখন সেই চুল প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের চুলের মতোই মূর্তিটির চুলও দিন দিন বড় হচ্ছে। মূর্তির চুল পরীক্ষার পরে শ্রীখোসলা বলেছেন—

'It looked and felt like real human hair, and grew out of the Buddha's head naturally–each individual hair sprouting from the scalp and joining the others to form loose trees hanging over the back in a realistic manner.'

হাইকোর্টের একজন বিচারপতির এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আমরা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করব মানসী!

যাক্ গে, এবারে জিসপার কথায় ফিরে আসছি। জিস্‌পাতে একটি বন-বিশ্রাম গৃহ আছে। সেখান থেকে রাস্তা চলে গিয়েছে জিংজিংবার (১৪,০০০´)। বেশ চওড়া পথ, অনায়াসে জীপ চলতে পারে। তবে এখনও যাতায়াত শুরু হয় নি। অবশ্য তুমি যখন কেলং আসবে, তখন হয়তো তুমি গাড়িতে করেই পৌঁছতে পারবে জিংজিংবার। শুধু তাই নয়,

অদূরে ভবিষ্যতে কেলং থেকে গাড়িতে করে লে পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

জিস্‌পা থেকে ভাগার তীর দিয়ে পথ। প্রাচীন হাঁটাপথে ৪ মাইল এগিয়ে দরচা গ্রাম— উইলো বন আর বার্লির ক্ষেতে ঘেরা সুন্দর একটি গ্রাম। সেখানে তোমাকে পেরোতে হবে দরচা ঝরণা।

দরচা গ্রাম থেকে পাতসেও ২০ মাইল। কিন্তু পথ মোটেই দুর্গম নয়। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে তুমি অসংখ্য আর্তেমিসিয়া গাছ দেখতে পাবে মানসী! রুপোলি-সবুজ সেই সব ঝোপ থেকে একটা চমৎকার গন্ধ বেরিয়ে সর্বদা সারা পথকে আমোদিত করে রাখে। আর্তেমিসিয়া ওষুধের গাছ। এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে স্যান্টোনিন রয়েছে।

শেষের ৮ মাইল সামান্য চড়াই এবং বৃক্ষলতাহীন বন্ধুর পার্বত্য পথ। তোমার মনে হবে মানসী, তুমি তিব্বতের কাছাকাছি চলে গিয়েছ! দু'খানি ঘর ও একটি বারান্দা নিয়ে পাতসেও বিশ্রামভবন (১২,৫৫০´)। বলা বাহুল্য বাথরুম এবং রান্নাঘর রয়েছে। রয়েছে আসবাবপত্র ও বাসনপত্র। পাথরের দেওয়াল ও টিনের চাল। তোমার কোনো কষ্ট হবে না সেখানে।

মালভূমিসদৃশ তৃণাবৃত উচ্চস্থানে বিশ্রামভবনটি অবস্থিত। প্রশস্ত উপত্যকার দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। অনেক নিচে বয়ে যাচ্ছে ভাগা। উপত্যকার দক্ষিণ দিকে তাকালে তুমি তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা ও একটি হিমবাহ দেখতে পাবে। দেখে মুগ্ধ হবে।

তাহলেও পাতসেও কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত নয়। কারণ এমন দৃশ্য তুমি লাহুল উপত্যকার বহু স্থানে দেখতে পাবে। পাতসেও বিখ্যাত ছিল তার প্রাচীন মেলার জন্য। তিব্বতের সঙ্গে যাতায়াত বন্ধ হবার আগে পাতসেও মেলা এ অঞ্চলের বৃহত্তম বাণিজ্য-সম্মেলন ছিল।

জেনারেল ব্রুস ১৯২০ সালে অগাস্ট মাসে তাঁর লাহুল অভিযানের সময় ঐ মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি সেই বিজন প্রান্তরে জনসমাবেশ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ভেড়া ও খচ্চরের পিঠে করে ব্যবসায়ীরা মালপত্র নিয়ে এসেছিলেন। কেবল ভোটিয়া ব্যবসায়ীদেরই পঞ্চাশটি তাঁবু পড়েছিল। তিব্বতীয় পশম, সোহাগা ও লবণের বিনিময়ে ভারতীয় শস্য কাপড় ও চায়ের কারবার হত সেখানে। দুর্ভাগ্যের কথা ভারত-তিব্বত যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে এই মেলাটিও এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

লাহুলের মেলা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে আমি এ চিঠি শেষ করছি মানসী! হিমালয়ের মানুষরা যে বড়ই মেলাপ্রিয়, তা তোমার অজানা নয়। তুমি জানো যে ওদের কাছে মেলা হল শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্মেলন। বলা বাহুল্য লাহুলের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সত্য। তাই জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে লাহুল পরিক্রমা করতে এলে তুমি কোনো-না-কোনো জায়গাতে মেলা দেখতে পাবেই।

সব মিলিয়ে লাহুল-স্পিতিতে বত্রিশটি উল্লেখযোগ্য মেলা হয়। এর মধ্যে দুটি ব্যবসাভিত্তিক, ঊনত্রিশটি ধর্মীয় এবং একটি জাতীয় উৎসব কেন্দ্রিক। বলা বাহুল্য শেষেরটি হয় এই কেলং শহরে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে। কেনাকাটার মতো নাচ-গানও ওদের মেলার অপরিহার্য অঙ্গ। পনেরোই অগাস্টের মেলার তাই লাহুল-স্পিতি জেলার শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীরা অংশ নিয়ে থাকেন। এঁদের অনেকে সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লীর উৎসবেও যোগদান করে থাকেন।

লাহুলের প্রায় প্রতি গ্রামেই বছরে অন্তত একটি করে মেলা হয়। দেওয়ালী, দশহরা,

দোল, রামনবমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি নানা উৎসব উপলক্ষে এই সব মেলা হয়। প্রধান সাতটি মেলা হয়—শানশা, গোন্ধলা, গুম্‌রং, গেমুর ও খাংসার গ্রামে এবং কেলং শহরে। এই মেলাগুলিতে এক থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত লোকের সমাগম হয়ে থাকে।

॥ নয় ॥

জেনে তুমি খুশি হবে মানসী, সেপাইজীর সুপারিশে শেষ পর্যন্ত জীপে খোকসার ফিরে যাবার টিকিট পেয়ে গেছি আমরা। শুধু তাই নয়, গাড়িতে যাতে একটু বসবার জায়গা পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থাও করেছেন সেপাইজী। তাঁর জয় হোক্।

টিকিট কেটে ফিরে আসি ট্যুরিস্ট-বাংলোয়। কিন্তু ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আর কতক্ষণই বা আছি এখানে। এরই মাঝে যতটা পারা যায়, কেলংকে দেখে নেওয়া যাক্। ঘরে ঢুকলে আর তাকে দেখতে পাবো না। তার চেয়ে বারান্দায় বসা যাক্। এখানে রোদ পড়েছে, বসতে ভালই লাগবে।

চৌকিদার ভেতর থেকে চেয়ার এনে দেয়। আমরা গোল হয়ে বসি। বসে বসে চারিদিকের হিমালয়কে দেখি—লাহুল-হিমালয়। দেখি আর তার গল্প করি। সেই গিল্পের কথাই লিখছি তোমাকে।

আজকের গল্পকার সেপাইজী। বিষয়বস্তু মৃত্যু। এদেশের মানুষ বোধ হয় 'মানুষ মরণশীল' কথাটা মেনে নিতে চান না। তাই তাঁরা কেমন করে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে চান, সেই গল্পই বলছেন সেপাইজী। বলছেন, 'ধরুন একজন রোগীকে বাঁচাবার সকল চেষ্টা বিফল হল। ওঝা, বদ্যি, পুরোহিত ও লামা সবাই বুঝতে পারলেন লোকটিকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। যমদূত তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন সেই মৃত্যুপথযাত্রীর আত্মীয়-স্বজনরা যমদূতকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা শুরু করেন।"

"কি রকম!" বিস্মিতা সুজয়া বলে ওঠে।

সেপাইজী একটু হেসে আবার বলতে শুরু করেন, "সে এক বিচিত্র উপায় বহিনজী! সেই মুমুর্ষু লোকটির সমান আকারের একটি মূর্তি তৈরি করা হয়। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরানো হয় সেই মূর্তিকে। তারপরে মূর্তিটিকে নিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় শবযাত্রা। পুরোহিত কিংবা লামা মন্ত্রপাঠ করতে করতে শবযাত্রার সঙ্গী হন, বাঁশি ও ঢোল বাজতে থাকে। মুমূর্ষুর আত্মীয়রা বাজি পুড়িয়ে ও বন্দুক ছুঁড়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

"শোভাযাত্রা নদীর তীরে পৌঁছয়। তখন মানুষের মতো করেই সেই মূর্তিকে দাহ করা হয়। তারপরে ভাড়া-করা কাঁদুনীরা কান্না জুড়ে দেয়। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে তারা সুর করে যমদূতকে উদ্দেশ করে বার বার বলতে থাকে—লোকটি ন' বছর আগে মারা গিয়েছিল, আজ তার সৎকরা করা হল। অতএব মৃত্যুদূত যেন ভুল করে আর কাউকে নিয়ে না যায়, সে যেন দয়া করে ফিরে যায়।"

"ভারী মজা তো।" সুজয়া বলে। "কিন্তু এতে কোনো ফল হয় কি?"

"কি জানি," সেপাইজী হাসেন। "ওরা তো বলেন হয়। আর একেবারে না হলেই বা এত হাঙ্গামা করবেন কেন? তবে শুনেছি যমদূতকে ফাঁকি দেওয়া নাকি খুবই কষ্টকর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারা যায় না। ফলে দু'বার করে শবযাত্রা ও শবদাহের ব্যয় বহন করতে হয় মৃতের পরিবারকে।"

"এদের শবযাত্রা বুঝি বেশ ব্যয়বহুল ?" সুজয়া প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" সেপাইজী উত্তর দেন, "মৃতদেহকে ভালো করে সাজাতে হয়। বাজনদার ও পেশাদার কাঁদুনী ছাড়া শবযাত্রা হয় না। কিন্তু শ্মশানে যাবার সময় কেউ কান্নাকাটি করে না। এদের শ্মশান মানেই নদীর তীর। তবে লোকালয় থেকে দূরে দাহ করা হয়।"

"কেলংয়ের শ্মশান কোথায় ?" সুজয়া আবার প্রশ্ন করে।

"ইস্তিংরী, এখান থেকে মাইল দু'য়েক দূরে, ভাগার তীরে। ভারী সুন্দর জায়গাটি।"

"তাই নাকি। তাহলে তো এখানকার মানুষদের ভারী মজা।" সুজয়া আনন্দে বলে ওঠে, "মারা যাবার পরে একটা সুন্দর জায়গায় শেষগতি হয় তাদের।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "এইজন্যই কলকাতার মরার কথা ভাবতে পারি না আমি। শ্মশান হবে উদার উন্মুক্ত ও রমণীয়, কি যেন নাম বললেন—ইস্তিংরী, হ্যাঁ, ঐ ইস্তিংরীর মতো।"

সুজয়া চুপ করে। সে যেন একটু অন্যমনস্ক। কি ভাবছে সুজয়া ? ইস্তিংরীর কথা কি ? লাহুলে আসার পর থেকেই দেখতে পাচ্ছি, সে মৃত্যুকে নিয়ে বড় বেশি চিন্তা করছে। কিন্তু কেন ? সে যে আমাদের সবার ছোট। সামনে তার সম্ভাবনাময় সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।

কিন্তু সেকথা বলার সুযোগ পাই না। ইতিমধ্যে সেপাইজী আবার বলতে শুরু করেছেন, "লাহুলের শবযাত্রাকে আপনি কিছুতেই শোকযাত্রা বলতে পারবেন না বহিনজী ! আপনার মনে হবে কোনো উৎসবের শোভাযাত্রা।"

"আচ্ছা এদেশে কি শ্রাদ্ধশান্তি হয় ?" সুজয়া স্বাভাবিক স্বরেই প্রশ্ন করে।

"হয় বৈকি। তবে গ্রীষ্মকালে কেউ মারা গেলে, তখন তাকে শুধু দাহ করা হয়। শ্রাদ্ধোৎসব হয় শীতকালে, কারণ তখন লাহুলীদের হাতে অন্য কোনো কাজ থাকে না। গ্রীষ্মকালে এদের এত কাজ করতে হয় যে শ্রাদ্ধের জন্য সময় নষ্ট করা সম্ভব হয় না মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের।"

সেপাইজী চুপ করেন। সুজয়াও চুপ করে আছে। সে তাকিয়ে আছে পথের দিকে। আমিও সেদিকে তাকাই। দেখতে পাই ওদের—একদল লাহুলী মেয়েকে। দিনের শেষে তারা ক্ষেতে কিংবা বনে কাজ সেরে ফিরে চলেছে ঘরে। ওরা ক্ষুধার্ত, ওরা ক্লান্ত, তবু ওরা হাসি আর গানে ভরে তুলেছিল রাজপথ। সহসা ওদের নজর পড়ে আমাদের দিকে। বুঝতে পারে আমরা দু'চোখ ভরে দেখছি ওদের। মুহূর্তে সংযত করে নিজেদের। আড়চোখে আমাদের দেখে আর ধীরে ধীরে পথ চলে। চলতে চলতে কি যেন বলাবলি করছে ওরা। সম্ভবতঃ সুজয়ার সম্পর্কেই কোনো আলোচনা। কিন্তু সে শুনতে পাচ্ছে না তাদের কথা। কেবল চেয়ে চেয়ে দেখছে।

আমরাও দেখছি ওদের। পরনে কালো পশমী পোশাক—আজানু লম্বিত কোর্তা ও সরু পায়জামা। কোমরে খানিকটা কাপড় কিম্বা দড়ি জড়ানো। নাকে কানে গলায় হাতে ও পায়ে পাথর আর রূপা কিম্বা পেতলের ভারি ভারি গয়না। কয়েকজনের পায়ে খড়ের জুতো, বাকি সকলের খালি পা।

তুমি হয়তো অবাক হবে মানসী, যে দেশে ধান হয় না, সে দেশের মেয়েরা খড়ের জুতো পরছে কেমন করে ? ধানের খড় নয়, যবের খড় দিয়ে জুতো তৈরি করে লাহুলীরা। প্রত্যেককেই তৈরি করতে হয়। কারণ শীতকালে লাহুলের সর্বত্র বরফ পড়ে। জুতো ছাড়া তখন হাঁটা-চলা করা সম্ভব নয়। অথচ চামড়া, কাপড় কিংবা রাবারের জুতো কেনার পয়সা

পাবে কোথায় ? লাহুলীরা যে বড় গরীব।

লাহুলের প্রধান ফসল যব, ভুট্টা ও আলু। যব থেকেই হয় বার্লি—লাহুলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর যবের খড় থেকে হয় দড়ি, সেই দড়ির জুতো পরে লাহুলীরা শীতকালে জীবনরক্ষা করে।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম—লাহুলী মেয়েরা আমাদের বারান্দা পেরিয়ে গেছে। এখন ওদের কেশবিন্যাশ দেখতে পাচ্ছি আমরা। প্রায় প্রত্যেকেই অনেকগুলি করে বেণী রচনা করেছে। তাই করে ওরা। শুনেছি অনেকে নাকি চল্লিশটি পর্যন্ত বেণী বুনে থাকে আর সোনার কাজ করা রূপোর চিরুনি মাথায় খোঁজে। তবে শীত এবং জলের দোষে লাহুলে খুবই চুল উঠে যায়। ছেলেমেয়ে প্রায় প্রত্যেকেরই একটু বেশি বয়সে টাক পড়ে যায়। এদের কারও মাথায় তেমন টাক দেখছি না অবশ্যি। দেখলে ব্যথিত হতাম। মেয়েদের ঠোঁটে সিগারেট আর মাথায় টাক নিঃসন্দেহে চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক।

লাহুলী মেয়েরা চলে গিয়েছে। আমরা আবার কথাবার্তা শুরু করেছি। কথায় কথায় লাহুলের প্রত্নতত্ত্ব এবং হিমালয়ের চিত্রকলা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। এবারে বক্তা সুজয়া। তোমাকে আগেই বলেছি মানসী, সে ইতিহাসের ছাত্রী এবং শিল্পী। তাই আমরা মযোযোগ দিয়ে তার বক্তব্য শুনছি। সে বলছে, "লাহুলের প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ে কিছু জানতে হলে, আপনাদের অন্তত কাংগানি, শাশুর এবং কারদাং মঠ দেখতে হবে। এই তিনটি মঠে রেশম, চমরী গরুর লেজ এবং শয়তানের মুখোসের ওপরে সাধু, দানব ও কদাকার পশুর চিত্র অঙ্কিত আছে। আছে তরোয়াল, ঢোল, করতাল প্রভৃতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। আর আছে বুদ্ধদেবের বিশাল বিশাল মূর্তি। সেগুলি না দেখলে লাহুলকে ঠিক জানা যাবে না।

"আরও অনেক কিছু দেখার আছে লাহুলে। যেমন মোরেভিয়ান মিশনের রেভারেন্ড ফ্রাঙ্কে (Rev. Francke) তাঁর 'History of Western Tibet' বইতে বলেছেন যে তিনি পাট্টান উপত্যকায় কয়েকটি পাথরের প্রাচীন মূর্তি পেয়েছেন। তিনি লাহুলে তেইশটি শিলালিপিও আবিষ্কার করেছেন। তবে সে লিপিগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত। সেগুলিতে ভক্ত লিপিকার হয় ভগবান অথবা লামা অর্থাৎ গুরুর কাছে প্রার্থনা করেছেন, নয়তো কেবলই কোন রাজা কিংবা রাণীর নাম লিখে রেখেছেন। রেভারেন্ড ফ্রাঙ্কের মতে কারদাং মঠের একটি শিলালিপি দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত। এ ছাড়াও লাহুলে তিনি নবম শতাব্দীর কয়েকটি সমাধি এবং পাথরে খোদিত বৌদ্ধশিল্প আবিষ্কার করেছেন।" সুজয়া থামে।

কিন্তু আমাদের সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখেই বোধ হয় সে আবার বলতে শুরু করে, "এবারে লাহুলের শিল্পকলার কথা বলছি। আপনারা জানেন, সেকালে উচ্চ-শতদ্রু উপত্যকার নাম ছিল গুগে রাজ্য। বৌদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও তৎকালীন বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওই গুগে রাজ্যে যান। তিনি তখন বৃদ্ধ। তবু রাজা 'থে-শে'র অনুরোধে বৌদ্ধধর্মকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবার জন্য তিনি দুর্গম পথ পেরিয়ে তিব্বতে যান। গুগে রাজ্যে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করে তিনি সেটিকে বিদ্যামন্দিরে পরিণত করেছিলেন। তাঁর গবেষণা এবং বিদ্যাচর্চার ফলে কিছুকালের মধ্যেই গুগে পশ্চিম হিমালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁরই পরামর্শে রাজা কাশ্মীর থেকে শিল্পী নিয়ে যান।

"আপনারা জানেন যে কাশ্মীরী শিল্পীরাই তিব্বতীয় শিল্পকলার পথিকৃৎ। কিন্তু কাশ্মীরের কমনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে তিব্বতের রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে

স্বভাবতই সেই শিল্পীদের শিল্পধারা পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকেই তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে মূর্ত করে তুলেছিলেন।

"স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তীকালে তিব্বতীয় শিল্পকলা লাদাখ ও লাহুল-স্পিতির শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছে। লাহুলী শিল্পীরাও নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য তাকে দেব-দেবীর মর্যাদা দিয়েছেন। প্রকৃতিকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁরা তাঁদের শিল্প-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। লাহুলের গেমূর গুম্ফায় একাদশ শতাব্দীর মারিচি বজ্রবিহারী এবং তায়ূল মঠে ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চরক্ষা দেবীর মূর্তি দর্শন করলে আমরা সেই শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারতাম। স্পিতির নাকো মঠের বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী, তাবো মঠের অবলোকিতেশ্বর এবং কী (Kye) মঠের ভূমি দেবতার (Lord of Soil) মূর্তি তিনটিও একই শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন। এই মূর্তি তিনটির নির্মাণকাল যথাক্রমে একাদশ পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী। লাহুল-স্পিতিকে জানতে হলে এইসব মঠগুলিও দর্শন করা দরকার। কিন্তু সময়াভাবে আমাদের আর তা হয়ে উঠল না। ফলে আমরা লাহুল বেড়িয়ে গেলাম বটে কিন্তু লাহুল দর্শন হল না আমাদের।" সুজয়া চুপ করে।

আমরাও চুপ করে থাকি। সুজয়া সত্যি কথাই বলেছে। আমরা যা দেখলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি না-দেখা রয়ে গেল লাহুলে। কিন্তু কি করব, আমরা যে একালের মধ্যবিত্ত পর্যটক। আমাদের সময় ও অর্থের অভাব। তার ওপরে রয়ে গেছে পিছুটান—ঘরে ফেরার তাগিদ।

মাস্টারজী ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। তাই তিনি আবহাওয়াটাকে হালকা করে তুলবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "তবু তো আপনারা লাহুল দেখে গেলেন, ক'জনেই বা এমনি দেখে যায়। হাজার হাজার দর্শনার্থী প্রতি বছর মানালী বেড়াতে আসে। তাদের এক-দশমাংস যদি লাহুলে আসত, তাহলে লাহুল অনেকখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারত। কেন তারা আসেন না জানেন?"

"জানি।" সুজয়া বলে, "লাহুলের কথা খুব সামান্যই জানেন তাঁরা। এমন বৈচিত্র্যময় উপত্যকা যে ভারতীয় হিমালয়ে বেশি নেই, সে খবর রাখেন না অনেকেই।"

"তাই তো বলছিলাম," মাস্টারজী বলেন, "নিজেদের থেকে সেই খবর যোগাড় করে অবহেলিত লাহুলে এসেছেন আপনারা। আপনারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

মাস্টারজীর কথাটা ভাল লাগে আমার। আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু সুজয়া একটু নীরব হেসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "আমাদের খুশি করতে চাইছেন?"

"খুশি হওয়া না-হওয়া আপনাদের," মাস্টারজী বলেন, "আমি সত্যি কথাই বলছি।"

"যাক্, আর সত্যাশ্রয়ী না হয়ে এবারে লাহুলের গাছপালা ও জীবজন্তুর কথা কিছু বলুন তো! কাল সকালেই তো চলে যাচ্ছি। বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে, কেলংয়ের কাছ থেকে।" শেষদিকে সুজয়ার স্বরটা যেন আবার গাঢ় হয়ে ওঠে।

মাস্টারজী বুঝতে পারেন তার ব্যথা। কেলংয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে কাল সকালে। সুজয়া বিরহকাতরা। তাই তিনি বলেন, "তাতে কি হয়েছে বহিনজী! আপনি তো বলেছেন, আবার আসবেন লাহুলে, এই কেলংয়ে।"

"আসব বৈকি, নিশ্চয়ই আসব। আমি আবার আসব লাহুলে।" সে একটু থামে। তারপরে কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা দমন করে স্বাভাবিক স্বরে বলে, "তবু কি জানেন, আসন্ন বিদায়টা বড় বেশি বলে মনে হচ্ছে। যাক্ গে, এবারে লাহুলের গাছপালা ও জীবজন্তুর কথা বলুন।"

মাস্টারজী আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করেন, "আপনারা দেখেছেন লাহুলে গাছপালা খুবই কম। কিন্তু আর্তেমিসিয়া, এফেড্রা, একোনিটাম প্রভৃতি ওষুধের গাছ যথেষ্ট জন্মায় এখানে। অন্যান্য গাছপালার মধ্যে এগারো হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে সাধারণতঃ নীল পাইন (Pinus Excelsa), পার্চ (Betula Utilis), উইলো (Salix Fragilis), পপলার (Populus Cibata Juglandeae), স্প্রুস (Picea Morinda), পাইরাস (Pyrus Pashia) এবং আখরোট (Juglans Regia Cupliferae) প্রভৃতি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। আপনারাও দেখেছেন।

"উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর ওষুধের গাছ ও ফুল দেখতে পাবেন। ইয়ারমারুস স্পেক্‌টাবিলিস ছাড়াও লাহুলের গোলাপ, জুনিপার ও রডোডেনড্রন দেখবার মতো। এগুলি সাধারণতঃ চোদ্দ হাজার ফুট পর্যন্ত জন্মায়। তার ওপরে প্রায় ষোলো হাজার ফুট পর্যন্ত জেনসিয়ান, একোমিয়াম, জুরিনিয়া, পলিগোনাম প্রভৃতি ফুল পাওয়া যায়।

"ষোলো হাজার ফুটের ওপরে গাছপালা নেই বললেই চলে। অবশ্য মাঝে মাঝে রেম (Rehm) গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই হল সংক্ষেপে লাহুলের গাছপালার কথা। এবারে আমি জীবজন্তুর কথা বলছি।" মাস্টারজী থামেন।

সুজয়া বলে ওঠে, "বলুন।" সে রীতিমত উৎসাহী। বিস্ময়কর জ্ঞানলিপ্সা ওর। কিন্তু সেকথা বলার উপায় নেই। উত্তর দেয়—'জানতে চাইব না, জানার যে শেষ নেই।'

যাক্‌ গে, আসল কথায় ফিরে আসি। সুজয়ার অনুরোধের উত্তরে মাস্টারজী বলতে আরম্ভ করেন, "বাঘ, নেকড়ে ও স্নো-লেপার্ড দেখতে পাওয়া যায় লাহুলে। পাহাড়ী শেয়াল প্রচুর আছে এখানে। আর রয়েছে বাদামী রংয়ের ভালুক এবং কস্তুরীমৃগ।"

"শুনেছি পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক আইবেক্স আছে?" সুজয়া প্রশ্ন করে।

"আগে ছিল, এখন আর তেমন নেই। শিকারীরা লাহুলের আইবেক্স প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। তবে স্পিতি উপত্যকায় নাকি এখনও কিছু আইবেক্স রয়েছে। ওদিকটায় শিকারীদের দৌরাত্ম্য কম কিনা!"

মাস্টারজী থামতেই নেতা জিজ্ঞেস করে, "আইবেক্স কি?"

"পাহাড়ী ছাগল—আকৃতিতে খুবই বড় বড়। স্থানীয় নাম তাংরোল।" সুজয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। তারপরে সে মাস্টারজীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা শুনেছি, লাহুলের বরালও নাকি খুব বিখ্যাত?"

"হ্যাঁ, তবে আইবেক্সয়ের মতো নয়। লাহুলে শিকারীদের প্রধান আকর্ষণই ছিল আইবেক্স। তাই আজকাল তাঁরা আর লাহুলকে তেমন পছন্দ করেন না।" মাস্টারজী একটু থামেন। তারপরে আবার বলেন, "শুধু বরাল নয়, আরও নানা জাতীয় পাহাড়ী হরিণ দেখতে পাওয়া যায় লাহুল-হিমালয়ে।"

কেউ আর কিছু বলতে পারার আগেই চৌকিদার চা নিয়ে আসে। আমাদের আলোচনা থেমে যায়। হাত বাড়িয়ে কাপটা নিই। চায়ে চুমুক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। গোধুলি নেমে এসেছে লাহুলে। কিছুক্ষণ পরেই ঐ তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার ওপারে চাঁদ উঠবে। লাহুল পরিণত হবে লীলাভূমিতে।

"আমি আবার আসব।...."

চমকে উঠি। সুজয়ার দিকে তাকাই। সে তাকিয়ে আছে লাহুল-হিমালয়ের দিকে। আপন মনে বলে চলেছে, "আমি আবার আসব, আসব লীলাভূমি-লাহুলে, আসব বড়া-

শিগ্‌রী হিমবাহে, এই কেলং শহরে। সেবারে সময় হাতে নিয়ে আসব। অনেক, অনেকদিন থাকব।"

আর কিছু বলে না সুজয়া। শুধু সে একই ভাবে তাকিয়ে রয়েছে ঐ তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার দিকে, যেখানে শেষ সূর্যের পরশ লেগে সোনার ছড়ছড়ি।

নীরব কিছুক্ষণ। হঠাৎ বোধ হয় সুজয়ার খেয়াল হয় আমাদের উপস্থিতি। তাড়াতাড়ি সজল চোখদুটি মুছে নিয়ে সে আমাদের দিকে তাকায়। কিন্তু কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে চুপ করে থাকে।

মাস্টারজী জিজ্ঞেস করেন, "আপনার কি লাহুল পরিক্রমা পূর্ণ হল না বহিনজী ?"

"না।" সুজয়া ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দেয়।

আমরা চুপ করে থাকি। একটু বাদে সুজয়া স্বাভাবিক স্বরে বলে, "কেমন করে পূর্ণ হবে বলুন, এত তাড়াহুড়া করে কি দেখা যায় ? তার ওপরে বড়া-শিগ্‌রী হিমবাহে তো যাওয়াই হল না। বড়া-শিগ্‌রীকে না দেখলে যে লাহুল দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।"

"আপনি আবার আসবেন ?" সেপাইজী জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ।" সুজয়া শান্তস্বর জবাব দেয়।

"একা ?"

"না। আসব কয়েকটি বাঙ্গালী মেয়েকে নিয়ে—আসব ললনা পর্বতাভিযানে।"

লাহুলের শেষ সূর্যের খানিকটা রক্তিম কিরণ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে এখানে। তারই একমুঠো সোনালী আলো সুজয়ার সুন্দর মুখখানিকে দিয়েছে রাঙিয়ে। মনে হচ্ছে যেন রক্ত।

চমকে উঠি। না, না, রক্ত নয়, রক্ত হবে কেন ? সুজয়ার মুখে রক্ত নয়, আলো—দিনান্তের সোনাঝরা আলো।

দিনের শেষে আলোটুকু গেল মিলিয়ে। সন্ধ্যা নেমে এলো লাহুলের মাটিতে। চৌকিদার এসে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

পথের আলো জ্বলল, বাড়ির আলো জ্বলল—কাছের ও দূরের, কেলং ও কারদাংয়ের।

তোমাকে আমি আগেই বলেছি মানসী, এপারে কেলং ওপারে কারদাং, মাঝখানে ভাগা। ভাগানদী অনেক নিচে বয়ে যাচ্ছে, প্রায় দু'হাজার ফুট নিচু দিয়ে। কেলং থেকে কারদাং পরিস্কার দেখা যায়। দিনে তো বটেই, রাতেও দেখা যায়। আলোর মালা গলায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কারদাংকে আমরা এখান থেকে চমৎকার দেখতে পাচ্ছি।

যাবার রাস্তাটি কিন্তু মোটেই সহজ নয়। ভাগার ওপরে একটি কাঠের পুল রয়েছে বটে। তবে অনেকটা নেমে গিয়ে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এপারের রাস্তাটা অবশ্য ভাল, নামা-ওঠা খুব একটা কষ্টকর নয়। কিন্তু ওপারে খাড়া পাকদণ্ডী। উঠতে দম বেরিয়ে যায় আর নামার সময় প্রতি পদক্ষেপে আছাড় খাবার সম্ভাবনা। তাহলেও কারদাংয়ের কাজের মানুষরা প্রতিদিন কেলং আসেন।

তোমাকে আমি আগেই বলেছি মানসী, লাহুলের প্রাচীন রাজধানী কারদাং এখন একটি গণ্ডগ্রামে রূপান্তরিত ! কিন্তু সেখানকার বাড়িগুলি দেখলে তুমি ভারী খুশি হবে।

তুমি কেলং এলে কিন্তু অবশ্যই কারদাং যেও মানসী ! কেবল সেখানকার গুম্ফা দেখতে নয়, কারদাং গ্রাম এবং তার অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হতে। তোমার খুবই ভাল লাগবে। গ্রামের চেয়েও ভাল লাগবে গ্রামের কর্মঠ মানুষগুলিকে। গ্রীষ্মকালে দেখবে নারী পুরুষ

সবাই কাজ করছে। দেখবে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি কাজ করছে। তারা গ্রামের লোহার তথা কামারের বাড়ি থেকে কাস্তে ধার দিয়ে নিয়ে গান গাইতে গাইতে মাঠে মাঠে যাচ্ছে। ফসল কেটে আনছে। শুকোতে দিচ্ছে বাড়ির ছাদে। আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিলে মাড়াই করছে। তারপরে ঝেড়েবেছে গোলাঘরে নিয়ে যাচ্ছে। পানি-চাক্কিতে নিয়ে গিয়ে পেষাই করে আনছে। সংসারের যাবতীয় কাজ করছে। আর অবসর সময় খড়ের জুতো কিংবা উলের জামা বুনছে।

এই প্রসঙ্গে তোমাকে আমি আর একটি কথা বলে নিই মানসী! আমাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার এখনও কিছু কিছু রয়ে গেছে লাহুলে। যেমন ধরো, লোহার গ্রামের সবাইকে অস্ত্রপাতি তৈরি করে দিচ্ছে কিন্তু কোনো পয়সা নিচ্ছে না। পরিবর্তে ফসল তোলার পরে প্রত্যেক চাষী তাকে খানিকটা করে ফসল দিয়ে আসে। তাতেই তার সারা বছরের খাওয়া-পরা চলে যায়।

লাহুলের যে কোনো পানি-চাক্কিতে গিয়ে তুমি দেখবে কোনো লোক নেই। গাঁয়ের মানুষরা নিজেরাই চাক্কি ঘুরিয়ে শষ্য পেষাই করে নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় পানি-চাক্কির মালিকের জন্য খানিকটা আটা কিংবা বার্লি রেখে যাচ্ছে নির্দিষ্ট পাত্রে।

সমাজের সবাই সবাইকে দেখবে, প্রত্যেকের সাহায্যে বেঁচে থাকবে প্রত্যেকে—এই তো তোমাদের সমাজতন্ত্রের মূল কথা মানসী! কিন্তু একথা তো দু'হাজার বছর আগেও সত্য ছিল আমাদের দেশে। আশ্চর্য, সেকথা ভুলে গিয়ে তোমরা আজ সেই সমাজতন্ত্রকেই আমদানী করতে চাইছ বিদেশ থেকে। আর তারই জন্য লিপ্ত হয়েছ আত্মকলহে।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম। কেবল কারদাং নয়, লাহুলের যে কোনো গ্রামে এলেই তুমি দেখতে পাবে, লাহুলীরা অতিশয় অতিথি-বৎসল। তারা তোমাকে আপ্যায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মজে যাওয়া মাখন আর পাহাড়ী নুন দিয়ে তিব্বতী চা বানিয়ে দেবে। খেতে তোমার খুবই কষ্ট হবে মানসী, হয়তো বা বমি আসবে। তবু কিন্তু তুমি ওদের আতিথেয়তার অপমান কোরো না। নাক টিপে কোনমতে গিলে ফেলো সেই চা। কারণ তিব্বতী চা হচ্ছে ওদের সর্বশ্রেষ্ঠ উষ্ণ পানীয়।

চা পানের পরে ওরা তোমাকে চোরতেন দেখাতে নিয়ে যাবে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই চোরতেন থাকে। এ থেকে নিশ্চয়ই তুমি ধর্মের প্রতি লাহুলীদের আন্তরিক আকর্ষণের কথা বুঝতে পারছো। আর সবচেয়ে মজা কি জানো, তুমি হিন্দু বাড়িতেও চোরতেন দেখতে পাবে। প্রকৃতপক্ষে লাহুলের হিন্দুরা অর্ধেক বৌদ্ধ আর বৌদ্ধরা অর্ধেক হিন্দু। ফলে ধর্মীয় বিভেদ সত্ত্বেও একই সমাজব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে লাহুলে। নিজ নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও এরা পরম সুখে পাশাপাশি বাস করছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু পুরোহিত বৌদ্ধ প্রতিবেশীকে তার ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। গাঁয়ের লামা হিন্দু গ্রামবাসীদের পূজা-পার্বণের দিন-ক্ষণ ঠিক করে দিচ্ছেন।

এই গেল লাহুলী সমাজের কথা। এবারে আমি একটু প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। লাহুলের প্রসঙ্গে হিমাচলের কথা বলছি, লীলাভূমি-লাহুল যে হিমাচল রাজ্যের একটি বৈচিত্র্যময় উপত্যকা।

নবগঠিত হিমাচল প্রদেশ দশটি জেলায় বিভক্ত—ক্লির, সিমলা, শ্রিমূর, বিলাসপুর, কাংড়া, মাণ্ডি, মহাসু, চাম্বা, কুলু এবং লাহুল-স্পিতি। রাজ্যের আয়তন ৩৫,৪১৫ বর্গমাইলের মতো। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এই রাজ্যের জনসংখ্যা

১৮,১০,০০০ জন। সিমলা এই রাজ্যের রাজধানী।

হিমাচল প্রদেশ হল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টাদশ রাজ্য। তেষট্টি জন সদস্য নিয়ে গঠিত রাজ্যের বিধানসভা। হিমাচলীরা তিনজন সদস্যকে লোকসভায় পাঠান। লাহুলীরা অংশ নিয়েছেন ভারতের নির্বাচনে।

একটা প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারিদিক। হিমাচলের কথা হারিয়ে গেল আমার মন থেকে। আমি ফিরে এলাম বাস্তবে। কেলং ট্যুরিস্ট-বাংলোয় বসে আমি তোমার কাছে চিঠি লিখছি মানসী!

আমার সহযাত্রীরাও অপ্রস্তুত। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। কিন্তু কিছু বলতে পারার আগেই আর একটা শব্দ, আবার শব্দ, আবার একটা। বার বার কেঁপে উঠেছি আমরা, কাঁপছে ট্যুরিস্ট-বাংলো কাঁপছে কেলং।

"কি ব্যাপার, যুদ্ধ-টুদ্ধ বেধে গেল নাকি?"

সেপাইজী হেসে ওঠেন। বলেন, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। যুদ্ধ নয়, এমন কি আপনাদের কলকাতার মতো কোনো বৈপ্লবিক ব্যাপারও নয়, নেহাতই নিরামিষ বিষয়—ব্লাষ্টিং হচ্ছে, ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙে বাসপথ তৈরি করা হচ্ছে।"

যাক্ বাঁচা গেল, যুদ্ধ বা বিপ্লব নয়। কিন্তু ঐ গুড়ুম শব্দটার প্রতি মনে এমন একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে যে কারণ জানার পরেও যেন ভয়টা কাটছে না। যদিও বুঝতে পারছি, ঐ শব্দটা ভাবীকালের সমৃদ্ধ লাহুলের আগমনধ্বনি।

ইতিমধ্যে পুবের পাহাড়ের পেছনে চাঁদ উঠেছে। সেদিন খোকসারে যে চাঁদকে দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। লাহুল আজও তেমনি মাটির পৃথিবী নয়, রূপকথার রাজ্য—লীলাভূমি-লাহুল।

তাহলেও সেদিনের লাহুলের সঙ্গে আজকের অনেক তফাৎ। সেদিন সবে শুরু হয়েছিল লাহুল পরিক্রমা, আর আজ হল শেষ। তাই আজ এমন অপলক নয়নে আমি তাকিয়ে রয়েছি তার দিকে। আর যে এমন করে তাকে দেখতে পাবো না কোনোদিন।

মানসী, আজ কেবল আমার লাহুল পরিক্রমা পূর্ণ হল না, সেই সঙ্গে শেষ হল এই পত্রমালা!

মানসী, আমি জানি না তুমি এখন কোথায়? জানি না, তুমি এখন কি করছ, কেমন আছো? সেদিন পাঠানকোট স্টেশনে তুমি জোর করে বিদায় নিয়েছিলে আমার কাছ থেকে। বলেছিলে, পথের পরিচয়কে নাকি পথেই শেষ করে দিতে হয়। পাছে কলকাতায় ফিরে, সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে, অমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি, তাই সেদিন তুমি তোমার ঠিকানাটা পর্যন্ত দাও নি আমাকে।

কাজেই তোমার কাছে লেখা আমার এই পত্রাবলী আমি পাঠিয়ে দিলাম প্রকাশকের কাছে। জানি এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হবার পরে তোমার হাতে পড়বেই। কারণ তুমি আজও আমার তেমনি অনুগত পাঠিকা।

আমি জানি না, এই পত্রমালা তোমার কেমন লাগবে? তবে এ থেকে যদি লাহুল সম্পর্কে তোমার কৌতুহল কিছুমাত্র চরিতার্থ হয়, তাহলেই আমার লেখনী সার্থক হবে, আমি ধন্য হব। তুমি তো জানো মানসী, পাঠক-পাঠিকার প্রয়োজনে লেখা। লেখক যেমন বেঁচে থাকতে চায় তার পাঠক-পাঠিকার অন্তরে, তেমনি আমি বেঁচে থাকতে চাই আমার মানসীর মনে।

॥ দশ ॥

কলকাতা-৩১

মানসী,

চার বছর আগে যে পত্রাবলীর শেষে যতি টেনেছিলাম ভাবি নি একদিন আবার তার জের টানতে হবে। ভাবি নি আনন্দময় যে কাহিনী সেদিন তুলে দিয়েছিলাম তোমার হাতে, তার শেষ অধ্যায় হবে এমন বেদনাদায়ক। কিন্তু আমার ভাবনায় কি এসে যায় ? অদৃষ্ট দেবতার নিষ্ঠুর বিধান না মেনে উপায় কি ! তাইতো আমাকে আজ আবার কলম নিয়ে বসতে হল মানসী ! কারণ তোমাকে সেই মর্মান্তিক সংবাদ না জানালে যে আমার সে পত্রমালা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

সেবার কেলং থেকে আমরা নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছিলাম ঘরে—সুজয়াও এসেছিল ফিরে। আসবেই তো ! পদযাত্রী এবং পর্বতারোহীরা তো ফিরে আসবে ভেবেই হিমালযে যায়। জানি, অনেক সময়ে অনেকে ফিরে আসেন না, যেমন আসেন নি আর্ভিন ও ম্যালোরী, আসেন নি আণিমাদি, আসে নি গৌরাঙ্গ ও অমর। তবু আমরা হিমালয়ে যাই, আর তা যাই ফিরে এসে আবার হিমালয়ে যাবো বলে।

ওরা ছয়জনও তাই গিয়েছিল। গিয়েছিল বিজয়িনীর বরমাল্য নিয়ে ফিরে আসতে। বলেছিল, ওরা সবাই আসবে ফিরে। আসবে বঙ্গললনার ঘরকুনো দুর্নাম ঘুচিয়ে, লাহুলের ললনা শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করে।

সবই করেছে ওরা। কিন্তু ওদের দুজন আর আসে নি ফিরে। আসে নি আমাদের মাঝে। লীলাভূমি-লাহুলের জলে স্থলে আর অন্তরীক্ষে তারা রয়ে গেছে চিরদিনের তরে।

সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথাই আজ আমি তোমাকে বলতে বসেছি মানসী, কিন্তু তার আগে তোমাকে অন্য কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।

তুমি তো জানো মানসী, লাহুল-হিমালয়ের পর্বতারোহণ ইতিহাসে মহিলা পর্বতারোহীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বিগত পনেরো বছরে চারটি মহিলা পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে লাহুল-হিমালয়ে। আর তার সব কয়টিই আয়োজিত হয়েছে বড়া-শিগ্রী হিমবাহ অঞ্চলে। এর দুটি অভিযানের কথা আমি তোমাকে বলেছি—জয়েস ডানশীথ এবং জোসেফাইন স্কারয়ের পর্বতাভিযান।

তার পরে দীর্ঘ আট বছর লাহুল-হিমালয়ে আর কোনো মহিলা পর্বতাভিযান আয়োজিত হয় নি। আট বছর বাদে ১৯৬৯ সালে তৃতীয় মহিলা পর্বতাভিযান পরিচালিত হল লাহুলে। আর তা পরিচালনা করলে তোমরা—বাংলার মেয়েরা

বাংলার প্রথম মহিলা পর্বতাভিযান আয়োজিত হয় ১৯৬৭ সালে, গাড়োয়াল-হিমালয়ের রোন্টি (১৯,৮৯৩´) শিখরে। শ্রীমতী দীপালী সিন্‌হা সে অভিযানের নেতৃত্ব করেছে। সুজয়া, আমাদের সুজয়া ছিল সে অভিযানের ম্যানেজার। লীলাভূমি-লাহুল দর্শন করে ফিরে এসে পরের বছরই সুজয়া সেই অভিযানের অংশ নিয়েছিল। বাঙ্গালী মেয়েরা যে বিশ্বের অন্য কোনো দেশের মেয়েদের চেয়ে কম কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও দুঃসাহসী নয়, তা প্রমাণিত হল রোন্টি অভিযানে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে সুজয়া দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে এ্যাড্‌ভান্স ট্রেনিং নিয়ে এলো। পর্বতারোহণের সর্বোচ্চ

সম্মানের অধিকারী হয়েও কিন্তু তার মন ভরল না। তাকে যে দু'বারই দার্জিলিং থেকে ট্রেনিং নিতে হল, অথচ উত্তরকাশী নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিংয়ের শিক্ষাক্রম নাকি ভারি মজার। কিন্তু তার পর্বতারোহণের দুটি শিক্ষাক্রমই শেষ হয়ে গিয়েছে।

তাতে কি হয়েছে? পড়াশুনায় যদি 'ডাব্‌ল এম. এ.' হওয়া যেতে পারে, তবে পর্বতারোহণে কেন 'ডাব্‌ল এ্যাড্‌ভান্স' হওয়া যাবে না? অতএব উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আবার ট্রেনিং নিতে হবে।

কিন্তু এবারে আর একা নয়। বাঙ্গালী মেয়েরা পর্বতারোহণে বড়ই পেছিয়ে রয়েছে। অতএব তার 'পথিকৃৎ' ক্লাবের মেয়েদের নিয়ে যেতে হবে উত্তরকাশী, পর্বতারোহণ শিক্ষা দিয়ে নিয়ে আসতে হবে তাদের।

ব্যাস, কাজ শুরু হয়ে গেল। 'হিমালয়ান ফেডারেশান'-এর মারফতে এক অভিনব শিক্ষাক্রমের প্রস্তাব সে পেশ করল 'ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান'-এর কাছে।

ফাউন্ডেশান মঞ্জুর করল তার প্রস্তাব। উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের মারফতে আয়োজিত হল সেই বিশেষ শিক্ষাক্রম। এ ধরনের শিক্ষাক্রম ভারতে এই প্রথম। আর তারই ফলে সুজয়া একই সঙ্গে দশটি মেয়েকে পর্বতারোহণ শিক্ষায় শিক্ষিতা করে আনতে পারল। পশ্চিমবাংলার পক্ষে এটি একটি মস্ত গৌরবের বিষয়।

'পাহাড়ে মেয়েরা' নামে কয়েকটি ধারাবাহিক রচনায় সুজয়া সেই বৈচিত্র্যময় পর্বতারোহণ শিক্ষা-শিবিরের কথা লিখেছে। তুমি নিশ্চয় 'অমৃত' পত্রিকায় তার সেই সুন্দর রচনাসম্ভার পাঠ করেছো মানসী!

পরের বছর। অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে সুজয়া রূপকুণ্ড (১৬,৩০০´) ও গোনাতাল দর্শনের পরে কুয়ারী গিরিপথ অতিক্রম করে। এই পদযাত্রার কথা তার 'রূপকুণ্ড ও কুয়ারী' রচনায় প্রকাশিত হয়েছে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে। জানি না, তুমি সে রচনাটি পড়েছো কিনা? তাই তার কয়েকটি অংশ আমি উদ্ধৃত করছি এখানে। এই উদ্ধৃতি থেকে তুমি হিমালয়ের প্রতি তার আন্তরিক প্রীতি ও অপরিসীম শ্রদ্ধার আরেকবার পরিচয় পাবে মানসী!

গোনাতালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সুজয়া লিখেছে ঃ 'নৌকায় ভাসতে ভাসতে দেখলাম, "নন্দাঘুন্টি"র (২০,৭০০´) শুভ্র শিখর ছুঁয়ে নব অরুণোদয়, দেখলাম মৈথানার বুকে রক্তিম সূর্যাস্ত। গভীর রাতে বাংলোর বারান্দা থেকে তাকিয়ে দেখি—হ্রদের শ্যামল কোমলতায় রুপোলী চাঁদের অবগাহন।'

কুয়ারী গিরিপথের ওপরে দাঁড়িয়ে সুজয়া 'হিমালয়ে সেই সুবিশাল প্যানোরমার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে' রইল। সে দেখতে পেলো, 'পুঞ্জীভূত উর্মিমালার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে হারিয়ে গেল শুভ্র পর্বতশীর্ষ, মিলিয়ে গেল সুনীল আকাশ। হিমালয়ের অস্তিত্ব মুছে গেল, পরাভূত সূর্য বিদায় নিল। বেদনার্ত হৃদয়ে অন্তরীক্ষে বিরাজিত গিরিরাজের পদপ্রান্তে প্রণতি জানিয়ে নেমে চললাম তপোবনের পথে।"

তারপরেই ১৯৭০ সালের মহিলা লাহুল অভিযান। সে অভিযানের কথা বলার জন্য আজ আমি আবার তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসেছি মানসী!

কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে আর একটি অভিযান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই। কারণ একটু আগে বলতে গিয়েও সে অভিযানের কথা বলা হয়ে ওঠে নি আমার।

জোসেফাইন স্কার-য়ের আট বছর পরে লাহুল-হিমালয়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা

অভিযান আয়োজিত হল। রোন্টি অভিযানের নেত্রী দীপালী সিন্‌হা এই অভিযানের নেতৃত্ব করে। দলের অন্যান্য পর্বতারোহীরা হল—লক্ষ্মীপাল, দীপ্তি সেনগুপ্তা, শীলা ঘোষ, স্বপ্না মিত্র এবং জি ভারালক্ষ্মী। ওদের সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার তপন দত্ত—অভিযানের মেডিক্যাল অফিসার।

বড়াশিগ্‌রী হিমবাহ অঞ্চলের ২১,৭৬০ ফুট উঁচু একটি নামহীন শৃঙ্গকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়েছিল এই অভিযান। ভারতীয় পর্বতারোহীরা চিরকাল লাহুল-হিমালয়কে অবহেলা করে এসেছে। তা সত্ত্বেও দীপালী লাহুলে অভিযান করেছে। কাজেই আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রসঙ্গে আর একদল বাঙ্গালীর কথাও তোমাকে বলে নেওয়া দরকার। তাঁরা অবশ্য গিয়েছিলেন সুজয়াদের পরে। এবং তাঁদের সে অভিযান পর্বতাভিযানও নয়। তাঁদের তুমি পর্যবেক্ষক বলতে পারো। ওঁরা পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন যে ছোটাশিগ্‌রী হিমবাহ অঞ্চলে ভবিষ্যতে কোনো পর্বতাভিযান পরিচালনা করা যায় কিনা? আনন্দের কথা, তাঁদের সে সমীক্ষা সফল হয়েছে।

আসানসোলের 'মাউন্টেন লাভারস অ্যাসোসিয়েশন' এই যাত্রা আয়োজন করেছিলেন। পর্বতারোহী প্রশান্ত চক্রবর্তী সেই সন্ধানীদলের নেতৃত্ব করেছেন। অন্যান্য সদস্যরা হলেন—মনোজ ভৌমিক, চৌধুরী আবদুর রহিম, প্রাণেশ চৌধুরী, সুব্রত ঘোষ এবং বিশ্বনাথ ঘোষ। তাঁরা ১৮ অক্টোবর (১৯৭০) তারিখে ১৬,২৫০ ফুট উঁচু সারাউম্‌গা লা (Saraumgaa La) অতিক্রম করেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত এই গিরিবর্ত্মটি ছোটাশিগ্‌রী এবং তোষ হিমবাহকে যুক্ত করেছে। ইতিপূর্বে আর কোনো ভারতীয় অভিযাত্রীদল এ গিরিবর্ত্মে অতিক্রম করতে পারেন নি।*

এবারে সুজয়াদের কথায় ফিরে আসা যাক্। তুমি তো জানো মানসী, লাহুল-হিমালয়ের প্রতি সুজয়ার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তাই সেবারে লীলাভূমি-লাহুল পরিক্রমার সময় সে বার বার বলেছে—'আমাকে আবার আসতে হবে লাহুলে।...আসব কয়েকটি বাঙ্গালী মেয়েকে নিয়ে—আসব ললনা অভিযানে।—অনেক, অনেকদিন থাকব।"

সুজয়া তার কথা রেখেছে মানসী, আর সেই কথা বলার জন্যই আজ কলম নিয়ে বসেছি আমি। তুমি তো জানো যে সুজয়া বড়াশিগ্‌রী হিমবাহ অঞ্চলের ২০,১৩০ ফুট উঁচু একটি নামহীন শৃঙ্গের নাম রেখেছিল 'ললনা'। ৩২° ১৪´ ৫´´ উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৭° ৩২´ ২০´´ পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই গিরিশৃঙ্গটি।

অভিযানের দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব পূর্ণ হল। চারজন উচ্চশিক্ষিতা পর্বতারোহী ও জনৈকা মহিলা ডাক্তারকে নিয়ে সুজয়া দল গঠন করল—মহিলা লাহুল অভিযাত্রী দল। সুজয়া ছাড়া অভিযানের অন্যান্য সদস্যারা হল—সুদীপ্তা সেনগুপ্তা, কমলা সাহা, নীলু ঘোষ, শেফালি চক্রবর্তী ও ডাক্তার পূর্ণিমা শর্মা। এটি বাংলা দেশের তৃতীয় মহিলা পর্বতাভিযান, কিন্তু প্রথম 'অল লেডিজ এক্সপিডিশান'—কারণ এর আগের মহিলা অভিযান দুটিতে পুরুষ ডাক্তাররা ছিলেন মেডিকেল অফিসার।

২৫শে জুলাই (১৯৭০) দিল্লী-কালকা মেলযোগে সুজয়ারা সিমলা রওনা হল। অসংখ্য

---

* ১৯৭৬ সালে সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী আবার সারাউম্‌গা লা অতিক্রম করেছেন। ছিয়াত্তর বছরের প্রবীন পর্বতারোহী শৈলেশ চক্রবর্তী এই দলে ছিলেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী সেদিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে ওদের বিদায় দিলেন গৌরবময় প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায়। সেপ্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু সেকথা এখন থাক্, তার আগে তোমাকে সেই গৌরবময় অভিযানের কথা বলে নিই।

সিমলা হয়ে ২৯শে জুলাই রাত ন'টায় সময় মানালী পৌঁছল ওরা। অত রাতে মানালীতে আশ্রয় পাওয়া খুবই দুস্কর, তা তোমার অজানা নয় মানসী ! সেদিন রাতে তাদেরও কোনো আশ্রয় জুটল না। কিন্তু তাতে ওদের কি এসে যায় ? ওরা বঙ্গ-ললনা হলেও পর্বতারোহী। তাই যে 'বাস'-য়ে করে সিমলা থেকে মানালী গিয়েছিল, সেই 'বাস'-য়ে শুয়েই রাত কাটিয়ে দিল বাঙ্গালী মেয়েরা।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য ছয় দিন মানালী থাকতে হল তাদের। শেষ পর্যন্ত মানালী পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া পাওয়া গেল, যোগাড় হল পনেরোটি ঘোড়া ও আটজন কুলি। তাদের মধ্যে ছ'জন কুলির উচ্চহিমালয় সম্পর্কে সাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল।

তুমি শুনে অবাক হবে মানসী, এই অভিযানে ওরা কোনো শেরপা নেয় নি। কেন নেয় নি জানো ? ওরা শেরপাদের সাহায্যে পাহাড়ে উঠতে চায় নি, আপন শক্তিতেই ললনা শিখরে আরোহণ করার দুর্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল।

মানালী থেকে যাত্রা শুরু হল ৫ই আগস্ট। একটি ট্রাক-য়ে চড়ে ওরা রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে বেলা দটোর সময় পৌঁছল গ্রামফু। সেই গ্রামফু মানসী, মাউন্টেনিয়ার মিস মালিনীর আগে যেখানে পৌঁছাবার জন্য সুজয়া সেদিন আমাদের সঙ্গে পাকদণ্ডী পথে ছুটে নেমেছিল। এবারে কিন্তু আর তাকে হাঁটতে হয় নি। কারণ ১৯৬৯ সাল থেকেই বাস যাতায়াত শুরু হয়েছে রোতাংয়ের ওপর দিয়ে। এখন তুমি বাসে চেপে মানালী থেকে জিস্পা পর্যন্ত চলে যেতে পারো।

এবারে কিন্তু সুজয়া আর খোকসারে গেল না। গ্রামফুতেই রাত কাটালো। পরদিন সকালে শুরু হল পদযাত্রা ১০.৫ মাইল হেঁটে তারা ছেতরু (১৭,৮০০´) পৌঁছল। পথ তো তোমার অজানা নয় মানসী ! চন্দ্রানদীর তীর দিয়ে পথ—খোকসার থেকে স্পিতি উপত্যকার পথ।

তার পরদিন অর্থাৎ ৭ই অগাস্ট সকালে ওরা রওনা হল ছেতরু থেকে ১০মাইল হেঁটে উপস্থিত হল ছোটাধারা—১২,১০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত একফালি সমতল প্রান্তর।

৮ই অগাস্ট সকালে সেখানকার বিপজ্জনক ঝুলা পেরিয়ে চন্দ্রানদীর অপর তীরে পৌঁছল—পৌঁছল বড়াশিগ্রী হিমবাহে, মহিলা লাহুল অভিযানের মূল-শিবিরে (১২,৭০০´)।

কিন্তু সেদিন শিবির স্থাপন করতে পারল না। করবে কেমন করে ? যে পথে অভিযাত্রীরা সেখানে গিয়েছে, সে পথে তো মালবাহী ঘোড়া যেতে পারে না। ঘোড়ার পক্ষে সেই ঝুলা পার হওয়া সম্ভব নয়। ঘোড়াগুলিকে তাই নিয়ে যেতে হল বাতাল, স্পিতির দিকে আরও দশ মাইল। সেখানে পুল পেরিয়ে আবার আট মাইল পেছিয়ে এসে ঘোড়াকে পৌঁছেতে হবে মূল-শিবিরে। একদিনে আসা সম্ভব নয়। কাজেই সেদিন ঘোড়াগুলি পৌঁছল না সেখানে। পৌঁছল না তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম। ফলে সেই হিমশীতল হিমবাহ অঞ্চলে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হল কলকাতার মেয়েদের।

বড়শিগ্রী হিমবাহ স্নাউট (Snout) উঃ উঃ পূর্বে (N.N.E.) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের মূল-শিবির। ছোট ছোট নুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট উঁচু পর্যন্ত বিরাট বিরাট পাথরে

ঢাকা ছিল হিমবাহের সে জায়গাটি। তার মানে বড়শিগ্‌রী হিমবাহের গ্রাবরেখার ওপরে স্থাপিত হল এই শিবির।

স্পিতি ভাষায় বড়াশিগ্‌রী শব্দের অর্থ হল, পাথরে ঢাকা হিমবাহ। সুদীপ্তা বলেছে, সার্থকনামা বড়াশিগ্‌রী। খাদগুলির ভেতরে ছাড়া আর কোথাও বড় একটা বরফ দেখতে পাওয়া যায় না। সবটাই পাথরে ঢাকা। কিন্তু বড়াশিগ্‌রী হিমবাহের রূপ বর্ণনা করবার জন্য তো আজ আমি কলম নিয়ে বসি নি মানসী! আর তা করবার কোনো প্রয়োজনও নেই। এই পত্রমালার প্রথম দিকে আমি তোমাকে বলেছি বড়াশি্‌গরীর কথা। আজ তাই যাদের কথা বলতে বসেছি, তাদের কথাই বলছি তোমাকে।

৯ই অগাস্ট সুজয়া, সুদীপ্তা ও কমলা এক নম্বর অগ্রবর্তী মূল শিবিরের স্থান নির্বাচন করল। স্থানটি ছিল বড়াশিগ্‌রী ও তার প্রথম উপ-হিমবাহের সংযোগস্থলে ১৩,১০০ ফুট উঁচুতে। পরদিন কুলিরা সেখানে মালপত্র ফেলে এলো। ১১ অগাস্ট বর্ষণকে উপেক্ষা করে অভিযাত্রীরা শিবির প্রতিষ্ঠা করল।

সুদীপ্তা, কমলা ও শেফালীকে নিয়ে পরদিনই সুজয়া স্থাপন করল দু'নম্বর অগ্রবর্তী মূল-শিবির। বড়শিগ্‌রী ও তার দ্বিতীয় উপ-হিমবাহের মিলনস্থলে ১৩,৭০০ ফুট উঁচুতে স্থাপিত হল এই শিবির। সুজয়া এই উপ-হিমবাহটির নাম রাখল 'ললনা হিমবাহ'। কারণ সেটি তার ললনা শৃঙ্গ থেকে সৃষ্ট হয়ে বড়াশিগ্‌রীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে।

খারাপ আবহাওয়া এবং পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমাগত পাথর গড়িয়ে পড়বার জন্য ওদের দুটি দিন নষ্ট হয়ে গেল। দু'দিন ওরা তাঁবুর বাইরে বেরোতে পারল না। দু'দিন পরে প্রকৃতি শান্ত হল। সেদিন স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য-প্রভাতে নতুন উদ্যমে আবার আরম্ভ হল অভিযান। ১৬,১০০ ফুট উঁচুতে এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচিত হল। কুলিরা মালপত্র রেখে এলো সেখানে। কিন্তু ফেরার পথে পাথর পড়ে আহত হল একজন কুলি। তাকে পাঠিয়ে দিতে হল মানালী। অভিযানের এই অবস্থায় আটজন কুলি থেকে একজন কমে যাওয়া কতখানি ক্ষতিকর, তা তুমি বুঝতে পারবে মানসী!

১৬ই অগাস্ট নীলু এবং পূর্ণিমা এলো নিচের শিবিরে। কমলাকে নিয়ে সুজয়া চলে গেল নবনর্বাচিত এক নম্বরে আর সুদীপ্তা ও শেফালী রইল দু'নম্বর অগ্রবর্তী শিবিরে। এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার মানসী, সুজয়া ছিল সবার চেয়ে বয়সে বড়। সে তার সব সাথীকেই ভালবাসত। প্রকৃতপক্ষে অভিযানকালে সে-ই ছিল তাদের অভিভাবক। তা হলেও কমলার প্রতি তার টানটা যেন একটু বেশি ছিল। সর্বদাই সে তাকে সঙ্গে রাখত। এজন্য অনেক সময় অন্য সদস্যরা ঠাট্টা করত সুজয়াকে। ওরা বলত, 'আপনি কমলাকে আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন সুজয়াদি!' সুজয়া হেসে উত্তর দিত, 'আমি তোমাদের প্রত্যেককেই ভালবাসি। তবে কমলি তো তোমাদের চেয়ে ছোট, তাই ওকে আমি চোখে চোখে রাখি। তাছাড়া তোমরা তো জানো, কমলি বড় ভাল মেয়ে—লেখাপড়ায় ভাল, খেলাধুলায় ভাল, পর্বতারোহণে ভাল।' ওরা সঙ্গে সঙ্গে সুজয়া জিজ্ঞেস করত, 'আমরা বুঝি ভাল নই?' সুজয়া অবার হাসত। বলত, 'ভাল, তবে কমলি তোমাদের চেয়ে একটু বেশি ভাল।'

ওরা কিন্তু রাগ করত না সুজয়ার কথায়। কমলিকে নিয়ে তাদের সবারই গর্ব। বস্তুত কমলি ছাড়া অভিযান অচল। কমলিকে তারা প্রত্যেকেই ভালোবাসে। তাহলে কমলার প্রতি সুজয়ার ভালোবাসাটা বোধ হয় একটু বেশি ছিল। সে সর্বদা তাকে কাছে কাছে রাখতো, মানসী! আজও তাই রেখেছে। কিন্তু সেকথা এখন নয়, তার আগে যে অনেক কথা বলার

আছে তোমাকে।

১৭ই অগাস্ট সুদীপ্তা এক নম্বর শিবিরে এসে দুজয়াদের সঙ্গে যোগ দিল। পরদিন সকালে ওরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দু' নম্বর শিবিরের জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও যোগ্যস্থান পাওয়া গেল না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ১৭,০০০ ফুট উচ্চতায় দুটি বিরাট বিরাট গহ্বরের মাঝখানে একফালি সংকীর্ণ তুষারাবৃত স্থান নির্বাচিত করল। সেখানেই স্থাপিত হল অভিযানের দু'নম্বর শিবির। এই জায়গাটুকু ললনা শৃঙ্গের পাদদেশে, একটা প্রস্তর প্রাচীরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত।

১৯শে অগাস্ট ১৮,০০০ ফুট উঁচুতে, ললনা শৃঙ্গের পূঃ উঃ পূর্বে (E.N.E.) তিন নম্বর অর্থাৎ অভিযানের শিখর-শিবির প্রতিষ্ঠিত হল। এই শিবির স্থাপনের সময় সুদীপ্তা একটা গভীর তুষারগহ্বরে পড়ে গিয়ে কোনোমতে বেঁচে গেল।

সেদিন রাত থেকেই শুরু হল তুষারপাত। পরদিন সকালে উঠে ওরা দেখতে পেল, এক রাত্রির মধ্যে এক ফুটের ওপর তুষার পড়েছে। বাধ্য হয়ে ওদের সারা দিনটা শিবিরে বন্দী হয়ে থাকতে হল।

দিনটা নষ্ট হল রাতটাকে নষ্ট করল না ওরা। রাত একটার সময় সুজয়া স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানাতে বসল। তুমি ভাবতে পারো মানসী, আঠার হাজার ফুট উঁচুতে, তাপাঙ্ক যেখানে হিমাঙ্কের নিচে, সেখানে রাত একটার সময় স্টোভ জ্বালিয়ে বসেছে একটি বাঙালি মেয়ে, যে বাপের বাড়িতে কখনও কোনো কষ্ট পায় নি—যার স্বামীর সংসারে সুখের সীমা নেই! তাই মাঝে মাঝে আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম, কেন এত কষ্ট করে সুজয়া? জিজ্ঞেস করলে সে কি বলত জানো? বলত, 'আমি যে হিমালয়কে ভালোবাসি, তাই হিমালয়ের দেওয়া সকল দুঃখ-কষ্টকে সানন্দে মাথা পেতে গ্রহণ করি।'

যাক গে, যে কথা বলছিলাম। বরফ গলিয়ে জল গরম করতে ঘন্টাখানেক কেটে গেল। ঠিক দুটোর সময় কাজুবাদামের সঙ্গে সুজয়া গরম চা-এর মগ এগিয়ে দিল সহযাত্রীদের সামনে। অগত্যা সুদীপ্তা ও কমলাকেও উঠে বসতে হল। চা খেয়ে পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিতে প্রায় ঘন্টাদুয়েক কেটে গেল।

ভোর চারটের সময় চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হল অভিযাত্রীরা। দু'জন কুলিকে নিয়ে ওরা তিনজন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে চলে। প্রবল বাতাসকে উপেক্ষা করে দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে এগিয়ে চলে তিনটি বাঙ্গালী মেয়ে। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর হাতছানিকে অবহেলা করে ওরা দুর্বার বেগে অগ্রসর হতে থাকে ললনা শিখরের দিকে। ললনা, সুজয়ার স্বপ্ন-শিখর।

সূর্যোদয় হচ্ছে, লীলাভূমি-লাহুলে সূর্য উঠেছে—বাঙালীর জয়সূর্য। সকৃতজ্ঞ চিত্তে ওরা আগামী দিনের দিবাকরের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায়। তারপর আবার এগিয়ে চলে।

ওরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরোহণ করে শিখর-শিরায় উপস্থিত হল। শিরাটা খুব খাড়া নয়, কাজেই অক্লেশে আরোহণ করতে পারল।

সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ওদের অগ্রগতি ব্যাহত হল। সামনে একটা খাড়া কঠিন বরফের দেয়াল পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা আবার তুষারধস নামার মতো। তাহলেও ওরা ফিক্সড রোপ (Fixed rope) করে সেই তুষার ও প্রস্তরপূর্ণ জায়গাটা পেরিয়ে যেতে পারল।

ইতিমধ্যে সূর্য উঠেছে। চমৎকার আবহাওয়া। ওরা পরমানন্দে আরোহণ করতে

থাকল। ডানদিকে খানিকটা বেঁকে একেবারে ললনা শিখরের পূর্বদিকে উপস্থিত হল।

শিখর থেকে যখন মাত্র শ'পাঁচেক ফুট নিচে, তখন ওদের সব দড়ি ফুরিয়ে গেছে। কাজেই আর ফিক্সড রোপ করা সম্ভব নয়। অথচ জায়গাটা বড়ই দুর্গম। খাড়া পর্বতগাত্র, হাঁটু সমান তুষার আর বড় বড় পাথরে বোঝাই।

তাই বলে হার মানল না ওরা। বিলে (Belay) করে করে সেই দুর্গম জায়গাটা অতিক্রম করে অভিযাত্রীরা একেবারে শিখরের মাত্র ফুট দশেক নিচে উপস্থিত হল। সেখানে কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিল। তারপরে....

তারপরে সুজয়া সুদীপ্তাও কমলা আরোহণ করল ললনা শিখরে—ওদের স্বপ্ন শিখরে। ভারতীয় পর্বতারাহণের ইতিহাসে আর একটি অধ্যায় লিখিত হল। ১৯৭০ সালের ২১শে অগাস্ট তারিখটা অক্ষয় হয়ে রইল সে ইতিহাসের পাতায়—অক্ষয় হয়ে রইল সুজয়া, সুদীপ্তা ও কমলার নাম, সেই সঙ্গে 'পথিকৃৎ' ও দলের অন্য অভিযাত্রীদের নাম।

বঙ্গ-ললনারা লাহুল-ললনাকে প্রণাম জানালো। তারপর ললনা শিখরে তারা পথিকৃৎ-য়ের পতাকা প্রোথিত করল। তিব্বতী ওড়না (Khada), চকোলেট ও ফলের রস দিয়ে তারা ললনাকে পূজা করল। একটুকরো কাগজে সদস্যাদের সবার নাম লিখে, সেটি একটা জলের বোতলে ভরে শিখরে স্থাপন করল। তারপরে শিখরে দাঁড়িয়ে প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে ওরা চারিদিকের মনোরম দৃশ্য দর্শন করল। প্রাণভরে দেখল বড়াশিগ্রী হিমবাহ আর লাহুল-হিমালয়কে—লীলাভূমি-লাহুলকে। সুজয়ার অনেক দিনের সাধ মিটল। তার স্বপ্ন সফল হল।

প্রায় পাঁচ ঘন্টা একটানা অবতরণের পরে অভিযাত্রীরা ফিরে এলো শিবিরে। সেদিন তাদের প্রায় বারো ঘন্টা আরোহণ এবং অবরোহণ করতে হয়েছে। কি বিস্ময়কর শক্তি, সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা!

২৩ শে অগাস্ট বিকেলে শিখর বিজয়িনীরা ফিরে এলো মূল-শিবিরে, মিলিত হল শেফালী নীলু ও পূর্ণিমার সঙ্গে। ওদের মিলনানন্দে মুখরিত হয়ে উঠল বড়াশিগ্রী হিমবাহ। তারুণ্যের জয়গানে উদ্বেলিত হল লাহুল—সুজয়ার লীলাভূমি-লাহুল।

পর্বতারোহণ শেষ হলেও পর্বতাভিযান হয় নি শেষ। অভিযান শেষ হয় অভিযাত্রীরা ঘরে ফিরে এলে। তার তখনও অনেক বাকি। তোমাকে আমি আগেই বলেছি মানসী, শেরপাদের সাহায্য ছাড়াই ওরা এই অভিযান পরিচালনা করেছে! মাত্র সাতজন কুলির সাহায্যে ওরা ললনা শিখরে আরোহণ করেছে। পনেরোটি ঘোড়া ওদের মালপত্র মূল-শিবিরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। কাজেই সাজসরঞ্জাম নিয়ে আসার জন্য কয়েকটি ঘোড়া চাই। তাই পরদিন সকালে লামা তাসি নামে একজন কুলিকে ওরা বাতাল পাঠিয়ে দিল। সে বিকেলে ঘোড়া নিয়ে আসবে। কাল সকালে ওরা রওনা হবে ঘরে, যার চেয়ে আপনার ঠাঁই নেই এই বিশ্বসংসারে।

বিকেলের আগেই বাঁধা-ছাদা শেষ করে ফেলল। কিন্তু তাসি ফিরে এলো না সেদিন। 'কাল আসবে'—এই আশায় বুক বেঁধে ওরা রাত অতিবাহিত করল। পরদিন সকাল থেকেই শুরু হল প্রতীক্ষা। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। সকল প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল, তাসি এলো না ফিরে।

ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না। সুজয়া জানে, অতিরিক্ত রোজগারের জন্য কুলিরা অনেক সময়ে এমন করে। একটা দিন নষ্ট করতে পারা মানে এক দিনের বাড়তি মজুরি পাওয়া। তাই রাতে সে সবার সঙ্গে আলোচনায় বসল। সাব্যস্ত হল, পরদিন সকালে শেফালী ও

কমলাকে নিয়ে দু'জন কুলিসহ সুজয়া নিজে বাতাল যাবে ঘোড়ার খোঁজে। যেমন করেই হোক্ ঘোড়া যোগাড় করে আনবে।

পরদিন—২৬শে অগাস্ট, ১৯৭০ সাল। আমাদের পক্ষে এক চরম দুঃখের দিন মানসী ! কিন্তু ভারতীয় পর্বতারোহণের পরম পুণ্যতিথি। হিমালয়ের জন্য আত্মত্যাগের এক মহান ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে সেই শুভতিথিতে। সুজয়া ও কমলা সেদিন মহাজীবন লাভ করেছে। লীলাভূমি-লাহুল নাম সার্থক হয়েছে।

সেদিন প্রাতঃরাশ সেরে কমলা ও শেফালীকে নিয়ে সুজয়া মূল-শিবির থেকে বাতাল রওনা হল। সঙ্গে চলল, কুলি গিয়ালছেন ও পাসাং। সুদীপ্তা, নীলু ও পূর্ণিমা কিছুদূর এগিয়ে দিল ওদের। তারপরে তারা ফিরে গেল শিবিরে। কাল সকালেই শিবির গোটাতে হবে, আজ তাই একটু ভাল খাবার রান্না করা যাক্। সারদিন পরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে সুজয়াদি,কমলা....। তখন একটু ভাল খাবার পেলে খুশি হবে ওরা। তাদের কথা শুনে নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা নিশ্চয়ই অদৃশ্যলোক থেকে অনুকম্পার হাসি হাসছিলেন। কিন্তু তারা তা টের পায় নি, পাবার কথাও নয়।

আর আমরা ? আমরা যারা বহুদূরে ওদের পথ চেয়ে বসেছিলাম। অনেকদিন ওদের কোনো খবর আসে নি। সুজয়া শেষ চিঠি লিখেছিল মানালী থেকে, ৩রা অগাস্ট (১৯৭০) তারিখে। লিখেছিল, 'শত চেষ্টা করেও টাকার অপচয় রোধ করা যাচ্ছে না। জিনিসপত্রের জন্য কুলি-খরচাও হচ্ছে প্রচুর। আলুসেদ্ধ আর ফেনা-ভাত খেয়ে চলেছি, তবু টাকার সাশ্রয় হবার কোনো লক্ষণ নেই।

'সিমলাতে ওয়েস্টার্ণ কমাণ্ডের অফিসে গিয়ে আমরা অনেক কষ্টে ১৯৬৫ সালের সার্ভে করা ম্যাপ দেখেছি। ললনার চেহারা অত্যন্ত দুর্গম।...

'কবে ফিরে আসতে পারব, বলতে পারছি না। এর পরে আর চিঠি দিতে পারব না। কারণ আমরা সভ্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।....যতই দুর্গম হোক্, আমরা ললনা শিখরে আরোহণ করবই এবং তা যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে।'

তারপরে ওদের আর কোনো খবর পাই নি। স্বভাবতই আমরা সবাই গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। এই সময় সহসা ২৮শে অগাস্ট সকাল সাড়ে দশটার একটু পরে একটা টেলিগ্রাম এলো—

'MRS. SUJAYA GUHA LEADER OF LADIES LAHOUL EXPEDITION AND MISS KAMALA SAHA WERE INVOLVED IN AN ACCIDENT ON 26TH AUGUST IN KARCHA NALA NEAR SHIGRI GLACIER. THE DEADBODY OF MRS. GUHA WAS FOUND. WHILE THE BODY OF MISS SAHA IS STILL MISSING. THE TEAM HAS SUCCESSFULLY CLIMBED A PEAK OF 20,130 FEET IN LAHOUL ON 21ST AUGUST AND RETURNED TO BASECAMP ON 23RD AUGUST--

SUDIPTA SENGUPTA

শুধু আমরা নই মানসী, সারা ভারত সেদিন চমকে উঠেছিল এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে। সাফল্য-সংবাদের সঙ্গে এতবড় মর্মান্তিক বার্তা আর আসে নি হিমালয় থেকে।

তাই পরদিন সকালে ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল সেই দুর্ঘটনার সংবাদ। সবাই শ্রদ্ধা জানালেন সুজয়া ও কমলার উদ্দেশে।

৩০শে অগাস্ট (১৯৭০) 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখলেন—'দলনেত্রী শ্রীমতী সুজয়া গুহ এক দুর্ঘটনায় পড়িয়া নিহত...এবং সদস্যা শ্রীমতী কমলা সাহা নিখোঁজ হইয়াছেন। শ্রীমতী গুহের মৃত্যু নিঃসন্দেহে পর্বতাভিযানের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের শুন্যতা সৃষ্টি করিবে।....তাহার মৃত্যুতে শুধু তাহার পরিবার বা এই পর্বতারোহী দল নয়, সমগ্র দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হইল।'

'যুগান্তর' লিখলেন—'এই মৃত্যু আমাদের কাছে এক পরম সান্ত্বনাও বটে। আমরা জানলাম বিপদ যেখানে নিন্দিত এবং মৃত্যু সেখানে অসম্ভব নয়, সেখানে বঙ্গ-ললনারাও ঝুঁকির মুখে নিজেদের উন্মুক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত নন। এটা একটা পরম গৌরবের কথা। বাংলা দেশের ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের মধ্যেও দুঃসাহসের এই জাগরণ ভাবীকালের অভিযাত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা হয়ে থাকবে।'

'দৈনিক বসুমতী' লিখলেন—'ভারতের নারী অভিযাত্রীদের ইতিহাসে শ্রীমতী গুহের নাম লিখিত থাকিবে। আমরা শ্রীমতী গুহের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং বিশ্বাস করি যে যুগ যুগ ধরিয়া তাহার সাহসিকতার দৃষ্টান্ত তরুণদের অনুপ্রাণিত করিবে।'

সফলকাম মহিলা লাহুল অভিযানের ভাগ্যহীনা অভিযাত্রীরা ৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফিরে এলো। হাসতে হাসতে একদিন বিদায় নিয়েছিল যারা, কাঁদতে কাঁদতে তারা নেমে এলো গাড়ি থেকে। কাঁদলাম আমরাও। ওরা এসেছে, কিন্তু আসে নি সুজয়া, আসে নি কমলা। স্নেহের কমলাকে নিয়ে সুজয়া চিরদিনের মতো রয়ে গেছে লাহুলে—লীলাভূমি-লাহুলে।

কাঁদতে কাঁদতেই ওরা সেদিন বলল সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা, কাঁদতে কাঁদতেই আমরা শুনলাম অকরুণ করচা নালার সেই নিষ্ঠুর আঘাতের কথা। সেই কথাই আজ আমি তোমাকে লিখছি মানসী!

২৬শে অগাস্ট সকাল ন'টার সময় শেফালী ও কমলাকে নিয়ে সুজয়া রওনা হল বাতালের পথে। ওদের মূল-শিবির থেকে বাতালের দূরত্ব আট মাইলের মতো। সাত মাইল গিয়ে করচা নালা একটি পাহাড়ী নদী। হিমবাহ অঞ্চল থেকে সৃষ্ট হয়ে বাতালের কাছে চন্দ্রানদীতে মিশেছে। মূল-শিবিরে থেকে বাতাল যেতে হলে এই নদীটি পেরোতে হয়।

সেদিন সুজয়ারা যখন করচা নালার তীরে পৌঁছল, বেলা তখন সাড়ে বারোটা। তাই সকালে যেখানে মাত্র ফুটখানেক জল থাকে, সেখানে তখন প্রায় তিন ফুট জল। দুর্দাম ও দুর্বার হয়ে উঠেছে করচনা নালা। তুমি তো জানো মানসী, উচ্চ-হিমালয়ের এইসব নদীগুলি কত ভয়ঙ্করী!

ওরাও জানতো। তাই করচার সংহার মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ালো ওরা। সুজয়া বুঝতে পারল, কোমরে দড়ি না বেঁধে এই উত্তাল ও উদ্দাম জলধারাকে অতিক্রম করা সহজ কথা নয়। যাবার সময় ছোটধারার ঝুলা পেরিয়ে মূল-শিবিরে গিয়েছে। করচা যে এত ভয়ঙ্করী হতে পারে জানা ছিল না ওদের। তাই ওরা দড়ি আনে নি সঙ্গে। এমন কি সুজয়া আর কমলা 'আইস এক্স' পর্যন্ত আনে নি। কেবল একখানি আইস এক্স ছিল শেফালীর হাতে।

কুলিদের সঙ্গে পরামর্শ করল ওরা। কুলিরা তাদের নালা পেরোতে নিষেধ করল। অথচ বাতালকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সেখান থেকে—কতটুকুই বা পথ, বড় জোর মাইলখানেক

হবে ! সেখানে যেতে পারলে মানুষ দেখতে পাবে, ঘোড়া যোগাড় করা যাবে, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে পারবে।

তবু কুলিদের পরমার্শ অমান্য করল না সুজয়া। তাদের বলল, "তোমরা নালা পেরিয়ে বাতাল চলে যাও। গিয়ে দেখো, তাসী কি করছে ? শিগ্‌গীর ঘোড়া নিয়ে এসো। তোমরা ফিরে এলে একসঙ্গে শিবিরে ফিরব। আমরা ততক্ষণে এখানে পাথর কুড়াচ্ছি।"

হ্যাঁ, সত্যি মানসী—সেদিন ওরা করচার তীরে অনেক সুন্দর সুন্দর পাথর কুড়িয়েছিল। পাথর কুড়োতে বড় ভালোবাসত সুজয়া, আর শুধু পাথরই বা বলি কেন, সুন্দর ও বিচিত্র সকল বস্তুর প্রতি একটা আশ্চর্য মমতাবোধ ছিল তার। সুযোগ পেলেই সে তা সংগ্রহ করত, ঘরে এনে সাজিয়ে রাখত। আজ সুজয়া নেই, কিন্তু আছে তার সেই সব কুড়িয়ে আনা পাথর, ঝিনুক, ফেনা আর ক্যাক্‌টাসের সংগ্রহ। তারা আছে সুজয়ার অক্ষয় স্মৃতি হয়ে।

সেদিন একসময় ওদের পাথর কুড়ানো শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কুলিরা ফিরে এলো না। এতক্ষণে তো ফিরে আসা উচিত ছিল। বিশেষ করে সে যখন বলে দিয়েছে, একজনকে অন্তত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে—ঘোড়ার খবর নিয়ে আসতে। তাহলে কি ঘোড়া পাওয়া যায় নি ? না, ওরা দু'জনও তাসীর মতোই মতলববাজ ?

সুজয়া চিন্তিত হয়ে পড়ে। কমলা ও শেফালীর সঙ্গে আলোচনা করে। তারাও সমর্থন করে তাকে। কুলিদের ভরসায় আর এখানে বসে থাকা সমীচীন নয়। তার চেয়ে খুব সাবধানে পেরোনো যাক্ করচা নালা। একবার ঘুরে আসা যাক্ বাতাল থেকে। নিজেরা গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসা দরকার। ভয় পাবার কি আছে, বিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু ললনা শিখরে উঠতে পারল আর এই বিশ ফুট চওড়া নালাটা পেরোতে পারবে না ? ওরা বাতাল গেলে বাড়তি রোজগারের অসুবিধে হবে বলেই কুলিরা ওদের নালা পেরোতে নিষেধ করেছে।

হাত-ধরাধরি করে ওরা তিনজন উচ্ছ্বাসিত করচা নালার হিমশীতল জলে নেমে পড়ল। প্রথমে সুজয়া, তারঁপরে কমলা। সবার শেষে শেফালী—তার হাতে আইস এক্স। সবারই পরনে হলুদ রংয়ের 'উয়িন্ডপ্রুফ জ্যাকেট'।

কোমর সমান জল। প্রবল বেগে বয়ে চলেছে চন্দ্রার সঙ্গে মিলিত হতে। মুহূর্তের অসাবধানতায় মৃত্যু। ওরা শক্ত হাতে একে অপরকে ধরে, খুব সাবধানে এক-পা এক-পা করে চলল এগিয়ে। সুজয়া অর্ধেক পথ পেরিয়ে এলো। এমন সময়....

এমন সময় সহসা শেফালীর হাত থেকে আইস এক্সটা ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে ধরতে গেল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে কমলার হাত থেকে তার হাত গেল খুলে। সে কাত হয়ে জলের ভেতর পড়ে গেল। তুষারশীতল দুর্বার জলধারা তাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবার আগে একবার শুধু শেফালী দেখতে পেলে, সুজয়া ও কমলা তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। সুজয়া চিৎকার করে বলছে, "আইস এক্স, আইস এক্স'।"

সুজয়া সেদিন শেফালীকে কি বলতে চেয়েছিল আমি জানি না মানসী ! তুমিও জানতে পারবে না সেকথা। তারপরে যে আর কেউ কোনোদিন সুজয়ার কথা শোনে নি, দেখতে পায় নি কমলাকে।

কতক্ষণ পরে বলতে পারে নি শেফালী। শুধু বলেছে যে জ্ঞান ফিরে আসার পরে সে দেখতে পেলো, নালার তীরে বড় একখানি পাথরে তার দেহটা আটকে রয়েছে

কোনোমতে। যেখানে সে জলেপড়ে গেছে, সেখান থেকে জায়গাটার দূরত্ব কম করেও পঞ্চাশ ফুট। কখন সে সেখানে গেল, কেমন করেই বা গেল ? কিছুই মনে পড়ল না তার। কেবল মনে পড়ল, জলে পড়ে যাবার কথা, আর সুজয়া ও কমলার কথা। বুঝতে পারে সে বেঁচে আছে এবং যেমন করেই হোক তাকে জল থেকে উঠতে হবে।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। না, তেমন কোনো গুরুতর আঘাত লাগে নি, কেবল কয়েকটা জাগয়া ছড়ে গেছে। সে খুব সহজেই জল থেকে তীরে উঠে এলো।

কিন্তু ওরা কোথায়—সুজয়াদি আর কমলা। ওরা যে ওখানেই ছিল। জলে পড়ে গিয়েও সে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে ওখানে। শেফালী ছুটে আসে সেখানে। শীতে তার সর্বশরীর হিম হয়ে গেছে, গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চাইছে না, তবু সে চিৎকার করে ওঠে, সুজয়াদি...ই,...কমলা...আ,...কমলি...ই ই, সুজয়...আ...দি...ই...ই..."

কেউ সারা দেয় না। শুধু শেফালীর গলাফাটা চিৎকার মনুষ্যবর্জিত বড়াশিগ্‌রী হিমবাহের পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে শেফালীর কাছেই ফিরে আসে। কোথায় সুজয়া, কোথায় কমলা ? কেউ নেই। কিছু নেই।

তবু শেফালী ডাকে। বার বার ডাকে তার সুজয়াদি ও কমলাকে। কিন্তু তারা সাড়া দেয় না।

ওরা কি তাহলে তাকে একা ফেলে করচা নালা পেরিয়ে চলে গেছে বাতাল ? কিংবা ফিরে গেছে শিবিরে ? ছি, ওরা এত স্বার্থপর ! একবার দেখল না শেফালী বেঁচে আছে কিনা ? ভেবে দেখল না, সে একা একা কেমন করে এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পেরিয়ে ফিরে যাবে শিবিরে ? অভিমানে তার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে।

চোখ মুছতে গিয়ে কিন্তু তার মনে হয়—না, সুজয়াদি তো স্বার্থপর নয়। স্বার্থপর নয় কমলা। না,কখনই নয়। এই অভিযানের জন্য যত দুঃখ-কষ্ট এসেছে, তার অধিকাংশ সয়েছে ওরা দু'জনে। তাহলে ওরা কোথায় গেল ?

শেফালী আবার ফিরে আসে নালার ধারে। না, কেউ নেই। কেবল করচার কলোচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে।

নিঃসঙ্গ শেফালী শ্রান্ত চরণে চলতে শুরু করে। অবসন্ন শরীরটাকে কোনোমতে বয়ে নিয়ে চলে শিবিরের দিকে—শিবির বহুদূর।

বেলা প্রায় তিনটার সময় পাসাং এবং গিয়ালছেন ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসে করচার তীরে। ওপারে মেমসাবদের বসে থাকার কথা, কিন্তু তারা তো নেই। তাহলে কি তাদের দেরি দেখে মেমসাবরা শিবিরে ফিরে গেছেন ? ভালই করেছেন।

ঘোড়া পেলে খোঁড়া হওয়া—সংসারের সাধারণ নিয়ম। কুলিদের বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। দুটি ঘোড়ার পিঠে চেপে পাসাং ও গিয়ালছেন করচা নালার জলে নামে— নালা পার হতে থাকে।

প্রায় একই সঙ্গে দুজনের নজর পড়ে সেদিকে। দুজনেই চিৎকার করে ওঠে, "হলুদ রঙের ওটা কি জলে ভাসছে ? মেমসাবদের কারও উয়িন্ডপ্রুফ্ নয় তো !"

দুজনেই জলে লাফিয়ে পড়ে। ছুটে যায় সেখানে—সামান্য দূরে। তাড়াতাড়ি তুলতে যায় সেই হলুদ জামাটি। কিন্তু এ তো শুধু জামা নয়, এ যে একজন মানুষ। হ্যাঁ, মানুষ...মেমসাব...তাদের লীডার-মেমসাব—আমাদের সুজয়া।

সুজয়া আর নেই মানসী—শেষ, সব শেষ।

ধরাধরি করে ওরা সুজয়াকে তুলে আনে তীরে। শরীরে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। সে যেমন ছিল তেমনি আছে, কেবল তার প্রাণটুকু নেই। থাকবে কেমন করে, সে যে প্রাণ দান করেছে। তার সাধের লাহুলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সুজয়া। সে সৌভাগ্যবতী, তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ পূর্ণ হয়েছে।

পাসাং বসে রইল সুজয়ার কাছে। গিয়ালছেন সংক্ষিপ্ত পথে ছুটে এলো শিবিরে। শেফালী তখনও আসে নি সেখানে। আনন্দময় শিবিরে মুহূর্তে মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে এলো। সুদীপ্তা, নীলু ও পূর্ণিমা পাগলের মতো কেঁদে উঠল।

আলো নিয়ে কুলিরা রওনা হল করচা নালার দিকে। কিছুদূর এগিয়ে ওরা দেখতে পেলো শেফালীকে। সুজয়ার মৃত্যুসংবাদ শুনে শেফালী পথের ওপর বসে পড়ল। কুলিরা কোনোমতে অর্ধচেতন শেফালীকে নিয়ে এলো শিবিরে—সুজয়ার ললনা অভিযানের মূল-শিবিরে। সেখানে সুজয়া নেই, কোনো দিন আর সে আসবে না সেখানে।

কুলিরা আবার রওনা হল। দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছল করচা নালার তীরে। নিষ্ঠুর স্রোতস্বিনী তখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ?

পাসাং তেমনি ভাবে বসে আছে সুজয়ার শিয়রে। তার দু'চোখে তখনও নেমে আসছে অশ্রুধারা। বড়াশিগ্রীর শীতল বাতাস সে আশ্রুরাশিকে তুষারে পরিণত করতে পারে নি।

রাত্রির ভয়াবহতা, হিমবাহের শীতলতা ও পথের দুর্গমতাকে উপেক্ষা করে কুলিরা করচার তীরে তীরে খুঁজে বেড়ালো কমলাকে—সুজয়ার কমলিকে। কিন্তু পেলো না তাকে।

পরদিন সকালে সুদীপ্তারা ছুটে এলো অভিশপ্ত করচা নালার তীরে। তারাও পাগলের মতো খুঁজে বেড়ালো। কিন্তু তাদের কমলাকে আর পেলো না খুঁজে।

শুধু ওরা নয় মানসী, তারপরে আরও অনেকে খুঁজেছেন। খুঁজেছেন 'ইন্দো টিবেটান বর্ডার পুলিশে'র অনুসন্ধানী দল। কিন্তু পাওয়া যায় নি তাকে। আর্ভিন, ম্যালোরী, অমর ও গৌরাঙ্গের মতো কমলাও চিরদিনের মতো গেছে হারিয়ে।

ভারত-তিব্বত-সীমান্তরক্ষীদলের এই অন্বেষণ সম্পর্কে কমাণ্ডার এম. এস. কোহলী (১৯৬৫ সালের সফলকাম ভারতীয় এভারেস্ট ২৯০২৮´ অভিযানের নেতা) যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, আমি এই সঙ্গে তোমাকে তার অনুলিপি পাঠালাম মানসী—

'Commandant, Indo-Tibetan Border Police Battalion and Sub-Divisional Magistrate returned to Kulu from Keylong...Ashes of Mrs. Guha being taken by the members of the expedition to Calcutta. Windproof of Miss Saha found mear the confluence of Rifhi Nala and Chandra river and is in the custody of police Station, Keylong. Seems body has floated in Chandra. Impossible to trace body now. Search by I. T. B., Police abandoned on 1st September.'

পুলিশের গাড়িতে করে সেদিন রাতেই সুজয়াকে নিয়ে যাওয়া হল খোকসার—তিন বছর এগারো মাস পাঁচ দিন আগে আমাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যে-খোকসার পৌঁছেছিল সুজয়া। যে বিশ্রামভবনে বসে সুজয়া আমাদের রান্না করে খাইয়েছিল, সেই বিশ্রামভবনেরই একখানি ঘরে তার প্রাণহীনা দেহটিকে সযত্নে শুইয়ে রাখা হল।

পরদিন ২৮ শে অগাস্ট—সেই গাড়িতে করেই সুজয়াকে সঙ্গে নিয়ে সুদীপ্তারা রওনা হল কেলং। সেই চন্দ্রানদীর পুল পেরিয়ে পথ। যে চন্দ্রাকে দেখে সুজয়া সেদিন খুশি হয়েছিল, সেই চন্দ্রার দিকে তাকিয়েই তার সহযাত্রীরা কেঁদে আকুল হল—চন্দ্রা তাদের কাছ থেকে কমলাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

সেই একই পথ মানসী, যে পথ দিয়ে সেদিন সুজয়া আমাদের সঙ্গে কেলং গিয়েছিল! সেই শিশু গোন্ধলা ও তাণ্ডি—যে তাণ্ডিতে যাবার পথে সেদিন সুজয়া বলেছিল, "মরতে তো একদিন হবেই। কিন্তু হিমালয়ের বুকে মৃত্যু ক'জনের অদৃষ্টে জোটে।....আমার যদি সত্যি সে সৌভাগ্য হয়, আমি যদি লাহুলের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি, তাহলে তোমরা আমার এই নশ্বর দেহ চন্দ্রা কিংবা ভাগার তীরে পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিও।"

আমাদের দুর্ভাগ্য মানসী, সৌভাগ্যবতী সুজয়ার সেই পরম প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আমরা সেখানে উপস্থিত হতে পারি নি। কিন্তু তার সেই অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। পূর্ণ করেছে তারই স্নেহের সহযাত্রীরা—সুদীপ্তা, শেফালী, নীল ও পূর্ণিমা। ৩০শে অগাস্ট (১৯৭০) তারা উদার উন্মুক্ত ও রমণীয় মহাশ্মশান ইস্তিংরীতে তাদের প্রিয়নেত্রী শ্রমতী সুজয়া গুহের শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করেছে।

তারপরে? হ্যাঁ, আছে মানসী। আমি তোমাকে বলছি, তারপরেও আছে। আছে সুজয়া, আছে কমলা। আর্ভিন ও ম্যালোরীর মতো, গৌরাঙ্গ ও অমরের মতো, সুজয়া আর কমলাও আছে বেঁচে। বেঁচে আছে হিমালযের জলে স্থলে আর অন্তরীক্ষে, বেঁচে আছে লীলাভূমি-লাহুলের অণুতে আর পরমাণুতে।

সুজয়া আর কমলা বেঁচে থাকবে মানসী—ওরা বেঁচে থাকবে চিরকাল। বেঁচে থাকবে তাদের এই প্রিয় পৃথিবীর শত-সহস্র মানুষের অন্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। ওরা বেঁচে থাকবে তোমার আর আমার অন্তরে।